সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু
মহাজীবনের মহাকাব্য

সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু
মহাজীবনের মহাকাব্য
মজিদ মাহমুদ

সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু
মহাজীবনের মহাকাব্য
মজিদ মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ ❑

স্বত্ব ❑ লেখক

প্রকাশক ❑

বর্ণবিন্যাস ❑ বৌটুবানী
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭৬৬০৬৬৬০৬, ০১৭৮৮৪০৫৪০৬
ই-মেইল : boutubani.bd@gmail.com

মুদ্রক ❑

প্রাপ্তিস্থান ❑ বাতিঘর, পাঠক সমাবেশ, প্রথমা, বিদিত, সন্ধিপাঠ, প্রকৃতি, রকমারি ডট কম।

প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

মূল্য ❑ ৫৯০ টাকা

Sahitte Bangabandhu Mahajibaner Mahakabbo
by Mozid Mahmud,

ISBN :

Price : BDT 590.00
USD 21.00$

উৎসর্গ

আমার কোনো বন্ধু নেই বঙ্গবন্ধু ছাড়া

মুখবন্ধ

বিষয় বিবেচনায় 'বঙ্গবন্ধু-সাহিত্য' নামে বাংলাসাহিত্যে এক নতুন শাখার আবির্ভাব হয়েছে। বিষয়-শৈলীর পাশাপাশি অঙ্গ-শৈলীরও বৈচিত্র্য এসেছে এ শাখায়। একটি জাতির অধিকাংশ কবি যখন জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে একই বিষয়-শৈলীর আওতায় সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করে থাকেন তখন সেটি সাহিত্যের শাখা হিসাবে পরিগণিত না হয়ে পারে না। যেমন মর্সিয়া, এলিজি, মসনবি, ট্র্যাজেডির বিষয় ও আঙ্গিক সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে কিছুটা আলাদা। লন্ডন চার্চের হত্যাকাণ্ডের পরে যেমন কেন্টাবারি টেলস, মার্ডার ইন দ্য চার্চ, মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল, কিংবা থমাস গ্রে কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড-এর মতো শক্তিশালী করুণ শোকগাথার সৃষ্টি হয়েছে; তেমন মহানবীর দৌহিত্রদের কারবালা প্রান্তরে করুণ পরিণতির পরে মর্সিয়া সাহিত্য রচনা হয়েছে; আবার হযরত আলীর মাহাত্ম্যগাথা নিয়ে কাওয়ালী কাব্য-সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও করুণ পরিণতি নিয়ে তেমনি সৃজনশীল রচনার ফলগুধারার সৃষ্টি হয়েছে।

তেইশ বছরের পাকিস্তান পর্বে শেখ মুজিবুর রহমানের আপোষহীন নেতৃত্ব, বিশেষ করে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ঊন-সত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন পর্যন্ত এই সময়কালের ঘটনা, জেল-জুলুম নিয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রান্তরের কবি সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেছিলেন। চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বঙ্গবন্ধু যখন জেলে, জেল থেকে দেশে ফেরার পরেও তাঁকে নিয়ে অনেক সাহিত্য রচিত হয়। সে-সব সাহিত্যের বিষয় ছিল বীরগাথামূলক। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার পরে, কিছুদিন স্তব্ধতা নেমে এলেও ধীরে ধীরে কবি সাহিত্যিকগণ জাতির পিতার এই করুণ কাহিনিকে অবলম্বন করে এক ধরনের এলিজি ট্র্যাজেডি ও মর্সিয়া সাহিত্যের মতো একটি নতুন ধরনের সাহিত্য তৈরি করার প্রয়াস পান।

এসব সাহিত্য যদিও সব সময় নিরঙ্কুশ ভালোবাসা-জাত নয়, তবু বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের অংশগ্রহণমূলক হওয়ায় সংখ্যার দিক দিয়ে বিশালতায় রূপ নিয়েছে। বাঙালি এমন কবি সাহিত্যিক পাওয়া দুষ্কর- যারা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু লেখেননি। লেনিন, মাওজেদং, চে গুয়েভারা, লিঙ্কন, মহাত্মা গান্ধী ছাড়া এমন কোনো রাষ্ট্র

নায়ক হয়তো পৃথিবীতে নেই যাকে নিয়ে এত সাহিত্যকর্ম হয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত করে বলা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি সাহিত্য হয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলা ভাষায় যতটা সাহিত্য রচিত হয়েছে তার কাছাকাছি আর কেউ নেই। ফলে কেউ চাইলে কেবল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত সাহিত্যধারার উপরে রীতিমতো গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে পারেন।

তাছাড়া ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রকাশিত হওয়ার পরে এই ধারা আরো পরিপুষ্ট হয়েছে। একটি জাতির স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তির জীবন ও কর্মের ভাষাগত রূপদানের দক্ষতা তাঁকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, উইনস্টন চার্চিলের সারিতে নিয়ে এসেছে। ১৯৪০ সালের ভারত বিভাগের চূড়ান্ত পর্ব থেকে তেইশ বছরের পাকিস্তান পর্বের বাঙালির লড়াই সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ইতিহাস তাঁর গ্রন্থ ছাড়া আর কোথাও এতটা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পাওয়া যায় না। ফলে সাহিত্যিকদের রচনার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর রচনা একটি সম্পূরক সাহিত্যমূল্য তৈরি করেছে।

তবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অধিকাংশ বই সংকলন জাতীয়। আবার লেখক শিরোনামের ব্যাপারে যতটা আগ্রহী বিষয়ের গভীরে যাওয়ার ব্যাপারে ততটা আন্তরিক নন। বঙ্গবন্ধুকে সেরা বাঙালি প্রমাণে বিবিসির জরিপে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল জনমত জরিপ। শুধু জনমতের দ্বারাই কি হাজার বছরে ভাষা-জাতির কারো পক্ষে সেরা প্রমাণিত হওয়া সম্ভব। এতে গুণগত ব্যাখ্যা অধিকাংশ বইয়ে অনুপস্থিত। এমনকি যাঁরা এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন তাদের উপসংহার প্রাক-ধারণা প্রসূত। এই বইয়ে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করা হয়েছে।

আমার এই বইয়ের প্রধানত উদ্দেশ্য সাহিত্যিক, দ্বিতীয়ত বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা ও রীতির প্রয়োগ। পাশাপাশি কিভাবে তিনি ইতিহাসে সেরা বাঙালিতে পরিণত হলেন। কিভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অঙ্গীভূত করলেন, এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর দ্বারা প্রসারিত হলেন।

এই গ্রন্থের রচনাগুলো যেমন আমার সৃজন ও মননশীল সাহিত্য পরিকল্পনার অংশ, তেমন অনেকখানি সংগ্রাহকের ভূমিকাও পালন করা। তাছাড়া এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য আমার ব্যক্তিগত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি তৈরি করা। আশা করি কাজটি বঙ্গবন্ধুর সাহিত্য নিয়ে যারা ভবিষ্যতে কাজ করবেন তাদের সহায়ক হবে।

মজিদ মাহমুদ
ঢাকা, নভেম্বর ২০২১
mozidmahmud@yahoo.com

সূচি

তিনি কেন সেরা বাঙালি ১১

শ্রীনীরদ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি প্রকল্প ও বঙ্গবন্ধু ২০

অসমাপ্ত আত্মজীবনী : মহাজীবনের মহাকাব্য ৪১

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি সংস্কৃতির সরণি ৮৩

নজরুল ও বঙ্গবন্ধু : একই বৃন্তে দুটি কুসুম ১০০

কবিতায় উৎকীর্ণ বঙ্গবন্ধুর মুখ ১১৫

বঙ্গবন্ধু বাংলা গল্পে রূপকথার রাজপুত্র ১৫৫

প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্গবন্ধু : বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা ১৮১

টেলেমেকাস ও এ্যাগামেমনন্ : মিথ ও বাস্তবতা ২০৬

সেই রাত্রির কল্পকাহিনি : মহানায়কের আবির্ভাব ২৩৮

যিসাস মুজিব ও ইথাকা ২৫১

বাঙালির বঙ্গবন্ধু ২৭২

স্বীয় কবিতায় বঙ্গবন্ধু ও স্বাধিকারের গান ২৮৬

চারণ কবিতায় দয়ার রাজা মুজিবর ৩০৭

শিশু ও ছড়া সাহিত্যে বঙ্গবন্ধুর হাসি ৩৩৪

আমার বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ : বাল্যস্মৃতি ৩৪৮

গ্রন্থপঞ্জি ৩৬৬

পত্রপত্রিকা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ ৩৬৮

নির্ঘণ্ট ৩৬৯

তিনি কেন সেরা বাঙালি

'সূর্য যখন অস্ত গেল, সোনালি রঙ আকাশ থেকে ছুটে আসছে। মনে হল, তাজের যেন আর একটা নতুন রূপ। সন্ধ্যার একটু পরেই চাঁদ দেখা দিল। চাঁদ অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে আর সাথে সাথে তাজ যেন ঘোমটা ফেলে দিয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে। কি অপূর্ব দেখতে! আজও একুশ বৎসর পরে লিখতে বসে তাজের রূপকে আমি ভুলি নাই, আর ভুলতেও পারব না।'
– (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

১.

যদিও আমরা প্রায়ই বলে থাকি হাজার বছরের বাঙালি জাতি, তবু একটি জাতির কালগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের সাধারণীকরণ খুব স্পষ্ট করে না। হাজার বছরের জাতি দ্বারা নিশ্চয় বোঝানো হয়ে থাকে বাঙালি জাতির বয়স কমবেশি এক হাজার বছর। একটি জাতির ক্ষেত্রে এটি কেবল তখনই বলা সম্ভব, যখন একটি মানবগোষ্ঠী কোনো বিশেষ কারণে অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে যায়- নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে যে ধরনের নৃতাত্ত্বিক মানবগোষ্ঠীর দ্বারা এই ধারাক্রম চালু হয়েছিল তা এক হাজার বছর আগেও বিদ্যমান ছিল। হতে পারে তারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করতেন, কিংবা কাছাকাছি একই অঞ্চলে থাকতেন। আবার এমনও হতে পারে তারা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে থেকে অভিভাসিত হয়েছিলেন। হয়তো একটি বিশেষ কারণে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের দ্বারা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দ্বারা, পেশা ও যন্ত্রণা ভোগের দ্বারা, গায়ের রঙ শরীরের গঠন ও পছন্দের দ্বারা নিজেদের সুখ-দুঃখকে ভাগাভাগি করেছিলেন।

বাঙালি জাতি হওয়ার ক্ষেত্রে সকল পারস্পারিক বিষয়াদি ছাড়িয়ে যে অভিন্ন বিষয়টি তাদের পরিচয় নির্ণয় করেছিল, তা হলো- তার ভাষা। বাংলা ভাষার লিখিত প্রমাণাদি এক হাজার বছরের কাছাকাছি হওয়ায় আমরা হাজার বছরের বাঙালি জাতি বলার জন্য উদ্বুদ্ধ হই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল

রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে চর্যাপদের যে অমূল্য সম্পদ আহরণ করে এনেছিলেন, তা-ই ছিল বাংলা ভাষার প্রথম লিখিত নিদর্শন। এই গীতিকাগুলির বয়স বিবেচনায় দেখা যায় এখন থেকে কমবেশি হাজার বছর আগে এটি রচিত হয়েছিল। তবে এটা ঠিক, লিখিত ভাষার আগেও মৌখিকভাবে এই ভাষা গড়ে উঠতে অন্তত আরো কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন ছিল। ভাষা ও লিপি তৈরির সময় ও কষ্টসাধ্য পথ পেরিয়ে চর্যার কবিতাগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পাশাপাশি এই ভাষার আদি নৃগোষ্ঠী নিশ্চয় পূর্বেও কোনো ভাষায় কথা বলত। সেই সব নিদর্শনের ভিত্তিতে বলা হয়, সংস্কৃত থেকে মাগধী বা গৌড়িয় অপভ্রংশ হয়ে আজকের বাংলা ভাষার সূত্রপাত হয়েছিল।

এটি ভেবে আশ্চর্য হতে হয়, যেসব উৎসভাষার নিগড় থেকে এই ভাষা তার রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার নিদর্শন আজ প্রায় বিলুপ্ত। এর অন্যতম কারণ কেন্দ্রের কঠিন সুশৃঙ্খল থেকে এই ভাষাটি পারস্পারিক যোগাযোগের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র তার খোঁজ বড় কমই রাখত। বরং রাজা ও তার পণ্ডিতদের কাছে যখন প্রতিভাত হতো সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের ভাষায় তাদের ধর্ম ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সহজ অংশিদার হওয়ার চেষ্টা করছে, তখন তারা নানা রকম নিবর্তন আইন চালু করতো। তাই লক্ষ্য করা যায়, এই ভাষা-জাতির বিরুদ্ধে ইতিহাসের সবকালে ছিল দমনমূলক নীতি। সাধারণ মানুষ যখন প্রথম পর্যায়ে নিজেদের ভাষায় বেদ পুরাণের কাহিনি রচনা করতে শুরু করলেন, তখন বলা হলো- যারা রামের চরিত, অষ্টাদশ পুরাণ মানব ভাষায় রচনা ও পাঠ করবে তারা রৌরব নরকে অনন্তকাল দগ্ধ হবে। উচ্চবর্গের এই আইন সব কালেই বলবৎ ছিল। ইতিহাসের মধ্যযুগে এই অঞ্চলে মুসলিম শাসনের সময় অভিজাত শ্রেণি বাংলাকে অচ্ছুৎ ভাষা বিবেচনা করতেন। বাংলা চর্চার বদলে আরবি-ফারসিকে তারা প্রাধান্য দিতেন। আব্দুল হাকিমসহ অসংখ্য কবিদের রচনা থেকে আমরা সেই বেদনাময় ও প্রতিবাদি বর্ণনা পাই। পাকিস্তান পর্বে এই ভাষা বিভেদ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলার বিরুদ্ধে উর্দুর আধিপত্যবাদ এই ভাষাভাষির জনগণকে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসে। তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে বাংলাভাষার প্রতি নিবর্তন মানেই বাংলাভাষী জনগণের প্রতি নিপীড়ন। ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসন অবসানের আগেই ভাষা প্রশ্নে যথেষ্ট বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল- ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা কি হবে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের সময়ে উর্দুবলয়ের নেতাদের চিন্তায় কস্মিনকালেও এটি ধরা পড়েনি যে বাঙালির অধিকাংশ মুসলমান হলেও তাদের জাতিগঠনের সাধারণ উপাদান ধর্ম নয়। যে ভাষার জন্য তারা নির্যাতিত হয়েছে, যে ভাষা তাদের কাছাকাছি বসবাস করতে সহায়তা করেছে। এই একটি মাত্র ভাষা ছাড়া অন্য কোনো কুলিনভাষায় তাদের অধিকার ছিল না, সেই ভাষা গোষ্ঠীর প্রতি আর যা-ই হোক তাদের অনুগামিতা ছিল না। ফলে নির্যাতিত বাঙালি মুসলমান কিংবা অচ্ছুৎ বাঙালি হিন্দু মূলত একই যন্ত্রণার অংশিদার ছিল। তাদের জন্য ধর্ম পরিবর্তনও ছিল প্রধানত নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ও প্রতিবাদের অংশ। সাতচল্লিশ সালের আগে পর্যন্ত বাঙালির জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ততটা প্রকট ছিল না, তার প্রমাণ ভারত বিভাগের সময়ে অখণ্ড বাংলা ভূখণ্ডের মানুষের নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা। আর এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ নেতৃত্বের অভাব। বাঙালিকে একত্রিত করে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের দাবি করা তখনো তৎকালীন নেতাদের পক্ষে ভাবা সম্ভব হয়নি। বাংলা ভাগের পেছনে তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা খুব কার্যকরি হয়নি। যার ফলে ভারতবর্ষে বাঙালি সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুত্ব ও মুসলমানিত্বের ভিত্তিতে এই বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে বিভক্তির দেয়াল তুলে দেয়। এর অন্যতম কারণ তখন পর্যন্ত বাঙালি জাতির মধ্যে নেতৃত্বের দুর্বলতা, অন্য জাতির নেতাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়া এবং জনগণের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক না থাকা।

২.

বাঙালিদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র দরকার এটি সর্ব-প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই অনুভব করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে জাতির স্বাধীনতা নেই, সে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই। একটি সর্বভৌম জাতিসত্তার জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বাধীন রাষ্ট্র-ক্ষমতা না থাকলে অন্যজাতির একদিকে যেমন করতলগত থাকতে হয়, অন্যদিকে কালে কালে জাতিসত্তার বিলুপ্ত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন, বাঙালি স্বাধীন না হলে, বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন সর্বভৌম রাষ্ট্র না থাকলে পাঞ্জাবিরা ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার দ্বারা, নৃতত্ত্বের ভ্রান্ত পাঠ দ্বারা, এমনকি শুদ্ধিকরণের নামে বাঙালি জাতির স্বকীয়তা ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র এক বছরের মধ্যে উর্দুকে বাংলার উপরে চাপিয়ে দেয়ার নির্লজ্জ ও অযৌক্তিক পদক্ষেপ তারা

গ্রহণ করে। আরবি হরফে বাঙলা লেখার দুষ্কর্মও তারা ভাবতে থাকে। তাদের এই দুষ্কর্মে সহযোগিতার জন্য কিছু দেশি সহযোগীরা সব সময় হাত বাড়িয়েই ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগণ বাঙালি জাতির উপরে তাদের চাপিয়ে দেয়া ভাষা-প্রকল্পে সফল হতে পারলে এতদিনে আমাদের রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিংবা মধ্যযুগের আরো আরো কবিদের পরিচয়ের সঙ্কট দেখা দিত। ভাষা প্রকল্পে সফল না হওয়া সত্ত্বেও তারা পাকিস্তানি রেডিও টিভিতে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করেছিল, নজরুলের হিন্দু মিথযুক্ত কবিতা বাতিল ঘোষণা করেছিল। কেবল সেই সব কবি ও কবিতাই তাদের পছন্দ ছিল- যেখানে পাকিস্তান জিন্দাবাদ কিংবা তাদের পক্ষে যায় এমন কবিতা। বাঙালি জাতিকে তার ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থই তাদের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারকে খর্ব করা। চর্যার কাল থেকে এই জাতি তার ভাষার কারণে যেভাবে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল সেই একই কারণে তথাকথিত উচ্চবর্গের দ্বারা নিপীড়নের শিকারও হয়েছে। চর্যার কবি ভুসুকা পা-র মধ্যেও সেই কষ্ট বিদ্যমান ছিল- "আজ ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী/ ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।" একই কষ্ট বহন করেছিলেন, আব্দুল হাকিম, দৌলত কাজী, আলাওল, চণ্ডীদাস। বাংলায় কবিতা লেখার জন্য তাদের সে যুগেও নিগৃহীত হতে হয়েছিল। এমনকি অনেককে হত্যা করা হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির অস্তিত্বের জন্য বাঙালিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র-পরিকল্পনার বিকল্প ছিল না। কিন্তু কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। সুদূর প্রসারী প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ছাড়া তা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না এর বাস্তবায়ন। একটি দেশ থেকে আরেক স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ের নেতৃত্ব সামান্য ভুল হলে ব্যাপক প্রাণহানীর যেমন আশঙ্কা থাকে তেমন নতুন করে আবারো শৃঙ্খলার মধ্যে আটকে পড়তে হয়।

ফলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য তাঁর পাকিস্তান পর্বের পুরো সময়কাল বিবেচনা করতে হবে। তিনি কেবল এই তেইশ বছর সময়কালে সরাসরি বিপ্লব আন্দোলনের ডাকই দেননি, তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে এ দেশের মানুষকে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন- যাতে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি তারা করতে পারে। পাকিস্তানের মাত্র তেইশ বছরের জীবনকালে তিনি তের বছরের অধিক সময় জেলে থেকেও পাকিস্তান সরকারের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলেন। অথচ কোনোভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ সহজ

ছিল না যে, তিনি অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায়, অন্য কোনো দেশের সহায়তায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। বরং তাঁর সহিষ্ণুতা ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি পাকিস্তান স্বৈরশাসকদের আরো সংকটে ফেলে দিয়েছিল। এভাবেই বঙ্গবন্ধু একই সঙ্গে বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। তাঁর এই অবিসংবাদিত ও সর্বব্যাপী নেতৃত্বের প্রতি এই অঞ্চলের প্রায় সকল মানুষ ও জনগোষ্ঠী নিঃশর্ত মেনে নিয়েছিল, এমনকি ভিন্ন রাজনীতির বিশ্বাসের মানুষরা তাঁর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। তবে কতিপয় পাকিস্তানি দোসর ও তাদের অনুগামী ছাড়া।

৩.

এই আলোচনার দ্বারা এটি প্রমাণ করা যে, হাজার বছরের বাঙালি জাতির মধ্যে কেন শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে বিবেচনা করা হয়? কেবল বাঙালির হিসাবে নয়, বিবিসি-সহ সকল বিদেশি মিডিয়ার নানা জরিপেও এই সত্য উঠে এসেছে। অনেকে এই সত্য বুঝতে পারেননি, কিংবা অনেকে বুঝতে চেষ্টা করেন না, আবার বিরুদ্ধবাদিরা সকল সত্য অস্বীকার করতে চায়। এখানেই প্রমাণ্য যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে বাঙালি জাতির সকল কৃতিত্ব ইতিহাসে অস্বীকৃত থেকে যেতে পারত; কিংবা বাঙালি জাতির সকল গৌরবময় ইতিহাস ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হতো। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ- যিনি এই ভাষার সাহিত্যিক হিসাবে নোবেল বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসককুলের দ্বারা তার সৃষ্টিকর্ম অপসারিত হয়েছিলেন। সুতরাং রাজনৈতিক অধিকার সবার চেয়ে বড়। যে জাতির স্বাধীনতা নেই সেই জাতির বীরত্বেরও স্বীকৃতি নেই। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের আগে বাঙালির সকল কর্মের স্বীকৃতি কেবল তার ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত। জাতির জনকের নেতৃত্বের ফলে অতীতের সকল বিচ্ছিন্ন বীরত্ব ও কৃতিত্ব জাতিগত কৃতিত্বে রূপ নেয়। সুতরাং ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বাঙালির কৃতিত্ব তাঁর জন্য অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর নেতৃত্বেও বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ আছেন, নজরুল আছেন, হিন্দু আছেন মুসলমান আছেন- কেউ আর আলাদা নন।

আমরা যদি বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, অভিবাসী বাঙালি- সবার দিকে তাকাই- তাহলে দেখব একটি স্বাধীন বাংলার দিকে তারা আকুল আগ্রহে চেয়ে আছে। এই স্বাধীন বাংলাদেশ তাদের জন্য একটি গর্বের বার্তা বয়ে

এনেছে- তারা আজ সকলেই অনুভব করে- তারা বাঙালি এবং বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ আছে। পৃথিবীর সকল বাঙালি এই স্বাধীন বাংলাদেশ নিজেদের বলে স্বীকার করে। একটি জাতির এই মহান কৃতিত্বের দাবিদার বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এক হাজার বছরের ইতিহাসের বিশ্ববাসী প্রথম দেখল- হাজার বছরের ইতিহাসে একজন বাঙালি প্রথমবারের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রথম রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এর আগে সেন আমলে, তুর্কি আমলে, সুলতানী আমলে, মোগল ও ব্রিটিশ আমলে কোনো বাঙালি স্বাধীন বাংলার শাসক ছিলেন না। ইংরেজ শাসনের শেষ পর্যায়ে বাঙালিদের হাতে সীমিত প্রাদেশিক ক্ষমতা থাকলেও জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে বাঙালির নেতৃত্ব তাদের ছিল না।

৪.

ইতিহাসে বাঙালির শ্রেষ্ঠ কাজ বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, আর স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। প্রথমটির মাধ্যমে বাঙালি তাঁর আত্ম-পরিচয়ের সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ নির্মাণ করেছিল। দ্বিতীয়টি তাকে করেছিল টেকসই ও চিরঞ্জীব। যেভাবে আরব রোমান জাতি, ইরান জর্মন জাতি, গ্রিক-ইংরেজ জাতি- এভাবে আরো অনেকে- যারা অনেক আগে থেকে জাতিতে পরিণত হয়েছিল, যারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ খায় না।। এই দুটি পর্বেই যিনি অবিসংবাদিতভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বাঙালিকে সংগঠিত করেছিলেন, পরিণামে বিশাল জীবন দান করেছিলেন- তিনি আর কেউ নন, তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাঙালিকে তাঁর স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় করতে হয়েছিল সর্বোচ্চ ত্যাগ। তিনটি পর্যায়ে সংগ্রাম লড়াই ও জীবনদানের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

১. পাকিস্তানের তেইশ বছর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত। এই পর্বের মধ্যে ছিল ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, গণ অভ্যুত্থান। যৌক্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক এই আন্দোলনের সময়েও অনেক বাঙালিকে জীবন দিতে হয়েছে।
২. ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আট মাস ২০ দিন, সশস্ত্র যুদ্ধ, ৩০ লক্ষ মানুষের জীবন দান, ৩ লক্ষ নারীর অপমান, সকল অবকাঠামো ধ্বংস।

৩. ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, সর্বাধিনায়কের সপরিবারে জীবন দান।

অনেকে বলেন, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এটি আসলে পুরোপুরি ঠিক নয়। বলা উচিত ২৮ বছরের সংগ্রাম, লড়াই, আত্মত্যাগ, সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই পুরো আটাশ বছর ধরে এই যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি ও সর্বাধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই তিন পর্ব জুড়েই বাঙালিকে স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য জীবন দিতে হয়েছে। প্রথমে ভাষার আন্দোলনে, বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণে সংগ্রাম ও লড়াই করতে হয়েছে। এই পর্বে বাঙালিরা ছিল নিরস্ত্র, শান্তির মাধ্যমে সমাধান আকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় প্রত্যয়ী; কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগণ ছিলেন যুদ্ধংদেহী, স্বেচ্চাচারী, গণতন্ত্রহারী। তারা বাঙালিকে লড়াই থেকে হঠানোর জন্য এই পর্বে দেখিয়েছে ভয়, মাঝে মাঝে করেছে বর্বোচিত হত্যা।

দ্বিতীয় পর্বের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আমাদের সবার জানা আছে। হানাদার পাকবাহিনি তাদের দাবি অনুযায়ী স্বদেশিদের উপর পৃথিবীর বর্বোরচিত হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। মাত্র নয় মাসের এক যুদ্ধে এত লোকক্ষয় মধ্যযুগের চেঙ্গিস হালাকু খানও করেনি। এই যুদ্ধেও সর্বাধিনায়ক নায়ককে এ সময়ে কৌশলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল পাকিস্তানি কারাগারে। তাঁকে হত্যার নানা নীল নকশা আঁটা হয়েছিল সেখানে।

তবে তৃতীয় পর্বের যুদ্ধাবস্থা নিয়ে আমরা প্রায় ভুল করে থাকি। আমাদের বড় ভুল, আমরা মনে করে থাকি নয় মাসেই যুদ্ধ হয়েছিল শেষ। কিন্তু কখনো প্রশ্ন করি না, কিভাবে? যুদ্ধে যে-সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার হয়েছিল, তাতো তখনো যুদ্ধের ময়দানে পড়েছিল। অস্ত্র কখনো সপক্ষেও শাণিত হয়। তদুপরি তখনো যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক পরদেশের কারাগারে বন্দি। দেশে ফিরে যুদ্ধকালীন শত্রুমিত্র বুঝে নিতে তাঁর লাগছে কিছুটা সময়। যাদের সঙ্গে রাজনীতি করেছিলেন, যারা ছিল বিরুদ্ধ পক্ষ- তারা কতটা বিরুদ্ধ নয় মাসের যুদ্ধে তা কল্পনায় বুঝে বড়ো কঠিন। নরম ও উদার দিলের মানুষ, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠা, সেই সুযোগ নিতে চাইলেন অনেকে। সারা দেশে শত্রুদের ধ্বংসযজ্ঞ, ফেলে যাওয়া মাইন। যারা যুদ্ধ করেছিলেন তাদের

মধ্যে অনেকের উদ্দেশ্য ছিল অসৎ। অনেকের মধ্যে ছিল সদ্য বিদায়ী পাকিস্তানি মনোভাব। বাঙালির অর্জনের গুরুত্বের চেয়ে তুলনায় বেশি আগ্রহী। যারা মাত্র কিছুদিন আগে ছিল পাকিস্তানি আমলা তারাই পরিণত হলো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আমলা। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল ঘাপটি মারা পাকিস্তানি সহযোগী সৈনিক। এই পর্বেও যুদ্ধ ছিল, কঠিন ভয়াবহ। নয় মাসে শত্রু ছিল চিহ্নিত, এখন শত্রু মিত্রের একই পোশাক। বরং শত্রুর নানা ছল, মিশে যেতে, প্রতিশোধ নিতে। নয় মাসের যুদ্ধে ছিল সশস্ত্র সেনাদের শৃঙ্খল, পরবর্তী সাড়ে তিন বছরে বিশৃঙ্খল জনতা। এই যুদ্ধ এককভাবে করতে হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে। একদা যারা তাঁর পাশে ছিলেন, সশস্ত্র যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদেরই কেউ কেউ হয়ে উঠলেন সর্বাধিনায়কের বিপরীত। পুরো সময় ধরে চলল অসহযোগিতা, এমনকি তাঁকে ব্যর্থ করে দেয়ার দেশি বিদেশি চেষ্টা, পরিণামে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। অনিবার্য হয়ে উঠল বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান। শেখ মুজিব এই আন্দোলনের নায়ক।

আমার এ আলোচনায় বরং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে কিছুটা সমর্থনে আনা যায়- "সবাইকে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন, ছাপিয়ে উঠেছেন। কেন পারলেন? অন্যরা কেন পারলেন না? কেন পিছিয়ে গেলেন তাঁরাও, যারা বৈষয়িকভাবে। অধিকতর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? প্রধান কারণ সাহস। শেখ মুজিবের মতো সাহস। আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনি একাধিকবার ফিরে এসেছেন, আপস না করে। কিন্তু কেবল সাহসে হয় না; হওয়ার নয়। সাহস দুর্বৃত্তেরও থাকতে পারে; থাকেও অনেক সময়। শেখ মুজিবের সাহস ব্যক্তিগত স্বার্থের পুষ্টি সাধনে নিয়োজিত হয়নি। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি পরিচিত দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিপক্ষে। তিনি তাঁর দলের লোক ছিলেন, শ্রেণিরও ছিলেন। কিন্তু পার হয়ে গিয়েছিলেন ওই দুই সীমান্ত, পরিণত হয়েছিলেন জনগণের নেতায়। তাঁর সাহস জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করার জাতীয়তাবাদী সাহস।

সাহস মওলানা ভাসানীরও ছিল। তিনিও বাঙালির মুক্তির পক্ষে ছিলেন। অনমনীয়। পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার কথা তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন। প্রকাশ্যে। কিন্তু পার্থক্য ছিল। ভাসানী পাকিস্তানি শাসকদের দেখেছেন, কিন্তু কেবল তোদেরই দেখেননি, ওই শাসকদের পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনটাও

দেখতে পেয়েছেন। দেখেছেন সামন্তবাদকেও। শেখ মুজিবের দেখাটা ছিল সেই তুলনায় সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তিনি পাকিস্তানি শাসকদের চিনেছেন, তাদের অধীনতা থেকে বাঙালিকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা এলে তারপরে কী ঘটবে, সেটা তার ভাবনার বিষয় ছিল না। স্বাধীনতা ছাড়া অন্য সবকিছুই যে অসম্ভব, এটা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন এবং সেভাবেই কাজ করেছেন। পরের জিনিস পরে দেখা যাবে, ওই ছিল মনোভাব। লক্ষ্য নির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ ছিল বলেই তার জন্য সাফল্য এল। মাওলানার সাফল্যটা ছড়িয়ে গেল, কোনো কেন্দ্রভূত রূপ নিল না। তা ছাড়া মাওলানার একটা সীমাবদ্ধতাও ছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতেন, তাকে তিনি ভাবতেই পারতেন না ধর্মকে বাদ দিয়ে পরিচ্ছন্ন সমাজতন্ত্র নয়, তাঁর লক্ষ্য ছিল ইসলামি সমাজতন্ত্র, যার দরুন সামন্তবাদের প্রভাব থেকে যে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন, এমনটা বলা যাবে না।"

(ভোরের কাগজ, ১৫ আগস্ট ১৯৯৬/বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধায় ভাবনায় স্মৃতিতে)

বলা চলে, হাজার বছর পরে বঙ্গবন্ধুর হাতে এক নব-বাংলার সূচনা হয়েছিল। আর সে কারণেই তিনি সর্বকালের সেরা বাঙালি। কারণ যে বাঙালিকে আজ আমরা চিনি, তিনি ছাড়া তার আগের পরিপূর্ণ রূপ নেই। তাঁর সময়ে কিংবা পূর্বে বাঙালির লড়াই আর বর্তমানে বাঙালির জাতিসত্তার লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়ে গেছে।

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী'র শ্রেষ্ঠ বাঙালি প্রকল্প ও বঙ্গবন্ধু

'ইংরেজ সবকিছু লুট করেই নিয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ থেকে। লর্ডস্থানীয় লোকরাই এই লুটের প্রধান কর্ণধার ছিলেন। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অনেক জায়গায়ই মোগল শিল্পের অনেক নিদর্শন আছে। আমরা ইতিমাদ-উদ-দৌলা দেখে ফিরে চললাম তাজমহল দেখতে।'

– (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

১.

শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১৯৯৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ছয় শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এই ছয়জন হলেন– রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর এই রচনার পরে কোলকাতায় বেশ শোরগোল শুরু হয়েছিল। তাদের কথা এই সব শ্রেষ্ঠ বাঙালির মাঝ থেকে কোন বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের নাম বাদ পড়ে গেল। নীরদচন্দ্র চৌধুরী পরে আরেকটি রচনায় তার কৈফিয়ত দেন। সেই প্রবন্ধের নাম ছিল 'ঈশ্বরচন্দ্র অবশ্যই মহাপুরুষ, শ্রেষ্ঠ বাঙালি নন'। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে 'শ্রেষ্ঠ বাঙালি কে?' নামে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শ্রী চৌধুরীর বিবেচনায়, মহাপুরুষ আরো থাকতে পারেন; তবে শ্রেষ্ঠ বাঙালি এই ছয় জন ছাড়া নেই।

নীরদচন্দ্র মারা যাওয়ার মাত্র দুই বছর পরে ২০০২ সালে বিবিসি স্বাধীন বাংলাদেশ ও বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একটি জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসাম ত্রিপুরাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে বসবাসরত বাঙালিরা অংশ গ্রহণ করেন। বিবিসি সেই জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে ওই বছরের এপ্রিলের দিকে। সেখানে নীরদচন্দ্র কথিত ছয় বাঙালির মাত্র দুই জন সেরা বাঙালিতে ঠাঁই পান। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষ বসু ছাড়া

আর কারো নাম জরিপে উঠে আসেননি। অবশ্য জরিপে উঠে আসেনি বলে বাঙালি হিসাবে তাঁরা নিকৃষ্ট হয়ে গেছেন এমন ভাবা বোকামি। কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহল উদ্দীপক–রবীন্দ্রনাথ সে জরিপে প্রথম স্থান থেকে নেমে আসেন। নীরদচন্দ্রের দাবি অনুসারে 'বাঙালির সমগ্র ইতিহাসে বাঙালি হিসাবে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি রবীন্দ্রনাথ, তাহার অপেক্ষা বড় বাঙালি জন্মে নাই, জন্মাবেও না।' রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এ নিয়ে বিবাদ করা উচিত নয়, উদ্দেশ্যও নয়। কিন্তু বিবিসি জরিপে এমন কী ঘটল যেখানে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানের দাবিত্বেও এই পরিবর্তন ঘটল। এমনকি রবীন্দ্রনাথের পরে বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠা তিনি অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয় বলে বিবেচনা করে থাকেন। শ্রীমান চৌধুরীর এই দাবিতে আমার অপত্তি নেই, অনাপত্তিও নেই। আমি কেবল দুটি জরিপের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

এতক্ষণে আমরা বুঝে গেছি, বিবিসির জরিপে উঠে আসা প্রথম বাঙালির নাম শেখ মুজিবুর রহমান। এই নামের কোনো বাঙালি ছিলেন কবিগুরুর পক্ষে হয়তো জানা সম্ভব হয়নি; কোনোভাবে জানলেও তিনি যে গোকুলে বেড়ে উঠছিলেন তা জানা প্রায় অসম্ভব। তাঁর মৃত্যুর সময় এই গুণধর বাঙালির বয়স মাত্র একুশ বছরের কাছাকাছি। কিন্তু সেই বাঙালি বিশ্ব বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে জানতেন, তাঁর জন্মের সাত বছর আগে তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করে বাঙালির নাম বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে অঙ্কন করে দিয়েছেন। অবশ্য এই দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালি শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হননি; তাদের কর্ম তাদের বাঙালির কাছে চির অম্লান করে রেখেছে। বিশ্বকবি শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান সম্বন্ধে কিছু না জানলেও বঙ্গবন্ধু তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে শ্রেষ্ঠ জেনেই আজীবন শ্রেষ্ঠের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছিলেন। বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল তার সাংস্কৃতি লড়াইয়ের উপাদান হিসাবে বঙ্গবন্ধু তাঁকে প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর গান স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ কথা বলার উদ্দেশ্য, একজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্যজন যেন ন্যূন অনুমিত না হন। তবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবন্ধুর কীর্তি সম্বন্ধে না জানলেও শ্রীমান চৌধুরী কিন্তু তাঁর পুরোটাই জানতেন। কারণ তাঁর প্রায় শত বছরের জীবন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের প্রায় সবটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের তেইশ/চব্বিশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে এবং মারা গিয়েছিলেন

বঙ্গবন্ধুর জীবনের দুঃখজনক পরিসমাপ্তির প্রায় তেইশ/ চব্বিশ বছর পরে। ফলে এটি বলা যাবে না তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম অনুধাবনের অবসর পাননি। কারণ তাঁর কথিত অন্য বাঙালিরাও ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী কথিত আধুনিককালের সৃষ্ট।

এবার দেখা যাক, নীরদ চৌধুরী তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের মাপকাঠিতে কী ধরনের উপাদান ব্যবহার করেছিলেন। এ কথা প্রথমে বলে নেয়া ভালো, মানুষ হিসাবে কেউ সীমাবদ্ধতার বাইরে নন, কম আর বেশি। শ্রীমান চৌধুরীও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁকে উল্লেখ করার অন্যতম কারণ তিনি নিজেও কোনো সাধারণ বাঙালি নন। ব্রিটিশের শেষার্ধ ও ব্রিটিশ পরবর্তীকালের শেষার্ধে তিনি একজন বিশিষ্ট বাঙালি বলে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর শিক্ষা রুচি লিখন শৈলী ও উপস্থাপন করার ক্ষমতা অন্যদের কাছে সর্বদা মান্যতা আদায় করে নিয়েছেন। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে তাঁর দক্ষতা ছিল ঈর্ষণীয়। ১৯৯২ সালে ব্রিটেনের রানি তাঁকে কমান্ডার অব দি অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার (সিবিই) প্রদান করেন; পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেন। ইংরেজি বাংলাতে তিনি বেশ কিছু ভালো গ্রন্থ রচনা করেছেন– যা দুই জাতির লোকই উল্লেখ করে থাকেন। অতএব, এই 'আত্মঘাতী বাঙালি'র কোনো বিবেচনা উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া তাঁর এই মতামতের যুক্তি ও বিবেচনা অন্য অনেক বাঙালির কাছে গুরুত্বহীন নয়। নীরদ চৌধুরী তাঁর কর্ম দ্বারা, পাণ্ডিত্য ও বিতর্ক দ্বারা নিজে বিশ শতকের সূচনা লগ্ন থেকে একটি চরিত্রে পরিণত হয়েছে। একদিকে যেমন তাঁর ছিল সাহিত্যের অগাধ জ্ঞান, অন্যদিকে রাজনীতি তিনি ভালোই বুঝতেন। তিরিশের দশকে শরৎ বসুর সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনের আগেই তিনি বিখ্যাত 'শনিবারের চিঠি'র প্রাণপুরুষ হিসাবে কাজ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রেডিও'র ধারাভাষ্যকার, মডার্ন রিভিউ'র চাকরি, শেষ পর্যন্ত সত্তর দশকে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

আমার প্রশ্ন এমন একজন বাঙালি (শ্রীমান চৌধুরী) কিভাবে আত্মঘাতী হতে পারেন! যিনি কিনা জনমতের বাইরে থেকে তাঁর আত্মরতির প্রকাশ ঘটাতে পারেন। বিবিসি জরিপে বঙ্গবন্ধু কেবল সেরা বাঙালি বিবেচিত হননি, দ্বিতীয় শীর্ষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল বিস্তর। সেটি এমন এক সময়ে হয়েছিল, যখন শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দল না ক্ষমতায় ছিল, না তাঁর স্বপক্ষে কোনো প্রচারাভিযান ছিল। আমরা যদি শ্রী নীরদ চৌধুরীর বাঙালির শ্রেষ্ঠত্বের

ক্ষেত্রে শুধু আর্য হিন্দু বাঙালিদের বুঝে থাকি তাহলে কোনো আলোচনার দরকার হয় না। কিন্তু তিনি এমন কথা স্পষ্ট বলেন নাই যে, আর্য হিন্দু ছাড়া কেউ খাঁটি বাঙালি হতে পারবেন না। তবে তিনি ইঙ্গিতে সে-কথা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন– সে কথা সবার জানা। যেমন তিনি 'হিন্দুর মুসলমানী পোশাক কেন?' প্রবন্ধে আল-বিরুনির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন– 'এক হিন্দু রাজা শত্রুকুলকে নিঃশেষে বধ করিতে না পারিয়া, যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকে ঘৃণিত করিবার জন্য মুসলমানী পোশাক পরাইয়াছিলেন।'

শ্রী নীরদ চৌধুরী তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন, তা সর্বদা অকাট্য হয় না। তিনি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হন, এটি তার একান্ত নিজস্ব ভাবনা। বিদ্যাসাগরকে তিনি যে শ্রেষ্ঠ বাঙালি না বললেও মনে করেন, তিনি অন্যতম মহান বাঙালি। তাঁর কাছে বাঙালির কিছু রূপরেখা আছে। তার আগে তিনি বলতে চেয়েছেন, এটি একান্ত তাঁর নিজস্ব মতামত, সেটি অন্যের দৃষ্টিতে সঠিক নাও হতে পারে। ব্রিটিশ শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ব্যবহার করে তিনি বলেন, অনেক শ্রেষ্ঠ ইংরেজ শেক্সপিয়ারকে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ মনে করেননি। তাই বলে কোনো ইংরেজ তাদের এতটা আক্রমণ করেননি, যেমনটা বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে হয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়েছি এই ভেবে, বাঙালি মুসলমানরা যদি তার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার উপযুক্ত না হয়, তাহলে তার পছন্দের ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন কিভাবে মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে শ্রেষ্ঠ বাঙালির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে নির্বাচিত করলেন। যদিও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারের মধ্যে একটি বালখিল্য ব্যাপার আছে। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের আসন যেখানেই থাক না কেন, বাঙালির প্রার্থনা পূজা অর্চনা তাদের ছাড়া হয় না। আবার পূজা অর্চনা নির্বিঘ্নে করার জন্য নিরাপদ ঘর চায়। বঙ্গবন্ধু বাঙালির পরিচয়ের নিরাপদ ঘর নির্মাণ করেছিলেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরী রচনার সারবস্তু আমি এখানে একটু বিশদভাবে তুলে ধরতে চাই। যাদের কাছে এই দীর্ঘ অনুচ্ছেদ অপ্রয়োজনীয় মনে হবে, কিংবা পূর্বে পঠিত হয়েছে, তারা সরাসরি এটি এড়িয়ে যেতে পারেন।

২.

শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখছেন, 'যে-বিষয়ে মতবিরোধ হইতে পারে ইহাই কেহ ধারণা করিতে পারে না, উহার সম্বন্ধেও মতবিরোধ কিরূপ উৎকট হইয়াছে তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। উহা শেক্সপিয়ারের সাহিত্যিক কীর্তি সম্বন্ধে।

যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারাও সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি।'

তিনি ড. জনসনের সরাসরি ইংরেজি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার অনুবাদ করলে এমন দাঁড়ায়, 'শেক্সপিয়ার কোনো জ্ঞানের কথা বলার চেয়ে আনন্দ উৎপাদনে বেশি ব্যস্ত থাকতেন, তার লেখায় কোনো নৈতিক অনুশীলন ছিল না, এটি কেবল প্রাচীনতার দায় দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বিশ্বকে ভালো করে তোলার জন্য সর্বদা একজন লেখকের কলম ধরা কর্তব্য।' কাব্যগুণ বিচারে ডা. জনসন শেক্সপিয়ারের প্রতি অবজ্ঞাই প্রকাশ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, শেক্সপিয়ার কোনো ভুল ছাড়া এক নাগারে ছয় পঙক্তি লিখতে পারতেন না।

প্রায় একইভাবে চার্লস ডারউইন বলেছেন, আমি ইদানীং শেক্সপিয়ার পড়তে গিয়ে রীতিমতো বিরক্ত হচ্ছি, আমার বমির উদ্রেক হচ্ছে। বার্নার্ড শ' লিখিয়াছেন, 'হোমার ছাড়া এমন কোনো বিখ্যাত লেখক নেই, এমনকি স্যার ওয়াল্টার স্কটও নন, যখন আমার মনের কাছে প্রশ্ন করি তখন দেখি আমি শেক্সপিয়ারের চেয়ে বেশি আর কাউকে ঘৃণা করি না।' নীরদচন্দ্র বলছেন, এ ধরনের বিচারের ফলেও এই তিনজনের বিরুদ্ধে কোনো ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশ করে নাই, বরঞ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের খামখেয়ালির অধিকার আছে, এই কথা স্বীকার করে আমোদই পেয়েছে।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ বিচারে যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন, তার পরিচয় দেয়া যাক: 'ঈশ্বরচন্দ্রের নাম করেননি বলে যাঁরা অভিযোগ করছেন তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, তিনি আরও অনেক শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম করেনি। এদের মধ্যে শুধু চারজনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, রামমাহেন, মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামকৃষ্ণ। বাঙালি হিসাবে এদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ পোষণ করেননি।

তবে আপত্তিকারীদের দাবি ঈশ্বরচন্দ্রের নাম ছয়জনের মধ্যেই করা উচিত ছিল। করতে হলে নীরদচন্দ্র মনে করেন যে ছয়জনের উল্লেখ তিনি করেছেন তাঁদের একজনকে বাদ দিতে হতো। তার মতে আপত্তিকারীরা একটু প্রণিধান করলেই বুঝতে পারতেন যে, তিনি একটা বিশেষ বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করে ছয়জনের নাম করেছেন। কিন্তু এটি কেউ উপলব্ধি করেছেন বলে তাঁর মনে হয় না। শ্রেষ্ঠত্ব যে নানা ধরনের হতে পারে, অথবা সকল শ্রেষ্ঠত্ব যে সমতুল্য নয় এটি যেন আপত্তিকারীরা চিন্তা করে দেখেননি।

তিনি শ্রেষ্ঠত্বকে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন– সর্বমুখ' শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাপ্ত, বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন– 'আজিকার দিনে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার অতীতের তুলনায় অকল্পনীয় প্রসার লাভ করিয়াছে, যেমন– শ্রেষ্ঠ জকি, শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়, শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় বা শ্রেষ্ঠ নারী খেলোয়াড়, শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা অভিনেত্রী-নাট্যশালায় বা ফিল্মে, শ্রেষ্ঠ ফিল্ম-কারক, শ্রেষ্ঠ গায়ক বা গায়িকা, শ্রেষ্ঠ পপ-সিঙ্গার, ইত্যাদি। এইরূপ বিশিষ্ঠ শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দুইটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত, এই শ্রেষ্ঠত্ব যাঁহাদের তাঁহারা নিজের বিষয় ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, এই সবগুলি শ্রেষ্ঠত্ব এক শ্রেণির নয়, সমতুল্যও নয়। আর একটা কথাও বলা প্রয়োজন যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ফুটবল খেলোয়াড় বা পপ-সিঙ্গারের তুল্য সম্মানিত, সমাদৃত ও সুপরিচিত হইবার সাধ্য কোনও শ্রেষ্ঠ কবি বা বৈজ্ঞানিকেরও নাই।'

তিনি এটাকে আবার সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্ট বলে পার্থক্য করেছেন। তার মতে শ্রেষ্ঠত্ব পক্ষান্তরে যাঁদের সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তাঁদের কৃত্য ও চরিত্রের অভিঘাত সব দিকে দেখা যায়, এটি সীমাবদ্ধ নয়। এই দুইটির জন্য দেশবাসী, এমনকি সমগ্র মনুষ্যসমাজের উপর তাঁদের প্রভাব সক্রিয় হয়। তাঁর মতে সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠত্বের আর একটা আশ্চর্যজনক দিকও আছে; এই শ্রেষ্ঠত্ব যাঁদের আছে তাঁরা বিশিষ্ট ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। তারপর তিনি তার প্রস্তাবিত ছয় শ্রেষ্ঠ বাঙালির কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন :

১. রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, পৃথিবীর যে-কোনও দেশের, যে-কোনও কালের শ্রেষ্ঠ কবির সমকক্ষ।

২. বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, তাঁরাও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সমতুল্য।

৩. কেশবচন্দ্র সেন ও বিবেকানন্দ শক্তিমান ধর্মপ্রচারক, মার্টিন লুথার ও ইগন্যাসিয়াস শোয়ানোর সহিত তুলনীয়।

৪. সুভাষচন্দ্রের বিশিষ্টতা অন্য ধরনের। তিনি বিশ্বাসের বশে স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করেছিলেন, হিন্দুদের সমগ্র ইতিহাসেও বিশ্বাসের জন্য আত্মবলিদানের আর একটিও দৃষ্টান্ত নেই।

এরপর এই ছয় বাঙালির সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমান চৌধুরীর মতে তাঁরা সকলেই চরিত্রধর্মে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, দোষে-গুণে আজীবন খাঁটি বাঙালি ছিলেন, কখনও বাঙালিত্ব ছাড়তে পারেননি।

তাঁর মতে নব্য বাঙালির চরিত্র, তার মনোবৃত্তি ও আচরণ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথই সৃষ্টি করেছিলেন, বিশেষ করে নব্য বাঙালি নারীর। "নব্য বাঙালির ধর্মবিশ্বাস (religion অর্থে) ও নীতিপরায়ণতা আসিয়াছিল কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের শিক্ষা হইতে। কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাঙালি 'লিবারেলিজমে'র স্রষ্টা ও প্রচারক, অন্য দুইজন বাঙালি 'কনসারভেটিজমে'র।"

শরৎচন্দ্রের সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠত্ব অন্য রকমেরড়একদিকে তিনি নব্য বাঙালির চরম দৃষ্টান্ত, 'চরিত্রহীনতায়ও; অপরদিকে তিনি নব্য বাঙালির সাধারণ রূপের প্রচারক; তাঁর রচনাতেই নব্য বাঙালি নিজের সত্য পরিচয় পেল, এমনকি তার চরিত্রের দুর্বলতারও সাফাই পেল।

সুভাষচন্দ্রের সার্বত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব আবার এ থেকেও আলাদা। তিনি দোষে-গুণে খাঁটি 'কনসারভেটিভ নব্য বাঙালি-পূর্ণতার কথা বিবেচনা করলে, তাঁর অপেক্ষা পূর্ণতর 'কনসারভেটিভ' বাঙালি পাওয়া যাবে না। তাঁর বাঙালিত্বের অকাট্য প্রমাণ এই যে, তিনি নিজের বাঙালিত্বকে গান্ধীবাদের দ্বারা ভেজাল করেননি। চিত্তরঞ্জন দাশও এটি এড়াতে পারেননি। গান্ধীবাদ বাঙালি চরিত্রকে দ্বিধাবিভক্ত করে শক্তিহীন ও প্রায় অকর্মণ্য করেছেন বলে শ্রী নীরদচন্দ্রের দাবি। এর জন্য বাঙালি দুই কূলই হারিয়েছে। চিত্তরঞ্জন বিপ্লববাদীদের হত্যাকাণ্ডকে ঘৃণা করতেন ও এর দ্বারা বাঙালির অনিষ্ট হবে মনে করতেন, তবুও তিনি গোপীনাথ সাহার জয়গান করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেন মহৎ, কেন শ্রেষ্ঠ নন তার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন তিনি। এবার সরাসরি তাঁর জবানিতে শুনি–'আমি যে-সব চরিত্রধর্মের ও কৃত্যের বিচার করিয়া ছয়জন বাঙালিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, সেই বিচারে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিছুতেই সেই শ্রেণির বা category অন্তর্ভুক্ত করা যাইত না। তিনি মহান ব্যক্তি ছিলেন, তবে অন্য ধরনের, তাঁহার মহত্ত্বও ছিল অন্য রকমের, তাঁহার বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্বও ছিল অন্য ধরনের। তাঁহার বিশিষ্টতা যে আমার নির্বাচিত ছয়জন বাঙালির বিশিষ্টতা নয় তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। যেমন: ১. তিনি মহাকবি হন নাই; ২.

তিনি ঔপন্যাসিক হন নাই; ৩. তিনি ধর্মপ্রচার করেন নাই; ৪. তিনি বিশ্বাসের বশে দেশের জন্য আত্মবলিদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিশিষ্টতা একান্তই নিজস্ব ছিল। উহার পরিচয় দিব।

নীরদ চৌধুরীর যুক্তিগুলো অনেকটা নিম্নরূপ :

১. তিনি সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা গতানুগতিক হলেও তিনি চিরপরিচিত বাঙালি টোলের পণ্ডিত হননি। একটি দৈহিক ধর্মেই এর পরিচয় পাওয়া যেত। যেহেতু সারা জীবনে তাঁর ভুঁড়ি হয়নি, অথচ ভুঁড়িবিহীন সংস্কৃত পণ্ডিত অকল্পনীয়, এইরূপ পণ্ডিতের লৌকিক আখ্যাই ছিল, 'ডুড়ে ভটচাজ'। এই দৈহিক বিস্তার সম্বন্ধে তাঁদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের পত্নীদের প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল; বুঝ লোকে যে জানে সে সন্ধান। তিনি সংস্কৃত পুস্তকের সম্পাদনাও নিজস্ব ধরনের করতেন।

২. তিনি নূতন ধরনের বাংলা গদ্যের প্রবর্তন করেছিলেন সত্য, তবে তিনি এর অগ্রদূত মাত্র। বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হওয়ার অব্যবহিত পরে এর উৎকটভাবে সংস্কৃত গদ্যের অনুকারী হয়েছিল, অথচ সংস্কৃত গদ্যের সৌন্দর্য এতে দেখা দেয়নি। সংস্কৃত ধারা বর্জন করে স্বাভাবিক বাংলা গদ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা অন্যেরাও করেছিলেন, সেই চেষ্টার দৃষ্টান্ত হিসাবে দুইটি বই-এর উল্লেখ করেছে, 'হুতোম পেঁচার নকশা' ও 'আলালের ঘরের দুলাল'। আধুনিক বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এই প্রচেষ্টাকে পথ সন্ধান মাত্র বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন 'হুতোমি' ও 'আলালি' বাংলা গ্রহণীয় নয়। বাংলা গদ্য নিজের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। কিন্তু বঙ্কিমের সমগ্র বাংলা গদ্য এক 'স্টাইলে'র নয়, 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'ইন্দিরা'র শেষ সংস্করণ পর্যন্ত পড়লে বাংলা গদ্যের বিকাশের পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যাবে।

৩. শিক্ষাদাতা হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙালির শিক্ষায় নূতনত্বের প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর বর্ণমালার বইগুলিতে। এতে প্রাচীন 'শিশুবোধকের' ধারাকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু বাংলা গদ্য থেকে মানসিক শিক্ষা বর্ণমালার বই থেকে হয়নি, বরঞ্চ 'সুবাধে' গোপাল হাস্যাস্পদই হয়েছিল। যে-সব প্রাথমিক পুস্তক থেকে বাঙালির মানসিক শিক্ষা সে-

যুগে আরম্ভ হতো সেটি অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' থেকে। ঈশ্বরচন্দ্রের 'কথামালা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের শিক্ষার পুস্তক, এটি মৌলিক রচনা নয়।

৪. তাঁকে বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা বলতে হলে কেবলমাত্র 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা'র উল্লেখ করতে হয়। এ-দুটির প্রথমটি ভবভূতির 'উত্তরচরিতে'র বাংলা রূপান্তর; শকুন্তলা কালিদাসের নাটকের। এই দুইটি বই বাঙালি বালকেরা ও মেয়েরা পড়ে অভিভূত হয়ে পড়ত সত্য, তবে কেউই সীতা বা শকুন্তলা হতে চাইত না, বরঞ্চ তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ তরুণ বাঙালি মনে বহু স্বপ্ন জাগাত।

৫. শিক্ষাদাতা হিসাবে প্রথম সংস্কৃত শিখবার ব্যাকরণও ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছিলেন, এর প্রথমটি 'উপক্রমণিকা' যা রবীন্দ্রনাথ যেমন পড়েছিলেন, তিনিও তেমন পড়েছিলেন, পরে তাঁরই রচিত 'ব্যাকরণ কৌমুদী'ও সবাই পড়ত। তবে এই ব্যাকরণ পুস্তকগুলি বাপদেবের 'মুগ্ধবোধ' অবলম্বন করে লিখিত হয়েছিল, এটি বাঙালির মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

তাঁর মতে ঈশ্বরচন্দ্রের এই সব বিশিষ্টতার বিচার করে বলা যায় না যে, এগুলো বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চতম স্তরে উঠিয়াছিল। এর মূল্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক মূল্য, পথপ্রদর্শকের কীর্তি, এটি চিরস্থায়ী হয়নি। অপরদিকে তাঁর সর্বমুখীন শ্রেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বের চরম সোপানে উঠেছিল, এর জন্য তাঁকে মহান ব্যক্তি, ইংরেজিতে যাকে great man বলে, তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেই মহত্ত্ব বাঙালি-ধর্মী হয়নি। এতে ঈশ্বরচন্দ্রকে মহাপুরুষ নিশ্চয়ই বলা যাবে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলা শ্রীমান চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর নিজের জীবনে ক্রমে-ক্রমে বাঙালিত্ব বর্জন করেছিলেন। এর একটা কৌতুকজনক দিক আছে। রবীন্দ্রনাথ কয়েক বছর ভিন্ন সারা জীবনে অবাঙালি পরিচ্ছদ ধারণ করেও মনে-প্রাণে বাঙালি ছিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র সারা জীবন ধুতি পরে, গায়ে থেকে এবং চটিজুতা পরেও মনে-প্রাণে ইউরোপীয় হয়ে গিয়েছিলেন। এর সপক্ষে নীরদচন্দ্র কিছু যুক্তি তুলে ধরেছেন:

১. 'প্রথম মহত্ত্ব চরিত্র বলে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাঙালির মধ্যে কয়েকটা নূতন ধারণা দেখা দিয়াছিল, যেমন: আদর্শপরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নীতিপরায়ণতা–এই কথাগুলি প্রচলিত বাংলাতে ছিল না, আসিয়াছিল ইংরেজির অনুবাদে, নূতন শব্দসৃষ্টি হিসাবে।'

ঈশ্বরচন্দ্র চরিত্রবলের অন্যান্য দিকের কথা বাদ দিলে শুধু একটা ব্যাপারের মাত্র উল্লেখ করা যায়, তিনি পুত্র নারায়ণচন্দ্রের আচরণে বিরক্ত হয়ে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছিলেন। এটি হিন্দুর ধারা নয়; পুত্র সম্বন্ধে হিন্দুর মোহ ধৃতরাষ্ট্রীয়। এর ব্যতিক্রম ভারতবর্ষে আধুনিককালেও দেখা যায়নি।

ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিতীয় মহত্ত্ব দানপরায়ণতায়। হিন্দু সমাজে দানপরায়ণতা যে ছিল না তা নয়, তবে এর একটা প্রথাগত দিক ছিল, যেমন, ধর্মের জন্য দান, ব্রাহ্মণের জন্য দান, ইত্যাদি। মানুষের দুঃখ বা অভাব দেখে অর্থসাহায্য করা সচরাচর দেখা যেত না। পার্থিব উন্নতির জন্য দান ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের নব্য নায়ক সম্বন্ধে লিখেছিলেন, দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙালি যুবা কাজকর্ম নেই, কাজকর্মের মধ্যে কারো দাতব্য কর্ম এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাংলা সমাজেই নেই। অথচ বঙ্কিম নিজেও 'রজনী' উপন্যাসে শচীন্দ্রকে এই চরিত্রের নায়কই চিত্রণ করেছিলেন। এই আদর্শ বাঙালি ইংরেজি শিক্ষা হতে পেয়েছিল। মধুসূদন তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন,

'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের ববন্ধু।'

দীন বাঙালি ভিন্ন অন্য কেহ ঈশ্বরচন্দ্রকে দানের জন্য ভক্তি করিত না। নীরদচন্দ্রের ভাষায়– 'ঈশ্বরচন্দ্রের অবাঙালি শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গে তাঁহার পুস্তক ক্রয় এবং পুস্তক সংগ্রহের কথাও বলিব। বাড়িতে পুস্তক রাখা বাঙালির লৌকিক জীবনে ছিল না। উহা ইংরেজ ভদ্রসমাজের মধ্যে অবশ্য কর্তব্য ছিল। তাহারা পুরুষানুক্রমে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকটি প্রাচীন বাড়িতে বিরাট লাইব্রেরি গঠন করিয়াছিল। ইহার উল্লেখ প্রতিটি জীবনী ও উপন্যাসেই পাওয়া যায়। জেন অস্টিনের "প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস" উপন্যাসে এইরূপ কথাবার্তা আছে।"

লাইব্রেরি করার এই নূতন ধারার বিবরণ ১৮২৩ সনে প্রকাশিত কলিকাতা কমলালয়ে আছে। একজন গ্রামবাসী কলিকাতায় এসে এই সব লাইব্রেরি দেখল, কিন্তু পড়িবার কোনও লক্ষণ দেখল না বা আগ্রহের পরিচয় পাইল না। সে ব্যঙ্গ করে কলিকাতাবাসীকে বলল, 'বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম উত্তম গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি, ইংরাজী, আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ বা দুই গেলাসওয়ালা আলমারীর মধ্যে সুন্দর শ্রেণিপূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে

দোকানদারের বাপেও এমত সোনার জল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না। আর তাহাতে এমন যত্ন করেন একশত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারে না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে। অন্য পরে হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদগর (বাইন্ডার) ভিন্ন বাবুও স্বয়ং হস্ত দেন নাই, এবং কোনো কালেও দিবেন এ মত কথাও শুনা যায় না।'

গ্রামবাসী ইহার পর এইভাবে পুস্তক ক্রয় ও সংগ্রহের সার্থকতা কি সেই প্রশ্ন তুলিল, বলিল, 'ইহার কারণ কি আমি পাড়াগেঁয়ে ভূত, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার তর্ক করিয়া মরিতেছি।' তবে নিজের বুদ্ধিতে গ্রামবাসী একটা কারণ নির্ধারণ করিল, বলিল 'বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন, যেমন অধিক ধন আছে তাহার ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী সুস্থিরা থাকেন। তেমনি কেতাব লইয়া আন্দোলন করিলে সরস্বতী বিরক্ত হয়েন।' কলিকাতাবাসী এই সব কথা শুনিয়া উত্তর করিল, 'অহে তুমি কি অবোধ, তোমার জ্বালায় আমি জ্বলিত হইলাম। এ মত প্রশ্ন কর যাহা অতি সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাও বুঝা যায়।'

কী বোঝা যায়? কলিকাতাবাসীর উত্তর, 'পুস্তক সংগ্রহের কারণ এই, ভাগ্যবান (ধনী) লোকের সংসারে তাবৎ দ্রব্যই থাকে, কিন্তু-সর্বদা সকল দ্রব্য ব্যবহার হয় না।... তাঁহারা এমন কি দায়গ্রস্ত হইয়াছেন যে, ঐ কেতাবগুলীন অর্থব্যয় করিয়া কিনিয়াছেন তাহা ব্যবহার না করিলে দিন যাপন হয় না, এ মত নহে।'

তাঁর মতে ঈশ্বরচন্দ্র বই সংগ্রহ করে কিভাবে বাঙালি ধারার বিরোধী হয়েছিলেন। সর্বোপরি জীবিতকালে ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল তাঁর সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টার জন্য, বিধবাবিবাহ আইন পাস করার ব্যাপারে আন্দোলন করবার জন্য ও পরে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য। হিন্দুরা তখন বলতে আরম্ভ করল ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ধর্ম ধ্বংসের জন্য নূতন কালাপাহাড় হয়েছেন। গল্প আছে যে, একজন বাঙালি চিনতে না পেরে তাঁকেই বলেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর গোমাংস খায়। বিধবা বিবাহের ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র বালবিধবার দুঃখ এবং অনেক সময়ে পতিতা হওয়ার অধঃপতন দেখে দয়াপরবশ হয়েছিলেন। একটা গল্প আছে যে, তিনি গুরুস্থানীয় পণ্ডিতের তরুণী পত্নী দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বহুবিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলনের সমর্থন বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত করতে পারেননি। বিধবা বিবাহ ১৮৫৬ সনে আইনসঙ্গত করা হলেও জনপ্রচলিত

হয়নি। বহুবিবাহ যে লোপ পেয়েছে তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন, 'ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবিতকালেও ঈশ্বরচন্দ্র সকল বিষয়ে বিবেচক ব্যক্তির যুক্তিযুক্ত সমালাচেনার ঊর্ধ্বে বিরাজমান ছিলেন না। তার মতে এখন আবার বিদ্যাসাগরপূজা নূতন করে দেখা দিতেছে কেন? আমি দূর হতে যতটুকু বুঝতে পারছি, এর দুইটি দিক আছে, দুই-ই অবশ্য বর্তমান বাঙালি জীবনের তুচ্ছতা ও কীর্তিহীনতার ফল। এর একটি দিক ঘৃণ্য, অপরটি দুঃখজনক।

তিনি বিদ্যাসাগরকে কেবল শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় স্থান দেননি এমনই নয়, তিনি কেশবচন্দ্র সেনকে সর্বকালের সেরা ছয় বাঙালির মধ্যে স্থান দিয়েও বিতর্কেও সৃষ্টি করেছিলেন। অথচ ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রাখেননি। বর্তমান সময়ের মানুষ উল্লিখিত দুই মহাপুরুষের নাম ও কৃতিত্বের কথা জানলেও শিক্ষিত বাঙালি ছাড়া কেউ কেশবচন্দ্র সেনের নাম জানেন বলে মনে হয় না। তাঁর দৃষ্টিতে কেশবচন্দ্র কেন শ্রেষ্ঠ বাঙালি তার উদ্ধার করা যাক : 'সম্প্রতি আমার বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগে উঠিয়াছে– আমি কেশবচন্দ্র সেনকে কেন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলিলাম, কেনই বা তাঁহাকে বিবেকানন্দের সমপর্যায়ে আনিবার স্পর্ধা দেখাইলাম। ইহা হইতেই আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আজিকার শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে বঙ্গদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে ১৯৪৭ সনের আগেকার স্মৃতি লোপ পাইয়াছে।

এই আপত্তির উত্তর আমি সংক্ষেপেই দিতে পারি একটি মাত্র অকাট্য ঐতিহাসিক সত্যের কথা বলিয়া– কেশবচন্দ্র পূর্ববর্তী না হইলে বিবেকানন্দ দেখা দিতেন না।' প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহন বিলাত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব লোপ পায় ও এর অস্তিত্ব নামে মাত্র থাকে।

তিনি যুবা দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। 'উপনিষদের একটি ছিন্ন পাতা কুড়াইয়া পাইয়া কি করিয়া তিনি একটা নূতন ধর্মানুভূতি পান, সে কাহিনি সর্ববিদিত। কিন্তু তাঁহার পুত্র সত্যেন্দ্রনাথও পিতা-প্রবর্তিত ব্রাহ্মত্বের স্পষ্ট পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, অর্থাৎ উপনিষদ হইতে কতকগুলি বচন সঙ্কলন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ একটা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ পাইলেন। ইহাও সত্য যে, দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর উপনিষদের ব্রহ্ম নহেন, তাঁহার ঈশ্বর প্রকৃত প্রস্তাবে "গোরা" উপন্যাসে। বর্ণিত পরেশের ঈশ্বর, তিনি ভক্তির ঈশ্বর, জ্ঞানের ঈশ্বর নহেন।'

শ্রীমান চৌধুরীর মতে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও সীমাবদ্ধ পরিধির বাইরে যেতে পারেনি। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির উপর এর প্রভাব বিস্তার করেনি। ব্রাহ্মধর্মে এই সর্বমুখিনতা দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তন করতে পারেননি, করলেন কেশবচন্দ্র। এর জন্যই দেবেন্দ্রনাথের সাথে তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের মতান্তর হলো। এর ফলে ১৮৬১ সনে ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথ পুরাতন ধারা বজায় রেখে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন, কেশব সবদিকে নূতনত্ব এনে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। এর নূতনত্ব দেখা গেল তিনদিকে–প্রথম বেদ ও উপনিষদের ধর্ম হতে দূরে সরে যাওয়া ও খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব আনাতে; দ্বিতীয়, জাতিভেদ না মানায়; তৃতীয়ত, বাল্যবিবাহ দূর করে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন করাতে। দেবেন্দ্রনাথ জাতিভেদ ও বাল্যবিবাহ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

নীরদচন্দ্রের মতে কেশবচন্দ্র যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করলেন, এর সত্যকার ব্রাহ্মধর্ম হয়ে দাঁড়াল। একটা নূতন বাঙালি শিক্ষিত ও উদারনৈতিক সমাজের সৃষ্টি করল।

৩.

এবার আসি শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কথায়। তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য প্রয়োগ করেননি, যেভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কিংবা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্য করেছিলেন। শ্রীমান চৌধুরীর বিশাল আলোচনা লিপিবন্ধ করার আগে কিছু কথা বলেছিলাম, এখন বাকি কথা বলব। তিনি যদি শুধু কবি সাহিত্যিক এবং ধর্ম প্রবর্তকদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি খুঁজতেন তাহলে আমাদের আপত্তি তত প্রবল হতো না। তিনি সুভাষ বসুকেও শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রেখেছিলেন। তাহলে বঙ্গবন্ধু কেন তার বিবেচনায় এলো না। এবার বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব ও বাঙালিত্বকে নিয়ে কিছু বলব।

১. বঙ্গবন্ধুই প্রথম হিন্দু-মুসলিম বাঙালির উত্তরাধিকার নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। কারণ, বাঙালিই হিন্দু হয়েছে, বাঙালিই মুসলমান হয়েছে। সেন শাসনের ফলে বাংলায় হিন্দুত্বের যে কুলীন ধারার সূচনা হয়, তা বাংলার বাইরের থেকে আগত। তার অব্যবহিত পরে তুর্কি শাসন থেকে যে মুসলিম ধারা তৈরি হয় তাও বাংলার বাইরে থেকে আগত। এই দুই ধারা মিলেই মূলত বাঙালিকে পরিপুষ্ট করেছে। একটি ধারাকে প্রধান ও খাঁটি করে তুললে অন্যধারাটি দূষিত হয়ে

পড়ে। শ্রীমান চৌধুরী কথিত বাঙালির প্রথম রাষ্ট্র পরিকল্পনা যদি বঙ্গভঙ্গ রোধের মধ্যে হয়ে থাকে, সেখানে বাঙালি মুসলমানের অংশ গ্রহণ ছিল না বললেই হয়। আবার ব্রিটিশ আমলে এ কে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী-নাজিমুদ্দির মন্ত্রী পরিষদে হিন্দু-মুসলিম জল ও তেলের মতো মিশ খায়নি। সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের কালে হিন্দু মুসলিমের বিশাল অবিশ্বাস, ধর্মের ভিত্তিতে বাঙালি আলাদা হয়ে পড়ল। এর ব্যতিক্রম কেবল দেখতে পাওয়া যায়ড়বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনে। তাঁর আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এমনই ছিল, একদিনের জন্যও সংখ্যালঘু বাঙালির হিন্দুর মনে হয়নি তারা বাইরের কেউ, কিংবা সংখ্যাগুরু মুসলমান কোনোভাবে হিন্দুর অধিকারের চেয়ে বেশি কিছু। অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম ধর্মীয় চেতনা বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের দ্বারা লোপ পেয়ে তা কেবল বাঙালির আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। আবার সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনি উদার জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, বণ্টন, সাম্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

২. রাজনীতির ক্ষেত্রে তার আগে বাঙালির যে রাজনীতির সূচনা হয়েছিল তার মধ্যে শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী প্রমুখ নেতাদের দ্বারা। তিনি তাদের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাঙালি জাতীয় তাদের নির্মাণ সম্পন্ন করেছিলেন। নীরদ চৌধুরী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতির স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। 'সুভাষচন্দ্রের সাত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব আবার ইহা হইতেও বিভিন্ন। তিনি দোষে-গুণে খাঁটি "কনসারভেটিভ" নব্য বাঙালি-পূর্ণতার কথা বিবেচনা করিলে, তাঁহার অপেক্ষা পূর্ণতর "কনসারভেটিভ" বাঙালি পাওয়া যাইবে না। তাঁহার বাঙালিত্বের অকাট্য প্রমাণ এই যে, তিনি নিজের বাঙালিত্বকে গান্ধীবাদের দ্বারা ভেজাল করেন নাই। চিত্তরঞ্জন দাশও ইহা এড়াইতে পারেন নাই। গান্ধীবাদ বাঙালি চরিত্রকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া শক্তিহীন ও প্রায় অকর্মণ্য করিয়াছে। ইহার জন্য বাঙালি দুই কূলই হারাইয়াছে। চিত্তরঞ্জন বিপ্লববাদীদের হত্যাকাণ্ডকে ঘৃণা করিতেন ও উহার দ্বারা বাঙালির অনিষ্ট হইবে মনে করিতেন, তবুও তিনি গোপীনাথ সাহার জয়গান করিলেন। এই দ্বিত্ব অনিরসনীয়।"

নীরদসি'র দাবি অনুযায়ী, সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বাঙালিত্বকে ভেজাল করেননি গান্ধী প্রমুখের সাহচার্যে। আমরা বলতে পারি বঙ্গবন্ধু তাঁর বাঙালিত্বকে কোনোভাবেই

খর্ব হতে দেননি। তাঁর আত্মবিশ্বাস একটা জাতির ভাগ্য নির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। তিনি অন্য জাতির মানুষের কাছে কখনো নিজের জাতের অপমান হতে দেননি। পোশাকের ক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে, খাদ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি বাঙালিরটাই পছন্দ করতেন। প্রয়োজনে তিনি ইংরেজ জাতির ভাষা ব্যবহার করতেন, কেবল যোগাযোগের জন্য। কখনো অন্য জাতির মানুষের মতো হওয়ার চেষ্টা করেননি। শ্রীমান চৌধুরী মনে করেন, বাঙালির প্রথম রাষ্ট্র পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়েছিল ১৯১১ বঙ্গভঙ্গ রোধ করার মাধ্যমে। এর আগে এতটা জাতীয়চেতনা অতীতে আর কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু ১৯৪৭ এসে সেই রাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়াল– একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান। উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বাংলা ভাগের আহ্বান এল। এর কারণ হিসাবে তিনি মনে করেন হিন্দু এবং মুসলমান যে দুটি আলাদা সম্প্রদায় সেই সত্যটি ভুলে থাকা। হিন্দু-মুসলমানের আলাদা সত্তা বিবেচিত হলে হয়তো এমন বিপর্যয় নাও হতে পারত। আমার যুক্তি বঙ্গবন্ধু তো সেখানেও সফল হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম আলাদা সত্তাকে গুরুত্ব দিয়েই বাঙালির অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। যে সব সাংস্কৃতিক উপাদানের জন্য বাঙালি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সেখানে হিন্দু-মুসলিম উত্তরাধিকার ছিল অবিচ্ছেদ্য। ভারত বিভাগের সময় যে বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি মুসলমানের অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার ভাবত না; তারাই আবার রবীন্দ্রনাথের অধিকার নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও দক্ষ নেতৃত্বের ফলে।

নীরদ চৌধুরী যখন তার প্রবন্ধটি রচনা করছেন তার প্রায় দেড় যুগ আগে বাঙালির তার স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথের গান জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বলা চলে অর্ধেকের বেশি বাঙালি এই স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকীর অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন, কেন শ্রীমান চৌধুরী তাঁর শ্রেষ্ঠ বাঙালি প্রকল্পে শেখ মুজিবুর রহমানের নামটি যুক্ত করতে পারলেন না। যেভাবে তিনি সুভাষ বসুকে রাখতে পারলেন, ঠিক সেভাবেও তাঁর মনে এই প্রশ্নটি আসা একটি ঐতিহাসিক বিষয় হতে পারত। সুভাষ বসুর মধ্যে বাঙালিত্বের বৈশিষ্ট্য অন্যের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়নি। নীরদ চৌধুরীর দাবি অনুসারে সুভাষ বসু– যিনি এক মাত্র হিন্দু বাঙালি যিনি সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশের জন্য যেটি আর কোনো

হিন্দু বাঙালি অতীতে নেননি। তাঁর এই মন্তব্য সঠিক হলেও আমরা দেখব, বঙ্গবন্ধু দেশের জন্য তাঁর সর্বোচ্চ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জীবনের শুরু থেকেই। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য, পাকিস্তানের তেইশ বছরের শাসনামলের তেরো বছরই তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন। কিন্তু একদিনের জন্যও তাঁর নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের কর্মের পরিবর্তন আসেনি। এমনকি তাঁকে পাকিস্তানি জেলে রেখেই বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সম্পন্ন হয়েছিল। বাঙালি তাঁর অনুপস্থিতি একদিনের জন্যও অনুভব করেননি। তাঁর নেতৃত্ব ধারণ করেই যুদ্ধ করেছে। তাঁর নামেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বাঙালির কাছে তিনি ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্ব থেকে রাজনীতি শুরু করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে যে-সব নেতারা ছিলেন, তাদের অনেকে বাঙালির মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন, বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। শ্রীমান চৌধুরী কথিত বাঙালির খাঁটি বৈশিষ্ট্য হয়তো তাদের অনেকের ছিল না। যেমন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে আমরা লুঙ্গিপরা বাঙালি হিসাবে কল্পনা করতে পারি না। এমনকি তিনি ভালো বাংলাও বলতে পারতেন না। ভারতীয় মুসসলমানের একটি উচ্চবর্গীয় ব্যাপার তাঁর মধ্যে ছিল। পারিবারিকভাবেও তিনি তার অধিকারী ছিলেন। মওলানা ভাসানীর মধ্যে যদিও বাঙালির বৈশিষ্ট্য কিছুটা বেশি ছিল। তবু তার পোশাক ও রাজনীতিক আদর্শ সর্বদা সাধারণ বাঙালির অনুরূপ নয়। তিনি নিজে মাদরাসা পড়ুয়া মৌলভি হলেও মার্কসবাদে তার আস্থা ছিল। একই সঙ্গে তিনি মার্কসবাদ, ইসলামের সাম্যবাদ এবং বাঙালির বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করতে চাইতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে এর কোনোটাই যত্নে আহরিত নয়। তিনি ছিলেন তৎকালীন সাত কোটি বাঙালির মতো সাধারণ মানুষ। তিনি তাদের মতো কথা বলতেন, তাদের মতো পোশাক পরতেন, তাদের মতো সন্তান আদর করতেন, পরিবর্তন চাইতেন। তাঁর সকল চিন্তার কেন্দ্রে ছিল এদেশের মানুষ। তাঁর গুরুদের দ্বারাও তার বাঙালিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিংবা তিনি নিজেকে কখনো তাঁদের মতো করে তৈরি করার চেষ্টা করেননি। তাছাড়া যদি সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা আসে তাহলেও তিনি সবার আগে থাকবেন। এর আগে আর কোনো বাঙালিকে এতটা আত্মত্যাগ করতে হয়নি।

আত্মত্যাগ বলতে যদি আমরা জীবন দান বুঝি সেখানেও তাঁর ত্যাগ সর্বকালের সেরা। ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে মোহনদাস করমচাঁদ

গান্ধী ভারতের জাতির পিতার মর্যাদা পেয়েছেন। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনি দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হন। দেশ স্বাধীনের পরে অনেক দেশের জাতীয় নেতাদের এমন করুণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসে আমরা যে-সকল মহান ব্যক্তিদের জীবন সম্বন্ধে জানি, তাদের অনেককে আদর্শের জন্য জীবন দিতে হয়েছে। সক্রেটিসের হেমলক পান, যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশ দান– তাদের প্রতি মানবজাতিকে আরো সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। তাদের অনুসারীগণ এটি বিশ্বাস করেন যে, তাদের মহান আত্মত্যাগ হয়েছিল মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে। এখানে যে দুটি নাম উল্লেখ করা হলো এঁরা ছাড়াও ইতিহাসের কালে বহু মানুষকে এ রকম মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তাদের মৃত্যুবরণ দেশ-জাতি সর্বদা স্মরণ করে থাকেন। আমাদের এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ দখলদারিত্বের পরে যারা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে জীবন দিয়েছেন; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্য লড়াই করে প্রাণ দিয়েছেন, তাদের আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। কিন্তু ইতিহাসে শেখ মুজিবুর রহমানের মতো রাষ্ট্র-স্থপতি জাতি নির্মাতাকে এতটা ত্যাগ করতে হয়নি। তাঁর কাজের বিরোধীরা, দেশ-বিদেশি শত্রুরা তার পুরো পরিবার এবং অন্যত্র বসবাসকারী আত্মীয় অনুসারীসহ একই দিনে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে। সেদিক দিয়েও এই আত্ম-বিসর্জন করুণ ও মহৎ। তাহলে শ্রীমান চৌধুরীর কেন মনে হলো না, সকল বিচারে তার ত্যাগ সর্বাধিক। তাহলে কি বলা সঙ্গত হবে– কেবল হিন্দু বাঙালি নন বলে বঙ্গবন্ধু নীরদ চৌধুরীর বিচারে উত্তীর্ণ হতে পারেননি! তিনি যে, ছয় জন বাঙালিকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বলে রায় দিয়েছিলেন, বিবিসির বিচারে তাদের মধ্যে দু'জন বাঙালি বিশ্বের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের দ্বিতীয় বাঙালি আর সুভাষ বসু পঞ্চম স্থান অধিকারী বাঙালি। অতীশ দীপঙ্কর, শ্রীচৈতন্যও অবশ্য ছয়জনের তালিকায় স্থান পাননি।

শ্রীমান চৌধুরী তাঁর রচনায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের সেরা বাঙালি, তার মতো বাঙালি আর জন্মাবে না। তাঁর সঙ্গে দ্বিমত করার কারণ দেখি না। তবু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কেবল উৎকৃষ্টমানের সাহিত্যই রচনা করেননি, সাহিত্যের একটা যুগ সৃষ্টি করেছেন। তার সাহিত্যকে বুকে ধারণ করে বাংলা ভাষা এগিয়ে গেছে। তিনি নোবেল প্রাপ্তির ফলে বাংলার বাইরেও বাঙালির খ্যাতি তৈরি হয়েছিল। তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞ বাঙালির প্রেরণা হিসাবে থাকবে। তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি হবেন তাতে

সন্দেহ কি। তিনি নিশ্চয় বিগত একশ বছরের প্রথমার্ধে শ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হলে তিনি সমগ্র বাঙালির কাছে সেরা বলে বিবেচিত হতেন না। তখন হিন্দু বাঙালি ও মুসলিম বাঙালি বলে বিভক্ত বাঙালির কাছে সেরা বাঙালি হিসাবে হয়তো মান্য হতেন। মুসলিম বাঙালিরা সর্বদা তাঁর ত্রুটি ধরে বেড়াতেন। আমি আমার আগের রচনায় বলেছি, বঙ্গবন্ধু কেবল তাঁর সাহিত্য কর্ম হৃদয়ে ধারণ করেননি, তাকেও এই বাংলায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য যে গান রচিত হয়েছিল, তা-ই ভঙ্গবঙ্গের জাতীয় সংগীত হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। আজ স্বাধীন বাংলাদেশে কেউ ভাবতে পারেন না, রবীন্দ্রনাথ কখনো পাঠ্যসূচির বাইরে থাকতে পারেন, তাঁর চর্চার ক্ষেত্রে কোনো বাধার সৃষ্টি হতে পারে! কিন্তু স্বাধীন ভারতে এখনো রবীন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় চর্চার অংশ নন। প্রাদেশিক পশ্চিমবঙ্গেই কেবল তিনি অবাধ চর্চিত। ভারতের অন্য অংশ রবীন্দ্রনাথের রচনা, জীবন চর্চা সম্বন্ধে ততটা ওয়াকিবহাল নয়।

৩. লুঙ্গি, গেঞ্জি বঙ্গবন্ধুর সেরা পছন্দের পোশাক ছিল। তিনি খালি গায়ে থাকতেও পছন্দ করতেন। তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশিক পোশাক খুব পছন্দ করতেন না, তাই এমনকি একটি কোট তিনি ব্যবহার করতেন, যার হাতা ছিল না, যা মুজিব কোট নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল। পোশাকের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ বাঙালি। অন্য কোনো জাতির মানুষের সঙ্গে তার পোশাকের মিল নেই।

৪. ভাষা প্রয়োগর দিক দিয়েও তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালির্‌দাবায়ে রাখতে পারবা না।' তাঁর বক্তব্য ছিল ছন্দিত, শ্বাসাঘাত যুক্ত, পর্ব তালে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা বাঙালির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অংশ। যেমন– 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।'

৫. বঙ্গবন্ধুর আরেকটি শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে এ আলোচনা শেষ করব। সেই শ্রেষ্ঠত্বটিও একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করার জন্য তিনি ব্যবহার

করেছিলেন, সেটি হলো তার ভাষণ বক্তৃতা। তিনি ছিলেন একজন জন্মগত বাগ্মী–জনতার সামনে দাঁড়িয়ে ভাষার মাধ্যমে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন তাদের গতিবিধি। সংগীতের যে কাজ, কবিতা সাহিত্যের যে কাজ–সেই কাজ তিনি তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে করতে পারতেন। কবিতা গানের আসর ছেড়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর ভাষণের মাঝখান থেকে উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। এক সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল তাঁর, যেটি যুদ্ধের ময়দানে দক্ষ সেনাপতির কাজ। তাই বলে তিনি কখনো অযৌক্তিক, উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য বক্তব্য প্রদান করেননি। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সরকার ও বিরোধী দল মিলেই একটি দেশের শাসনতান্ত্রিক চাকা সচল থাকে তা তিনি জানতেন। আজ যে দল ক্ষমতায় কাল সে দল বিরোধী দলে, ফলে তিনি এমন কোনো রাজনৈতিক হঠকারী আচরণ করেননি, যার জন্য তাঁকে দোষ দেয়া যায়। তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তন চেয়েছিলেন, কিন্তু তার কাজের কোনো গুরুত্ব ছিল না, স্বৈরাচারী সামরিক ও সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান সরকারের কাছে। তাঁর ছয় দফা দানের পরেও তাদের টনক নড়েনি। তার ৭ মার্চের ভাষণ ছিল পৃথিবীর অন্যতম সেরা রাজনৈতিক বক্তব্য। তার একটি বক্তব্যের মাধ্যমে একটি জাতি স্বাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো রাজনৈতিক নেতাকে এ ধরনের বক্তৃতা দিতে হয়নি। এটা কোনো বাগাড়ম্বরতা নয়, এখন নেটের যুগে, উইকিপিডিয়ার যুগে একটু চাইলে যাচাই করা সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চার্চিলে ভাষণ, এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষণের সাথে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তুলনামূলক বিচার করলে এখানেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। ব্রিটিশ ও মার্কিন দুই নেতার ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল মূলত যুদ্ধের পরবর্তী কালের বিষয়। যেখানে ছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের প্রতি, নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, জাতি গঠনের রূপরেখা এবং দেশের সবার জন্য সরকারের কর্তব্য। কিন্তু ৭ মার্চের ভাষণ ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যেখানে একই সঙ্গে তিনি একজন নির্বাচিত সম্ভাব্য রাষ্ট্র প্রধান, সেই পাকিস্তান শামরিক রাষ্ট্রের সারি সারি সেনাবাহিনি, অপর দিকে জনতা। জনতা কী চাচ্ছে, কার কাছে চাচ্ছে তাকে ওই সভায় তাৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে তার নিজের জীবনসহ উপস্থিত জনতার প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। তিনি ঐ ভাষণে সকল দিক বিবেচনা করে। স্বরের উত্থান-পতন, গঠন ও প্রতিরোধের ইঙ্গিত দিলেন। বললেল, তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তোল। তিনি পাকিস্তানের সরকারকে সব রকম অসহযোগিতার ডাক দিলেন, খাজনা ট্যাক্স বন্ধের ঘোষণা দিলেন।

বললেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। তার এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল বাঙালির সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাঙালি তাঁর বাণীকে পাথেয় করে এগিয়ে গেল সম্মুখ পানে।

এবার আসি নীরদ চৌধুরী কথিত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বিচারে। তিনি মূলত বাঙালির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ভাষা, পোশাক ও অবদানকে মূল্যায়ন করেছেন। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, তিনি যে ছয় বাঙালিকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন তাদের অধিকাংশ ব্রিটিশ শিক্ষার দ্বারা পুষ্ট, বাঙালিত্ব তাদের মধ্যে থাকলেও অবিমিশ্র নন। যেমন :

১. ধর্ম পালনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন দুজনই সনাতন হিন্দুর পরিপন্থী, খ্রিষ্ট ধর্মেও অনুকরণে গড়ে ওঠা ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী কিংবা প্রবর্তক। এটি কোনোভাবেই হিন্দু বাঙালির নিজস্ব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

২. রবীন্দ্রনাথ কখনো হিন্দু বাঙালির নিজস্ব পোশাক পরিধান করেননি। এমনকি তাঁর পরিবারেও সে চর্চা ছিল না। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ব্রিটিশ পূর্ববর্তী শাসক পারস্য সংস্কৃতির অনুসারী ছিলেন।

৩. রবীন্দ্রনাথ বাঙালির কবি হিসাবে আদৃত হলেও তাঁর নোবেল প্রাপ্তি হয়েছিল ইংরেজি অনুবাদে।

৪. তাঁর তিপ্পান্ন বছর বয়সে নোবেল প্রাপ্তির আগে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে বাঙালিদের মধ্যে ধারণার উদ্রেক করেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য আর সব শ্রেষ্ঠ বাঙালিরা তাদের চল্লিশ বছরের মধ্যেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি এসেছিল মূলত বাইরের স্বীকৃতির মাধ্যমে দেশে।

৫. ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির ব্যবহৃত ভাষা অনুসরণ করেননি।

৬. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার প্রণালি ছিল ইউরোপীয়। তিনিও তারুণ্যে স্কুল অব লন্ডনে পড়াশোনা করেছেন। তিনি সংস্কৃতি বা টোলের শিক্ষা গ্রহণ করেননি।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি হওয়ার জন্য সনাতন বাঙালি না হওয়ায় কোনো বাধা হয়নি। নীরদচন্দ্র চৌধুরী যেসব মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন, সে-

সব একান্ত তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। তবু তাঁর সেই মাপকাঠি ব্যবহার করলেও শেখ মুজিবের কৃতিত্ব একটুও কমে না, রবীন্দ্রনাথও এতে খাটো হয় না। কৃতিত্বের ধরন বুঝতে না পারলে এই গোল মিটবে না। আগেও বলেছি বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না পেলে রবীন্দ্রনাথ সংখ্যালঘু বাঙালির কাছে সেরা থাকতেন, এখন তিনি সংখ্যাগুরু বাঙালির কাছে, বলা চলে সব বাঙালির কাছে সেরা। তাছাড়া যে বাঙালি সবার সেরা বলে রায় পেয়েছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগে এবং রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর আন্দোলনের অংশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি এক নম্বর বাঙালির জন্য তেমন কিছু করতে হয়নি। পূর্বে উল্লেখ সত্ত্বেও এই বলে শেষ করতে চাইড়

হাজার বছরের বাঙালি জাতির জীবনে দুটি মহাকর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে, যার সঙ্গে অতীতের আর কোনো ঘটনার তুলনা চলে না। দুটি ঘটনাই সম্পন্ন হয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এই দুটি ঘটনার আগেও শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গ রোধের মাধ্যমে মূলত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি তাঁর রাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রথম সোপান হিসাবে বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে সমর্থ হয়েছিল। ইংরেজের অধীনে বাঙালির দ্বারা প্রাদেশিক সরকার গঠনেরও গুরুত্ব ছিল। উনিশ শতকে হিন্দু বাঙালির সংস্কার আন্দোলন ব্রাহ্মধর্ম–এসবও বাঙালিকে পুষ্টি জুগিয়েছিল। মধ্যযুগে ইলিয়াস শাহী সুলতানি শাসন, গৌরাঙ্গের বৈষ্ণব আন্দোলন বাঙালিকে বাঙালি করার পথে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বিশ শতকের সূচনা পর্বের আগে বাঙালি কখনো জাতি হিসাবে বাঙালির অভিযাত্রা সম্পন্ন করতে পারেনি। এর একটি বায়ান্নর বাংলা ভাষা আন্দোলন, অপরটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন। এই দুটি আন্দোলন মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে সংঘটিত হলেও এর চরিত্রে সাম্প্রদায়িকতা অনুপস্থিত ছিল। এই প্রথমবারের মতো বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান পরিচয় বাইরে রেখে বাঙালির পরিচয় ধারণ করে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীন দেশ অর্জনের চূড়ান্ত পর্বে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অনেকে ওডিউসের যাত্রায় শরিক থাকলেও শেখ মুজিবই হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির মহাকাব্যের নায়ক। অতএব তাঁকে বাদ রেখে শ্রেষ্ঠ বাঙালি খোঁজা অন্ধের হস্তিদর্শনের নামান্তর।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী : মহাজীবনের মহাকাব্য

'সূর্য অস্তাচলগামী, আমরাও তাজমহলের দরজায় হাজির। অনেকক্ষণ থাকব, রাত দশটা পর্যন্ত দরজা খোলা থাকে, তারপর দারোয়ান সাহেবরা এসে ঘণ্টা দিয়ে জানিয়ে দিবে সময় হয়ে গেছে। তাজকে ত্যাগ করতে হবে, রাতের জন্য। আমরা বসে পড়লাম, একটা জায়গা বেছে নিয়ে কয়েকজন নামাজ পড়তে গেলেন। আজানের ধ্বনি কানে এসেছে। পাকিস্তান হওয়ার পরও আজান হয় কি না জানি না।' – (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

১.

২০১২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশের আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অনুরাগীদের কণ্ঠে আক্ষেপ এবং নিন্দুকদের কণ্ঠে অভিযোগ ঝরে পড়ত যে, তিনি রাজনীতি রাষ্ট্র ও তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখে রেখে যাননি। এটি নিন্দুকদের বলার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, তিনি বাগ্মী হিসাবে ভালো হলেও লেখাপড়ায় কিছুটা পিছিয়ে ছিলেন। লেখার মতো সাংগঠনিক ও সুশৃঙ্খল বিন্যাসের দক্ষতার অভাব ছিল তাঁর চরিত্রে, ধৈর্য্য এবং সময়ও তার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

উপমহাদেশের অন্যান্য রাজনীতিবিদদের উল্লেখ করে নিন্দুকগণ প্রায়ই বলতেন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যিনি তাঁর রাজনীতিক দার্শনিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। জওহরলাল নেহেরু যেমন রাজনীতির মাঠে দক্ষ ছিলেন তেমন রাজনীতিক এবং আত্মজৈবনিক লেখক হিসাবে মহৎ ছিলেন। মওলানা আজাদের 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' এর কথা প্রায় শোনা যেতো লোক মুখে। নেতাজী সুভাষ বসু বিদেশি সেক্রেটারি রেখে লিখেছিলেন, 'লঙ স্ট্রাগল অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম। বাবা সাহেব আম্বেদকার তো পণ্ডিত এবং লেখক বলেই সর্বমহলে সবচেয়ে বেশি আলোচিত। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও লিখতেন, আবার যশবন্ত সিংহের জিন্নাহ লেখার পরেও তিনি বেশ আলোচিত হলেন।

শেরে বাংলা, ভাসানী, খাজা নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দী সাহেব বই লিখেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে কারো কাছে কোনো তথ্য না থাকলেও সকল অভিযোগ যেয়ে পড়ত বঙ্গবন্ধুর প্রতি। কারণ তিনি অন্যদের তুলনায় কিছুটা সাধারণ পরিবার থেকে এসেছিলেন বলে, এটি প্রমাণ করা সহজ তার লেখার ক্ষমতা সহজাত নয়।

তাছাড়া যেহেতু বঙ্গবন্ধু একজন সফল রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির পিতা সেহেতু তাঁর কাছে প্রত্যাশা এবং প্রত্যাশা না পূরণের হতাশাও বেশি থাকা অস্বাভাবিক নয়। উপরন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তায় যেহেতু রাজনীতি সংক্রান্ত নতুনত্ব ছিল সেহেতু তাঁর নিজস্ব লেখার প্রয়োজনীয়তাও ছিল। যেভাবে মার্কস, লেনিন, মাওজেদং, চৌএন লাই, হোচিমিন তাদের রাষ্ট্রচিন্তা লিখে রেখে গেছেন সে-ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্র চিন্তার লিখিত রূপ থাকা জরুরী বিবেচনা করা যায়। তিনি দেশে বিদেশে সর্বকালের সেরা বাঙালি হিসাবেও স্বীকৃত হয়েছেন, অতএব বাঙালির রাষ্ট্র পরিকল্পনার দীর্ঘ সংগ্রাম একমাত্র পাওয়া সম্ভব তার নিজস্ব রচনার মাধ্যমে। ২০১২ সালের আগের কারো পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না, সত্যিই বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব রচনার এক অমৃত সম্ভার তৈরি করে রেখে গিয়েছেন। যেখানে তার নিজের জীবনের কথা, তাঁর সময়ের জীবনের কথা, তার সহরাজনীতিবিদের কথা, বাঙালির রাষ্ট্র পরিকল্পনার কথা, দীর্ঘ সংগ্রামের কথা অকপটে উঠে এসেছে। এবং সময়ের সকল পরিবর্তনের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে কিভাবে তার সত্যের জন্য অবিচল থেকেছেন- সে-সবও তার এই গ্রন্থসমূহে প্রকাশ পেয়েছে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র মতো একটি গ্রন্থ যেখানে জাতির অমূল্য সম্পদ হতে পারে সেখানে তিনি তিনটি গ্রন্থ বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২, 'কারাগারের রোজনামচা', বাংলা একাডেমি ২০১৭, 'আমার দেখা নয়াচীন', বাংলা একাডেমি ২০২০। তিনটা বই বাংলাদেশের প্রকাশনা ও বই বিক্রির ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়েছে এবং 'কারাগারের রোজনামচা' বইটিও এক বছরের কম সময়ের মধ্যে ৭০ হাজার কপি নিঃশেষিত হয়েছে। বাংলাদেশে আর কোনো রচনা এমন বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা।

স্যার উইনস্টন চার্চিল ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, প্রিয় রাজনীতিবিদ। তিনি ব্রিটেনের সর্বকালের সর্ব সেরা ব্রিটিশ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। চরিত্র ও মনোবলের দিক বিবেচনা করলে তাঁর অনেক কিছুর সঙ্গে মিল আছে বঙ্গবন্ধুর। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার চেয়ে তিনি বাস্তব জীবন থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন বেশি। এমনকি এই দুই নেতার সন্তান সংখ্যাও ছিল পাঁচ জন। তিনি একই সঙ্গে লেখক ও বাগ্মী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর সময়ে তিনি ব্রিটেনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সব মতের ব্রিটিশবাসীকে একত্রিত করেছিলেন। আবার তাঁর কার্যক্রম নিয়ে ব্রিটেনবাসীর মধ্যে সমালোচনা কম নয়। সাহিত্য না লিখেও তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন আত্মজৈবনিক লেখার জন্য। তাঁর লেখা উচ্চমার্গতা ইংরেজি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর আত্মজৈবনিক লেখা পড়ে উইনস্টন চার্চিলকে মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। বঙ্গবন্ধু চার্চিলের কথা তাঁর লেখায় বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। চার্চিল ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লেখেন ম্যালাকান্ড ফিল্ড ফোর্স (১৮৯৮), দ্য রিভার ওয়ার (১৮৯৯), লেডিস্মিথ (১৯০০) প্রভৃতি গ্রন্থ। বঙ্গবন্ধুর রচনাও বাঙালি জাতির অমিয় সম্পদ। বাংলা ভাষার প্রাঞ্জলতা, রাজনীতি ও আত্মজৈবনিক লেখার উদাহরণ হিসাবে অজীবন উজ্জ্বল থাকবে।'

লেখক শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২), কারাগারের রোজনামচা (২০১৭), আমার দেখা নয়াচীন (২০২০) রচনার মাধ্যমে তাঁর নিজের জীবনের এবং রচনার যে সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তার একটি পরিচয় দেয়া হলো : ১. সত্যবাদিতা ২. পরিবর্তনশীলতা ৩. প্রাক-ধারণার অপনোদন ৪. সিদ্ধান্তে অটল থাকা ৫. বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ৬. সমন্বয়বাদিতা ৭. সাম্য-বণ্টনের ধারণা ৮. গণতন্ত্র ৯. নিয়মতান্ত্রিকতা ১০. অসাম্প্রদায়িকতা ১১. ধর্মে মতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতা ১২. প্রবীণনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ১৩. শিক্ষা নেয়ার ক্ষমতা ১৫. ভাষার প্রাঞ্জলতা ১৬. অপেক্ষা ১৭. ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ১৮. খুটিনাটি বর্ণনা করার দক্ষতা ১৯. কৌতুক ও রসবোধ ২০. কষ্ট সহিষ্ণুতা ২১. অকপটতা ২১. লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ভারত স্বাধীনতা ২২. রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চা ২৩. সহবন্দীদের প্রতি সহমর্মিতা ২৪. বিপরীত মতকে গুরুত্ব দেয়া ২৫. মুসলিম লীগ সরকারের যৌক্তিক বিরোধিতা করা ২৭. শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী সাহেবকে সম্মান ও চরিত্র বিশ্লেষণ ২৮. শামসুল হক সাহেবের মূল্যায়ন ও বৈকল্য ২৯ খাজা নাজিমদ্দিনকেও শ্রদ্ধা ২৮.

বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী ও সংসারের প্রতি ভালোবাস ২৯. পরিবর্তনশীলতা ৩০. গোপন রাজনীতির বিরুদ্ধে ৩১. সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন ৩২. সৌন্দর্য বোধ ৩১. অনশন ৩২. অসুস্থতা ৩৩. ত্যাগ , সততা, দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস ৩৪. ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয়তা ৩৫. মহাত্ম গান্ধীর আত্মত্যাগের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দান ৩৬. দেখার দৃষ্টিভঙ্গি (মহাত্মা/ জিন্নাহ/ নাজিমউদ্দীন/ ভাসানী/ কানা হাশেম/ শহীদ সাহেব/ শেরে বাংলা/ শামসুল হক প্রত্যেকের যথাযথ মূল্যায়ন করেছিলেন।

'পৃথিবীর প্রত্যেক ইতিহাস সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রনায়কই মূলত লেখক, দার্শনিক বা চিন্তক; তা না হলে তিনি শুধুই রাজনীতিক মাত্র। ফলে সংস্কৃতিমনস্কতা তাঁদের ব্যক্তিত্ব গঠনে মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই যেসব রাজনৈতিক নেতা রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি এবং রাষ্ট্রদর্শন ও মানবিকতার আদর্শগত তাত্ত্বিকতায় বুৎপত্তি অর্জন করেছেন তাঁরা লেখক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়ক হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেছেন। প্রাচীন এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, থমাস জেফারসন, আব্রাহাম লিংকন, ইংল্যান্ডের উইনস্টোন চার্চিল, ভারতের মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহেরু বা সেনেগালের সেংঘর বা দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা এঁরা সকলেই খ্যাতকীর্তি রাষ্ট্রনায়ক, স্বাধীনতাসংগ্রামী বা মানবতাবাদী লেখক দার্শনিক এবং সংস্কৃতি তাত্ত্বিক ও ইতিহাস ব্যাখ্যাতা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রচিন্তার নায়ক মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন বা মাওসেতুং, হোচিমিনও তেমনি। অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়, আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও এঁদের ধারায় নিজেকে বিন্যস্ত করেছিলেন। তাঁরও এঁদের মতো একটি স্বকীয় রাষ্ট্রদর্শন ছিল, উপনিবেশ উত্তরকালে নতুন ধরনের আধিপত্যবাদ ও আধা ঔপনিবেশিক ধাঁচের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রণনীতি ও কৌশল ছিল।'

তিন শুরুতেই অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় নিজের জন্মবৃত্তান্ত ও বংশ পরিচয় তুলে ধরেছেন, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে। 'আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমাদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে। বাড়ির চার ভিটায় চারটা দালান। বাড়ির ভিতরে

প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, যা আমরাও ছোট সময় দেখেছি বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত। একটা দালানে আমার এক দাদা থাকতেন। এক দালানে আমার এক মামা আজও কোনোমতে দিন কাটাচ্ছেন। আর একটা দালান ভেঙে পড়েছে, যেখানে বিষাক্ত সর্পকুল দয়া করে আশ্রয় নিয়েছে। এই সকল দালান চুনকাম করার ক্ষমতা আজ তাদের অনেকেরই নাই। এই বংশের অনেকেই এখন এ বাড়ির চারপাশে টিনের ঘরে বাস করেন। আমি এই টিনের ঘরের এক ঘরেই জন্মগ্রহণ করি' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-৩)। একটা নিরস আত্মজীবনী লেখা তার উদ্দেশ্য ছিল না। এই আত্মজীবনী রচনাকালে তাঁর মধ্যে সাহিত্যের সূক্ষ্ম রসবোধ, মানব মনোসমীক্ষণ এবং পূর্বরচিত আত্মজীবনীসমূহের উপস্থিতি ছিল। তিনি যখন লেখেন- ' সর্পকুল দয়া করে আশ্রয় নিয়েছে।' তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর ইঙ্গিতময়তা উইটের সর্বোচ্চ প্রয়োগ। এই বাক্যের মাধ্যমে পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও পরিবেশের বর্ণনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনাও প্রাঞ্জল ভাষা সবিস্তারে তাঁর বাবা বেড়ে ওঠার পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন- ' আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে। বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কিভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা, দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে করে মাঠে-মাঠে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তাঁর কথা মতো যা বলতেন তারা তাই করত।" শেখ মুজিব আমার পিতা, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী ২০১৫)

তিনি কিভাবে বৃহত্তর রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কিভাবে তাঁর পরিচয় ঘটল তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক : '১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। তাঁরা গোপালগঞ্জে আসবেন। বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। এগজিবিশন হবে ঠিক হয়েছে। বাংলার এই দুই নেতা একসাথে গোপালগঞ্জে আসবেন। মুসলমানদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। স্কুলের ছাত্র আমরা তখন। আগেই বলেছি আমার বয়স একটু বেশি, তাই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনি করার ভার পড়ল আমার উপর। ... হক সাহেব ও শহীদ সাহেব এলেন, সভা হল। এগজিবিশন উদ্বোধন করলেন। শান্তিপূর্ণভাবে সকল কিছু হয়ে গেল। হক সাহেব

পাবলিক হল দেখতে গেলেন। আর শহীদ সাহেব গেলেন মিশন স্কুল দেখতে। আমি মিশন স্কুলের ছাত্র। তাই তাকে সম্বর্ধনা দিলাম। তিনি স্কুল পরিদর্শন করে হাঁটতে হাঁটতে লঞ্চের দিকে চললেন, আমিও সাথে সাথে চললাম। তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম এবং বাড়ি কোথায়। একজন সরকারি কর্মচারী আমার বংশের কথা বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন খুব কাছে, আদর করলেন এবং বললেন, "তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই?" বললাম, "কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। মুসলিম ছাত্রলীগও নাই।" তিনি আর কিছুই বললেন না, শুধু নোটবুক বের করে আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিলেন। কিছুদিন পরে আমি একটা চিঠি পেলাম, তাতে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং লিখেছেন কলকাতা গেলে যেন তার সঙ্গে দেখা করি। আমিও তাঁর চিঠির উত্তর দিলাম। এইভাবে মাঝে মাঝে চিঠিও দিতাম।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-১১)

এবার বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার 'শেখ মুজিব আমার পিতা' প্রবন্ধ থেকে আমরা এই তথ্যের সত্যতা এবং আরো কিছু কৌতূহল উদ্দীপক অতিরিক্ত তথ্য পেতে পারি। "আমাদের পূর্বপুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূরে। আমার আব্বা এই স্কুলে প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি। একরত্তি ছেলে চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তাঁর এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট! সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি লেখাপড়া করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা গোপালগঞ্জ ভর্তি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা লেখাপড়া করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোরবেলা কাটে।"

(শেখ মুজিব আমার পিতা, শেখ হাসিনা, সচিত্র বাংলাদেশ, আগস্ট ২০১৪)

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র একটি প্রতীকি মূল্যায়ন উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর অপর কন্যা শেখ রেহেনার কথায়। তিনি বলেছিলেন- "বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র মতো আমাদের দুই বোনের জীবনও অসমাপ্ত। ধর্মে আছে-

কারো বাবা মা, ভাই বোন মারা গেলে কবর দেয়ার আগে মুখ দেখনো হয়। আমরা দুই বোন সেই সুযোগ পাইনি। তাই যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আমাদের জীবনটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।"

(সচিত্র বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা)

২.

এবার অসমাপ্ত আত্মজীবনীর কিছু পাঠ নেয়া যাক : মুসলিমলীগ সরকার গঠন করার পর থেকে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বাড়তে থাকে। নবাবদের এক পরিবার থেকে এগারজনকে এমএল এ করা হয়। "খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ঢাকার এক খাজা বংশের থেকেই এগারজন এমএলএ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে, খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি তাঁর ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দীন সাহেবকে শিল্পমন্ত্রী করলেন। আমরা বাধা দিলাম, তিনি শুনলেন না। শহীদ সাহেবের কাছে আমরা যেয়ে প্রতিবাদ করলাম, তিনিও কিছু বললেন না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হলেন। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে।"

যোগ্য পুত্রের যোগ্য বাবা। পারিবারিক সমর্থন না পেলে নিঃস্বার্থ কাজ করা সম্ভব নয়। "আর একদিনের কথা, গোপালগঞ্জ শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার আব্বাকে বলেছিলেন, আপনার ছেলে যা আরম্ভ করেছে তাতে তার জেল খাটতে হবে। তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাকে এখনই বাধা দেন। আমার আব্বা যে উত্তর করেছিলেন তা আমি নিজে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; তাতে আমি দুঃখ পাব না। জীবনটা নষ্ট নাও তো হতে পারে, আমি ওর কাজে বাধা দিব না। আমার মনে হয়, পাকিস্তান না আনতে পারলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না।"

বাংলার মানুষ শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু হওয়ার আগে শেরে বাংলার চেয়ে এত জনপ্রিয় নেতা এই বাংলায় ছিল না। শেরে বাংলা জমিদার শ্রেণির মানুষের অত্যাচার থেকে বাংলার কৃষকদের রক্ষা করেছিলেন। শেরে বাংলা মুসলিম লীগের রাজনীতি পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন পাকিস্তার হলে এ বাংলার মানুষের ভালো হবে না। তাছাড়া নেতা হিসাবে তিনি মোহাম্মদ আলী

জিন্নাহদের চেয়েও শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী। দেশ ভাগের আগের তার চেয়ে আর কেউ মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক সুফল আনতে পারেননি। এসব কারণে জিন্নাহসহ অনেক বড় নেতা চাইতেন না তিনি মুসলিমলীগে আসুক বরং কোনঠাসা করে রাখার চেষ্টা করেছেন তাঁকে। বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনীতে তার প্রমাণ আছে। এমনকি তাঁর পিতা-মাতাও তাদের সভায় শেরে বাংলাকে নিয়ে কোনো সমালোচনা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। আত্মজীবনী থেকে– "হক সাহেব কেন লীগ ত্যাগ করলেন, কেন পাকিস্তান চান না এখন? কেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে মিলে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন? এই সমস্ত আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ একজন বৃদ্ধ লোক যিনি আমার দাদার খুব ভক্ত, আমাদের বাড়িতে সকল সময়ই আসতেন, আমাদের বংশের সকলকে খুব শ্রদ্ধা করতেন–দাঁড়িয়ে বললেন, "যাহা কিছু বলার বলেন, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলবেন না। তিনি যদি পাকিস্তান না চান, আমরাও চাই না। জিন্নাহ কে? তার নামও তো শুনি নাই। আমাদের গরিবের বন্ধু হক সাহেব।" এ কথার পর আমি অন্যভাবে বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম। সোজাসুজিভাবে আর হক সাহেবকে দোষ দিতে চেষ্টা করলাম না। কেন পাকিস্তান আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাই বুঝালাম। শুধু এইটুকু না, যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কালো পতাকা দেখাতে গিয়েছি, তখনই জনসাধারণ আমাদের মারপিট করেছে। অনেক সময় ছাত্রদের নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি, মার খেয়ে। কয়েকবার মার খাওয়ার পরে আমাদের বক্তৃতার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম। পূর্বে আমার দোষ ছিল, সোজাসুজি আক্রমণ করে বক্তৃতা করতাম। তার ফল বেশি ভাল হত না। উপকার করার চেয়ে অপকারই বেশি হত। জনসাধারণ দুঃখ পেতে পারে ভেবে দাবিটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতাম।"

তৎকালীন হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের নিরপেক্ষ বয়ান– "হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারেও বাংলার মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই মুসলমানরা ইংরেজদের সাথে অসহযোগ করেছিল। তাদের ভাষা শিখবে না, তাদের চাকরি নেবে না, এই সকল করেই মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। আর হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে ইংরেজকে তোষামোদ করে অনেকটা উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল। যখন আবার হিন্দুরা ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন অনেকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে মরতে দ্বিধা করে নাই। জীবনভর কারাজীবন ভোগ করেছে, ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। এই সময় যদি এই সকল নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ত্যাগী পুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের

সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও বেনিয়ারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে তিক্ততা এত বাড়ত না। হিন্দু নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং নেতাজী সুভাষ বসু এ ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা অনেক সময় হিন্দুদের হুঁশিয়ার করেছিলেন। কবিগুরুও তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে হিন্দুদের সাবধান করেছেন। একথাও সত্য, মুসলমান জমিদার ও তালুকদাররা হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে একই রকম খারাপ ব্যবহার করত হিন্দু হিসাবে নয়, প্রজা হিসাবে। এই সময় যখনই কোনো মুসলমান নেতা মুসলমানদের জন্য ন্যায্য অধিকার দাবি করত তখনই দেখা যেত হিন্দুদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত, এমনকি গুণী সম্প্রদায়ও চিৎকার করে বাধা দিতেন। মুসলমান নেতারাও 'পাকিস্তান' সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতা শুরু করার পূর্বে হিন্দুদের বিরুদ্ধে গালি দিয়ে শুরু করতেন।"

ভ্রমণে আগ্রহ, অজানাকে জানার প্রবল কৌতূহল ছিল তাঁর– "হাওড়া থেকে আমরা দিল্লিতে রওয়ানা করলাম। এই প্রথমবার আমি বাংলাদেশের বাইরে রওয়ানা করলাম। দিল্লি দেখার একটা প্রবল আগ্রহ আমার ছিল। ইতিহাসে পড়েছি, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শুনেছি, তাই দিল্লির লালকেল্লা, জামেমসজিদ, কুতুব মিনার ও অন্যান্য ঐতিহাসিক জায়গাগুলি দেখতে হবে। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় যাব।"

প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টের মধ্যেও পার্টির দায়িত্ব পালন করা, দেশের জন্য দলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা বঙ্গবন্ধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। অর্থ নেই, এর মধ্যেও সহকর্মীদের প্রতি দায়িত্ববোধের ঘাটটি হয়নি। দিল্লিতে লীগের কাজের জন্য গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া। অবর্ণনীয় কষ্টভোগ, ট্রেনের টিকিট কিনতে না পারায় বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ। তিনি লিখছেন– "হিসাব করে দেখলাম, তিনজনের টিকিট করার টাকা আমাদের নাই। দুইখানা টিকিট করা যায়, কিন্তু না খেয়ে থাকতে হবে। খলিল ভাই একমাত্র বন্ধু, তবে তিনি তখনও ছাত্র তার কাছেও টাকা পয়সা নাই। যাহোক, আর দেরি না করে স্টেশনে এসে হাজির হলাম, তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, একখানা টিকিট করব এবং কোনো 'সার্ভেন্ট' ক্লাসে উঠে পড়ব। ধরা যদি পড়ি, হাওড়ায় একটা বন্দোবস্ত করা যাবে।...

প্রথম শ্রেণির প্যাসেঞ্জারদের গাড়ির সাথেই চাকরদের জন্য একটা করে ছোট্ট গাড়ি থাকে। সাহেবদের কাজকর্ম করে এখানেই এসে থাকে চাকররা। দিল্লি যাওয়ার সময় আমরা ইন্টারক্লাসে যাই। এখন টাকা ফুরিয়ে গেছে, কি করি? একখানা তৃতীয় শ্রেণির টিকিট কিনলাম হাওড়া পর্যন্ত। আর দুইখানা প্লাটফর্ম টিকিট কিনে স্টেশনের ভিতরে আসলাম। মাখনের চেহারা খুব সুন্দর। দেখলে কেউই বিশ্বাস করবে না 'চাকর' হতে পারে। আমরা শুনলাম, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন সাহেব এই বগিতে যাবেন। নূরুদ্দিন খোঁজ এনেছে। ভাবলাম, বিপদে পড়লে একটা কিছু করা যাবে। নূরুদ্দিনকে খান বাহাদুর সাহেব চিনতেন।...

কিছু কিছু ফলফলাদি নূরুদ্দিন কিনত, আমরা তিনজন খেতাম। ভাত বা রুটি খাবার পয়সা নাই। তিনজনে ভাত খেতে হলে তো এক পয়সাও থাকবে না।' আমরা বাসে উঠে হাওড়া থেকে বেকার হোস্টেলে ফিরে এলাম। না খেয়ে আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে।" বঙ্গবন্ধু কোলকাতায় একই সঙ্গে মুসলিমলীগ ও ছাত্রলীগের কাজ করতেন। দুটি রাজনৈতিক সংগঠন তখন একই উদ্দেশ্যে কাজ করলেও তাদের ছিল স্বাধীন সত্তা, আজকের মতো একটা আরেকটার অধীনস্ত হয়ে পড়েনি।

"১৯৪৪ সালে ছাত্রলীগের এক বাৎসরিক সম্মেলন হবে ঠিক হল। বহুদিন সম্মেলন হয় না। কলকাতায় আমার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কিছুটা ছিল– বিশেষ করে ইসলামিয়া কলেজে কেউ আমার বিরুদ্ধে কিছুই করতে সাহজ পেত না। আমি সমানভাবে মুসলিম লীগ ও ছাত্রলীগে কাজ করতাম।"

ছাত্রলীগ মুসলিম লীগ করলেও বিরোধী শেরে বাংলার আমন্ত্রণে যেতে বাধা হয়নি। শেরে বাংলার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলা তখনো তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। "অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না এটা আমি মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম। একদিন হক সাহেব আমাদের ইসলামিয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধিকে খাওয়ার দাওয়াত করলেন। দাওয়াত নিব কি নিব না এই নিয়ে দুই দল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, "কেন যাব না, নিশ্চয়ই যাব। হক সাহেবকে অনুরোধ করব মুসলিম লীগে ফিরে আসতে। আমাদের আদর্শ যদি এত হালকা হয় যে, তাঁর কাছে গেলেই আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে যাব, তাহলে সে পাকিস্তান আন্দোলন আমাদের না করাই উচিত।"

'পাকিস্তান' না হলে মুসলমানদের কি হবে? শেরে বাংলা বলেছিলেন, "১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব কে করেছিল, আমিই তো করেছিলাম! জিন্নাহকে চিনত কে?" আমরা তাঁকে আবার অনুরোধ করে সালাম করে চলে আসলাম। আরও অনেক আলাপ হয়েছিল, আমার ঠিক মনে নাই। তবে যেটুকু মনে আছে সেটুকু বললাম। তাঁর সঙ্গে স্কুল জীবনে একবার ১৯৩৮ সালে দেখা হয়েছিল ও সামান্য কথা হয়েছিল গোপালগঞ্জে। আজ শেরে বাংলার সামনে বসে আলাপ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।...

এদিকে মুসলিম লীগ অফিসে ও শহীদ সাহেবের কানে পৌঁছে গিয়েছে আমরা শেরে বাংলার বাড়িতে যাওয়া-আসা করি। তাঁর দলে চলে যেতে পারি। কয়েকদিন পরে যখন আমি শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "কি হে, আজকাল খুব হক সাহেবের বাড়িতে যাও, খানাপিনা কর?" বললাম, "একবার গিয়েছি জীবনে।" তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, "ভালই করছ, তিনি যখন ডেকেছেন কেন যাবে না?" আরও বললাম, "আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছি মুসলিম লীগে আসতে।" শহীদ সাহেব বললেন, "ভালই তো হত যদি তিনি আসতেন। কিন্তু আসবেন না, আর আসতে দিবেও না। তাঁর সাথে কয়েকজন লোক আছে, তিনি আসলে সেই লোকগুলির জায়গা হবে না কোথাও। তাই তাঁকে মুসলিম লীগের বাইরে রাখতে চেস্টা করছে।"

শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, কোন সংকীর্ণতার স্থান ছিল না তাঁর কাছে। কিন্তু অন্য নেতারা কয়েকদিন খুব হাসি তামাশা করেছেন আমাদের সাথে। আমি খুব রাগী ও একগুঁয়ে ছিলাম, কিছু বললে কড়া কথা বলে দিতাম। কারও বেশি ধার ধারতাম না।'

তখনকার দিনে মানুষের মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ ছিল প্রচণ্ড– "তখনকার দিনে সত্যিকার যার প্রয়োজন তাকেই তা দেওয়া হত। আজকালকার মত টেলিফোনে দলীয় ছাত্রদের রুম দেওয়ার জন্য অনুরোধ আসত না। ইসলামিয়া কলেজে গরিব ছেলেদের সাহায্য করবার জন্য একটা ফান্ড ছিল। সেই ফান্ড দেখাশোনা করার ভার ছিল বিজ্ঞানের শিক্ষক নারায়ণ বাবুর। আমি আর্টসের ছাত্র ছিলাম, তবু নারায়ণ বাবু আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি যদিও জানতেন, আমি প্রায় সকল সময়ই 'পাকিস্তান, পাকিস্তান' করে বেড়াই। ইসলামিয়া কলেজের সকল ছাত্রই মুসলমান। একজন

হিন্দু শিক্ষককে সকলে এই কাজের ভার দিত কেন? কারণ, তিনি সত্যিকারের একজন শিক্ষক ছিলেন। হিন্দুও না, মুসলমানও না। যে টাকা ছাত্রদের কাছ থেকে উঠত এবং সরকার যা দিত, তা ছাড়াও তিনি অনেক দানশীল হিন্দু-মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে জমা করতেন এবং ছাত্রদের সাহায্য করতেন। এই রকম সহানুভূতিপরায়ণ শিক্ষক আমার চোখে খুব কমই পড়েছে।"

রাজনীতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সর্বদা উদার নৈতিকতার পরিচয় দিতেন, কিন্তু খাজা নাজিমউদ্দীন ও নবাবদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড স্বজন তোষণ। মূল দল মুসলিম লীগের কোনো সিদ্ধান্তও ছাত্রলীগ পরিবর্তনে চাপ দিতে পারত এবং যৌক্তিক দাবি মেনে নেয়ারও তখন নজির ছিল।

"শহীদ সাহেব ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কলকাতা থেকে দুইটা সিটে এমএলএ হন। নাজিমুদ্দীন সাহেব পটুয়াখালী থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে আসলেন। তাঁর রাজনীতি থেকে সরে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না। শহীদ সাহেব হক সাহেবকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, আমি নাজিমুদ্দীন সাহেবকে কলকাতা থেকে বাই ইলেকশনে পাস করিয়ে নেব। যদি হক সাহেব পারেন, তাঁর প্রতিনিধি দিয়ে মোকাবেলা করাতে পারেন। হক সাহেবও লোক দাঁড় করিয়েছিলেন নাজিমুদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে। নাজিমুদ্দীন সাহেবই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেন, শহীদ সাহেবের দয়ায়। সেই নাজিমুদ্দীন সাহেব শহীদ সাহেবকে অপমানই করলেন। যাহোক, আমাদের পক্ষ থেকে পাঁচজনই আমরা কাউন্সিলে দাঁড় করাব, নাজিমুদ্দীন সাহেবের দলের কাউকেও হতে দেব না। কারণ, আমাদের ভরসা ছিল কাউন্সিলে শহীদ সাহেব সংখ্যাগুরু।

মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব একটা আপোস করার চেষ্টা করলেন। মওলানা সাহেবের বাড়িতে শহীদ সাহেব ও মাওলানা সাহেবের আলোচনা হল। শহীদ সাহেব নরম হয়ে গেছেন দেখলাম। তিনি বললেন, "এখন পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম, গোলমাল করে কি হবে, একটা আপোস হওয়াই ভাল।.. দরজাগুলি খুলে দিলেন। ছাত্ররা ভিতরে বসল। আমিই প্রথম বক্তা, প্রায় আধা ঘণ্টা বক্তৃতা করলাম এবং শহীদ সাহেবকে বললাম, "আপোস করার কোনো অধিকার আপনার নাই। আমরা খাজাদের সাথে আপোস করব না। কারণ, ১৯৪২ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজের ভাইকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। আবার তাঁর বংশের থেকে এগারজনকে এমএলএ বানিয়েছিলেন। এদেশে তারা ছাড়া

আর লোক ছিল না? মুসলিম লীগে কোটারি করতে আমরা দিব না। আমরাই হক সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি, দরকার হয় আপনাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করব।" শহীদ সাহেবকে বাধ্য করে সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে এসেছিলাম। আমার পরে ফজলুল কাদের চৌধুরী ও ফরিদপুরের লাল মিয়া সাহেবও আমাকে সমর্থন করে বক্তৃতা করেন।"

মুসলিম লীগের সুবিধাবাদী রাজনীতি ও পারিবারিক সুবিধাবাদী রাজনীতি তখনো কোনো পরিবারে ছিল প্রবল। তার মধ্যে লাল মিয়া ও মোহন মিয়াদের পরিবার অন্যতম। তারা এক ভাই এক পার্টিতে অন্য ভাই অপরপার্টিতে থাকতেন। পারিবারিকভাবে তারা সর্বদা ক্ষমতার সঙ্গে থাকতেন। দিনে বিরোধিতা রাতে ভাইয়ে বাইয়ে সহযোগিতা তাদের রাজনীতির লক্ষ্য ছিল।

"ভোট দিয়েছি, আর সকল ভোটই তমিজুদ্দিন সাহেব, মোহন মিয়া ও সালাম সাহেবের নেতৃত্বে নাজিমুদ্দীন সাহেবের দল পেয়েছিল। লাল মিয়া সাহেবের জন্য দুই চারটা ভোট ফরিদপুর থেকে আমি জোগাড় করেছিলাম। লাল মিয়া সাহেব মোহন মিয়া সাহেবের সহোদর ভাই হলেও তিনি লাল মিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। লাল মিয়া সাহেব পার্লামেন্টারি বোর্ডের মেম্বার হওয়ার পরে ফরিদপুরের সদস্য নমিনেশনের সময় ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করেন। আমাদের দলের লোককে নমিনেশন দিতে রাজি হন নাই।"

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন– "শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না। উপযুক্ত হলেই তাকে পছন্দ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। কারণ, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। তাঁর সাধুতা, নীতি, কর্মশক্তি ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চাইতেন। এজন্য তাঁকে বারবার অপমানিত ও পরাজয়বরণ করতে হয়েছে। উদারতা দরকার, কিন্তু নীচ অন্তঃকরণের ব্যক্তিদের সাথে উদারতা দেখালে ভবিষ্যতে ভালর থেকে মন্দই বেশি হয়, দেশের ও জনগণের ক্ষতি হয়।'.. বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথম চিনতে পারে নাই। যখন চিনতে পারল, তখন আর সময় ছিল না। নির্বাচনের সব খরচ, প্রচার, সংগঠন তাঁকেই এককভাবে করতে হয়। টাকা বোধহয় সামান্য কিছু কেন্দ্রীয় লীগ দিয়েছিল, বাকি শহীদ সাহেবকেই জোগাড় করতে হয়েছিল। শত শত সাইকেল তাকেই কিনতে হয়েছিল। আমার জানা মতে

পাকিস্তান হয়ে যাবার পরেও তাঁকে কলকাতায় বসে দেনা শোধ করতে হয়। আমি পূর্বেই বলেছি শহীদ সাহেব সরল লোক ছিলেন।"

জাতি হিসাবে বাঙালির চরিত্রের অকাট্য মূল্যায়ন দেখা যায় তাঁর গ্রন্থে– "ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই, ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ায় খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ, যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।"

বাঙালির প্রতারণা ও প্রতারিত হওয়ার ইতিহাসও তাঁর অজানা নয়। ধর্মের নামে যুগ যুগ ধরে বাঙালিকে শোষণ করা হয়েছে। তার মনে অদৃশ্যের প্রতি, অতিলৌকিকতার প্রতি দুর্বলতা রয়েছে তার সদব্যবহার করছে চতুর কিছু মানুষ। বঙ্গবন্ধু খুব সজহ সরলভাবে অল্প কথায় তার বর্ণনা দিয়েছেন– "অনেক সময় দেখা গেছে, একজন অশিক্ষিত লোক লম্বা কাপড়, সুন্দর চেহারা, ভাল দাড়ি, সামান্য আরবি ফার্সি বলতে পারে, বাংলাদেশে এসে পীর হয়ে গেছে। বাঙালি হাজার হাজার টাকা তাকে দিয়েছে একটু দোয়া পাওয়ার লোভে। ভাল করে খবর নিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ লোকটা কলকাতার কোন ফলের দোকানের কর্মচারী অথবা ডাকাতি বা খুনের মামলায় আসামি। অন্ধ কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাসও বাঙালির দুঃখের আর একটা কারণ।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চার্চিলের ভারত নীতির ফলে যে এ দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, সেই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যায়। ব্রিটিশের এই দ্বিমুখী নীতি তাঁর বইতে উঠে এসেছে। "যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে মিস্টার চার্চিল ভারতে ক্রিপস মিশন পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। যুদ্ধের পরে যখন মিস্টার ক্লিমেন্ট এটলি লেবার পার্টির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হন তখন তিনি ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার কথা ঘোষণা করলেন।"

জিন্নাহ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর ধারণা জিন্নাহ বেঁচে থাকলে এতো তাড়াতাড়ি পাকিস্তান দুর্বিপাকে পড়ত না।

"জিন্নাহ সাহেব বক্তৃতা করলেন, সমস্ত সভা নীরবে ও শান্তভাবে তাঁর বক্তৃতা শুনল। মনে হচ্ছিল সকলের মনেই একই কথা, পাকিস্তান কায়েম করতে হবে। তাঁর বক্তৃতার পরে সাবজেক্ট কমিটি গঠন হল। আট তারিখে সাবজেক্ট কমিটির সভা হল। প্রস্তাব লেখা হল, সেই প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাব থেকে আপাতদৃষ্টিতে ছোট কিন্তু মৌলিক একটা রদবদল করা হল। একমাত্র হাশিম সাহেব আর সামান্য কয়েকজন যেখানে পূর্বে 'স্টেটস' লেখা ছিল, সেখানে 'স্টেট' লেখা হয় তার প্রতিবাদ করলেন; তবুও তা পাস হয়ে গেল।"

তাজমহল মোগল স্থাপত্য দেখতে আগ্রায় গিয়ে সম্রাট শাহজাহানের এই স্থাপত্যকলার হৃদয়গ্রাহী এক বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এতে তাঁর সাহিত্যিক ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যা।

"ইংরেজ সবকিছু লুট করেই নিয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ থেকে। লর্ডস্থানীয় লোকরাই এই লুটের প্রধান কর্ণধার ছিলেন। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অনেক জায়গায়ই মোগল শিল্পের অনেক নিদর্শন আছে। আমরা ইতিমাদ-উদ-দৌলা দেখে ফিরে চললাম তাজমহল দেখতে।...

সূর্য অস্তাচলগামী, আমরাও তাজমহলের দরজায় হাজির। অনেকক্ষণ থাকব, রাত দশটা পর্যন্ত দরজা খোলা থাকে, তারপর দারোয়ান সাহেবরা এসে ঘণ্টা দিয়ে জানিয়ে দিবে সময় হয়ে গেছে। তাজকে ত্যাগ করতে হবে, রাতের জন্য। আমরা বসে পড়লাম, একটা জায়গা বেছে নিয়ে কয়েকজন নামাজ পড়তে গেলেন। আজানের ধ্বনি কানে এসেছে। পাকিস্তান হওয়ার পরও আজান হয় কি না জানি না। এই দিনে অনেক লোক দেশ-বিদেশ থেকে এসেছে। বাঙালি, মারাঠি, পাঞ্জাবি–মনে হল ভারতবর্ষের সকল জায়গার লোকই এসেছে। আমাদের পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, এত ভিড় কি সকল সময়ই থাকে. বললেন না, পূর্ণ চন্দ্রের সময়ই অনেক লোক বিশেষ করে আসে।...

সূর্য যখন অস্ত গেল, সোনালি রঙ আকাশ থেকে ছুটে আসছে। মনে হল, তাজের যেন আর একটা নতুন রূপ। সন্ধ্যার একটু পরেই চাঁদ দেখা দিল। চাঁদ অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে আর সাথে সাথে তাজ যেন ঘোমটা ফেলে দিয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে। কি অপূর্ব দেখতে! আজও একুশ বৎসর পরে লিখতে বসে তাজের রূপকে আমি ভুলি নাই, আর ভুলতেও পারব না।...

মোগলদের স্থাপত্য শিল্পের গল্প করতে করতেই আমরা এসে পড়লাম ফতেহপুর সিক্রিতে। আকবর বাদশা নিজেই ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ

করেছিলেন। এখানে সম্রাট আকবর তাঁর রাজধানী করেছিলেন। আগ্রার দুর্গের সাথে এর বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তবে ফতেহপুর সিক্রি অনেক বড়। এই ফতেহপুর সিক্রির সামনেই যে বিরাট ময়দান দেখা যায় এর নামই খানওয়া। এখানেই সম্রাট বাবর সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। কেন যে আকবর বাদশা এখানে দুর্গ তেরি করেন তা বলা কষ্টকর। এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত। আমরা আগ্রা গেট পার হয়ে ভিতরে এলাম, সামনে বুলন্দ দরোজা। এটাই হল দুর্গের প্রধান গেট। একশত চৌত্রিশ ফিট উঁচু বুলন্দ দরোজা পার হয়েই আমরা প্রথম দেখতে পেলাম সেলিম চিশতীর দরগাহ। তাঁর মাজার জিয়ারত করে আমরা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করব। দরগাহ জিয়ারত করলাম।...

এক একজনে এক একটা জায়গা দেখতে চায়। আমি দেখতে চেয়েছিলাম তানসেনের বাড়ি। শেষ পর্যন্ত তানসেনের বাড়ি দেখতে গেলাম। তাঁর বাড়িটা প্রসাদের বাইরে, পাহাড়ের ওপর ছোট্ট একটা বাড়ি। বোধহয় সঙ্গীত সাধনায় ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি দূরে তাকতেই ভালবাসতেন।...

আমার মন যেন সান্ত্বনা পেল না তানসেনের বাড়ি দেখে। যা হোক, বহুদিনের কথা, এ বাড়িতে তিনি ছিলেন কি না শেষ পর্যন্ত তারই বা ঠিক কি? সম্রাট তো এত অর্থ খরচ করে যে প্রসাদা ও দুর্গ তৈরি করলেন, দু'বছরের বেশি থাকতে পারেন নাই, আবার আগ্রা দুর্গে ফিরে যেতে হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, পানির অভাবের জন্য। আমার মন স্বীকার করতে চায় না যে, পানির জন্য তিনি চলে যান। মনে হয় অন্য কোন কারণ ছিল। আট বর্গমাইল জায়গা নিয়ে ফতেহপুর সিক্রি, রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ গড়ে তোলেন– যার মধ্যে দুই হাজার নয়শত ঘর ছিল। আগ্রা দুর্গে ছিল প্রায় পাঁচশত ঘর। ফতেহপুর সিক্রিতে সম্রাটের সমস্ত অমাতৃবৃন্দের থাকার জায়গা হয়েও ষাট হাজার সৈন্য থাকতে পারত। সম্রাট আকবরের শক্তি এবং সামর্থ্য ছিল। তিনি এদের জন্য পানির ব্যবস্থা করতে পারেন নাই, পানির কষ্টেই তিনি ফতেহপুর সিক্রি ছেড়ে আসেন, এটা যেন বিশ্বাস করতে মন চাইল না।...

আমরা সকলেই কিছু খেয়ে নিয়ে রওয়ানা করলাম কেসেন্দ্রায়, যেখানে সম্রাট আকবর চিরনিদ্রায় শায়িত। এই সমাধি স্থান তিনি নিজেই ঠিক করে গিয়েছিলেন। দিল্লি থেকে শুরু করে অনেক রাজা-বাদশার সমাধি আমি দেখেছি, কিন্তু সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধির ভাবগম্ভীর ও সাদাসিধে পরিবেশটা

আমার বেশ লেগেছিল। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে অনেক রকমের গাছপালায় ভরা, ফল ও ফুলের গাছ! সমাধিটা সাদা পাথরের তৈরি।"

কষ্ট ত্যাগ, সংসার প্রেম, দেশের স্বাধীনতা এসবই বঙ্গবন্ধুর বৈশিষ্ট্য। জীবনে অনেক ত্যাগ তীতিক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি পৌঁছেছিলেন উন্নততর সোপানে।

"অনেক ধাক্কাধাক্কি করলাম, প্রথম শ্রেণির ভদ্রলোক দরোজা খুললেন না। ট্রেন ভীষণ জোরে চলছে, আমাদের ভয় হতে লাগল, একবার হাত ছুটে গেলে আর উপায় নাই। আমি দুই হাতলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিলাম, আর ওকে বুকের কাছে রাখলাম। মেলট্রেন– স্টেশন কাছাকাছি হবে না। আমাদের কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ছিল। বাতাসে হাত-পা অবশ হতে চলেছে। আর কিছু সময় চললে আর উপায় নাই। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল। আমরা নেমে পড়লাম। 'আনোয়ার' 'আনোয়ার' বলে ডাকতে শুরু করলাম। মধ্যম শ্রেণিতে আনোয়ার ছিল, ওর কাছেই আমার বিছানা। আমাদের জন্য আনোয়ার খুব উদ্বিগ্ন ছিল। জানালা দিয়ে কোনক্রমে ট্রেনের ভিতর উঠলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালাম। সকলের সকল কিছুই আছে, আমার সুটকেসটা হারিয়ে গেছে। শুধু বিছানাটা নিয়ে কলকাতা ফিরে এলাম।...

আব্বা, মা, ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেণুর ঘরে এলাম বিদায় নিতে। দেখি কিছু টাকা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। 'অমঙ্গল অশ্রুজল' বোধহয় অনেক কষ্টে বন্ধ করে রেখেছে। বলল, "একবার কলকাতা গেলে আর আসতে চাও না। এবার কলেজ ছুটি হলেই বাড়ি এস।...

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে নিজেই হাসতাম, সহপাঠীরাও হাসত। পড়তে চাইলেই কি আর লেখাপড়া করা যায়! ক্যাবিনেট মিশন তখন ভারতবর্ষে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করছে ক্যাবিনেট মিশনের সাথে।"

কোলকাতার গ্রেট কিলিংয়ের সময় বঙ্গবন্ধু সরাসরি সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ ও ছাত্রলীগের প্রভাবশালী নেতা হিসাবে দাঙ্গা প্রতিরোধে কাজ করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক রূপ কি ভয়াবহ হতে পারে তিনি সচক্ষে দেখেছিলেন। এই ঘটনা তাঁকে পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল। তাঁর বর্ণনা থেকেই উদ্ধার করা যাক :

"তোমাদের মহল্লায় মহল্লায় যেতে হবে, হিন্দু মহল্লায়ও তোমরা যাবে। তোমরা বলবে, আমাদের এই সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, আসুন আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই দিনটা পালন করি।..

আমার উপর ভার দেওয়া হল ইসলামিয়া কলেজে থাকতে। শুধু সকাল সাতটায় আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব মুসলিম লীগের পাতাকা উত্তোলন করতে। আমি ও নূরুদ্দিন সাইকেলে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হলাম। পতাকা উত্তোলন করলাম। কেউই আমাদের বাধা দিল না। আমরা চলে আসার পরে পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল শুনেছিলাম। আমরা কলেজ স্ট্রিট থেকে বউবাজার হয়ে আবার ইসলামিয়া কলেজে ফিরে এলাম। কলেজের দরজা ও হল খুলে দিলাম। আর যদি আধা ঘণ্টা দেরি করে আমরা বউবাজার হয়ে আসতাম তবে আমার ও নূরুদ্দিনের লাশও আর কেউ খুঁজে পেত না।...

বেকার হোস্টেল থেকে মাত্র কয়েকজন কর্মী এসে পৌঁছেছে। আমি ওদের সভাকক্ষ খুলে টেবিল চেয়ার ঠিক করতে বললাম। কয়েকজন মুসলিম ছাত্রী মন্নুজান হোস্টেল থেকে ইসলামিয়া কলেজে এসে পৌঁছেছেন। এরা সকলেই মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। এর মধ্যে হাজেরা বেগম (এখন হাজেরা মাহমুদ আলী), হালিমা খাতুন (এখন নূরুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী), জয়নাব বেগম (এখন মিসেস জলিল), সাদেকা বেগম (এখন সাদেকা সামাদ) তাদের নাম আমার মনে আছে। এরা ইসলামিয়া কলেজে পৌঁছার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল কয়েকজন ছাত্র রক্তাক্ত দেহে কোনোমতে ছুটে এসে ইসলামিয়া কলেজে পৌঁছেছে। কারও পিঠে ছোরার আঘাত, কারও মাথা ফেটে গেছে। কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না। কারণ, এ জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েরা এগিয়ে এসে বললেন, "যারা জখম হয়েছে, তাদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। পানির বন্দোবস্ত করেন।" কোথায় এরা কাপড় পাবে ব্যান্ডেজ করতে? যার যার ওড়না ছিঁড়ে, শাড়ি কেটে ব্যান্ডেজ করতে শুরু করল। কাছেই হোস্টেল, তাড়াতাড়ি খবর দিলাম। এদের ব্যান্ডেজ করেই একজন পরিচিত ডাক্তার ছিলেন তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে শুরু করলাম।...

দেখি শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক মসজিদ আক্রমণ করছে। মৌলভী সাহেব পালিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। তাঁর পিছে ছুটে আসছে একদল লোক লাঠি ও তলোয়ার হাতে। পাশেই মুসলমানদের কয়েকটা দোকান ছিল। কয়েকজন লোক কিছু লাঠি নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে

থেকে কয়েকজন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' দিতে শুরু করল। দেখতে দেখতে অনেক লোক জমা হয়ে গেল। আমাদের সামনা সামনি এসে পড়েছে। বাধা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। ইঁট পাটকেল যে যা পেল তাই নিয়ে আক্রমণের মোকাবেলা করে গেল। আমরা সব মিলে দেড় শত লোকের বেশি হব না। কে যেন পিছন থেকে এসে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের কয়েকখানা লাঠি দিল। এর পূর্বে শুধু ইঁট দিয়ে মারামারি চলছিল। এর মধ্যে একটা বিরাট শোভাযাত্রা এসে পৌঁছাল। এদের কয়েক জায়গায় বাধা দিয়েছে, রুখতে পারে নাই। তাদের সকলের হাতেই লাঠি। এরা এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করল। কয়েক মিনিটের জন্য হিন্দুরা ফিরে গেল আমরাও ফিরে এলাম।...

কালীঘাট, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার সকল জায়গায় শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ হয়েছে। শহীদ সাহেব বক্তৃতা করলেন এবং তাড়াতাড়ি সকলকে বাড়ি ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। কিন্তু যাদের বাড়ি বা মহল্লা হিন্দু এরিয়ার মধ্যে তারা কোথায় যাবে? মুসলিম লীগ অফিস লোকে লোকারণ্য। কলকাতা সিটি মুসলিম লীগ অফিসেরও একই অবস্থা। বহু লোক জাকারিয়া স্ট্রিটে চলে গেল। ওয়েলেসলী, পার্ক সার্কাস, বেনিয়া পুকুর এরিয়া মুসলমানদের এরিয়া চলা চলে। বহু জখম হওয়া লোক এসেছে; তাদের পাঠাতে হয়েছে মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্বেল ও ইসলামিক হসপিটালে। মিনিটে মিনিটে টেলিফোন আসছে, শুধু একই কথা, 'আমাদের বাঁচাও, আমরা আটকা পড়ে আছি। রাতেই আমরা ছেলেমেয়ে নিয়ে শেষ হয়ে যাব।'...

আমি দৌড়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে গেলে তিনি নিজেই এসে হুকুম দিলেন দরজা খুলে দিতে। আশেপাশে থেকে কিছু লোক কিছু কিছু খবর দিতে লাগল। বেকার হোস্টেল, ইলয়ট হোস্টেল পূর্বেই ভরে গেছে। এখন চিন্তা হল টেইলর হোস্টেলের ছেলেদের কি করে বাঁচাই। কোন কিছুই জোগাড় হচ্ছে না। কিছু ছাত্র দুপুরে চলে এসেছে। কিছু আটকা পড়েছে। বিল্ডিংটা এমনভাবে ছিল যে, একটা মাত্র গেট। চারপাশে হিন্দু বাড়ি, আগুন দিলে সমস্ত হিন্দু মহল্লা শেষ হয়ে যাবে। রাতে কয়েকবার গেট ভাঙবার চেষ্টা করেছে, পারে নাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ধরতে পারছি না। ফোন করলেই খবর পাই লালবাজার আছেন। লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার। নূরুদ্দিন অনেক রাতে একটা বড় গাড়ি ও কিছু পুলিশ জোগাড় করে তাদের উদ্ধার করে আনার ব্যবস্থা করেছিল। অনেক হিন্দু তালতলায়, ওয়েলেসলী এরিয়া ছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক

গোপনে আমাদের সাহায্য চাইল। অনেক কষ্টে কিছু পরিবারকে আমরা হিন্দু এরিয়ায় পাঠাতে সক্ষম হলাম, বিপদ মাথায় নিয়ে। বেকার হোস্টেলের আশেপাশে কিছু কিছু হিন্দু পরিবা ছিল, তাদেরও রক্ষা করা গিয়েছিল। এদের সুরেন ব্যানার্জি রোডে একবার পৌঁছে দিতে পারলেই হয়।

আমার মেজোবোনের জন্য চিন্তা নাই, কারণ সে বেনিয়া পুকুরে আছে। সেখানে এক বোন বেড়াতে এসেছে। এক বোন শ্রীরামপুরে ছিল। একমাত্র ভাইরা শেখ আবু নাসের ম্যাট্রিক পড়ে। একেবারে ছেলেমানুষ। একবার মেজো জনের বাড়ি, একবার আমার ছোটবোনের বাড়ি এবং মাঝে মাঝে আমার কাছে বেড়িয়ে বেড়ায়।...

কলকাতা শহরে শুধু মরা মানুষের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এক ভয়াবহ দৃশ্য! মানুষ মানুষকে এইভাবে হত্যা করতে পারে, চিন্তা করতেও ভয় হয়!... এদিকে হোস্টেলগুলিতে চাউল, আটা ফুরিয়ে গিয়েছে। কোন দোকান কেউ খোলে না, লুট হয়ে যাবার ভয়েতে। শহীদ সাহেবের কাছে গেলাম। কি করা যায়? শহীদ সাহেব বললেন, "নবাবজাদা নসরুল্লাহকে (ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ সাহেবের ছোট ভাই, খুব অমায়িক লোক ছিলেন, শহীদ সাহেবের ভক্ত ডেপুটি চিফ হুইপ ছিলেন) ভার দিয়েছি, তার সাথে দেখা কর।" আমরা তাঁর কাছে ছুটলাম। তিনি আমাদের নিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে গেলেন এবং বললেন, "চাউল এখানে রাখা হয়েছে তোমরা নেবার বন্দোবস্ত কর। আমাদের কাছে গাড়ি নাই। মিলিটারি নিয়ে গিয়েছে প্রায় সমস্ত গাড়ি। তবে দেরি করলে পরে গাড়ির বন্দোবস্ত করা যাবে।" আমরা ঠেলাগাড়ি আনলাম, কিন্তু ঠেলবে কে? আমি, নূরুদ্দিন ও নূরুল হুদা (এখন ডিআইটির ইঞ্জিনিয়ার) এই তিনজনে ঠেলাগাড়িতে চাউল বোঝাই করে ঠেলতে শুরু করলাম। নূরুদ্দিন সাহেব তা 'তালপাতার সেপাই– শরীরে একটুও বল নাই। আমরা তিনজনে ঠেলাগাড়ি করে বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেলে চাউল পৌঁছে দিলাম। এখন কারমাইকেল হোস্টেলে কি করে পৌঁছাই?...

নাসেরের একটা পা ছোটকালে টাইফয়েড হয়ে খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। পা টেনে টেনে হাঁটতে হয়। সেই পা দেখিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে উঠে পড়ে। দিনভর এ্যাম্বুলেন্সে থাকে, সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠে শ্রীরামপুর যায়। ট্রেনে তিন ঘণ্টা লাগে। কয়েকবার ট্রেনে আক্রমণ হয়েছে। কোনোমতে বেঁচে গিয়েছে।

একটা কথা সত্য, অনেক হিন্দু মুসলমানদের রক্ষা করতে যেয়ে বিপদে পড়েছে। জীবনও হারিয়েছে। আবার অনেক মুসলমান হিন্দু পাড়াপড়শীকে রক্ষা করতে যেয়ে জীবন দিয়েছে। আমি নিজেই এর প্রমাণ পেয়েছি। মুসলিম লীগ অফিসে যেসব টেলিফোন আসত, তার মধ্যে বহু টেলিফোন হিন্দুরাই করেছে। তাদের বাড়িতে মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছ। শীঘ্রই এদের নিয়ে যেতে বলেছে, নতুবা এরাও মরবে, আশ্রিত মুসলমানরাও মরবে।... একদল লোককে দেখেছি দাঙ্গাহাঙ্গামার ধার ধারে না। দোকান ভাঙছে, লুট করছে, আর কোনো কাজ নাই। একজনকে বাধা দিতে যেয়ে বিপদে পড়েছিলাম। আমাকে আক্রমণ করে বসেছিল। কারফিউ জারি হয়েছে, রাতে কোথাও যাবার উপায় নাই। সন্ধ্যার পরে কোন লোক রাস্তায় বের হলে আর রক্ষা নাই। কোন কথা নাই, দেখামাত্র শুধু গুলি। মিলিটারি গুলি করে মেরে ফেলে দেয়। এমনকি জানালা খোলা থাকলেও গুলি করে। ভোরবেলা দেখা যেত অনেক লোক রাস্তায় গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে। কোনো কথা নেই শুধু গুলি।...

একবার আমার ও সিলেটের মোয়াজ্জেম চৌধুরীর (এখন কনভেনশন মুসলিম লীগের এমএনএ) উপর ভার পড়েছে রাতে পার্ক সার্কাস ও বালিগঞ্জের মাঝে একটা মুসলমান বস্তি আছে–প্রত্যেক রাতেই হিন্দুরা সেখানে আক্রমণ করে–তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য। কারণ, বন্দুক চালানোর লোকের নাকি অভাব। আমি ও মোয়াজ্জেম বন্দুক চালাতে পারতাম। আমার ও মোয়াজ্জেমের বাবার বন্দুক ছিল। আমরা গুলি ছুঁড়তে জানতাম।... অনেক্ষণ ধরে চেষ্টার পর ময়দানের পিছন দিয়ে 'সওগাত' প্রেসের মালিক ও সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সাহেবের বাড়ির কাছে পৌঁছালাম।... তারা ছায়া দেখলেও গুলি করে। উপায় নাই। রাতে আমাদের সেখানেই কাটাতে হল। আমরা জায়গামত পৌঁছাতে পারলাম না। যদিও সে রাতে কোনো গোলমাল হয় নাই। প্রায় মাইল দেড়েক পথ অতিক্রম করেছিলাম। যে কোনো সময় গুলি খেয়ে মরতে পারতাম।

বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করার জায়গা ছিল একমাত্র এ্যাসপ্লানেডে, যাকে আমরা চৌরঙ্গী বলতাম। এখন অবস্থা হয়েছে আরও খারাপ। বেশ কিছুদিন কোনো গোলমাল নাই। হঠাৎ এক জায়গায় সামান্য গোলমাল আর ছোরা মারামারি শুরু হয়ে গের। শহীদ সাহেব সমস্ত রাতদিন পরিশ্রম করছেন, শান্তি রক্ষা করবার জন্য। কলকাতায় চৌদ্দ-পনের শত পুলিশ বাহিনির মধ্যে মাত্র

পঞ্চাশ-ষাটজন মুসলমান, অফিসারদের অবস্থাও প্রায় সেই রকম। শহীদ সাহেব লীগ সরকার চালাবেন কি করে? তিনি আরও এক হাজার মুসলমান কে পুলিশ বাহিনিতে ভর্তি করতে চাইলে তদানীন্তন ইংরেজ গভর্নর আপত্তি তুলেছিলেন। শহীদ সাহেব পদত্যাগের হুমকি দিলে তিনি রাজি হন। পাঞ্জাব থেকে যুদ্ধ ফেরত মিলিটারি লোকদের এনে ভর্তি করলেন। এতে ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেল। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার কাগজগুলি হৈচৈ বেশি করল।" এত কিছুর পরে কখনো ছাত্রত্ব থেকে তিনি পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নেননি। নিজের মধ্যেও যেমন প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানবোধ ছিল, তেমন পিতা-মাতা এবং মহিয়সী স্ত্রীর পক্ষ থেকেও চাপ ছিল।

"আসানসোলে ইউরোপিয়ান ভদ্রমহিলার কাছ থেকে এবং নিজ হাতে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম, পরবর্তী জীবনে তা আমার অনেক উপকার করেছিল, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে। এই সময় মনস্থির করলাম, আমাকে বিএ পরীক্ষা দিতে হবে। ড. জুবেরী আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, "তুমি যথেষ্ট কাজ করেছ পাকিস্তান অর্জন করার জন্য। তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই না। তুমি যদি ওয়াদা কর যে এই কয়েক মাস লেখাপড়া করবা এবং কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যাবা এবং ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বেই এসে পরীক্ষা দিবা, তাহলে তোমাকে আমি অনুমতি দিব।...

আমার ছোটবোনের স্বামী বরিশালের এডভোকেট আবদুর রব সেরনিয়াবাত তখন পার্ক সার্কাসে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছেন। আমার বোনও থাকত, তার কাছেই উঠলাম। কিছুদিন পরে রেণুও কলকাতায় এসে হাজির। রেণুর ধারণা, পরীক্ষার সময় সে আমার কাছে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পাস করব। বিএ পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম।...

শেখ শাহাদাত হোসেন দুই মাসের ছুটি নিয়ে আমাকে পড়তে সাহায্য করেছিল। পরে জীবনে অনেক ক্ষতি আমার সে করেছে। এর জন্য তাকে কোনোদিনই কিছু বলিনাই। ওর বাড়ি আমার বাড়ির কাছাকাছি।"

ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে বিপুল রক্তপাত ও শ্রম ঘামের পরে ইতিহাসের অখণ্ড ভারত সাম্প্রদায়িক কারণে ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু সমধর্মে বসবাস হলেই যে শান্তি আসে না তার প্রমাণ পাকিস্তান।

৩.

"পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে দিল্লিতে এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়। কারণ, বাংলাদেশ ভাগ হলেও যতটুকু আমরা পাই, তাতেই সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের মিলিতভাবে লোকসংখ্যার চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বেশি। সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও কর্মক্ষমতা অনেককেই বিচলিত করে তুলেছিল। কারণ, ভবিষ্যতে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাইবেন এবং বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও থাকবে না।...

নবাব মামদোত পূর্ব পাঞ্জাবের লোক হয়েও পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হলেন। লিয়াকত আলী খান ভারতবর্ষের লোক হয়েও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। আর সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের লোক হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে আবার তাঁকে নির্বাচন করতে হবে বলা হল। যেখানে সমগ্র বাংলাদেশের মুসলিম লীগ এমএলএরা সর্বসম্মতিক্রমে শহীদ সাহেবকে নেতা বানিয়েছিলেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন– এই অবস্থার মধ্যে দিল্লি থেকে হুকুম আসল আবার নেতা নির্বাচন হবে।...

ডা. মালেক বলেছিলেন, প্রথম কাজ হবে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা। ফল হল উল্টা, তিনজন এমএলএ ছাড়া আর সকলেই ছিলেন সিলেটের জমিদার। তাঁরা ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। হোটেল বিল্টমোরে তাঁদের রাখা হয়েছিল। আমরা এদের শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ধরে এনেছিলাম। শহীদ সাহেবের কাছে সিলেটের এমএলএরা দাবি করলেন তিনটি মন্ত্রিত্ব দিতে হবে সিলেটে। শহীদ সাহেব বললেন, "আমি কোন ওয়াদা করি না। তাঁদের যা প্রাপ্য তাই পাবেন।" অন্যদিকে নাজিমুদ্দীনের পক্ষে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। দু'একজন ছাড়া সিলেটের এমএলএরা নাজিমুদ্দীন সাহেবকে ভোট দিলেন, তাতে শহীদ সাহেব পরাজিত হলেন।...

নাজিমুদ্দীন সাহেব নেতা নির্বাচিত হয়েই ঘোষণা করলেন, ঢাকা রাজধানী হবে এবং তিনি দলবলসহ ঢাকায় চলে গেলেন। একবার চিন্তাও করলেন না, পশ্চিম বাংলার হতভাগা মুসলমানদের কথা। এমনকি আমরা যে সমস্ত জিনিসপত্র কলকাতা থেকে ভাগ করে আনব তার দিকেও ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ফলে যা আমাদের প্রাপ্য তাও পেলাম না। সরকারি কর্মচারীরা ঝগড়া গোলমাল

করে কিছু কিছু মালপত্র স্টিমার ও ট্রেনে তুলতে পেরেছিলেন, তাই সম্বল হল। কলকাতা বসে যদি ভাগ বাটোয়ারা করা হত তাহলে কোনো জিনিসের অভাব হত না। নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগ বা অন্য কারোর সাথে পরামর্শ না করেই ঘোষণা করলেন ঢাকাকে রাজধানী করা হবে। তাতেই আমাদের কলকাতার উপর আর কোনা দাবি রইল না। এদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, কলকাতা নিয়ে কি করবেন? 'মিশন উইথ মাউন্ডব্যাটেন' বইটা পড়লে সেটা দেখা যাবে। ইংরেজ তখনও ঠিক করে নাই কলকাতা পাকিস্তানে আসবে, না হিন্দুস্তানে থাকবে। আর যদি কোনো উপায় না থাকেতবে একে 'ফ্রি শহর' করা যায় কি না? কারণ, কলকাতার হিন্দু-মুসলমান লড়বার জন্য প্রস্তুত। যে কোন সময় দাঙ্গাহাঙ্গামা ভীষণ রূপ নিতে পারে। কলকাতা হিন্দুস্তানে পড়লেও শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত পাকিস্তানে আসার সম্ভাবনা ছিল। হিন্দুরা কলকাতা পাবার জন্য আরও অনেক কিছু ছেড়ে দিতে বাধ্য হত।

পূর্ব পাকিস্তানে দুনিয়ার অন্যতম পাহাড়ি শহর, থাকার কোন কষ্ট হবে না।' অর্থাৎ দার্জিলিংও আমরা পাব। তাও নাজিমুদ্দীন সাহেবের এই ঘোষণায় শেষ হয়ে গেল। যখন গোলমালের কোনো সম্ভাবনা থাকল না, মাউন্টব্যাটেন সুযোগ পেয়ে যশোর জেলায় সংখ্যাগুরু মুসলমান অধ্যুষিত বনগাঁ জংশন অঞ্চল কেটে দিলেন। নদীয়ায় মুসলমান বেশি, তবু কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট জংশন ওদের দিয়ে দিলেন। মুর্শিদাবাদে মুসলমান বেশি কিন্তু সমস্ত জেলাই দিয়ে দিলেন। মালদহ জেলায় মুসলমান ও হিন্দু সমান সমান তার আধা অংশ কেটে দিলেন, দিনাজপুরে মুসলমান বেশি, বালুরঘাট মহকুমা কেটে দিলেন যাতে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং হিন্দুস্তানে যায় এবং আসামের সাথে হিন্দুস্তানের সরাসরি যোগাযোগ হয়।" তারপর কোলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসা "কলকাতার কর্মীরাও অনেকে ঢাকা চলেছে, আমি পাকিস্তানে যাব না। তোমরা প্রেসটা ঢাকায় নিয়ে একে কেন্দ্র করে দলটা টিক রাখ, আর কাজ চালিয়ে যাও।"

হাশিম সাহেব আবার কলকাতার কর্মীদের বললেন, "তোমরা তো কলকাতায় থাকলে, তোমাদেরই বোধহয় প্রেসটা থাকা দরকার। কারণ, হিন্দুস্তানে তোমরা কিইবা করবা! যাদের বাড়ি পাকিস্তানে পড়েছে তাদের আর প্রয়োজন কি, পাকিস্তান তো হয়েই গেছে।" 'আমি বললাম, "আমি কি করব? সকলে বলল, "তোমাকে বাধা দিতে হবে।" বললাম, "আমি কেন বাধা দেব? আমি পাকিস্তানে চলে যাব।'

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মহত্ব ও হাশিম সাহেবের সীমাবদ্ধতা– "পরের দিন মিল্লাত প্রেসে গিয়ে হাশিম সাহেবের সাথে দেখা করি। পাশের ঘরে আমার সহকর্মীরা চুপ করে বসে আছে; শুনবে আমাদের কথা। আমি খুব শান্তভাবে তাঁকে বললাম, "প্রেসটা নাকি বিক্রি করবেন?" বললেন, "উপায় কি, প্রত্যেক মাসেই লোকসান যাচ্ছে, কি করি? আর চালাবে কে?" আমি বললাম, "খন্দকার নূরুল আলম তো ম্যানেজার হয়ে এতকাল চালাল। খরচ কমিয়ে ফেলল। প্রেসটা বিক্রি করে দিলে কর্মচারীদের থাকবে কি? আর আমরা মুখ দেখাতে পারব না। সমস্ত বাংলাদেশ থেকে চাঁদা তুলেছি, লোকে আমাদের গালি দিবে।" হাশিম সাহেব হঠাৎ রাগ করে ফেললেন এবং বললেন, "আমাকে বেচতেই হবে, কারণ দেনা শোধ করবে কে?" আমি বললাম, "কয়েক মাস পূর্বে যে প্রেসটা বিক্রি হল তাতে দেনা শোধ হয় নাই?" তিনি ভীষণ রেগে গেলেন, আমারও রাগ হল। উঠে আসার সময় বলে এলাম, "প্রেস বিক্রি করতে গেলে আমি বাধা দেব, দেখি কে আসে এই মিল্লাত প্রেসে?" হাশিম সাহেব খুব দুঃখ পেলেন আমার কথায়। পরের দিন ঐ সমস্ত বন্ধুরা আবার আমার কাছে এসে বলল, "হাশিম সাহেব খানা খান না। শুধু বলেন, 'মুজিব আমাকে অপমান করল!' তুই আবার দেখা কর, আর বলে দে, যা ভাল বোঝেন করেন।" আমি বললাম, "তোমরা খেলা পেয়েছ!...

শহীদ সাহেবকে বললাম, সকল ইতিহাস। তিনি আমার উপর রাগ করলেন, কেন আমি খারাপ ব্যবহার করলাম হাশিম সাহেবের সাথে! কত বড় উদার ছিলেন শহীদ সাহেব। আমি হাশিম সাহেবের কাছে যেয়ে বললাম, "আপনি মনে কিছু করবেন না, আমার এভাবে কথা বলা অন্যায় হয়েছে। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমার কিছুই বলার নাই।...

তাঁর সাথে ভিন্ন মত হতে পারি, কিন্তু তার কাছ থেকে যে রাজনীতির শিক্ষা পেয়েছি, সেটা তো ভোলা কষ্টকর। আমার যদি কোনো ভুল হয় বা অন্যায় করে ফেলি, তা স্বীকার করতে আমার কোনোদিন কষ্ট হয় নাই। ভুল হলে সংশোধন করে নেব, ভুল তো মানুষের হয়েই থাকে। আমার নিজেরও একটা দোষ ছিল, আমি হঠাৎ রাগ করে ফেলতাম। তবে রাগ আমার বেশি সময় থাকত না।...

আমি অনেকের মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি, কোন কাজ করতে গেলে শুধু চিন্তাই করে। চিন্তা করতে করতে সময় পার হয়ে যায়, কাজ আর হয়ে ওঠে

না। অনেক সময় করব কি করব না, এইভাবে সময় নষ্ট করে এবং জীবনে কোন কাজই করতে পারে না। আমি চিন্তাভাবনা করে যে কাজটা করব টিক করি, তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয়, সংশোধন করে নেই। কারণ, যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে, যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"

মুসলিম লীগের রাজনীতি করা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল এক অপরিসীম শ্রদ্ধবোধ। তিনি মনে করতেন লোকটি মধ্যে সত্যিকারের জাদু আছে। যে কোনো মুহূর্তে তিনি জনসাধারণের উপরে মানসিকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। তিনি এর দুএকটা বাস্তব উদাহরণও দিয়েছেন। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু এই গ্রন্থে গান্ধী সম্বন্ধে এক অদ্ভুত সুন্দর এবং সমাজ মনোস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। গান্ধীর দুর্ভাগ্য গোড়া হিন্দু এবং গোড়া মুসলমান কেউই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন না। তারা উভয়ই মনে করে তিনি তাদের স্বার্থেও পরিপন্থী। অথচ তিনি মুসলমানদেও পক্ষে বলে গোড়া হিন্দুপন্থীরা তাঁকে হত্যা করল। এখানে বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে সঠিকভাবে যে বিষয়টি নির্দেশ করেছেন, তা হলো গান্ধীর হিনত হওয়ার পরে বিভক্ত ভারতে মুসলমানদেও প্রতি হিন্দুদের বৈরি দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই পাল্টে গেল। তারা মনে করল, তাদের নেতা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, সুতরাং তাদেরকেও তাঁর পথে হাঁটতে হবে। নতুবা দেশ ভাগের পরে হিন্দুস্থানে সে যে সাম্প্রদায়িক চেতনার উদ্ভব হচ্ছিল তা স্তিমিত হতে দেরি হবে। এবার বঙ্গন্ধুর কথা ফিরে আসি–

"ব্যারাকপুরে পৌঁছে দেখি, এক বিরাট সভার আয়োজন হয়েছে। মহাত্মাজী রবিবার কারও সাথে কথা বলেন না, বক্তৃতা তো করবেনই না। মনু গান্ধী ও আভা গান্ধী 'আলহামদু' সূরা ও 'কুলহু' সূরা পড়লেন। তারপরে রামবন্দনা গান গাইলেন। মহাত্মাজী লিখে দিলেন, তার বক্তৃতা সেক্রেটারি পড়ে শোনালেন। সত্যই ভদ্রলোক জাদু জানতেন। লোকে চিৎকার করে উঠল, হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। সমস্ত আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে। মহাত্মাজী ঘোষণা করলেন, যদি দাঙ্গা হয় এবং মুসলমানদের উপর কেউ অত্যাচার করে তবে তিনি অনশন করবেন। মহল্লায় মহল্লায় বিশেষ করে হিন্দি ভাষাভাষী লোকেরা শোভাযাত্রা বের করে স্লোগান দিতে লাগল, 'মুসলমানকো মাত মারো, বাপুজী অনশন কারেগা। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই।...

ইয়াকুব বলল, তোমার মনে আছে আমি আর তুমি বিহার থেকে দাঙ্গার ফটো তুলেছিলাম?" আমি বললাম, "হ্যাঁ মনে আছে।" ইয়াকুব বলল, "সমস্ত কলকাতা ঘুরে আমি ফটো তুলেছি। তুমি জান না তার কপিও করেছি। সেই ছবিগুলি থেকে কিছু ছবি বেছে একটা প্যাকেট করে মহাত্মাজীকে উপহার দিলে কেমন হয়।" আমি বললাম, "চমৎকার হবে। চল যাই, প্যাকেট করে ফেলি।" যেমন কথা, তেমন কাজ। দুইজনে বসে পড়লাম। তারপর প্যাকেটটা এমনভাবে বাঁধা হল যে, কমপক্ষে দশ মিনিট লাগবে খুলতে। আমরা তাঁকে উপহার দিয়েই ভাগব। এই ফটোর মধ্যে ছিল মুসলমান মেয়েদের স্তন কাটা, ছোট শিশুদের মাথা নাই, শুধু শরীরটা আছে, বস্তি, মসজিদে আগুনে জ্বলছে, রাস্তায় লাশ পড়ে আছে, এমনই আরও অনেক কিছু। মহাত্মাজী দেখুক, কিভাবে তাঁর লোকেরা দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছে এবং নিরীহ লোককে হত্যা করেছে।'

ঢাকায় ফিরে আপনজনের কাছে বাড়ি ফেরার তাড়া, এদিকে পার্টির কাজের চাপ, একদিকে গেলে অন্যদিক অরক্ষিত পড়ে– "আব্বা, মা ও রেণুর কাছে কয়েকদিন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা এলাম। পূর্বে দু'একবার এসেছি বেড়াতে। পথ ঘাট ভাল করে চিনি না। আত্মীয়স্বজন, যারা চাকরিজীবী, কে কোথায় আছেন, জানি না। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে প্রথমে উঠব ঠিক করলাম।...

ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করলাম, ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে পৌঁছে দিতে। দেখলাম, রসিক গাড়ওয়ান মোগলটুলী লীগ অফিস চেনে। আমাকে বলল, "আপনি লীগ অফিসে যাইবেন, চলেন সাব আমি চিনি।" পয়সাও বেশি নিল বলে মনে হল না। অনেক গল্প শুনেছি এদের সম্পর্কে। কিন্তু আমার সাথে দরকষাকষিও করল না। শামসুল হক সাহেব ও শওকত সাহেব আমাকে পেয়ে খুবই খুশি।...

শাসসুল হক সাহেব বললেন, "জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় কনফারেন্স করব? সরকার নাকি এটাকে ভাল চোকে দেখছে না। আমাদের কনফারেন্স যাতে না হয় সেই চেষ্টা করছে এবং গোলমাল করে কনফারেন্স ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে।" আমি বললাম, "এত তাড়াতাড়ি এরা আমাদের ভুলে গেল হক সাহেব।" হক সাহেব হেসে দিয়ে বললেন, "এই তো দুনিয়া!"

পুনরায় কোলকাতায় গিয়ে পুরনো শিকড় উন্মূলের চেষ্টা– "এই সময় আমি কিছুদিনের জন্য কলকাতায় যাই। আমাদের রেস্টুরেন্টটা বিক্রি হয়েছে কি না,

না হলে ঢাকায় কোনো দোকানের সাথে বদল করা যায় কি না সে বিষয়টা দেখতে। কলকাতায় যেয়ে দেখি, রব সাহেব রেস্টুরেন্ট বিক্রি করে দিয়েছে। যাক বাঁচা গেল।'

বাবার অসুস্থতা, পুত্রের দায় ও কর্তব্য– বরিশালে এক বিরাট সভার আয়োজন হল। শহীদ সাহেব ঢাকায় এসে নাজিমুদ্দিন সাহেবের কাছেই থাকতেন।

মিয়া ভাই, আব্বার অবস্থা খুবই খারাপ, ভীষণ অসুস্থ। তোমার জন্য বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন করা হয়েছে, যদি দেখতে হয় রাতেই রওয়ানা করতে হবে। হেলেন [লেখকের ছোটবোন] চলে গিয়াছে তোমাদের বাড়িতে।" আমি শহীদ সাহেবকে চিঠিটা পড়ে শোনালাম। তিনি আমাকে রওয়ানা করতে হুকুম দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে রব সাহেবকে দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কখন খবর পেয়েছ?" বলল, "গতকাল খবর পেয়েছি। হেলেন রওয়ানা হয়েছে, আমি তোমার জন্য দেরি করছি। কারণ, জানি শহীদ সাহেব যখন আসবেন, তুমিও আসবে।" আমি সোজা মালপত্র নিয়ে রওয়ানা করলাম স্টেশনে আর আধা ঘণ্টা সময় আছে স্টিমার ছাড়তে। স্টিমার ধরতে না পারলে আবার আগামীকাল রাতে স্টিমার ছাড়বে।.. কিন্তু আমার পিতার যে স্নেহ আমি পেয়েছি, আর আমি তাঁকে কত যে ভালবাসি সে কথা প্রকাশ করতে পারব না।...

আমি বাড়িতে রইলাম কিছুদিন। আব্বা আস্তে আস্তে আরোগ্য লাভ করলেন। যে ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত তাদের মত হতভাগা দুনিয়াতে আর কেউ নাই। আর যারা বাবা মায়ের স্নেহ আর আশীর্বাদ পায় তাদের মত সৌভাগ্যবান কয়জন!

এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও রাজনীতি। অভিক্ত বাংলার রাজধানী কোলকাতা থেকে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন শেষ হতে না হতেই স্বাধীন দেশেও পরাধীন হিসাবে বিবেচিত হওয়া। আবারো শুরু হয়ে গেল যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য এত সংগ্রাম সেই পাকিস্তানি পশ্চিমের শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

৪. ঢাকা প্রত্যাবর্তন

"আমি ঢাকায় এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, আইন পড়ব। বই পুস্তক কিছু কিনলাম। ঢাকায় এসে শুনলাম গণতান্ত্রিক যুবলীগের এক সভা হয়ে গেছে।

কার্যকরী কমিটির নতুন সভ্য কো-অপ্ট করা হয়েছে। পূর্বে ছিলাম সতেরজন এখন হয়েছি চৌত্রিশজন। ১৫০ নম্বর মোগলটুলী থেকে পাকিস্তানের আন্দোলন হয়েছে, সেই লীগ অফিসেই এখন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা পাহারা দিতে শুরু করল গোপনে গোপনে। আমরা সকলে শহীদ সাহেবের ভক্ত ছিলাম। এটাই আমাদের দোষ। আমরা সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টাই করতে থাকলাম।...

নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগে'র নাম বদলিয়ে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' করা হয়েছে। আজিজ আহমেদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল হামিদ চৌধুরী, দবিরুল ইসলাম, নইমউদ্দিন, মোল্লা জালালউদ্দিন, আবদুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আরও অনেক ছাত্রনেতা একমত হলেন, আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান করা দরকার। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে ফজলুল হক মুসলিম হলের এ্যাসেম্বলি হলে এক সভা ডাকা হল, সেখানে স্থির হল একটা ছাত্র প্রতিষ্ঠান করা হবে। যার নাম হবে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। নইমউদ্দিনকে কনভেনর করা হল।"

আকরম খাঁ, মওলানা ভাসানী পাকিস্তান পর্বে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে– "মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের বিবৃতির পরে আর আমরা মুসলিম লীগের সদস্য থাকলাম না। অর্থাৎ আমাদের মুসলিম লীগ থেকে খেদিয়ে দেওয়া হল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসরিম লীগকে একটা প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। টাঙ্গাইলে দুইটা আইনসভার আসন খালি হয়েছিল। আমাদের ইচ্ছা ছিল, নাজিমুদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে লোক দেওয়া যায় কি না? মওলানা ভাসানী সাহেব আসাম থেকে চলে এসে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে বাস করছিলেন। তাঁর শরণাপন্ন হলাম। কিন্তু মওলানা সাহেব এক সিট নিজে এবং এক সিট নাজিমুদ্দীন সাহেবকে দিয়ে নির্বাচন করে এমএলএ হলেন। পরে নির্বাচনী হিসাব দাখিল না করার জন্য মওলানা সাহেবের নির্বাচন বেআইনি ঘোষণা হয়েছিল।"

জিন্নাহ ফান্ড, নাজিমুদ্দীন ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদ– "এই সময় আরেকটা অত্যাচার মহামারীর মত শুরু হয়েছিল। 'জিন্নাহ ফান্ড' নামে সরকার একটা ফান্ড খোলে। যে যা পারে তাই দান করবে এই হল হুকুম। 'জিন্নাহ ফান্ডে' টাকা দিতে কেউই আপত্তি করেছে বলে আমার জানা নাই। যাদের অর্থ আছে তারা খুশি হয়েই দান করেছে। অনেক গরিবও 'জিন্নাহ ফান্ডে' টাকা দিয়াছে।

কিন্তু কিছু সংখ্যক অফিসার সরকারকে খুশি করার জন্য জোরজুলুম করে টাকা তুলতে শুরু করেছিল। যে মহকুমা অফিসার বেশি তুলতে পারবেন, তিনি ভেবেছেন তাড়াতাড়ি প্রমোশন পাবেন।...

তিনি সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের হুকুম দিয়েছেন, যে না দিবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। চারিদিকে জোরজুলুম শুরু হয়েছে। চৌকিদার, দফাদার নেমে পড়েছে। কারও গরু, কারও বদনা, থালা, ঘটিবাটি কেড়ে আনা হচ্ছে। এক ত্রাসের রাজত্ব। জনাব ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবই নাজিমুদ্দীন সাহেবকে দাওয়াত করে এনেছেন। এখন তিনি মুসলিম লীগে আছেন। গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগ যারা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত করেছেন, এখন আর তারা নাই। এডহক কমিটি করা হয়েছে। মহকুমা হাকিম সাহেবের সাতে যোগসাজশে তারা কাজ করেছে।...

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মি. গোলাম কবির। তিনি খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন, কলকাতা থেকে আমাকে চিনতেন। আমাকে 'তুমি' বলে কথা বলতেন, আর আমিও 'কবির ভাই' বলতাম।...

"গভর্নর জেনারেল রাজনীতিবিদ নন, তিনি রাষ্ট্রপ্রধান। কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত নন। তিনি তো অতিথি, তাঁকে অসম্মান করা কি উচিত হবে?" আমি বললাম, "কে বলেছে আপনাকে, যে তাঁকে অসম্মান করতে চাই! তাঁকে সকলেই অভ্যর্থনা করবে, শুধু এটুকু কথা তাঁর সাথে আলোচনা করে আমাকে জানিয়ে দেন যে, তিনি হুকুম দিবেন এই অত্যাচার করে টাকা তোলার ব্যাপারে তদন্ত করবেন এবং দোষীকে শাস্তি দিবেন। দ্বিতীয়ত, টাকা তাঁকেই দেওয়া হবে, আমরা কোনো দাবি করব না; শুধু তিনি টাকাটা কলেজ করতে দিয়ে দেবেন। তিনিই আমাদের কলেজ করে দিবেন।" কবির সাহেব আমাকে বললেন, "তুমি কথা দাও, কোনো গোলমাল হবে না।" আমি বললাম, "কবির ভাই, আপনি পাগল হয়েছেন! আমি জানি না যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী নন, এখন বড়লাট হয়েছেন। কোনো গোলমাল হবে না, আমাদের পক্ষ থেকে। আপনি তাঁর সাথে পরামর্শ করে আমাকে জানিয়ে দিবেন সকাল দশটার মধ্যে, যাতে সকলে মিলে ভালভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে পারা যায়। আমাকে গ্রেফতার করে নাই। খাজা সাহেব আমাদের দাবিগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। জিন্নাহ ফান্ডে'র নামে টাকা তোলা হয়েছিল বলে মোহাম্মদ

আলী জিন্নাহর নামেই কলেজ করা হয়েছিল। আজও কলেজটা আছে, ভালভাবে চলছে।"

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র প্রতিও বঙ্গবন্ধুর ছিল প্রচণ্ড শ্রদ্ধবোধ। তিনি মনে করতেন, জিন্নাহ এত দ্রুত না মারা গেলে পাকিস্তান এতা তাড়াতাড়িতে দুর্গতিতে পড়ত না। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রথমে আমলাতন্ত্রের উপরে শাসককুল ভরসা রাখতে শুরু করে। পরে সামরিক যন্ত্র ক্ষমতা দখল করে। জনগণ থেকে সরকার দূরে যাওয়ার ফলে এই দুর্গতির জন্ম।

খাজা নাজিমুদ্দীনের রাজনৈতিক দর্শনের তিনি বিপরীত অবস্থান করলেও তাঁর প্রতি বঙ্গবন্ধু কখনো শ্রদ্ধাবোধ হারাননি। এই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি জীবনের সর্বদা তিনি লালন করেছেন।

শহীদ সাহেব বললেন– "তোমার উপরও অত্যাচার আসছে। এরা পাগল হয়ে গেছে। শাসন যদি এইভাবে চলে বলা যায় না, কি হবে!" আমি বললাম "স্যার, চিন্তা করবেন না, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি খোদা আমাকে দিয়েছেন। আর সে শিক্ষা আপনার কাছ থেকে পেয়েছি।"

"১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীনকে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন জনাব নূরুল আমিন সাহেব। এই সময়ও কিছু সংখ্যাক এমএলএ শহীদ সাহেবকে পূর্ব বাংলায় এসে প্রধানমন্ত্রী হতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি রাজি হন নাই। গণপরিষদে একটা নতুন আইন পাস করে শহীদ সাহেবকে গণপরিষদ থেকে বের করে দেওয়া হল।

বাম রাজনীতিক দল সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি– "জনসাধারণ চলেছে পায়ে হেঁটে, আর আপনারা আদর্শ নিয়ে উড়োজাহাজে চলছেন। জনসাধারণ আপনাদের কথা বুঝতেও পারবে না, আর সাথেও চলবে না। যতটুকু হজম করতে পারে ততটুকু জনসাধারণের কাছে পেশ করা উচিত।" তারা তলে তলে আমার বিরুদ্ধাচরণও করত, কিন্তু ছাত্রসমাজকে দলে ভেড়াতে পারত না।...

তখনকার দিনে আমরা কোনো সভা বা শোভাযাত্রা করতে গেলে একদল গুণ্ডা ভাড়া করে আমাদের মারপিট করা হত এবং সভা ভাঙার চেষ্টা করা হত। 'জুলুম প্রতিরোধ দিবসে' বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ও কিছু গুণ্ডা আমদানি করা হয়েছিল।" কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা।

আব্বাস উদ্‌দীনের গানের প্রভাব এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা বঙ্গবন্ধু ব্যক্ত করেছেন।

"নদীতে বসে আব্বাস উদ্‌দীন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। তাঁরই শিষ্য সোহরাব হোসেন ও বেদার উদ্দিন তাঁর নাম কিছুটা রেখেছিলেন। আমি আব্বাস উদ্‌দীন সাহেবের একজন ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।" আমি কথা দিয়েছিলাম এবং কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।" হিন্দুরা পাকিস্তানে প্রচণ্ড কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। তারা কোনো প্রতিবাদ করতে গেলেই রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেয়া হতো।

"তবে গণপরিষদ ও পূর্ব বাংলার আইনসভায় এদের কয়েকজন সভ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এদের সকলেই হিন্দু, এরা বেশি কিছু বললেই 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া হত। ফলে এদের মনোবল একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামারও ভয় ছিল। কংগ্রেসকে মুসলমান সমাজ সন্দেহের চোখে দেখত। একজন মুসলমান সভ্যও তাদের ছিল না। এদিকে মুসলিম লীগের পুরানা নামকরা নেতারা সকলেই সরকার সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন। মন্ত্রিত্ব, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি কিছু না কিছু অনেকের কপালেই জুটেছিল। নামকরা কোনো নেতাই আর ছিল না, যাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যায়।"

মুসলিমলীগের প্রথম পরাজয়– "শামসুল হক সাহেব মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে এমএলএ হয়েছেন। মুসলিম লীগের প্রথম পরাজয় পাকিস্তানে। মুসলিম লীগকে কোটারি করার ফল তাদের পেতে হল। আমরা জেলের মধ্যে খুবই চিন্তিত ছিলাম। হক সাহেব আমার উপর অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন; কেন আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম, টাঙ্গাইল না যেয়ে! পরে যখন সমস্ত খবর পেলেন তখন দেখতে পেলেন, আমার কোনো উপায় ছিল না।"

কারাগারের যন্ত্রণা–

'কারাগারের যন্ত্রণা কি এইবারই বুঝতে পারলাম। সন্ধ্যায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিলেই আমার খারাপ লাগত। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে সমস্ত কয়েদির কামরায় কামরায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয় গণনা করার পর। আমি কয়েদিদের কাছে বসে তাদের জীবনের ইতিহাস ও সুখ দুঃখের কথা শুনতে ভালবাসতাম। তখন কয়েদিদের বিড়ি তামাক খাওয়া আইনে নিষেধ ছিল। তবে রাজনৈতিক বন্দিদের নিষেধ ছিল না। নিজের টাকা দিয়ে কিনে এনে খেতে পারত। একটা বিড়ির জন্য কয়েদিরা পাগল হয়ে যেত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি কাউকেও বিড়ি খেতে দেখত তাহলে তাদের বিচার হত এবং শাস্তি পেত। সিপাহিরা যদি কোনো সময় দয়াপরবশ হয়ে একটা বিড়ি বা সিগারেট দিত কতই না খুশি হত! আমি বিড়ি এনে এদের কিছু কিছু দিতাম। পালিয়ে পালিয়ে খেত কয়েদিরা।" পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।

"আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু ম্যানিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম, সময় এখনও আসে নাই, তাই যারা বাইরে আছেন তারা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন।"

দেশের কাজ করবেন বলে, রাজনীতি করবেন, দেশের মানুষের দুর্গতি ঘুচাবেন, স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাবেন বলে বিলাতে শিক্ষার প্রস্তাবও তিনি গ্রহণ করেননি। নিজের স্বার্থ দ্বারা তিনি চালিত ছিলেন না কখনো।

"যদি ঢাকায় না পড়তে চাও, তবে বিলাত যাও। সেখান থেকে বার এট ল' ডিগ্রি নিয়ে এস। যদি দরকার হয় আমি জমি বিক্রি করে তোমাকে টাকা দিব।" আমি বললাম, "এখন বিলাত গিয়ে কি হবে, অর্থ উপার্জন করতে আমি পারব না।" আমার ভীষণ জেদ হয়েছে মুসলিম লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন দেখি তার উল্টা হয়েছে। এর একটা পরিবর্তন করা দরকার। জনগণ আমাদের জানত এবং আমাদের কাছেই প্রশ্ন করত। স্বাধীন হয়েছে দেশ, তবু মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে না কেন? দুর্নীতি বেড়ে গেছে, খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মুসলিম লীগ নেতারা মানবে না।"

ভাসানী সাহেবের কিছু সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু তাঁর গ্রন্থে– "রাতে এক বাড়িতে খেতে গেলেন মওলানা সাহেব। রাগ, খাবেন না। তিনি থাকতে কেন শামসুল হক সাহেবের নাম প্রস্তাব করা হল সভাপতিত্ব করার জন্য। এক মহাবিপদে পড়ে গেলাম। মওলানা সাহেবকে আমি বুঝাতে চেষ্টা করলাম, লোকে কি বলবে? তিনি কি আর বুঝতে চান? তাঁকে নাকি অপমান করা হয়েছে! শামসুল হক সাহেবও রাগ হয়ে বলেছেন, মওলানা ভাসানীর উদারতার অভাব, তবুও তাঁকে আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতাম। কারণ, তিনি জনগণের জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত। যে কোন মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় তারা জীবনে কোন ভাল কাজ করতে পারে নাই– এ বিশ্বাস আমার ছিল।..

আমাদের মধ্যে এত মিল ছিল যে কোন ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনাই ছিল না। আমি বুঝতে পারতাম মওলানা সাহেব, হক সাহেবকে অপছন্দ করতে শুরু করেছেন। সুযোগ পেলেই তাঁর বিরুদ্ধে বলতেন। আমি চেষ্টা করতাম, যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়।'

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নিজের কোনো বাড়ি ছিল না। তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, অথচ কোথাও তাঁর বাড়ি নেই। রাজনীতি করতে এসে তিনি অনেক কিছুই ত্যাগ করেছেন, নিজের আইন ব্যবসায় থেকে উপার্জন, পৈতৃক সম্পদ সব। "সোহরাওয়ার্দী সাহেব কলকাতা ত্যাগ করে করাচি চলে গিয়েছেন। মানিক ভাই ঢাকা এসে পৌঁছেছেন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়। তিনিও এসে মোগলটুলীতে উঠেছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সামান্য কিছু কাপড় ছাড়া আর কিছু নিয়ে আসতে পারেন নাই। ভারত সরকার তাঁর সর্বস্ব ক্রোক করে রেখেছে। অনেকে শুনে আশ্চর্য হবেন, শহীদ সাহেবের কলকাতায় নিজের বাড়ি ছিল না। ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়ি, ভাড়া করা বাড়ি। তিনি করাচিতে তাঁর ভাইয়ের কাছে উঠলেন, কারণ তাঁর খাবার পয়সাও ছিল না।"

সর্বত্র পুলিশি বাধা ১৪৪ ধারা, রাস্তার উপরে মওলানা ভাসানীর নামাজ আদায়– "নাজিরাবাজারে এসেও দেখি পুলিশ রাস্তা আটক করেছে, আমাদের যেতে দেবে না। তখন নামাজের সময় হয়ে গেছে। মওলানা সাহেব রাস্তার উপরই নামাজে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শামসুল হক সাহেবও সাথে সাথে দাঁড়ালেন। এর মধ্যেই পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছেড়ে দিল। আর জনসাধারণও ইঁট ছুঁড়তে শুরু করল। প্রায় পাঁচ মিনিট এইভাবে চলল। পুলিশ লাঠিচার্জ করতে করতে এগিয়ে

আসছে। একদল কর্মী মওলানা সাহেবকে কোলে করে নিয়ে এক হোটেলের ভিতরে রাখল। কয়েকজন কর্মী ভীষণভাবে আহত হল এবং গ্রেফতার হল। শামসুল হক সাহেবকেও গ্রেফতার করল। আমার উপরও অনেক আঘাত পড়ল।...

আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, ইনজেকশন নিয়ে, তখন ভাসানী সাহেব খবর দিয়েছিলেন, আমি যেন গ্রেফতার না হই। আমার শরীরে ভীষণ বেদনা, জ্বর উঠেছে, নড়তে পারছি না। কি করি, তবুও উঠতে হল এবং কি করে ভাগব তাই ভাবছিলাম। শওকত মিয়া আগেই সরে গেছে। রাস্তাঘাট তারই জানা। তিনতলায় আমরা থাকি, পাশেই একটা দোতলা বাড়ি ছিল। তিনতলা থেকে দোতলায় লাফিয়ে পড়তে হবে। দুই দালানের ভিতরে ফারাকও আছে। নিচে পড়লে শেষ হয়ে যাব। তবুও লাফ দিয়ে পড়লাম। কাজী গোলাম মাহাবুব ও মফিজও আমাকে অনুসরণ করল।"

লাহোর যাত্রা, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী সাহেব নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা : "তুমি লাহোর যাও, কারণ সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাহোরে আছেন। তাঁর এবং মিয়া ইফতিখার উদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ কর। তাঁদের বল পূর্ব বাংলার অবস্থা। একটা নিখিল পাকিস্তান পার্টি হওয়া দরকার। পীর মানকী শরীফের সাথে আলোচনা করে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে সারা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারলে ভাল হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছাড়া আর কেউ এর নেতৃত্বে দিতে পারবেন না।"

আমি যে পাকিস্তানী, তার প্রমাণ লাগবে, তাহলেই পশ্চিম পাকিস্তানে ঢুকতে দিবে। তখনও পাসপোর্ট ভিসা চালু হয় নাই। গরম কাপড়ও বাড়িতে রয়েছে। টাকা পয়সাও হাতে নাই। ওদিকে আবার পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান পেলেই হত্যা করে। কি করে লাহোর যাব বুঝতে পারছি না। আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ।"

লাহোরে তখন ভীষণ শীত। আমার তা সহ্য করা কষ্টকর হচ্ছিল। কোনোদিন লাহোর যাই নাই। মিয়া ইফতিখার উদ্দিন সাহেব ছাড়া কেউ আমাকে চিনত না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব নবাব মামদোতের বাড়িতে থাকতেন, একথা আমি জানি। এক দোকানের সামনে মালপত্র রেখে আমি নবাব সাহেবের বাড়িতে ফোন করলাম। সেখান থেকে উত্তর এল, সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাহোরে নাই, বাইরে গেছেন, দুই দিন পর ফিরবেন। আমার কাছে মাত্র দুই

টাকা আছে, কি করব? কোথায় যাব ভাবছিলাম, মালপত্রই বা কোথায় রাখি? বেলা তখন একটা, ক্ষিধেও লেগেছে, সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়ে নাই। দুইটা টাকা মাত্র, কিছু খেলেই তো শেষ হয়ে যাবে।...

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভাই প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী লাহোরে আসবেন এবং মিয়া সাহেবের বাড়িতে থাকবেন। তাই দুই দিনের মধ্যেই আমার ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে। আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সেটা বুঝতে পারলাম।

আর সাধারণ পাঞ্জাবিরাও ভাল উর্দু বলতে পারে না। পাঞ্জাবি ও উর্দু মিলিয়ে একটা খিচুড়ি বলে। যেমন আমি বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে খিচুড়ি বলতাম। এই সময় পাঞ্জাবে প্রগতিশীল লেখকদের একটা কনফারেন্স হয়। মিয়া সাহেব আমাকে যোগদান করতে অনুরোধ করলেন। আমি যোগদান করলাম। লেখক আমি নই, একজন অতিথি হিসাবে যোগদান করলাম। কনফারেন্স দুই দিন চলল।" লাহোরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার চেষ্টা করে আততায়ীরা। তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান।

"যে উগ্র হিন্দু গোষ্ঠী মহাত্মা গান্ধীর মত নেতাকে হত্যা করতে পারে, তারা অন্য সম্প্রদায়কে সহ্য করতে পারবে কি না? এই দিল্লিতেই মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। খোদা শহীদ সাহেবকে রক্ষা করেছিলেন। নাথুরাম গডসের সহকর্মী মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলার সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দিতে এই কথা স্বীকার করেছিল।...

মহাত্মা গান্ধী যে মুসলমানদের রক্ষা করবার জন্য জীবন দিলেন তাঁর জন্য তাঁর ভক্তদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তারা মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।"

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্যের সূচনা

"পূর্ব বাংলার কোটার চুয়াল্লিশজন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দাদের ছয়জন মেম্বার পূর্ব বাংলা নির্বাচিত করে দেয়। কেউই আপত্তি করে নাই। আমরা সংখ্যাগুরু থাকা সত্ত্বেও রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিকে করা হয়। আমাদের সদস্যরা বা জনগণ আপত্তি করে নাই। কিন্তু যখন দেখলাম, শিল্প কারখানা যা কিছু হতে চলেছে সবই পশ্চিম পাকিস্তানেই গড়ে উঠতে শুরু

করেছে, আর কয়েকজন মন্ত্রী ছাড়া পূর্ব বাংলার আর কেউ কোথায়ও নাই, বিশেষ করে বড় বড় সরকারি চাকরিতে পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করা শুরু হয়ে গেছে।"

পরিবারের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ ছিল বঙ্গবন্ধুর। এক ধরনের চাপা কষ্ট ছিল প্রেমময় স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি সব ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। দেশের জন্য, মানুষের মুক্তির রাজনীতির জন্য সরকারের রোষানলে পড়ে অধিকাংশ সময়ে জেলে থাকতে হচ্ছে। স্ত্রী ফজিলাতুননেছা মুজিব ওরফে রাণু তাঁর হয়ে সবকিছু সামলাচ্ছেন, চাপাকান্না বুকে পুষে। তাঁর কোনো অভিযোগ নেই, বরং তিনি তাকে তার পথে রাখার জন্য সকল কষ্ট হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছেন। বিবাহিত জীবনের অধিকাংশ সময়ে তাঁর স্বামীকে জেলে থাকতে হয়, তাঁর নিজের ঘরও জেলখানার অধিক। একই সঙ্গে ঘরে বাইরে ও জেলখানায় তাঁকেই সময় দিতে হয়। এমনকি বঙ্গবন্ধু জেলে থাকার ফলে তাঁর সন্তানরাও অধিকাংশ সময়ে স্কুলে ভর্তি হতে নীরব বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। সরকারের রোষানলে পড়তে হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর নিজের জবানিতে–"রাত দশটা বা এগারটায় হবে এমন সময় খুলনায় ট্রেন পৌঁছাল। সকল যাত্রী নেমে যাওয়ার পরে আমার পাঞ্জাবি খুলে বিছানার মধ্যে দিয়ে দিলাম। লুঙ্গি পরা ছিল, লুঙ্গিটা একটু উপরে উঠিয়ে বেধে নিলাম। বিছানাটা ঘাড়ে, আর সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম। কুলিদের মত ছুটতে লাগলাম, জাহাজ ঘাটের দিকে। গোয়েন্দা বিভাগের লোক তো আছেই। চিনতে পারল না। আমি রেলরাস্তা পার হয়ে জাহাজ ঘাটে ঢুকে পড়লাম। আবার অন্য পথ দিয়ে রাস্তায় চলে এসে একটা রিকশায় মালপত্র রাখলাম। পাঞ্জাবিটা বের করে গায়ে দিলাম।

রাতে রওয়ানা করে এলাম, দিনের বেলায় আসলে হাচিনা কাঁদবে। কামাল তো কিছু বোঝে না। শিবচরে জাহাজ আসে না, চান্দেরচর যেতে হবে, প্রায় দশ মাইল। আমার বড়বোনের দেবর, আমারও বিশিষ্ট বন্ধু ও আত্মীয় সাইফুদ্দিন চৌধুরী সাহেব আমাকে ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। রেণু আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় নীরবে চোখের পানি ফেলছিল। আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম না, একটা চুমা দিয়ে বিদায় নিলাম।"

জেলখানায় আমরণ অনশন, এমনকি তাঁর বাঁচার আশাও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, "আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম।

বারবার আব্বা, মা, ভাইবোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেণুর দশা কি হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কি হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম। হাচিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না।...

একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ঢাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।" আমি আর রেণু দু'জনই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, "আমি তো তোমারও আব্বা।"

৫.

এ এক মহাজীবনের মহাকাব্য। কি নেই এই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে! এই কাব্যের মহানায়কের জীবন যদিও অপরাহ্নের আগেই থেমে গিয়েছিল; তবু রেখে গিয়েছিলে বাঙালি জাতির সকল সঙ্কট উত্তরণের ইঙ্গিত। কিভাবে একটি জাতি সংঘবদ্ধভাবে লড়বে, স্বপ্ন দেখবে। কিভাবে পরমতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করবে, কিভাবে নিজের জীবন ত্যাগ করবে, সততা ন্যায় নিষ্ঠা সর্বোত্তম উপায় হিসাবে গ্রহণ করবে, কিভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে সক্রিয় থাকবে। কিভাবে নিজের স্ত্রী, সন্তানদের ভালোবাসবে, কিভাবে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে, কিভাবে অপরাধী নয় অপরাধকে ঘৃণা করবে– সবকিছুর ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর এই গ্রন্থে। অভিযোগহীন এক কর্মময় জীবন। এই জীবন পাঠ করলে অনুভব করা যায় একটি জাতির তরুণ সমাজ, শিশুরা ও সরকার কোন পথে চলবে। আজ সমাজের দুর্বৃত্তায়ন, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, বঙ্গবন্ধু পরাধীন দেশে যে সব অপনোদনের জন্য জীবন বাজি রেখেছেন, আজ তার দ্রুত প্রসার ঘটছে। অর্থ কষ্ট, স্বার্থ ত্যাগ পরার্থরতার জন্য যে রাজনীতি তা যেন আজ তিরোহিত। এমনকি যারা বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তারাও যেন তাঁর এই জীবনের মহাকাব্যিক গ্রন্থ পাঠ করে না। তারা যদি বঙ্গবন্ধুকে সত্যিকারের ভালোবাসতেন, তাহলে এক পরিশুদ্ধ জাতি গঠনে বাঙালি আরো অনেক দূর অগ্রসর হতে পারত।

জেলখানায় লদু নামে এক চোরের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় হয়। ১৯৫০ এবং ১৯৫২ দুই দুইবার জেলে লদু চোরের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু দেখা হয়েছে। সে কিভাবে ছিককে চোর থেকে পাকা চোরে পরিণত হলো তার সবিস্তার বর্ণনা আছে। এই চুরির কাজে কিভাবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনির লোকজন তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং বখরা নেয় সেকথাও আছে। চোরেরা জেলখানা আসলে কাঁচা চোর থেকে পাকা চোরে পরিণত হয়। লদু চোরের জবানি এবং বঙ্গবন্ধুর বর্ণনা থেকে কিছুটা শোনা যাক– "একদিন পকেট মেরে বেশ কিছু টাকা পেয়ে লুদু বাজার থেকে বড় একটা মাছ, কিছু পটল, কিছু আলু, আর দশটা টাকা নিয়ে দারোগা সাহেবের বাসায় গিয়ে চাকরকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব বাড়ি আছে কি না? সে উত্তর দিল ঘরে আছে। তাকে বল যে লুদু আসছে দেখা করতে। দারোগা সাহেব বেরিয়ে এসে বললেন, 'কি জন্য আসছিস, এইগুলি আবার কি? লুদু দেখল, দারোগা সাহেব খুব খুশি হয়েছেন। লুদু বলল, হুজুর সামান্য জিনিস এনেছি, গরিব মানুষ কোথায় পাবো! দারোগা তার চাকরকে বললো এগুলো ভেতরে নিয়ে যাও। দশটা টাকাও লুদু দিল। টাকা পকেটে রেখে দারোগা বললেন, 'বোধহয় ভাল দান মেরেছ, তা মাত্র দশ টাকা কেন? দারোগা সাহেব বললেন, "ঠিক আছে, তবে হাওয়ালদার, সিপাহিদের দেওয়ার জন্য সপ্তাহে ১০ টাকা দিবি। আর চুরি করলে, তার কিছু ভাগ আমাকে দিয়ে যাবি।'

'এইভাবে মাত্র পাঁচ মাস কাটালাম। হঠাৎ একদিন পকেট মারতে যাই। রেলওয়ে স্টেশনে। আমি পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম টাকা সমেত। আমাকে জিআরপি অফিসে নিয়ে খুব বানানো হলো। তারপরে বলল, নতুন বুঝি পকেট মারিস, কোনো খবর টবর রাখিস না। পুলিশ ১০০ টাকা চাইলো দারোগা সাহেবের জন্য, আর নিজের জন্য পঁচিশ টাকা। "অত টাকা তো ঘরে নাই, তবে ৭০ টাকা দারোগা সাহেবকে দেন, আর আপনি ২০ টাকা নেন। এইভাবে জিআরপি পুলিশকে হাত করলাম। রোজ পকেট মারতাম। সকালে স্টেশনে, জিআরপিকে ভাগ দিতাম। আর বিকালে পকেট মারতাম সদরঘাট, তার ভাগ দিতাম কোতওয়ালী থানায়। এইভাবে দুই বৎসর চলল।

এর মধ্যে একটা বাসে পকেট মারতে চেষ্টা করেছি, দেখি এক ভদ্রলাকে আমার দিকে চেয়ে আছে; আমি হাত টান দিয়ে নিয়ে এলাম। ভদ্রলাকে

আমাকে চোখ ইশারা দিল পকেট মারতে। প্রথম ধকল যখন কেটে গেল তখন আবার পকেট মারলাম। আমি যখন নামলাম ঐ ভদ্রলোকও দুইজন লোক নিয়ে নামল। আমি তাদের নিয়ে এক রেস্টুরেন্টে গেলাম। পকেট মেরে খামের মধ্যে ৭০০ টাকা রেখেছিলাম, আমি হাত সাফাই করে সরাইয়া ছিলাম ৪০০ টাকা, খামের মধ্যে থাকলো ৩০০ শ' টাকা। লুদু বললো, এই দুই ভদ্রলোক বলেছিল, এরা সিআইডি। টাকা ভাগ হলো, লুদুর ১০০, আর ওদের ২০০। কথা ঠিক হলো এইভাবে বাসে গাড়িতে পকেট মারবে, আর এরা লুদুকে বাঁচাইয়া দিবে। এভাবে সিআইডি অফিসও আমার হাতে হয়ে গেল। আমি বেপরোয়াভাবে পকেট মারা ও চুরি করা শুরু করলাম।

আমি জেলে এসে এবার ভালই পাকা হলাম। গলার ভিতর 'খোকড় বা ভাণ্ডার করা শিখলাম। পেশাদার ডাকাত, চোরদের গলায় একপ্রকার গর্ত করা থাকে; এরা গলার ভিতর ডাক্তার দিয়ে অপারেশন করে খোকড় করে।"

তবে কুখ্যাত লদু চোরের প্রতিও বঙ্গবন্ধুর মায়া লক্ষ করা যায়। পরিস্থিতি তাদের এই পথে নিয়ে আসে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে জড়িত দুষ্ট লোকেরা তাদের আরো বেপরোয়া করে তোলে।

বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যপ্রীতি নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। কারাগারের রোজনামচাতে আমরা আরো বিস্তারিতভাবে তার পরিচয় পাই। শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বন্ধুস্থানীয়। কিভাবে সমসাময়িক কালের সাহিত্য মূল্যায়ন করতে হয় তার পরিচয় পাওয়া যায় এই বইতে। "বন্ধু শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক' বইটি পড়তে শুরু করেছি। লাগছে ভালই, বাইরে পড়তে সময় পাই নাই। সন্ধ্যা হয়ে এল। একটু পরে ভিতরে যেতে হবে। তাই একটু হাঁটাহাঁটি করলাম। রুমে বসে লেখাপড়া করা ছাড়া উপায় কি! তাই পড়লাম বইটা নিয়ে। পরে আপন মনে অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলাম। মনে পড়ল। আমার বৃদ্ধ বাবা-মার কথা। বেরিয়ে কি তাদের দেখতে পাব? তাঁদের শরীরও ভাল না। বাবা বুড়া হয়ে গেছেন। তাঁদের পক্ষে আমাকে দেখতে আসা খুবই কষ্টকর। খোদার কাছে শুধু বললাম, "খোদা তুমি তাদের বাঁচিয়ে রেখ, সুস্থ রেখ।" (পৃষ্ঠা – ৬৩)

'শনিবার সূর্য উঠেছে। রৌদ্রের ভিতর হাঁটাচলা করলাম। আবহাওয়া ভালই। তবুও একই আতঙ্ক ইত্তেফাকের কি হবে! সময় আর কি সহজে যেতে চায়। সিপাহি, জমাদার, কয়েদি সকলের মুখে একই কথা, ইত্তেফাক কাগজ

বন্ধ করে দিয়েছে। ঘরে এসে বই পড়তে আরম্ভ করলাম। এমিল জোলা-র লেখা 'তেরেসা রেকুইন' (Therese Raquin) পড়ছিলাম। সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনটা চরিত্র- জোলা তাঁর লেখার ভিতর দিয়া। এই বইয়ের ভিতর কাটাইয়া দিলাম দুই তিন ঘণ্টা সময়।' (পৃষ্ঠা – ১০১)

"নূরে আলম সিদ্দিকী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভাল লেখাপড়া জানে, এমএ প্রথম ভাগ জেল থেকেই দিয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করেছে। বয়স খুবই অল্প। বাংলা ভাষার উপর অধিকার আছে। চমৎকার বক্তৃতাও করে। দেশের প্রতি ভালবাসা আছে। বাংলার মানুষকে ভালবাসে। কিছুটা চঞ্চল প্রকৃতির। তাই একটু বেশি কথা বলে, বয়সের সাথে ঠিক হয়ে যাবে। 'রক্ত কপোত' নামে একটা বই লেখার জন্য একটা মামলার আসামি আছে, মাঝে মাঝে কোর্টে যায়। ছাত্রদের সাথে কোর্টে গেলে দেখা হয় তাতে খুব আনন্দ পায়। তার মা মারা গেছেন। বাবার একমাত্র ছেলে। খুবই আদরের। মাঝে মাঝে বাবা মা'র কথা বলে। তাকে আমি খুবই স্নেহ করি।" (পৃ. ২২৫)

মুনতাসীর মামুন বঙ্গবন্ধুর লেখা নিয়ে বলেছেন, 'শেখ হাসিনা তাঁর পিতার কৃতী সন্তান, ব্যতিক্রমীও এই অর্থে যে, পিতৃঋণ শোধ হয় না, তিনি ঋণ স্বীকারে প্রয়াসী। বঙ্গবন্ধু যে একজন সুলেখক সেটি তিনি তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধু যে লিখতেন তাও তো আমরা জানতাম না। তিনি জানিয়েছেন, বস্তুত বঙ্গবন্ধুর জীবন ছিল গবেষকদের কাছে মূলত তথ্যহীন।"

এটা সত্যিই খুব আশ্চর্যের যে ২০১২ থেকে মাত্র সাত আট বছরের সময়কালে এ রকম তিনটি আকড় গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে, যা কল্পনা করা সহজ নয়। আর এই তথ্য এমন একটা ব্যক্তিগতও যেখানে পরিবারের সুযোগ্য সদস্যরা ছাড়া কারো পক্ষে আবিষ্কার করা সহজ হয় না।

রাজনীতিবিদদের অনেকে নামকরা গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু সে গ্রন্থের অধিকাংশ তাদের নিজেদের রচিত নয়। এই লেখার অধিকাংশ নিয়োগকৃত লেখক কিংবা তাঁদের সচিবদের দ্বারা অনুলিখন। যেমন আমরা এ ক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষ বসুর বিখ্যাত 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইয়ের কথা জানি। তিনি এটি লেখার জন্য এমিলি শেঙ্কল নামের একজন অস্ট্রিয়ান সচিব রেখেছিলেন। পরে নেতাজী তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কোনো সচিব কিংবা সহকারী ছিলেন না এই কাজের জন্য।

জাতির পিতার বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ব্যক্তি ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের অংশ, ছয় দশক পরেও আইন-শৃঙ্খল বাহিনির অনেকেই এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। চিহ্নিত অপরাধীদের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরাধীরা আরো অপরাধ কর্মে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

জাতির পিতার বই থেকে এতটা উদ্ধৃতি সংযুক্ত করার কারণ, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তাঁর চিন্তার উপর। তাঁর চিন্তাই হতে পারে একটি রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি সংস্কৃতির সরণি

এক একজনে এক একটা জায়গা দেখতে চায়। আমি দেখতে চেয়েছিলাম তানসেনের বাড়ি। শেষ পর্যন্ত তানসেনের বাড়ি দেখতে গেলাম। তাঁর বাড়িটা প্রসাদের বাইরে, পাহাড়ের ওপর ছোট্ট একটা বাড়ি। বোধহয় সঙ্গীত সাধনায় ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি দূরে থাকতেই ভালবাসতেন। – (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

১.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- বিশ্বকবি, কবিগুরু বলে খ্যাত। তাঁর অসংখ্য গান কবিতা বাঙালি জাতির আবেগের সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তিনি প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিতা সঙ্গীত বাদ দিলেও ছোটগল্প ও প্রবন্ধের শৈলী ও বিষয় নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর দীপ্ত পদচ্ছাপ থাকা স্বত্ত্বেও নোবেল পুরস্কার অর্জনের ফলে তাঁর আসন বাঙালি মনে আরো উজ্জ্বল হয়েছে। তাঁর সাহিত্য পরিমাণে ও উৎকর্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবিনশ্বর নিদর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপুল কর্ম ও সামগ্রিক জীবন বিবেচনায় তিনি বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব্রিটিশ শাসিত ঔপনিবেশিক ভারতে। তাঁর জন্মের একশত চার বছর আগে সমগ্র বাংলা অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানির কাছে ছলেবলে পরাস্ত হয়ে পড়েছিল। এই পরাধীনতার একশ বছরে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অনেক দেশ-প্রেমিক বীরসেনানি ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করে পরাস্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বড় স্বাধীনতার লড়াই উপস্থিত হয়েছিল- রবীন্দ্রনাথের জন্মের মাত্র চার বছর আগে- ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ। এই সব স্বাধীনতা যুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের ভূমিকা কি ছিল সে আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়, তবে এটি দেখা গেছে যে রবীন্দ্রনাথের জন্মের অব্যবহিত

পরে ঠাকুর পরিবার দেশাত্ববোধক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হিন্দুমেলা ও শিবাজি উৎসব।

'ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে স্বাদেশিকতার ভাব জাগরণ তথা জাতীয় চেতনার প্রসারের উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি মেলা। এই প্রতিঠান জাতীয় মেলা ও স্বদেশী মেলা নামেও পরিচিতি লাভ করে। ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ঠাকুর পরিবারের সহযোগিতায় কলকাতায় প্রথম হিন্দু মেলা আয়োজিত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্রের যৌথ উদ্যোগে প্রথম হিন্দু মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল দেশীয় শিল্পোৎপাদনে উৎসাহ দান, দেশীয় প্রতীকসমূহের প্রতি আনুগত্য । এই জন্য এই মেলাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বসূরি বলে মনে করা হয়। হিন্দু মেলা কলকাতার বাঙালি সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনটি নির্দেশ করে।.. ১৮৬৭ সালে যখন হিন্দু মেলা শুরু হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ছয় বছরের বালকমাত্র। কিন্তু কয়েক বছর পরেই তিনি এই মেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের নামযুক্ত প্রথম কবিতা 'হিন্দু মেলায় উপহার' হিন্দুমেলায় পঠিত হয়'।

(শিশিরকুমার দাশ সংকলিত ও সম্পাদিত, সংসদ বাংলাসাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা আগস্ট ২০১৯, পৃ. ২৪৩, উইকিপি)।

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতায় লিখেছিলেন-

'ভারত-কঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায়রে নতুন জীবন
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বলিয়া
আর কি কখনো দিবে রে জ্যোতি।'

শিশুবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের জন্য বেদনা ও মায়ার সৃষ্টি হয়। মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি যখন পড়াশোনার জন্য বিলাতে যান, তখন থেকে তিনি আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে শুরু করেন নিজ পরাধীন দেশের দুঃখবার্তা। তিনি ওই তরুণ বয়সেই তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' সেই সব দুঃখ কাহিনি তুলে ধরেন। ব্যক্তিগত দুঃখের সঙ্গে জাতীয় দুঃখও তাঁর কম ছিল না। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে কবিগুরুর সাহিত্যিক প্রতিভা যতই প্রখর হোক, তিনি সে-অর্থে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে তৎকালীন ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকলেও, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তিনি সমর্থন করলেও রাজনীতিকে প্রধান করে দেখেননি। শৈশব

থেকেই তিনি নিজেকে একজন সাহিত্যিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন। মহাত্মাগান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রসহ প্রত্যেকেই তাঁর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেন। আবার তাদের মতের সঙ্গে মিল না হলে অবলীলায় বিরোধিতা করতেন। ব্রিটিশ রাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রতিবাদে তিনি ইংরেজের 'নাইটহুড' উপাধি বর্জন করেছেন। রাজনীতি সচেতন গল্প কবিতা গান নাটক রচনা করেছেন। দেশ বিদেশে শান্তির পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে বেরিয়েছেন। আবার তার এসব রাজনৈতিক মতামত ও পক্ষপাতের বিরুদ্ধে সমালোচনাও কম হয়নি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার প্রায় বছর সাতেক আগেই তিনি দীর্ঘজীবন শেষ করে পরপারের ডাকে চলে যান।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক জেনে যেতে পারেননি, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতার রূপ কেমন হবে। তিনি নিশ্চয় জানতেন, ভারত স্বাধীন হওয়া মানে পূর্ণাঙ্গ ভারতের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা। সেই ভারত হিন্দুর জন্য যেমন সত্য, মুসলমানের জন্য তেমন সত্য, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এদেশে বসবাসরত সব ধরনের মানুষের জন্য সত্য। ব্রিটিশ আসার আগে এদেশে সবাই এক সঙ্গে বাস করতেন, হাজার বছর ধরে, এমনকি সব ধর্মের শাসনামলে। ব্রিটিশ আসার আগে মুসলমানরা এদেশ প্রায় আটশ বছর শাসন করেছে। কিন্তু ভাগাভাগির প্রশ্ন কখনো আসেনি। মুসলমানদের কেউ কেউ বাইরে থেকে এদেশ শাসন করলেও এ দেশের মানুষই হিন্দু ও মুসলমান হিসাবে ধর্মীয় পরিচয়ে বিভক্ত হয়েছে। ইংরেজ তার সুবিধার জন্য যখন অখণ্ড বাংলাকে প্রশাসনিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করল, তখন বাঙালিরা ভালো চোখে দেখেনি। যদিও এই ভাগের দ্বারা বাংলার পূর্বাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণের কিছুটা সুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল, তবু বিষয়টি বাঙালিরা ভালোভাবে নেয়নি। ইতিহাসে এই ভাগকেই মূলত ডিভাইড এণ্ড রুলের উদাহরণ হিসাবে দেখা হয়। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা। ব্রিটিশের এই দেশভাগকে কেন্দ্র করে বাংলার জনগণ ফুঁসে ওঠে। বিশেষ করে উচ্চবর্গের হিন্দু বাঙালি এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকায় চলে আসে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গুপ্ত হত্যা, অনুশীলন, যুগান্তর- ব্রিটিশের বিবেচনায় সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির বলা চলে তখন শুরু। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কবি সাহিত্যিক শিল্পী রাজনীতিবিদ- এই বাংলাভাগকে রোধ করতে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ এ সময় দেশাত্মবোধক গান কবিতা, গল্প প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা মায়ের পক্ষচ্ছেদনের

পায়তারা রুখে দিতে ভূমিকা রাখেন। শেষ পর্যন্ত প্রবল আন্দোলনের ফলে উনিশশ এগার সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ করা হয়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথ 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনা করেন ১৯০৫ সালে। গানটির রচনা সাল নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য থাকলেও উল্লিখিত বছরে কোলকাতার অ্যালবার্ট হলে প্রথম গানটি গীত হয়। এই গানটি রচনা হওয়ার প্রায় সাতষট্টি বছর পরে এটি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রূপে গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমার এই আলোচনার পটভূমি এখানেই।

আমি বলতে চাচ্ছি, রবীনন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গানটি রচনা করেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাতষট্টি বছর আগে, সেই গানটি জাতীয় সঙ্গীত হলো এত দীর্ঘ সময় পরে তার কারণ আমাদের ভাবতে বাধ্য করে। রবীন্দ্রনাথ যখন গানটি রচনা করেন, তখন নিশ্চয় তিনি ভাবেননি, এটি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হবে। আবার সে ভাবনা করা সম্ভব হলেও এটি ভাবা কোনো ভাবেই ভাবা সম্ভব ছিল না, এই বাংলা একদিন ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাবে। তাছাড়া এই গানটি রচনা করা হয়েছিল- একটি অখণ্ড বাংলার পক্ষে। এমনকি ব্যজস্তুতি এই, বঙ্গভঙ্গে ফলে যে বাংলার অধিকাংশ জনগণ উপকৃত হয়েছিল সেই বাংলাই প্রধানত স্বাধীন বাংলা হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে বাধ্য করেছিল, সেই বাংলার জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে এই গানটি গৃহীত হয়েছে। এটি আমাদের জন্য গর্বের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটি জানলে হয়তো একই সঙ্গে আনন্দ বেদনায় উদ্বেলিত ও বিষণ্ন হতেন।

রবীন্দ্রনাথের যে গানটি স্বাধীন বাংলার জাতীয় সঙ্গীত, সে গানটি সেই দেশের জাতীয় সঙ্গীত নয়, রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি যে দেশটির স্বপ্ন দেখতেন; কিংবা ব্রিটিশ যাওয়ার পরে স্বাধীন যে দেশটি এই ভারতবাসীর হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বপ্ন ছিল, কেবল রবীন্দ্রনাথ নয় তার জীবদ্দশায় প্রায় সব ভারতবাসীই চাইতেন, ব্রিটিশ যাওয়ার পর একটি অখণ্ড স্বাধীন ভারত। সেই প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ায় ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল- ধর্মের ভিত্তিতে। অতীত ইতিহাসে ভারতে এ ধরনের কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। সবচেয়ে বড় সংকট দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বাংলায়। হাজার বছরের ঐক্যবদ্ধ বাংলা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল- কিছু মানুষের হটকারিতায়, আর ইংরেজের অবিমৃশ্যকারিতায়। এমনকি বাংলামায়ের অঙ্গচ্ছেদনের বেদনায় যারা একদিন মুষড়ে পড়েছিলেন তারাই তখন বাংলা ভাগের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। ভারত ভাগ না হলেও উচ্চবর্গেও হিন্দু

ভদ্দরলোক, কিছু মুসলমানও তখন বাংলা ভাগের পক্ষে ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের আমলে যারা ইংরেজের বাংলা ভাগ ঠেকাতে মরিয়া ছিলেন তারা কেন ব্রিটিশ বিদায়কালে বাংলা ভাগের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন, ইতিহাসের এই প্রহসন সবার কাছে এক বিস্ময়। অবশ্য এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না, দেশ ভাগের তাগাদা সব সময় সংখালঘুদের কাছে থেকে এসে থাকে। যখন একটি রাষ্ট্রে ধর্মের সংখ্যাধিক্য সংখ্যালঘুদের মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে থাকে তখন এই সংকট উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কালে বঙ্গভঙ্গের সময় মনে করা হতো বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যাগুরু, কিন্তু বাস্তবে ছিল উল্টো। ফলে ১৯৪৭ সালে যখন দেশ ভাগ হচ্ছিল ধর্মের ভিত্তিতে তখন বাংলামায়ের অখণ্ডতার পক্ষে সকল বাঙালির থাকা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের পরেই বাঙালি বুঝতে পারল, ব্রিটিশের চেয়েও এক ভয়াবহ উপনিবেশ গড়ে তুলতে চায় পশ্চিমের উর্দুভাষী বাঙালিরা। ব্রিটিশের শাসনের প্রধান নিয়ামক ছিল- অর্থনীতিক শোষণ, আর পাকিস্তান কেবল অর্থনৈতিকভাবে শাসন করেই ক্ষান্ত দিতে চায় না, সে মানসিক দাসত্ব কায়েম করেও বাঙালির উপর আধিপত্য করার সকল ঘাট নিশ্চিত করার উপায় বের করতে থাকে। বাঙালির হাজার বছরের অর্জন, সম্মানও স্বাধীনতাকে খর্ব করে পাকিস্তানি শাসকরা এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বাঙালিদের সহজ ছিল না। বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় আচারগত কিছু পার্থক্য থাকলেও বাঙালির সাংস্কৃতিকগত মিল ছিল বেশি। কারণ বাঙালিরাই তাদের প্রয়োজনে হিন্দু হয়েছে, মুসলমান হয়েছে। আবার তাদের মধ্যে রয়েছে নানা রকম শ্রেণি ও বর্ণগত পার্থক্য। সুতরাং বলার অবকাশ নেই যে, ধর্ম এক হলেই অন্যদের কাছ থেকে নির্যাতনের মাত্রা কমে যায়। পাকিস্তান হওয়ার পরেই এই বিষয়টি যারা বুঝতে পারেন তাদের মধ্যে অন্যতম তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। যারা পাকিস্তানের পক্ষে ভারত বিভাগে আন্দোলন করেছিলেন। সেসবই ছিল সময়ের প্রয়োজনে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগণ মনে করলেন, বাঙালিকে সব কিছু ত্যাগ করে, উর্দুওয়ালাদের অনুকরণ করতে হবে, ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির বিপরীতে। আর বাঙালির আন্দোলন বেগবান হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকদের বাংলাকে উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে। বাংলা কেবল ভাষা নয়, বাংলা একটা সাংস্কৃতি, বাঙালির সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস। বাংলা বলতে বাঙালির সকল অর্জনকে বোঝায়। ফলে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে তারা বাংলা

ভাষা কেন্দ্রিক অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথকেও বর্জন করার পায়াতারা শুরু করে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাঙালি মুসলমানের কোনো সংকট না থাকলেও পাকিস্তানি শাসকরা রবীন্দ্রনাথকে তাদের জন্য হুমকি মনে করে। অনেকে ভুল করে থাকেন যে, তারা মনে হয় রবীন্দ্রনাথ হিন্দু বলেই তার বিরোধিতা করে থাকে। পুরোপুরি তা নয়, তারা নজরুল সাহিত্যের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে ওঠে। ভেতরে ভেতরে নজরুলকে কর্তন পরিবর্ধন পরিমার্জন করার চেষ্টা চলে। সুপারিশ করা হয়, হিন্দুর দেব-দেবতা বিষয়ক সকল গান কবিতা ও সঙ্গীত ও শব্দ বাদ দিয়ে কেবল ইসলামি তমুদ্দুনের অনুগামী রচনাই প্রচার করা হবে। সে ক্ষেত্রে নজরুলের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ, বিখ্যাত কবিতা 'অগ্নিবীণা' ও 'বিদ্রোহী' কবিতাও বাদ দিতে হবে। 'মহাশ্মশানে'র স্থালে 'গোরস্তান' লিখতে হবে।

যাই হোক, এ সমস্যা শুধু হিন্দু মুসলমানের সমস্যা নয়, এ সমস্যার বীজ লুকিয়ে আছে জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে-ইতিহাসের আদিকালে। ভারতের পশ্চিবঙ্গ রাজ্যে বৃহত্তর বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের সঙ্গে এবং বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হলেও পূর্ববাংলা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ; পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিবেশে কোনো রাজ্যের বাসিন্দারা পরদেশের নাগরিক না হলেও সব সময় তাদের স্ব স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী সংস্কৃতিক আচরণ করা যায় না। পশ্চিম বঙ্গে বাঙালিদের ক্ষেত্রে এ কথা সমান বলে খাটে। রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙালির সম্পদ নয়, ভারতবর্ষেরও সম্পদ; কিন্তু সম্প্রতি একটা বিষয় লক্ষ করা গেল : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী মদিজি রবীন্দ্রনাথকে নানা মাত্রায় ব্যবহারের মাধ্যমে বাঙালিকে আকৃষ্ট করতে চাইলেন। নিজের চেহারা, শ্মশ্রুমণ্ডন, পোশাকের কেতা- সব রাবীন্দ্রিক শৈলীতে বিন্যাস করেছিলেন। এমনকি তার গুজরাটি স্বরে ভুলভাল রবীন্দ্রনাথের কবিতা উচ্চারণ সবটাই ছিল ভোটারকে আকৃষ্ট করার নামান্তর। কিন্তু রাজ্যভোটে পরাজয়ের পরে রবীন্দ্র-সাহিত্য সহিংসতার শিকার হয়েছে হিন্দি বলয়ে। দীর্ঘদিন থেকে উত্তর প্রদেশে হিন্দি ও ইংরেজি অনুবাদের রবীন্দ্রনাথ পাঠ্য থাকলেও নির্বাচনের পরে তাঁকে বাতিল করা হয়েছে পাঠ্য বই থেকে। স্বাধীন বাংলাদেশে এই ঘটনা সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষেই কেবল সম্ভব ছিল।

আমার এই আলোচনার লক্ষ্য, একজন সাহিত্যিকের মান্যতা পাওয়া কেবল সাহিত্য-শৈলী মহৎ হওয়ায় একমাত্র বিষয় নয়। সকল কিছুর উর্ধ্বে রাজনৈতিক বিবেচনা নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ মহৎ সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি পাকিস্তানে গুরুত্ব পাননি, তেমনি হিন্দু ভারতেও জাতীয়তা ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ নীরব উপেক্ষার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ, বর্জিত থাকতেন। কেউ বলতেন তিনি মুসলমানের কবি নয়, সাম্প্রদায়িক কবি; তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে মূলত বাঙালি মুসলমানের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করেছেন; কেউ বলতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন; পূর্ব বাংলার জমিদারি থেকে অর্থ নিয়ে শান্তিনিকেতন করেছেন। এসকল আলোচনা মূল রাজনৈতিক। কোনো জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে, দেশ স্বাধীন না হলে সেই জাতির মহত্তম অর্জন অন্য জাতির কাছে পরিত্যাজ্য হয়ে থাকে। বলশেভিক আন্দোলনের পরে রাশিয়ায় অনেকদিন লেভ তলস্তয়সহ অনেকে নিষিদ্ধ ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতাই সব নয়, রাজনৈতিক ইচ্ছাও গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সর্বদা স্পর্শকাতর ছিলেন। তিনি যেমন তার সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, তেমন রবীন্দ্রনাথকে অসম্প্রদায়িক বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে দেখেছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য যেমন বঙ্গবন্ধুকে আনন্দ সাহস ও অনুরাগ যুগিয়েছে, তেমনি বঙ্গবন্ধুও স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে, আশ্রয় দিয়েছেন, লালন করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে, বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও তার বাঙালি পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ না হলে বাংলাদেশে তাঁর চরম প্রতিষ্ঠা হতো না।

এ কথা শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জানেন, কবিকে একটি রাষ্ট্রে রাখা না রাখা, মর্যাদা দেয়া না দেয়া রাজা ও রাজনীতির দায়িত্ব কিংবা আধিপত্যের উপরে নির্ভর করে থাকে। কবিকে নির্যাতিত হতে হয়েছে যুগে যুগে। রাজার সঙ্গে না মিললে, রাজার বিরুদ্ধে গেলে কবিকে বর্জন, শারীরিকভাবে নির্যাতন, নিন্দা এসবই রাজার কাজ। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের আগেও প্লেটো তার রিপাবলিকে কবির কোনো জায়গা রাখেননি। তিনি বলেছেন, 'আমাদের রাজ্যে কবির কোনো প্রয়োজন নেই। উপহাস করে বলেছেন, কবিকে ফুলচন্দন দিয়ে বরণ করে অন্যদেশের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব। বলব, 'মহাত্মন, আমাদের দেশে আপনার মতো মহান কবির দরকার নেই।' রিপাবলিকের সাথে অধিকাংশ

স্বৈরতন্ত্রের বিরোধ থাকে। এমনকি নীতিবাদিদের কাছেও কবির কোনো মূল্য নেই- যদি কবির তাদের মতের অনুরূপ না হয়।

২.

এখন আসি বঙ্গবন্ধু কিভাবে রবীন্দ্র সাহিত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাঙালিকে যুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আশি বছরের পূর্ণাঙ্গ জীবন সমাপন করে ১৯৪১ সালে পরলোকে চলে যান, তখন শেখ মুজিবের বয়স প্রায় একুশ বছর। তাঁর জন্মের প্রায় সাত বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য নোবেল পুরস্কার পান। বঙ্গবন্ধুর জন্মের আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার দ্বারা বাংলা ও বাঙালিকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করে তুলেছিলেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গান কবিতায় বাঙালি আবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন, দেশের প্রতি মমত্ব অনুভব করেছিলেন। ফলে বঙ্গবন্ধু ক্রমান্বয়ে যে দেশের প্রতি অনুগত অনুরক্ত হয়ে উঠছিলেন, যে দেশের মানুষের দুঃখ কষ্টে ব্যথিত হয়ে উঠছিলেন, যে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই দেশকে বাণীতে গানে রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আর সেই থেকেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের বন্ধুর পথে অনুপ্রেরণার সহযাত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাথে বঙ্গবন্ধুর সরাসরি যোগাযোগের চেয়ে তার মানসসঞ্জাত হয়ে ওঠার বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধুতনয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে বলেন, '১৯৪৯ থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল যা সব সময় আব্বার সঙ্গে থাকত। জেলখানায় বই বেশিরভাগই জেল লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন কিন্তু আমার মার অনুরোধে এই বই কয়টা আব্বা কখনও দিতেন না, সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তার মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী, শরৎচন্দ্র, নজরুলের রচনা, বার্নাড শ'র কয়েকটা বইতে সেন্সর করার সিল দেওয়া ছিল।... মা এই কয়টা বই খুব যত্ন করে রাখতেন। আব্বা জেল থেকে ছাড়া পেলেই খোঁজ নিতেন বইগুলি এনেছেন কিনা। যদিও অনেক বই জেলে পাঠানো হতো। মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউ মার্কেটে মার সঙ্গে আমরাও যেতাম। বই পছন্দ করতাম, নিজেরাও কিনতাম। সব সময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল।'

বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনী থেকেও আমরা জানতে পারি, 'তিনি কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ও তাঁর সহকর্মী জনাব মাজহারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন,

রুশ লেখক আইজ্যাক অ্যাসিমভ, তুর্কি কবি নাজিম হিকমতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত প্রগতিশীল লেখকদের সম্মেলনে যোগদান করেছেন, লাহোরে কবি আল্লামা ইকবালের বাড়ি 'জাভেদ মঞ্জিল'-এ অবস্থান করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে করাচি অভিমুখে যাত্রাকালে তিনি সহযাত্রী কয়েকজন কৌঁসুলিকে কাজী নজরুল ইসলামের কিছু কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাংশ আবৃত্তি করে শোনান।'

(দ্রষ্টব্য, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ২১৭, ইউপিএল ২০১৭)

বাংলা ভাষা সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করার জন্য বিশ্বকবির অবদানকে বঙ্গবন্ধু মর্যাদার সঙ্গে দেখতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র বছর চারেকের মধ্যে ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে চীন সফরে যান। চীনে ভ্রমণকালে তিনি তাঁর উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃ. ২২৮)। 'আমার দেখা নয়াচীন গ্রন্থে' বঙ্গবন্ধু লেখেন- "বাংলা ভাষা যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা এ অনেকেই জানে। ঠাকুর দুনিয়ায় 'ট্যাগোর' নামে পরিচিত। যথেষ্ট সম্মান দুনিয়ার লোক তাঁকে করে। আমি বললাম, পাকিস্তানের শতকরা ৫৫ জন লোক এই ভাষায় কথা বলে। এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাষার অন্যতম ভাষা বাংলা। আমি দেখেছি ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন খুব ভালো ইংরেজি জানেন, কিন্তু তিনি বক্তৃতা করলেন চীনা ভাষায়। একটা ইংরেজি অক্ষরও তিনি ব্যবহার করেন নাই।" (দ্রষ্টব্য- আমার দেখা নয়া চীন : বা.এ ২০২০, পৃ. ৪৪ অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃ. ২২৮-২২৯)।

মুহম্মদ সবুর 'আমার সোনার বাংলা যেভাবে জাতীয় সংগীত হলো' প্রবন্ধে লিখেছেন, '১৯৫৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তন গণপরিষদের অধিবেশনে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ থেকে আগত সংসদ সদস্যগণের সম্মানে বঙ্গবন্ধু কার্জন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বাংলার সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করা ছিলো তাঁর অন্বিষ্ট। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের গানসহ লোকসংগীত পরিবেশিত হয়। ডি. এল. রায় রচিত 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটি বঙ্গবন্ধুর প্রিয় গান হিসেবে অনুষ্ঠানে গীত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সনজীদা খাতুনকে 'আমার সোনার বাংলা' গাইবার জন্য বঙ্গবন্ধু অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পাকিস্তানিদের নিকট 'সোনার বাংলা'-র রূপমাধুর্য ও প্রীতি পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু এ গানটি নির্বাচন করেছিলেন। তবে পাঁচ স্তবকে বিন্যস্ত এ

গানটি সনজীদা খাতুনের মুখস্ত ছিলো না বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে 'গীতবিতান' সংগ্রহ করে তাঁকে গানটি পরিবেশন করতে হয়।'

উনিশ ছাপান্ন সালে বঙ্গবন্ধু যখন রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা গানকে তুলে ধরছেন, তখন একটি প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসে- কেন এই গানটিকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করলেন! এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে যে, সেদিন হয়তো তাঁর মনের মধ্যে এমন কিছু স্বপ্ন লুকিয়ে ছিল যে, তার নিজেরও 'সোনার বাংলা'র রূপ যেমনটি কবিগুরু উপলব্ধি করেছেন। নিশ্চয় 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' তাঁর মন ভরাতে পারেনি। কারণ ধূসর সিন্ধু মরু সাহারার সঙ্গে তার পূর্ববাংলার শ্যামলিমার মিল ছিল না। তাঁর বাংলা- যেখানে জমিনে মায়ের মায়াময় আঁচল পাতা রয়েছে। এই গান কেবল বিশ্বকবি রচনাই করেননি, এই গানে মিশে রয়েছে এই বাংলার পাগল করা আদি বাউল সুর। গগন হরকরার 'আমার মনের মানুষ যে রে'- সেই মনের মানুষের অনুসন্ধানও রয়েছে এই গানের চিরায়ত সুরের গভীরে। এই গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেও আবহমান বাংলার আত্মা মিশে আছে এই গানের সুরে। 'বঙ্গবন্ধু শিল্পী জাহিদুর রহিমের কণ্ঠে 'আমার সোনার বাংলা' শুনতে পছন্দ করতেন। বঙ্গবন্ধুর সস্নেহ আহ্বানে জাহিদুর রহিম বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশ করতেন। বঙ্গবন্ধু 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ', 'সুপ্রভাত', 'বিপদে মোরে রক্ষা করো', 'দুই বিঘা জমি' প্রভৃতি কবিতা যেমন আবৃত্তি করতেন, তেমনি গুনগুন করে রবীন্দ্রনাথের গানও গাইতেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার' বঙ্গবন্ধুর প্রিয় গানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।.. গত শতকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে এ দেশে রবীন্দ্রচর্চা অবাধ ছিলো না। তবে পূর্ববঙ্গীয় সংস্কৃতির জন্য দেশবাসী তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিলেন।'

রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে। কবির জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ করে যখন এদেশের কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা উৎসবের তোড়জোর শুরু করেন, তখন পাকিস্তান সরকার ও বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধবাদীরা এর বিরোধিতা শুরু করে। পাকিস্তানে রবীন্দ্র বিরোধিতা, বাঙালির প্রতিরোধ ও বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন উদ্যোগের ধারাবাহিকতার একটি বিবরণ দেয়া হলো বিভিন্ন জনের রচনা থেকে : '১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষে যেন কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন না করা হয় তার জন্য রাষ্ট্রীয় মদদে একে একে তৎপর হয়ে ওঠে সবাই। সে ধারাবাহিকতায় 'আজাদ' পত্রিকা রাষ্ট্রীয়

আনুকূল্যে পহেলা বৈশাখ থেকে শুরু করে মাসব্যাপী প্রতিদিন সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও সংবাদ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিরোধী প্রচার শুরু করে। প্রচার করা হয়- রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পাকিস্তানি একাত্মতার আদর্শবিরোধী। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এদেশের কবিদের রবীন্দ্রসংগীত রচনা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কবি গোলাম মোস্তফা বলেছিলেন, 'দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাও বিভক্ত হয়ে গেছে এবং পরিণতিতে একদিন পূর্ববঙ্গের ভাষাও হবে ইসলামি বাংলা ভাষা।' তিনি দাবি করেন পাকিস্তানের পরিবর্তিত মনোভঙ্গিমায় ও নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তাই আমাদের একটা সাহিত্যিক ভাষা বাছাইয়ের দরকার আছে। তিনি নজরুল সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই পরামর্শ দিয়েছিলেন। গোলাম মোস্তফার দাবি ছিল, নজরুল যেহেতু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছেন, সেহেতু ইসলামি পাকিস্তানে তাঁকে ততো গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য পত্রিকা, গবেষণা পত্রিকায় সমানভাবে রবীন্দ্রবিদ্বেষ প্রচার করতে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম মাসিক পত্রিকা 'মাহে নও' সব সময় রবীন্দ্রবিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকে। একই সঙ্গে তারা নজরুল বিরোধিতাও করে। তাদের দাবি- 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য নন। বাংলা একাডেমি পত্রিকায় ১৯৫৩-১৯৬৭ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক কোনো প্রবন্ধ ছাপেনি।'

১৯৬১ সালে জন্মশতবার্ষিকী হিসেবে সারা বিশ্বের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছিল। কিন্তু সে সময় রেডিও পাকিস্তান তার ঢাকা কেন্দ্র থেকে ৪৫ মিনিটের রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অন্য কিছু প্রচার করেনি। এতে তৎকালীন সাধারণ জনতা থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহল খুবই আশাহত ও ক্ষুব্ধ হন। 'রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে ১৯৬১ সালে পালিত হয় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী। বাংলার চেতনাদীপ্ত মানুষ রবীন্দ্রনাথকে 'তাঁর সংস্কৃতির সবচেয়ে পূর্ণোদিত মানুষ' হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি (খান সারওয়ার মুরশিদ পৃ : ১০৯)। খান সারওয়ার মুরশিদের ভাষায়, 'তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের দ্বন্দ্ব এবং টানাপড়েনে জড়িয়ে গেছেন। বলা চলে রবীন্দ্র শতবর্ষকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথ ভাষা আন্দোলনের পরে বাঙালির সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। রবীন্দ্র শতবর্ষে সরকারিভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিমৃশ্যতার কারণে সাধারণ বাঙালিদের মধ্যে রবীন্দ্রচর্চা আরো বেগবান হয়ে ওঠে। ১৯৬৩ সালে 'ছায়ানট' সঙ্গীত বিদ্যায়তন

পত্তনের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত সামগ্রিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার বিস্তার ঘটতে থাকে। তার আগে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হন শিক্ষিত বাঙালির প্রগতিশীল অংশ। ততদিনে বঙ্গবন্ধু পূর্ববাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের দাবিকে সামনে নিয়ে এসেছেন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাঙালী সংস্কৃতির পক্ষে শেখ মুজিব তখন সোচ্চার। তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও উদ্ধৃত হতে থাকে। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' বলে ভরাট গলা, দরাজস্বরে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে যখন আবৃত্তি করতেন, গুণমুগ্ধ শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা শ্রবণ করত।'

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে রবীন্দ্রনাথ আবার নতুন করে সংকটে পড়েন পাকিস্তান শাসিত পূর্ববাংলায়। তখন বাঙালিরা রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চায় নতুন করে তৎপর হয়ে ওঠে । ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবি ঘোষণা পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নেয়। সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি। খাজা শাহাবুদ্দিনের এ ঘোষণা করেন 'রেডিও ও টেলিভিশন থেকে পাকিস্তানবিরোধী রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের অন্য গানের প্রচারও হ্রাস করা হবে' এতে প্রগতিশীল রাজনীতিক ও সংস্কৃতিমনাদের ক্ষুব্ধ করে। ১৯৬৭ সালে 'পয়গাম' পত্রিকায় প্রকাশিত তিরিশ মাওলানা এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, 'রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীত মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতি ও যৌন ভোগ লালসার জয়গান গাহিয়াছে। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশনকে পবিত্র রাখার প্রয়োজন ছিল।' রবীন্দ্রসঙ্গীতে নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ প্রগতিশীল অংশ। আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ জানিয়ে বলে 'ক্ষমতা বলে হয়তো সাময়িকভাবে রেডিও ও টেলিভিশন হইতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু গণচিত্ত হইতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুমধুর আবেদনকে কোন কালেই মুছিয়া ফেলা যাইবে না।' ১৯৬৭ সালের ২৩ জুন পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। পাকিস্তান সংসদে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বললেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ নয়।'

১৯৬৯ সাল। শেখ মুজিবকে বাংলার মানুষ মুক্ত করে এনেছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নিশ্চিত ফাঁসির রজ্জু থেকে। তিনি এখন বঙ্গবন্ধু। শিল্পীরা তাঁকে

সংবর্ধনা দেবেন। এঁদের মধ্যে তাঁরাও আছেন, যাঁরা ১৯৬৭ সালে রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম দেখা করলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। দালাল শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের সংবর্ধনায় যেতে বঙ্গবন্ধুকে মানা করলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমিও যাব, আপনিও যাবেন।' সংবর্ধনায় তাঁরাই রবীন্দ্রপ্রীতি দেখালেন, বঙ্গবন্ধুর স্তাবকতা করলেন, কিছুদিন আগেও যাঁরা বিবৃতি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের সমালোচনা করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বললেন, 'আপনাদের রবীন্দ্রপ্রীতিতে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আপনারাই কিছুদিন আগে রবীন্দ্রসংগীতের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছিলেন। যাক, আপনারা "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটা এবার গেয়ে শোনান।' জাহিদুর রহিমকে খুঁজে আনা হলো। সব শিল্পী মিলে গান ধরলেন- 'আমার সোনার বাংলা' রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করলে শিল্পী ও প্রগতিবাদী মানুষের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু একাত্ম হন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা প্রদানকালে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'আমরা মির্জা গালিব, সক্রেটিস, শেক্সপিয়ার, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাও সে তুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য। আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখে যিনি বিশ্বকবি হয়েছেন। আমরা এই ব্যবস্থা মানি না - আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়বই, আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবই এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এই দেশে গীত হবেই।' (মুনতাসীর মামুন, বঙ্গবন্ধু কোষ, পৃ : ২৯৬)। লেখক জেমস জে নোভাক কীভাবে বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সে সম্পর্কে বলেন : "আরেকটি বিষয় মুজিব উসকে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে সামরিক ও যুদ্ধপ্রিয় পাকিস্তানি পাঞ্জাবিদের চেয়ে বাঙালি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের বোধ। অকৃত্রিম বাঙালি মনের সুক্ষ্ম ও শৈল্পিক গুণাবলী এবং সে মনের নৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কবিতার ভূমিকা কী তা মুজিব বুঝেছিলেন। বহুদিন আগে সক্রেটিস যেমনটা বুঝেছিলেন। তাই তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে যেয়ে বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানের মহান কবি ইকবালের বিপরীতে প্রতিস্থাপন করেছেন।"

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সম্ভবত বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দিনে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে রেসকোর্সের ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে কবিগুরুর সেই বিখ্যাত কবিতা পঙক্তির– 'সাত

কোটি বাঙালিকে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি"- বিপরীতে অশ্রুভেজা কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কবিগুরু, তোমার উক্তি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দেখে যাও তোমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।'

'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি জাতীয়তাবাদের রূপকার।' নেতাজী সংবর্ধনা সভায় ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বহুকাল পূর্বে আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বছর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।... দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।'

একই সভায় এমনটাও বলেছেন, 'একজনের কেন্দ্র কর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হতে পারলে তবেই হবে অসাধ্যসাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা কখনই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন, সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তারা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্যদান করেন।' 'দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।' তাই দেখি, স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখে বঙ্গবন্ধু প্রথম জনসমাবেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তুলে ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী/রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।' এই কাব্যোচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'কবিগুরু, তুমি এসে দেখে যাও, তোমার বাঙালী আজ মানুষ হয়েছে।'

'সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালী মারের উপরে মাথা তুলবে' বলে রবীন্দ্রনাথ যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দুর্নিবার শক্তিতে বাঙালী একাত্তরে গর্জে উঠেছিল দীপ্ত তারুণ্যে। রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী চিন্তাকে মূর্ত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। 'দেশের পুরনো জীর্ণতাকে দূর করে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে নববসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করার সৃষ্টি কর্তৃত্ব' গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুই। নতুন যুগের উদ্বোধনের ভার বিধাতা শেখ মুজিবের ওপরই অর্পণ করেছিলেন এবং তা রবীন্দ্র প্রেরণাজাত করে। এই মুজিবের হাত ধরে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্মস্থান হিসেবে পরিচিত পূর্ব বাংলায়। পাকিস্তান যুগে যেখানে তাঁর প্রবেশাধিকারকে সঙ্কুচিত

এবং বিজাতীয় বলে অবজ্ঞা করা হয়েছিল। নিষিদ্ধতার ঘেরাটোপে রবীন্দ্রনাথ ওপার হতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন নিশ্চয় সেদিন।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা' শব্দবন্ধটি তুলে নিয়েছিলেন এই গান থেকে। সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখতেন, এই স্বপ্নে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দেশবাসীকে। ১৯৭০ এর নির্বাচনের আগে পোস্টার করা হয়েছিল, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন'। স্বাধীনতার পর তিনি বলতেন, 'সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।' ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর 'আমার সোনার বাংলা'র প্রথম দশ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রূপে গৃহীত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধু শোনেন যে, স্বরবিতানের ছাপানো সুরের সঙ্গে আমাদের শিল্পীদের গাওয়া সুরের মিল নেই। তখন তিনি বলেছিলেন, 'যে সুর গেয়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে সুরেই আমাদের জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে, সেটিই জাতীয় সংগীতের সুর।'

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কেবিনেট সচিব এইচ টি ইমাম জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। দায়িত্ব দেন শান্তিনিকেতনের প্রথম মুসলমান ছাত্র রবীন্দ্র স্নেহধন্য শিল্পী আবদুল আহাদকে। বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সভায় উপস্থিত হয়ে তারা জানালেন, 'আমার সোনার বাংলা গানটি স্বরলিপি বইয়ে যেভাবে ছাপা আছে, সেটা আমরা গাই না। যে সুরটি প্রথম খুব সম্ভব সুচিত্রা মিত্র শিখেছিল ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে এবং রেকর্ডও করেছিল- বাংলাদেশের দরকার সেই সুরটির স্বরলিপি। শান্তিদেব ঘোষ যিনি রেকর্ডে সুচিত্রা মিত্রের ট্রেনারছিলেন, সভায় তিনিও ছিলেন। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত জানালো বিশ্বভারতী যে, তারা স্বরলিপি তৈরি করে বাংলাদেশের সরকারকে কিছুদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে 'রবীন্দ্রনাথের প্রচুর কবিতা বঙ্গবন্ধুর মুখস্থ ছিল। কবিতা তাকে প্রেরণা যোগাতো। পাকিস্তানী কারাগারে নয় মাসের বন্দীজীবনে রবীন্দ্র কবিতা আওড়াতেন, তার অধিকাংশ ছিল তার মুখস্ত। বাঙালি' বলে যে জাতির কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বঙ্গবন্ধু সেই জাতিকেই আবিষ্কার করেন সোনার বাংলায়। এনে দেন আত্মমর্যাদা, স্বাধীন সত্তা। এই বাংলাকে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা'। আর বঙ্গবন্ধু তা একটি জাতির জাতীয় সঙ্গীতে রূপান্তর করে, চিরস্থায়ী করে দেন।

কারাবাসের অধিকাংশ সময় 'সঞ্চয়িতা' ছিলো তাঁর আলোকময় সহচর। রবীন্দ্রকাব্যে ভাস্বর মানবিকতা ও স্বদেশপ্রেম বঙ্গবন্ধুকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গমাতা' কবিতায় অভিব্যক্ত অভীস্পা বঙ্গবন্ধুর সংবেদী সত্তায় পল্লবিত হয়ে উঠেছিলো :

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি দিল্লি হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে বিমানে বসে বঙ্গবন্ধু বাষ্পরুদ্ধস্বরে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গাইতে থাকেন এবং সহযাত্রী ভারতীয় কূটনীতিজ্ঞ শশাঙ্ক এস ব্যানার্জীকে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে বলেন। এ গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে বলে বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশ কূটনীতিবিদ ফেলিক্স ইউরলভ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ধ্রুপদী বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সাহিত্যকর্ম রুশ ভাষায় অনূদিত হচ্ছে মর্মে তিনি বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটির কিছু চরণ পাঠ করে শোনান। এ সময় বঙ্গবন্ধুর অভিব্যক্তি ছিলো অনন্যসাধারণ; তিনি স্বয়ং আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে এ গানটি আবৃত্তি করেন।'

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে রেসকোর্স ময়দানে যখন ভাষণ দান করেন তখন তাঁর সমগ্র সত্তায় অভূতপূর্ব আলোড়ন তরঙ্গিত হয়। তিনি আনন্দ-বেদনামিশ্রিত যে শব্দমালা উচ্চারণ করেন তা রবীন্দ্রানুগ। বাংলার মানুষ, বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার আবহাওয়ার সান্নিধ্য তাঁকে বিহ্বল করে তোলে। তিনি ক্রন্দিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় বড় ভালোবাসি'।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে এসে লিখেছিলেন-

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক-

এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি মহারাত্রির দূর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়েও মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

এই ধরাতলে যুগে যুগে কালের প্রয়োজনে মহামানবের জন্মযাত্রা হয়তো অব্যাহত থাকবে, তবু মহাকবি কথিত এক মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহাকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। (বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ, গৌরাঙ্গ মহন্ত, বাংলা ট্রিবিউন, ১৭ মার্চ ২০২০)

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর এই দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য, কিভাবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের হলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের সকল মানুষের হলেন; তার জন্য একজন মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল। যিনি রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অঙ্গীভূত করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে রবীন্দ্রনাথ বিপুল বাঙালিদের কাছে এতটা প্রিয় হতেন বলে মনে হয় না। আর তার কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের, যার নেতৃত্বে এদেশ স্বাধীন হয়েছিল।

নজরুল ও বঙ্গবন্ধু : একই বৃন্তে দুটি কুসুম

নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। – (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

স্বাধীন বাংলাদেশে নজরুলের সশরীরের উপস্থিতির ইতিহাস নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র কবির প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। এটি ভাবা খুব স্বাভাবিক ছিল না যে, নজরুলের ৭৩তম জন্মজয়ন্তী ও স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রথম বিজয়দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে স্বাধীনতার এই কবির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা। কারণ, নজরুলের গান কবিতা ভালোবাসা আর অন্যদেশের একজন অসুস্থ নির্বাক নাগরিককে নিজের দেশে আনতে চাওয়ার ঝক্কি ও আকাঙ্ক্ষা সাধারণ বৌদ্ধিক চেতনার সমান্তরাল নয়। আর এখানেই বঙ্গবন্ধুকে দেখতে হবে নজরুল-চেতনার ভেতর দিয়ে। এতেই প্রমাণিত হবে ইতিহাসের এই দুই মহান পুরুষের শুভ চেতনালোকে কোনো তফাত ছিল না। একজন বাণীতে যা প্রকাশ করেছিলেন, অন্যজন কর্মে তা পরিণত করেছিলেন। একটি পরাধীন জাতির চিৎপ্রকর্ষে মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা তা-ই নজরুলের ভেতর দিয়ে বাণীরূপ পাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়, একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ঈশ্বর সবার মধ্যে নয়, বিশেষ কারো মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন; নজরুলই যে জাতির সেই বিশেষ ব্যক্তি সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি; তার কণ্ঠস্বরই হয়ে উঠেছিল জাতির কণ্ঠস্বর; আর বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের মূর্তিমান রূপ।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে নজরুলকে বাংলাদেশের আনার প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন শেখ কামাল কবির ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে। সেখানে তিনি প্রথমে কবিপুত্র সব্যসাচীর সঙ্গে আলাপ করেন। সব্যসাচী তাকে জানান, ভারত

সরকার সম্মত হলে তার অমত নেই। এরপর বঙ্গবন্ধুপুত্র শেখ কামালের নেতৃত্বে কবিতে আনার জন্য দু'দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়।

এ কথা যদি আমরা ধরে নিই যে, বঙ্গবন্ধু নজরুলকে কেবল জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাহেতু এ দেশে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাহলে ইতিহাসের প্রতি পুরো সুবিচার করা হবে না। কারণ পাকিস্তান আমলে শাসকদের নজরুল-প্রকল্প ছিল তথাকথিক মুসলিম মানসের রাজনৈতিক অভিপ্সা; যেখানে নির্বাক নজরুলকে মুসলিম পাকিস্তানের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠার নিরন্তর প্রচেষ্টা। তাদের দৃষ্টিতে 'হিন্দু রবীন্দ্রনাথে'র সমান্তরালে দাঁড় করানোর জন্য কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কোনো যুতসই বিকল্প ছিল না। যদিও ইকবালের পাণ্ডিত্য ও পাকিস্তান চেতনার যথার্থতা ছিল, কিন্তু তার উর্দুভাষিতার কারণে তাকে বাঙালি-মনে নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা দেয়ার চেষ্টা ছিল বৃথা। তাছাড়া পাকিস্তানের পশ্চিম অংশটা নিয়ে তো আর পাকিস্তানি শাসকদের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না; তাদের ভয় ছিল বাঙালিয়ানার বিকাশমানতা নিয়ে। তাদের আশঙ্কা ছিল বাঙালিয়ানাকে ক্ষুণ্ন করতে না পারলে একদিন পাকিস্তানের অখণ্ডতা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। তারচেয়ে বড় ব্যাপার এ-সবের মাধ্যমে একটি অনুগামী মুৎসুদ্দি শ্রেণি গড়ে তোলা- যারা শাসকদের হয়ে কাজ করবে।

পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে নিয়ে শাসক ও শাসক-অনুগামীদের মধ্যে এমন সব মূর্খতার জন্ম হয়েছিল যা রীতিমত ভয়ের এবং হাস্যকরও বটে। আর এসবই হচ্ছিল ইসলামি তমুদ্দুনের দোহাই দিয়ে। সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছিল; আর সে-সব ফরমানের সমর্থনে স্বাক্ষর করছিলেন বাংলা ভাষাভাষি কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই। এমনকি নজরুলের গান কবিতা থেকে হিন্দু-আনি শব্দের ত্বকছেদনের মাধ্যমে মুসলমানি করা হচ্ছিল। এসব কবিতা শিশুদের উপযোগী করে পাঠ্যপুস্তকে সংযোজনও করা হচ্ছিল; তারই একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, নজরুলের তরুণের অভিযান কবিতাটির একটি অংশ, যেখানে নজরুল লিখেছিলেন, 'নব-নবীনের গাহিয়া গান/ সজীব করিব মহাশ্মশান।' এই 'মহাশ্মশান' যেহেতু হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জায়গা, সেহেতু সেটি পরিবর্তন করে 'গোরস্থান' করা হয়। এ ধরনের পরিবর্তন যারা করেছিলেন তারা কখনো ভেবে দেখেননি, গোরস্থান সর্বদা সজীবই থাকে। মহাশ্মশান থাকে ঊষর। কবি এই শব্দের ব্যবহার হিন্দু বা মুসলমানের মৃতদেহ সৎকারের জায়গা হিসাবে দেখেননি। কবির শব্দের যে অন্তর্নিহিত অর্থ সেটি সর্বদা তার বাহ্যিক অর্থকে

ছেড়ে যায়। সুতরাং পাকিস্তান আমলে শাসকদের নজরুল প্রীতি মোটেও বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা থেকে নয়। অবশ্য সবকালেই শাসকরা জনসমর্থিত বিষয়গুলো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে থাকে। যাতে ওই সব বিশ্বাসগত বিষয়সমূহের জন্য জনগণ সন্তুষ্ট থাকে।

পাকিস্তান শাসনামলেও নজরুলকে ঢাকায় আনতে কয়েকবার চেষ্টা করা হলেও তা নানা কারণে সফল হয়নি। কারণ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নজরুল একটি রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে অমীমাংসিত ছিল। তাছাড়া, নজরুলকে পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলমানদের প্রধান কবি করার প্রচেষ্টা থাকলেও এতে সকলের মত ছিল না। যারা নজরুল-সাহিত্য ও চেতনার অখণ্ড বিকাশ চাইতেন তারা সর্বদা এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে ছিলেন, আবার অনেকেরই খায়েশ ছিল পাকিস্তানি তমুদ্দুনের প্রধান কবি হবার; তাই নজরুল এদেশে আসলে তাদের গুড়ে বালি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। যদিও নজরুল তার অনেক আগেই নীরব নির্বাক হয়ে গেছেন; তবু নজরুল-চেতনা ও বাণী বাঙালি মনে এতই জাগ্রত যে তার কোথাও মালিন্য লাগেনি। নজরুল যে সব আনুষাঙ্গিক বিষয়ে বাণীরূপ দিয়েছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা সবকালে সমান জাগরুক। নজরুলের বাণীর উচ্চকণ্ঠকতা শাসক ও উচ্চবিত্তের শান্তিভঙ্গের কারণ হলেও সাধারণ মেহনতি মানুষের মুখপাত্র হিসাবে তার একক প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

নজরুল ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে মৌল সাযুজ্যের ধরনটা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। এই দুই মহাপুরুষই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পরাধীন ভারতবর্ষের বাংলাভাষী অঞ্চলে। নজরুল-জন্মের প্রায় বিশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বয়সের দূরত্ব থাকলেও একই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের জন্ম হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর জন্মের মাত্র কিছুদিন আগে বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে দেয়ার পরে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম তল্পিতল্পা নিয়ে বন্ধু মুজফ্ফর আহ্মদ এর আশ্রয়ে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের অফিসে চলে আসেন। এই যুদ্ধ-ফেরতা কবির জীবন-জগত সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল, তা একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষয়ীষ্ণু একটি মুসলিম পরিবারে জন্ম, শৈশবে পিতৃহারা, মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ, লেটোদলের কবিয়াল; সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্যের আশ্রয়ে থেকে স্কুলে পড়ার কারণে নিজের দেশ সম্বন্ধে একটি সাম্যক জ্ঞান তৈরি হয়েছিল বিদ্রোহী কবির। নজরুল সারা-জীবনে এককটি বিষয় উপলব্ধি

করেছিলেন- ভারতবর্ষ থেকে বিদেশি শাসন বিতাড়িত না হলে এ দেশের মানবিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সুদূর পরাহত। ইংরেজরা কেবল ছলে-বলে কৌশলে এ দেশের শাসন ক্ষমতাই গ্রহণ করেনি, তারা ঔপনিবেশিক ব্যবসায় ও লুটতরাজের দ্বারা সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত করে তুলেছিল খুব অল্প দিনের মধ্যে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র বছর দশেকের মধ্যে এ দেশ ইতিহাসের এক ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। বাংলায় ১১৭৬ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিষ্টিয় সালের এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে এক কোটি লোক মারা যায়, যা তৎকালীন জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। এই দুর্ভিক্ষের সময় কোম্পানির লোকজন মৃত মানুষদের করও আদায় করেছিল- জীবিত মানুষদের কাছ থেকে। এই কুখ্যাত কর আদায় ইতিহাসে 'নাজাই কর' নামে পরিচিত।

ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ একটি দরিদ্রতম দেশে পরিণত হয়। আর উপনিবেশবাদিরা তাদের শাসন জিইয়ে রাখার জন্য নানা রকম ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিতেন। তার একটি- এ দেশের মানুষের মধ্যে ধর্মগত বিভেদ সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা। ব্রিটিশের এই শাসন নীতিকে বলা হয়, বিভেদ করো শাসন করো। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল ভারতবর্ষের মানুষের একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য; ইংরেজ শাসনের দ্বারা সেই চরিত্র কলুষিত হয়ে পড়ে। পরিণামে একটি দেশের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠী আলাদা হয়ে পড়ে; অথচ হাজার হাজার বছর ধরে এটিই ছিল তাদের দেশ। নজরুল তার জীবন থেকে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই পরদেশি শাসকরা এদেশ থেকে না গেলে এ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি ঘটবে না। তাই নজরুল জীবনে আমরা কখনো এই বিচ্যুতি লক্ষ্য করি না যে, নজরুল ইংরেজ শাসনের ব্যাপারে কোনো শর্তে আপোষ করেছেন। পল্টন থেকে ফিরে আসার পরে সরকারি চাকরির সুযোগ নিয়ে তিনি সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারতেন। কিন্তু সে পথে না গিয়ে তার লেখনির মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সেই বিপ্লবের অগ্নিখরার দিনে নজরুলই বিপ্লবীদের মুখে বাণী দিয়েছিলেন। তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে নজরুলের গান গাওয়া হবে,– কারাগারেও আমরা তার গান গাইব।'

নজরুলের লেখালেখির উত্তুঙ্গপর্বে ভাবি বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। আর একই বছরে নজরুলের 'খেয়াপাড়ের তরণী' 'কোরবাণী'সহ বহু কবিতা মোহিতলাল

মজুমদারের মতো সাহিত্য-সুহৃদদের হৃদয় আকর্ষণ করছে। আর এই বছরেই শেরে-বাংলা এ. কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে এবং নজরুল ও তার বন্ধু মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' এর প্রকাশ হচ্ছে। আর এই হলো বাঙালি মুসলমানের নবযুগের সূচনা। এই সূচনা পর্বেই বঙ্গবন্ধুর আবির্ভাব; তার চলার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন, শেরে বাংলা, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী ও নজরুলের মতো পূর্বসূরিরা। তাকে আর পিছন ফিরতে হয়নি। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে যাবতীয় শৃঙ্খল মুক্তির বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। নজরুল মানসে যেমন স্বাদেশিকতা, ধর্ম নিরপেক্ষকতা, শোষণ ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তেমনি বঙ্গবন্ধুর মানস-গঠন ও কর্মের প্রেরণায় ছিল এ ধরনের মূল্যবোধ।

বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৪০ সালের দিকে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হলেন, তখনো নজরুলের সক্রিয় সাহিত্য রচনার কাল। এই সময় থেকেই বঙ্গবন্ধু সর্ব-ভারতীয় মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে চলে আসেন; এবং পূর্বতন নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় তিনি তার পূর্বসূরি নেতাদের মতো মুসলিম লীগের বিভাজিত রাজনীতিতে অংশ নিলেও নজরুল কিন্তু তার কবিত্বের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মের নামে বিভাজিত রাষ্ট্র মুসলমানদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না; এবং তাই তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকে শুরু থেকেই সমর্থন করতে পারেননি। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকে 'ফাঁকিস্তান' বলেও স্যাটায়ার করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত বিভাজিত করে মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা জোরালো ছিল না। কারণ, অখণ্ড ভারতবর্ষই তো ছিল, হিন্দু ও মুসলমানের দেশ। ঔপনিবেশিক শাসনের আগে যদি তারা একত্রে বসবাস করতে পারে তাহলে বিভাজন-নীতির হোতারা চলে গেলে কেন একত্রে বসবাস করতে পারবে না। তাছাড়া মুসলমানদের কাছ থেকেই তো ইংরেজরা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, তাহলে খণ্ডিত ভারতের দায়িত্ব নিয়ে তারা কিভাবে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। তাছাড়া সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে মুসলমানরা যদি অখণ্ড ভারতের নাগরিক থাকতেন তাহলে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারত। পরিণামে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষাই অধিক হতো বলে মনে করা যায়। উপরন্তু পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠনের দ্বারা যে ক্ষুদ্র অংশের মালিক তারা হয়েছে, তারচেয়ে অধিক সংখ্যক মুসলমান হিন্দু ভারতে বসবাস করেন, চাইলেই তাদের পাকিস্তানে আশ্রয় দেয়া সম্ভব নয়। এই বাস্তবতা

নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন। সারা জীবন যিনি ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য লড়াই করেছেন তিনি কিভাবে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভাজন মেনে নেবেন! নজরুল জানতেন, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনের পরিকল্পনা ইংরেজের সর্বশেষ চাল; যার দ্বারা ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরেও তারা এ দেশ থেকে সুবিধা আদায় করতে পারবেন। ভারত বিভাজনের ফলে প্রত্যক্ষ দুজন মানুষের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার সুযোগ ঘটেছিল, তার একজন নেহেরু আর অন্যজন জিন্নাহ; আর পরোক্ষ লাভ হয়েছিল উপনিবেশবাদিদের। জনগণ এর দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদি কোনো সুফল পেয়েছে কিনা, তা প্রমাণ করা সহজ নয়।

তাই নজরুল তার সক্রিয় সাহিত্য রচনার শেষের দিকে ১৯৪২ সালের দিকে লিখছেন, 'বাঙালির বাঙলা'। নজরুল সেই রচনায় বলছেন, 'বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে– 'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তি এশিয়া কেন, বুঝি পৃথিবীর কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে।' ভারত বিভাগের মাত্র পাঁচ বছর আগে নজরুলের এই যুক্তি কিসের ইঙ্গিত বহন করে? তিনি তো আসলে ওই সময়ে অখণ্ড বাংলার স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন, যেটি তৎকালীন কর্মবিমুখ নেতারা বুঝতে চেষ্টা করেননি। নজরুল সে সময়ে বাঙালি জাতিকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন, জাগিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন, ইংরেজ দানবের বিদায়ের পরে যেন নতুন কোনো অসুরের জন্ম না হয়। তিনি বলছেন, 'এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য! খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে তাকে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে বিনাশ করবো সংহার করবো।' নজরুল কি সেদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, আসলে কি হতে যাচ্ছে; বাঙালি বাংলা কি আবার কোনো দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে। তিনি এই রচনায়, বাংলা অঞ্চলকে বাংলাদেশ হিসাবে উল্লেখ করছেন, এর আগে যার বিরল উদাহরণ রয়েছে। এর দুই দশক পরেও যখন কবিরা 'আমার পূর্ববাংলা' লিখছেন তখন নজরুল অখণ্ড ভারতবর্ষে বঙ্গকে বাংলাদেশ হিসাবে উল্লেখ করছেন। বাঙালির বাঙালিত্ব যে আবার কোনো ষড়যন্ত্রে বিনাশ হতে পারে, তার জন্য তিনি অভয়মন্ত্র রচনা করছেন। 'বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই একমন্ত্র শেখাও :

'এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালি– আমাদের।
দিয়ে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।'
বাঙলা বাঙালির হোক! বাঙলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক।'

নজরুল কি সত্যিই সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন বাংলা বাঙালির থাকছে না। 'রামা'দের আর 'গামা'দের বলতেই বা নজরুল কি বুঝিয়েছেন। কে জানতো এই মন্ত্রই একদিন বাঙালির মুক্তির মন্ত্র হয়ে উঠবে। এই 'জয়বাংলা'ই হয়ে উঠবে সেই মুক্তির স্লোগান! বঙ্গবন্ধুর স্লোগান। কিন্তু সেদিনের মুসলিম লীগের ক্ষমতাভাগী নেতাদের কাছে নজরুলের এই আর্তির কোনো মূল্য ছিল না। আর বঙ্গবন্ধু নেতা হিসাবে সেদিন এতই তরুণ যে প্রবীণ নেতাদের বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। বাংলা আর বাঙালির ব্যাপারে নজরুলের এই অবস্থান সেদিন, মুসলিম বিভাজিত নেতারাও ভালো চোখে দেখেননি; তার প্রমাণ নজরুল যখন ১৯৪৩ সালে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, কেউ তার স্বাস্থ্য উদ্ধারে এগিয়ে আসছেন না; এমনকি সোহরাওয়ার্দীর কাছে তার জন্য সহায়তা চাওয়া হলে তিনিও কবির প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেন। যে কবিকে তাদের বশংবদ হিসাবে কাজে লাগে না, সে যতবড় কবিই হোক না কেন, তাকে কে পুছবে। বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশেও এই নীতির ব্যত্যয় হয়নি। সেই কবিদেরই কেবল রাষ্ট্রীয় মূল্য রয়েছে, যারা নেতার ইচ্ছেকে কাব্যে রূপদান করেন; বাঙালি বা বাংলাদেশের স্বার্থের চেয়ে নেতার ইচ্ছে তাদের কাব্য-রচনার দুর্মতি। এখনকার প্রধান কবিদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৪০ সালে বঙ্গবন্ধু যখন কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান, তখন নজরুল কোলকাতা বেতারের ব্যস্ততম ব্যক্তিত্ব। তার গান কবিতায় তখনো দেশ উত্তাল; এই সময়ে নজরুলের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সরাসরি দেখা হয়েছিল কিনা, তার তথ্য আপাতত আমাদের কাছে নেই; নিঃসন্দেহে হয়ে থাকবে বলে মনে হয়; কারণ তখনো বঙ্গবন্ধু তরুণতম নেতা হওয়ার কারণে আমাদের কাছে তথ্যের হয়তো ঘাটতি রয়েছে। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে নজরুল সুস্থ অবস্থায় সর্বশেষ ঢাকায় আসেন, ঢাকা বেতারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। তারপর অনেকদিন নজরুল অধ্যায়ের ওপর কিছুটা যবনিকা পড়তে থাকে। তার কারণ,

নজরুল ১৯৪২ সালের পরে তিনি যখন অসুস্থ ও বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তখন দেশ বিভাগের ডামাডোল নিয়ে নেতা-জনতা সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অসুস্থ নজরুলের খোঁজ-খবর রাখা কারো পক্ষে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্ভব হয়নি। বলা চলে এ-সময়ে নজরুলের চিকিৎসা তেমন কিছু হয়নি। তবে দেশ বিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকার নজরুলের চিকিৎসার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারপরেও সুযোগ-সুবিধা অভাবে অসুস্থ নজরুল কোলকাতার ঘুপচি গলিতে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকেন।

এ সময়ে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে নজরুলের জন্য কিছুই করা হয়নি, বা সম্ভব হয়নি; নজরুলের অসুস্থতার প্রায় তিন দশকের মধ্যে ব্যক্তি নজরুল বা সাহিত্যের নজরুলের সঙ্গে পাকিস্তানি নেতা-জনতার সঠিক সম্পর্ক ছিল তা বলা যাবে না। তবে অখণ্ড নজরুল চর্চার উদ্যোগ যে একেবারে ছিল না তা কিন্তু নয়। কারণ, এদেশের সাধারণ মানুষের নজরুলের প্রতি ভালোবাসা এবং আবেগের কর্মময় রূপ ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি দশা থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় এসেই নজরুলের খোঁজ-খবর নেন। এমনকি কথিত আছে, স্বাধীন বাংলাদেশে যখন কৃতীত্ব অনুযায়ী খেলাত বন্টন হয়ে গেছে, তখন বঙ্গবন্ধু নাকি তার অনুগামী নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোরা আমার বিদ্রোহী কবির জন্য কি রেখেছিস? তিনি কবির রচিত 'চল চল চল' গানকে রণসঙ্গীতের মর্যাদা দেন। কারণ বঙ্গবন্ধুর মনে সদা এই সত্য জাগ্রত ছিল যে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রেরণা প্রাণে ধারণের ফলে আমাদের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছে। তাছাড়া সেই সময়েই এই গানটির মধ্যে সত্য লুকিয়ে আছে, 'বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের সে তো নাই কো শেষ।' অর্থাৎ বাংলাদেশের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা ও উদগাতা যে কাজী নজরুল ইসলাম সে কথা বঙ্গবন্ধুর চেয়ে আর কেউ ভালো করে বোঝেননি। তাই তিনি বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে কবির তিয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে বাংলাদেশে আনার উদ্যোগ নিলেন।

নজরুল পরিবারের সঙ্গে শেখ কামালের যোগাযোগের পরে বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করলেন, নজরুলকে বাংলাদেশে পাঠানোর অনুমতি দানের জন্য। অসুস্থ নজরুলকে বাংলাদেশে পাঠানো ভারতের জন্যও খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল না; কারণ নজরুল যতই অসুস্থ ও অবহেলায় থাক না কেন সে তো সে দেশের সম্পদ। শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক ও স্বাধীন

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনা করে ইন্দিরা গান্ধী রাজি হয়েছিলেন যে, জন্মজয়ন্তীর পরে নজরুলকে আবার ভারতে ফেরত পাঠানো হবে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ সালের ২৪ মে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্ল্যাইটে নজরুলকে ঢাকায় আনা হয়। এদিন ছিল এ দেশের মানুষের জন্য এক স্মরণীয় ঘটনা; তাদের প্রাণের কবি, স্বাধীনতার কবি তাদের মধ্যে উপস্থিত।

বক্ষ্যমান লেখকের 'তুমি শুনিতে চেয়ো না' নজরুল জীবনভিত্তিক উপন্যাসে কাজী নজরুল ইসলামের ঢাকায় আগমন বিষয়ক একটি অংশ তুলে দেয়া হলো : 'এখানে আমার কবরের বিষয়টি বলা চলে– সেদিনই নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল, যেদিন আমি বাংলাদেশের মাটিতে পা দিয়েছিলাম। শেখ মুস্তাফা কামাল যেদিন আমার ক্রিস্টোফার রোডের বাসায় গিয়ে সব্যসাচীকে প্রস্তাব দিল– তারা আমায় তাদের স্বাধীন দেশে নিয়ে যেতে চায়।

কামাল বলেছিল, 'কবির চির স্বপ্ন ছিল যে স্বাধীনতার, যে ধর্ম নিরপেক্ষতার– বাংলাদেশের বাঙালিরা তা অর্জন করেছে। আজ আমার পিতা বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নজরুলের সেই চির কাঙ্ক্ষিত দেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমি তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি। সেই দেশে কবির যাওয়া একান্ত জরুরী। সে দেশের কোটি কোটি মানুষ কবিকে সশরীরে একটু দেখতে চায়। আমার পিতারও অভিপ্রায়– স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার কবিকে নিয়ে তার প্রথম জন্মদিন পালিত হোক।'

শেখ কামাল বলেছিল, 'বাংলাদেশ নামটিও তো এসেছে কবির লেখা থেকে। কাজী নজরুলের আগে বাংলাদেশ শব্দটি কেউ আগে এভাবে বলেননি। সেই দেশ আজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে; কবিকে আমরা সেখানে পেতে চাই।' সব্যসাচী অবশ্য বলেছিল, 'বঙ্গভঙ্গের সময় কবিগুরু একটা গানে বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।'

শেখ কামাল বলেছিল, 'তা ঠিক। বিদ্রোহী কবির কথায়- 'বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে– 'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তি এশিয়া কেন, বুঝি পৃথিবীর কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্মশক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে।' নিজ জাতি সম্বন্ধে এমন আত্ম-বিশ্বাস আর কোন কবির ছিল না।'

কামাল বলেছিল, 'বিদ্রোহী কবির "নম নম নম বাংলাদেশ মম" গানটি দেশ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর আগে লেখেন। তাছাড়া "বাঙলা বাঙালির হোক! বাঙলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক।" - এ থেকে জয়বাংলা স্লোগান সেদিন বাঙালির মুক্তির স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। আমারাও সেদিন গেয়েছিলাম, 'বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ।'

সেদিন সব্যসাচীকে শেখ কামাল আরো কিছু কথা বলেছিল। যেমন আমার চরিত্রের সঙ্গে শেখ মুজিবের চরিত্রের অনেকটা মিল আছে। আমার মানসলোকে যে স্বপ্ন উজ্জীবিত হয়েছিল, আমার লেখায় যেমন প্রকাশ পেয়েছিল, বাঙালিদের জন্য সে-রকম উপনিবেশ মুক্ত শোষণ মুক্ত একটি দেশ প্রতিষ্ঠা ছিল তার স্বপ্ন।

তবে শেখ কামাল এক অদ্ভুত কথা বলেছিল। আমার প্রথম ছেলে কৃষ্ণ-মুহম্মদ, যার আসল নাম আজাদ কামাল। এই নামটিই আমার পছন্দের ছিল। তুর্কি বীর কামাল পাশা আমার মনে স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। আমার স্বপ্ন তখন 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।' কামাল পাশা কবিতার মধ্যে আমি আমার প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছিলাম। কামাল বলেছিল, 'আমার নামও রাখা হয়েছিল স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে মুস্তাফা কামাল। আমার পিতাও নব্য তুর্কি কামালের ভক্ত ছিলেন।'

আরো বলেছিল, 'নিনির মতো কামালও সেতার বাজনায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে।' একজন রাজনীতিকের সন্তান, নিজেও সৈনিক আবার সুর ও সঙ্গীতের চর্চা করছে– এসব জেনে আমার মন ভরে গিয়েছিল। সব্যসাচীকে কামাল বলেছিল, 'আমার বাবা মাঠের কবি আর আপনার বাবা কবিতার কবি।'

শেখ কামালের বলিষ্ঠ উপস্থাপনা আর অকাট্য যুক্তির কাছে সব্যসাচী কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, নজরুল তার পিতা হলেও সে বাঙালি জাতির; আর সেই জাতি যদিও রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে বিভক্ত, তবু তাকে পাওয়ার সবারই হক আছে। সব্যসাচী বলেছিল, 'ভারত সরকার অনুমতি দিলে, আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।' শেখ মুজিব ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।'

স্বাধীন বাংলাদেশে কিভাবে নজরুলকে ছাড়া স্বাধীনতার উৎসব সম্পন্ন হয়! হাজার হাজার লোক সেদিন মিছিল করে বিমানবন্দর থেকে নজরুলকে ধানমন্ডি ২৮ নম্বরে কবি ভবনে নিয়ে আসেন। ওই দিনই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সশরীরে কবিভবনে বিদ্রোহী কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে যান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কবির জন্য মাসিক এক হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। তিনি ডেপুটি সেক্রেটারি পদের একজন কর্মকর্তাকে এই দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত করেন। কবিকে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করা হয়। কবিভবনে প্রতিদিন জাতীয় পতাকাকে উড্ডীনের ব্যবস্থা রাখা হয়। পরের দিন নজরুলের জন্মদিনে মানুষের ঢল নামে; হাজার হাজার মানুষ কবিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কবিভবনে গমন করে। এখানে কবির যত্নে ও চিকিৎসার সর্বোত্তম ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘদিন অসুস্থ ও অযত্নে কবির পিঠে ও কোমরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কবিভবনে উন্নত চিকিৎসা ও পরিচর্যার ফলে কবির স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর সম্মান-সূচক ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। সম্মাননা পত্রে বলা হয়, 'দেশকালের জরা-শোক-অবক্ষয়-অন্ধকারকে নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে প্রজ্জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার, আনন্দের, সংগ্রামের আলোকিত চেতনাকে যাঁরা বিশ্বলোকে পৌঁছে দিতে সক্ষম, তারাই মহৎ। তেমনি এক মহত প্রতিভা আপনি, কাজী নজরুল ইসলাম।'

নজরুলের বাণী ও প্রেরণা যে বঙ্গবন্ধুর জীবনে আলোকবর্তিকা হিসাবে দেখা দিয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর কর্মের মাধ্যমে তার প্রকাশ সম্পন্ন হয়েছে। নজরুল স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিদেশী শোষণমুক্ত একটি স্বাধীন বাঙালি জাতির, বঙ্গবন্ধু কর্মের মাধ্যমে তার রূপদান করেছিলেন। হটিয়ে দিয়েছিলেন, পাকিস্তানি দুঃশাসনকে। তাই একই বৃত্তে এই দুই মহান ব্যক্তির অবস্থান বাঙালির জাতির ইতিহাসে সবকালে সমানভাবে প্রজ্জ্বলিত থাকবে। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, বাইরের শাসন-শোষণমুক্ত হলেই, শোষিত-নিপীড়িত মানুষের পক্ষের আন্দোলন শেষ হয়ে যায় না। দেশি শাসকরাও অনেক সময় বিদেশি শাসকদের মতো শোষণ-শাসনে অবতীর্ণ হয়, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোও নজরুল ও বঙ্গবন্ধুর চেতনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ; আর আমরা যদি তা ভুলে যাই তাহলে মনে রাখতে হবে, তাদের শিক্ষা আর আমাদের ওপর কাজ করছে না।

কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বঙ্গবন্ধু একটাই শ্রদ্ধা করতেন যে, অসুস্থ নজরুলকে দেখতে গিয়ে তিনি তার বিছানায় কিংবা চেয়ারে পর্যন্ত বসতেন না। বাংলাদেশের জাতির পিতা হাসপাতালের মেঝেতে বসে অসুস্থ কবির খোঁজখবর নেয়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সর্বকালের সেরা এই দুই মহান মানুষের কর্ম ও শিক্ষা হোক আমাদের প্রেরণার উৎস।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার ৯০ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ-ভারত যৌথ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে বলেছিলেন, "বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল এবং বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানসিকতার দিক থেকে সমান্তরাল অবস্থানে রয়েছেন। তিনি অনুষ্ঠানে আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছা ছিল শোষণহীন বাংলাদেশ গড়া। নজরুলও চেয়েছেন বঞ্চনাহীন, অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়তে। দুজনের স্বপ্ন ছিল এক ও অভিন্ন। দুজনই ছিলেন বিদ্রোহী। একজন সাহিত্যে, অন্যজন রাজনীতিতে। এজন্য একজনকে বলা হয় 'পোয়েট অব লিটারেচার', অন্যজনকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স'।"

নজরুল ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আরো একটি বক্তব্য পাওয়া যায় অন্য এক অনুষ্ঠানে। পশ্চিমবঙ্গের কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৮ সালের বিশেষ সমাবর্তনে বঙ্গবন্ধুতনয়া শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন দেশের শোষণপীড়িত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম-আন্দোলন করেছেন, কারাবরণ করেছেন, আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, ঠিক তেমনি নজরুলও শোষিত-বঞ্চিত মানুষের কথা লেখনীর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। আর এ কারণেই কারাবরণ করতে হয়েছে। তাই একদিকে বাংলা সাহিত্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, তেমনি অন্যদিকে রাজনীতির কবি শেখ মুজিবুর রহমান।'

বঙ্গবন্ধু নজরুলের চেয়ে ২০ বছর ৯ মাস ২৩ দিনের ছোট। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন নজরুল তখন সৈনিক কবি। সেখান থেকেই নিয়মিত লেখা পাঠাতেন 'মোহাম্মদী' ও 'সওগাত' পত্রিকায়। এ দুটি পত্রিকাই বঙ্গবন্ধুর পিতা তাঁদের বাড়িতে রাখতেন। কাজেই পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই বঙ্গবন্ধু নজরুলকে জেনেছেন-চিনেছেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম ব্রিটিশ আমলে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। এই বৃহত্তর ফরিদপুর শহরে নজরুল ৭ বার আগমন করেন। তাঁর এই আগমন ছিল কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান, মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান, নিজের নির্বাচনী প্রচারের কাজে, কৃষি-শিল্প সংস্কৃতি সম্মেলনের অতিথি হিসেবে, জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে যোগদান, ফরিদপুর সংসদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের ছাত্র সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে। এই শেষ সফরে বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে নজরুলের সংস্পর্শে আসেন।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে' তিনি লিখেছেন— 'একটা ঘটনার দিন-তারিখ আমার মনে নাই, ১৯৪১ সালের মধ্যেই হবে। (আসল তারিখ ১২ আগস্ট ১৯৪১ খ্রি.) ফরিদপুর ছাত্রলীগের জেলা কনফারেন্সে শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁরা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ূন কবীর, ইব্রাহীম খাঁ সাহেব। সে সভা আমাদের করতে দিল না। ১৪৪ ধারা জারি করল। কনফারেন্স করলাম হুমায়ূন কবীর সাহেবের বাড়িতে। কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব গান শোনালেন।...

বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের শেষাংশে যে 'জয় বাংলা' স্লোগান ব্যবহার করেন, তা আক্ষরিক অর্থে নজরুলই প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতায়। আগস্ট ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ভাঙার গান' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। মাত্র কয়েক মাস পরে ১১ নভেম্বর গ্রন্থটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। কারণ কবিতাটির পরতে-পরতে ছিল বাঙালির মুক্তির ইঙ্গিত-বিজয়ের ইঙ্গিত।

পূর্ণ অভিনন্দন
জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আজি-অন্তরীণ!
জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন!

এক অভিন্ন চিন্তাচেতনা ও স্বপ্নের নায়ক ছিলেন নজরুল ও বঙ্গবন্ধু। জাতি-ধর্ম ভেদাভেদের বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন এই দুই মহান নেতা।

বিদ্রোহী কবি উচ্চারণ করেন-
'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান/
মুসলিম তার নয়ন-মণি হিন্দু তাহার প্রাণ।
বঙ্গবন্ধু বলেন—

'বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।' বিদ্রোহী কবি ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত-জুবিলি অনুষ্ঠানের ভাষণে বলেন, 'বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি।' বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চে ভাষণে বলেন— 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, মানুষের অধিকার চাই।'

বিদ্রোহী কবি 'বিদ্রোহী' কবিতার শেষাংশে বলেন, 'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না/বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত/আমি সেইদিন হব শান্ত।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে লড়াইয়ের ডাক দিয়ে বলেন– 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বাংলা-বাঙালি নিয়ে দুই মানবতাবাদীর সমউচ্চারণ- বঙ্গবন্ধু বলেন 'জয় বাংলা।' বিদ্রোহী কবি বলেন, 'বাঙলার জয় হোক।'

১৯৭২ সালের ২৪ মে কবি নজরুলকে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকা আনেন। সেদিনই তিনি তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুননেছাসহ কবিকে দেখতে যান। বঙ্গবন্ধু গভীর শ্রদ্ধাভরে কবিকে পুষ্পমালা পরিয়ে দেন এবং পরম মমতায় বারবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু কবির জন্য ধানমন্ডির একটি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন, মাসিক এক হাজার টাকা ভাতা প্রদানসহ চিকিৎসার জন্য মেডিকেল টিম গঠন করে দেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে বিদ্রোহী কবির ৭৩তম জন্মবার্ষিকী ঢাকাসহ সারাদেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। নজরুল একাডেমি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কবিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে 'বাণী' পাঠিয়ে দেন। বাণীর একটি বাক্যে লেখেন 'নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালির স্বাধীন ঐতিহাসিক সত্তার রূপকার।'

সদ্য স্বাধীন দেশের প্রথম মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বঙ্গবন্ধু নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' গানটিকে বাংলাদেশের রণসংগীতের মর্যাদা দেন। ২০২১ সাল নজরুল ও বঙ্গবন্ধুর জীবনের এক বড় মাইলফলক। কারণ এ বছর ৬ জানুয়ারি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্মশতবর্ষ এবং ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ। নজরুলের কাঙ্ক্ষিত খাঁটি বিদ্রোহী বঙ্গবন্ধু, যিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের দেশের অধিকার আদায় করেছিলেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক ফ্রাঁঞ্জ ফাঁনো বলেছেন, 'বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের গুলি করার মধ্য দিয়ে একজন বিদ্রোহী প্রথম নিজের মাটির স্পর্শ পায়।'

অন্যদিকে 'আগস্ট' মাস সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য হারানোর মাস, কষ্টের মাস, শোকের মাস, কারণ এ মাসেই বঙ্গবন্ধু ও বিদ্রোহী কবি- দুই মহান মানুষের মহাপ্রয়াণ ঘটে। একজন ১৫ আগস্ট ও আরেকজন ২৯ আগস্ট।

বঙ্গবন্ধু বিদ্রোহ কবির দুই দশক পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু দুষ্কৃতিকারীদের আঘাতে সপরিবারে তাঁর আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

কবিতায় উৎকীর্ণ বঙ্গবন্ধুর মুখ

আমার বোনের বাড়িতে পৌঁছালাম, একদিন দুই দিন করে সাত দিন সেখানে রইলাম। ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটু বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবু তো যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়ামায়া করে লাভ কি? –(অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সমার্থক হয়েছিলেন, এখনো তাই। একটি থেকে আরেকটি আলাদা করার উপায় নেই। তিনি পাকিস্তানের প্রায় তেইশ বছর ধরে এদেশের মানুষকে তিলে তিলে স্বাধিকার আন্দোলনে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। এদেশের মানুষ জানত দেশের স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষকে একদিন চূড়ান্ত লড়াই করতে হবে। বলা চলে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের পর থেকে চূড়ান্ত লড়াইয়ের মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র, গণ অভ্যুত্থান সে-সব ছিল মূলত স্বাধিকারের সমর দ্বৈরত। নির্বাচনী নিরঙ্কুশ জয়ী হওয়ার পরেও বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা অর্পণ না করার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল পাকিস্তানের হীন মানসিকতা ও ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল মূলত সর্বাধিনায়কের যুদ্ধের নির্দেশ। এতকাল তিনি নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম করে আসছিলেন। এবার তিনি বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বললেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।' ৭ মার্চের ভাষণে যুদ্ধ ঘোষণার প্রায় সব উপাদান উপস্থিত ছিল।

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্রে রেখে লেখা হয়েছে পৃথিবীর সর্বাধিক কবিতা। হয়েছে অসংখ্য কবিতা সংকলন। অনেকে লিখেছেন একাধিক কাব্যগ্রন্থ।

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর কবিতা বলতে কেবল তথাকথিত শহুরে কবিদের কবিতা বোঝা উচিত হবে না। তেইশ বছরের পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিককালে অনেক কবি লিখেছেন অনেক কবিতা। মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কবি তাঁকে নিয়ে কালজয়ী কবিতা লিখেছেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ কালপর্বে লিখিত কবিতা; ১৯৭৫ পরবর্তী কবিতা। এছাড়া লোক-কবিতা, চারণ কবিতা, হাটুরে কবিতায় বঙ্গবন্ধুর গুণ কীর্তন করা করেছেন গ্রাম বাংলার অসংখ্য লোক কবি।

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলা একাডেমি থেকে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে সংকলন প্রকাশের সংখ্যা কম নয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরে প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৮ সালে- 'এ লাশ আমরা রাখব কোথায়?' কথাসাহিত্যিকগণও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাদের মধ্যে শওকত ওসমান, মাহমুদুল হক, সেলিনা হোসেন, রাহাত খান প্রমুখ। বাংলাদেশের কবিদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের কবিরাও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, জগদীশ চক্রবর্তী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণীষ ঘটক, সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিনোদ বেরা প্রমুখ। উর্দু কবিদের মধ্যে কাইফি আজমি, নওশাদ নূরী প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কবিতা লিখে কারাবন্দি হন আরেক পাঞ্জাবি কবি আহমেদ সালিম। লাহোর ডিস্ট্রিক জেলে বসে লেখা তাঁর 'সিরাজউদ্দৌলা ধোলা' কবিতাটি তিনি উৎসর্গ করেন শেখ মুজিবুর রহমানকে। বলা হয়ে থাকে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মরদেহ সমাধিস্থ করার পর তাঁর বাল্যবন্ধু মৌলভী শেখ আবদুল হালিম গভীর মনোবেদনা থেকে আরবি ভাষায় রচনা করেন একটি কবিতা। তিনি কবিতায় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবি করেছিলেন। যদিও অনেক পরে আমরা তা জানতে পেরেছি।

একক কবি হিসাবে বঙ্গবন্ধুকে কবিতা লেখায় গুণে ও মানে এবং সংখ্যার অধিক্যে যাঁদের নাম উল্লেখ হয়ে থাকে তাদের মধ্যে নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, মুহম্মদ নূরুল হুদা, আসাদ চৌধুরী, অসীম সাহা, কামাল চৌধুরী, জাফর ওয়াজেদ প্রমুখ। শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক সংখ্যার আধিক্য না হলেও মানসম্পন্ন কবিতা লিখেছেন। ছড়া কবিতা রচনার ক্ষেত্রে লুৎফর রহমান রিটন, আমীরুল ইসলাম ও আসলাম সানীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলা একাডেমির 'বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা' গ্রন্থে যাদের কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে : জসীম উদ্‌দীন (বঙ্গবন্ধু)' সুফিয়া কামাল (মুজিবের জন্মদিনে); সিকান্দার আবু জাফর (ফিরে আসছেন শেখ মুজিব); আবুল হোসেন (জাতির পিতা তিনি); মাহবুব উল আলম চৌধুরী (গরাদভাঙার সংগ্রামীরা জাগো); আবদুস সাত্তার (একটি অমিয় নাম); জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (রাত্রির তৃতীয় যামে); মযহারুল ইসলাম (একটি সূর্য্যের হাত ধরে); শামসুর রাহমান (ইলেকট্রার গান); হাসান হাফিজুর রহমান (একান্ত মানচিত্র বাংলার); কায়সুল হক (তিনি এবং আমাদের স্বপ্ন); আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী (বঙ্গবন্ধু); সৈয়দ শামসুল হক (প্রয়াত পিতার উদ্দেশে খেদ ও শোকসূচক একটি রচনা); মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গবন্ধু); দিলওয়ার (শেখ মুজিবুর রহমান); বেলাল চৌধুরী (বত্রিশ নম্বর); ফজলুল হক সরকার (সেই নদী থেকে জল নেবো); হায়াৎ মামুদ (মুজিবের এপিটাফ); খালেদ এদিব চৌধুরী (বাংলাদেশের হৃদয় হতে); ওমর আলী (মৃত্যুমাখা জন্মভূমি); মনজুরে মওলা (এই বাড়ি); ফজল-এ খোদা (তুমিই বাঙালি তুমিই বাংলা); অরুণাভ সরকার (মুছে দেবো সমস্ত শৈবাল); শামসুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধু); শহীদ কাদরী (হন্তারকদের প্রতি); সিকদার আমিনুল হক (তোমার অপেক্ষায় ছিল সবাই); রফিক আজাদ (এই সিঁড়ি); রবিউল হুসাইন (যেহেতু তিনি খুব বড়ো ধরনের মানুষও ছিলেন); আসাদ চৌধুরী (এ কেমন জন্মদিন); ফারুক আলমগীর (চার দশকের শোকগাথা); মোহাম্মদ রফিক (ব্যাঘ্র বিষয়ক); মহাদেব সাহা (আমি কি বলতে পেরেছিলাম); আবু কায়সার (সূর্যের অনল); নির্মলেন্দু গুণ (সেই রাত্রির কল্পকাহিনি); মাহমুদ আল জামান (একটি ভাস্কর্যের সামনে); তিতাশ চৌধুরী (তোমাকে অস্বীকার করবে কে?); রুবী রহমান (জাতির জনক); সানাউল হক খান (পঙক্তি পনেরো আগস্ট); নূহ-উল-আলম লেনিন (মুজিব মানেই বসন্ত-উৎসব); মাকিদ হায়দার (হৃদপুরে); মাহবুব সাদিক (হাজার বছর পরে বঙ্গবন্ধু); হাবীবুল্লাহ সিরাজী (আমি অপেক্ষা করছি); অসীম সাহা (তাঁর নিজস্ব গন্তব্যে); জাহিদুল হক (স্মৃতি); কাজী রোজী (কাঁদলেন একজন নিপাট মানুষ); মুহম্মদ নূরুল হুদা (অনন্ত মুজিব জন্ম); আলতাফ হোসেন (প্রিয় বঙ্গবন্ধু আমাদের); আবিদ আনোয়ার (তোমার রক্ত মাটিতে পড়েনি); আতাহার খান (চেয়ার); ময়ুখ চৌধুরী (অপরাধ ১৯৭৫); জরিনা আখতার (বঙ্গবন্ধুর নকশিকাঁথার মাঠ); রবীন্দ্র গোপ (বাঙালির অপর নাম); দাউদ হায়দার (মানচিত্র যখন শোকগ্রস্ত); শিহাব সরকার (পিতা); সুজাউদ্দিন কায়সার (হৃদমন্দিরে বঙ্গবন্ধু); মুজিবুল হক কবীর (মেঘনাদ কণ্ঠ); মাসুদুজ্জামান

(আত্মপরিচয়); ফারুক মাহমুদ (বাড়িটার মন ভালো নেই); বিমল গুহ (শেখ মুজিবের তর্জনী); শামীম আজাদ (যে তুমি আমার স্বাক্ষর); ইকবাল হাসান (আমাদের ক্ষমা করবেন পিতা); নাসির আহমেদ (তোমাকে চিনিনি বহুদিন); ত্রিদিব দস্তিদার (বাংলাদেশের হৃদয়-পতাকা কাঁদে); দিলারা হাফিজ (ছবি); কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় (পায় ফিরে ভূগোল ছেলেকে); জয়দুল হোসেন (কাঙ্ক্ষিত আকাঙ্ক্ষা); ইকবাল আজিজ (বঙ্গবন্ধুর ছায়া); আলমগীর রেজা চৌধুরী (টুঙ্গিপাড়া); সোহরাব হাসান (দশ বছর পর); হালিম আজাদ (তাঁর তর্জনীর গর্জনে); মোহাম্মদ সাদিক (বঙ্গবন্ধুর পাইপ); হাসান হাফিজ (দীপ্র বাতিঘর তুমি); অঞ্জনা সাহা (অবিনাশী আলো); গোলাম কিবরিয়া পিনু (বঙ্গবন্ধু); জাহিদ হায়দার (১৫ অগাস্ট); ফরিদ আহমদ দুলাল (মহানায়ক পিতার জন্য); সোহরাব পাশা (বঙ্গবন্ধু : বাংলাদেশ); কামাল চৌধুরী (টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে); মাহমুদ কামাল (বঙ্গবন্ধু আমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন); ওয়াহিদ রেজা (একটি গাছ); আসাদ মান্নান (বাঙালির বেহুলাবাসর); তুষার দাশ (বামন-গীতি); মুহাম্মদ সামাদ (শাপমুক্তি); আসলাম সানী (আমি প্রাচীন আর্য-দ্রাবিড় আমি বাঙালি); শাহাজাদী আঞ্জুমান আরা (পিতার মুখ); জাফর ওয়াজেদ (একটি মুজিব); সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (শুভ্র কাফন); অনীক মাহমুদ (পিতৃঋণ); ওমর কায়সার (ফিরে আসো বারবার); আবু হাসান শাহরিয়ার (নক্ষত্রমানব); ঝর্না রহমান (মানচিত্রের প্রাণপুরুষ); মিনার মনসুর, সুমন সরদার (এত ভার বয়ে যাই); মহীবুল আজিজ (সমাধিস্থ হওয়ার আগে); হাফিজ রশিদ খান (দীর্ঘদিন তোমাকে দেখি না, পিতা); জাহিদ মুস্তাফা (একজন শেখ মুজিব); সরকার মাসুদ (সিংহের জন্য প্রার্থনা); কামরুল হাসান (উদিত কৈশোর ক্রান্তিকালে); হারিসুল হক (প্রান্তরের গান); রহিমা আখতার কল্পনা (বঙ্গবন্ধুর মুখ); ফেরদৌস নাহার (সাদা পাঞ্জাবি. কালো ফ্রেমের চশমা); মারুফ রায়হান (টুঙ্গিপাড়া); খালেদ হামিদী (একমাত্র তুমিই পিতা); মারুফুল ইসলাম (অমরত্বের অন্য নাম); বদরুল হায়দার (পনেরো আগস্ট); সৈয়দ তারিক (সারথি); খালেদ হোসাইন (মুজিব, তোমাকে যারা ভালোবাসে); আমিনুর রহমান সুলতান (৭ই মার্চের তর্জনী); শিহাব শাহরিয়ার (বত্রিশের রক্তমাখা সিঁড়ি); তারিক সুজাত (আমি আমার আঁতুড়ঘরে পথ হারালাম); সুহিতা সুলতানা (বঙ্গবন্ধু); সাজজাদ আরেফিন (রূপকথার গল্প); আসিফ নূর (কালো ব্যাজ খুলে ফেললা); অনিকেত শামীম (তর্জনীর স্পর্ধিত অহংকার); মজিদ মাহমুদ (ঠিকানা); শামসুল আরেফিন (জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু); মতিন রায়হান (ও জাদুকর বাঁশিওয়ালা); সরকার আমিন (হাইফেনের ফাকে); তপন বাগচী

(জেগে থাকে টুঙ্গিপাড়া); মাহবুব কবির (হ্যালো); বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (আশ্চর্য পুনরুজ্জীবন); মিহির মুসাকী (৭ই মার্চের ভাষণের মানে); মুজিব মেহেদী (কোথাও বিকল্প নাই); শাহ্নাজ মুন্নী (বঙ্গবন্ধু); রহমান হেনরী (সদা বিদ্যমান); শান্তা মারিয়া (এক দ্রাবিড় পুরুষ); শাহেদ কায়েস (মধুমতীর খোকা); আলফ্রেড খোকন (ইতিহাসের কেন এত পিপাসা); শামীম রেজা (বঙ্গবন্ধু নাকি মানচিত্র বাংলার); অলকা নন্দিতা (কামিনী ফুলের গাছ); মুজিব ইরম (মুজিব)। এছাড়া ভীষ্মদেব চৌধুরী, ভাস্কর চৌধুরী, বুলবুল মহালানবীশ, রকিবুল হাসান, ভাগ্যধন বড়ুয়া, ওবায়েদ আকাশ, মাসুদ পথিক, সোহাগ সিদ্দিকী, ফারহান ইশরাক, সঞ্জীব পুরোহিত, এজাজ ইউসুফি, রাসেল আশেকী, মোশারফ হোসেন ভুঞা, শাহাবুদ্দীন নাগরী, চানক্য বাড়ৈ, সৌম্য সালেক, মাহফুজ রিপন, নিতাই সেন, আহমেদ ফিরোজ, আদ্যনাথ ঘোষ, আমিনুল ইসলাম, জোবায়ের মিলন, বঙ্গ রাখাল, এ কে এম আব্দুল্লাহ, কামরুল বাহার আরিফ, শামস আল্দীন, আহমেদ শিপলু, ইকবাল রাশেদীন, সানাউল হক, শেখ রবিউল হক, শ্যামসুন্দর শিকদার, শিবলী মোকতাদির, সৈকত হাবীব, শ.ম শামসুল ইসলাম, সাফিয়া খন্দকার রেখা, সালেহ মুজাহিদ, সুব্রত বড়ুয়া, সাগর লোহানী, শেখ হাফিজুর রহমান, জুনান নাশিত, শাকিরা পারভীন, আলতাফ শাহনেওয়াজ, আসাদুল্লাহ, আফরোজা সোমা, পিয়াস মজিদ, নাজমুল আহসান, খালেদ চৌধুরী, মাহবুব মিত্র, মোস্তফা তোফায়েল, শেখ হাফিজুর রহমান, মাহমুদ হাফিজ, জামাল হোসেন, টোকন ঠাকুর, সুজন হাজং, তালুকদার রায়হান, ইমরোজ সোহেল, আরিফুল হক কুমার, অনিকেত রাজেশ, নাহিদা আশরাফী, মানিক মজুমদার, গাজী মনসুর আজিজ, বীরেন মুখার্জী, তুষার কবির, অনিন্দিতা মুক্তা সহ প্রভৃতির কবিতা চোখে পড়েছে।

"শতবর্ষে প্রকাশিত বঙ্গন্ধুকে নিবেদিত কবিতা সংকলনগুলোর মধ্যে লিয়াকত আলী লাকী ও রুবী রহমান সম্পাদিত 'শত কবিতায় বঙ্গবন্ধু, নাজমুল আহসান সম্পাদিত 'কবিতায় বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষে আবৃত্তির ১০০ কবিতা', সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল সম্পাদিত '১০০ কবির ১০০ কবিতা', বেবী মওদুদ সম্পাদিত 'বাঙালির শুদ্ধ নাম শেখ মুজিবুর রহমান' মোনায়েম সরকার ও আসাদ মান্নান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু : শতবর্ষে শতকবিতা' মোহাম্মদ মারুফ প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু রাজনীতির মহাকবি, নির্বাচিত কবিতা', শাহজাহান কিবরিয়া ও রহীম শাহ সম্পাদিত 'গদ্যে-পদ্যে শেখ মুজিব', সিদ্দিকুর রহমান সম্পাদিত 'কবিতায় বঙ্গবন্ধু', জাকারিয়া চৌধুরী সম্পাদিত মৃত্যুঞ্জয় শেখ মুজিব, হালিম আজাদ

সম্পাদিত পৃথিবীর কাছে নোটিশ, সালাউদ্দিন বাদল সম্পাদিত পিতা, মিনার মনসুর ও দিলওয়ার চৌধুরী সম্পাদিত শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ সম্পাদিত মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব, মফিজুল ইসলাম খান সম্পাদিত 'আমি তোমাদেরই লোক প্রভৃতি।

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) এই সময় তাঁর 'সহস্র সেলাম' শিরোনামী এক কবিতায় উচ্চারণ করেন : আমার তোমার নয়, চাও তুমি বাংলার জয়/তারই লাগি মৃত্যুমুখে আগাইয়া গিয়াছ নির্ভয়,/তোমার বিরাট সত্তা আজি তাই হিমাদ্রি-সমান/বাঙালীর সর্বগর্ব তোমাতেই আজি দ্যুতিমান।/আমি বাংলার কবি তাই বন্ধু ছুটিয়া এলাম/মুজিবর রহমান লহ মোর সহস্র সেলাম।

মনীষ ঘটক বঙ্গবন্ধুর স্তোত্র রচনা করেন এইভাবে : যমুনা-পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী/বুড়িঙ্গা-শীতলক্ষ্মী-সুরমা-কুশিয়ারা/কর্ণফুলী-আড়িয়াল খাঁর/তীর্থসলিল টকটকে লাল/ নবোদিত সূর্য কিরণে/চারটি বাংলা হরফে রূপায়িত হয়ে গেছে/ মুজিবর এবং অন্নদাশঙ্কর রায় লিখলেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সেই কালজয়ী কবিতা : যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা/ গৌরী যমুনা বহমান,/ তত দিন রবে কীর্তি তোমার/ শেখ মুজিবর রহমান।/দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা/রক্তগঙ্গা বহমান,/নাই নাই ভয় হবে হবে জয়/জয় মুজিবর রহমান।

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবি-কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রদ্ধার্ঘও স্মরণীয়। তিনি তাঁর 'বন্ধু' কবিতায় বলেন : নানা পরিচয়ে আসে,/কত যুগ কত দেশ ভিন্ন নামে তবু/ শোনে তার একই কণ্ঠস্বর,/আজ শুধু আমাদেরই মাঝে মুগ্ধ মন জানে/নাম তার বন্ধু মুজিবর।

বিমলচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'ইস্পাতসূর্য মুজিবর' কবিতায় বঙ্গবন্ধু-বন্দনা উচ্চারণ করেন ঘোষণাদৃপ্ত কণ্ঠে এই বলে : ইস্পাত গড়া শাণিত সূর্যের মতো/অভিশপ্ত বাংলার যন্ত্রণার অন্ধকার ফুঁড়ে/তুমি বেরিয়ে এলে মুজিবর/ তোমার জ্বলন্ত আবির্ভাবের আলোয়/আমরা স্তম্ভিত।

মনকাড়া, চিত্তজয়ী বেশ কিছু ছড়াও রচিত হয় এই সময়। পরমানন্দ সরস্বতী তাঁর ছোট্ট দু-লাইনের ছড়ায় পাকিস্তানের কুখ্যাত সমরনায়ক টিক্কা খানকে ব্যঙ্গ করে বলেন : এক ফুঁয়েতে টিক্কা ফতে, কল্কে হলো খালি/ইয়াহিয়ার আশার ভাতে মুজিব দিলেন বালি।

অমিতাভ চৌধুরী তাঁর রচিত এক ছড়ায় গভীর উচ্চারণে মুজিব- স্তোত্র রচনা করেন এইভাবে : মুজিব মুজিব কেথায় মুজিব/মুজিব গেছে রণে/ঢাল ধরেছেন হাল ধরেছেন/আছেন মনে মনে।

কবি মনীন্দ্র রায় তাঁর 'মানুষ' শীর্ষক কবিতায় বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত মহিমা স্বাক্ষরিত করেন কবিতায় : মুজিব, এই লুপ্ত মহাদেশকে/নতুন করে আবিষ্কার করে/আমাদেরও বুকের মধ্যে ধ্বনিত করেছো তুমি/এক উজ্জ্বল নাম– মানুষ/তুমি ধন্য।

নচিকেতা ভরদ্বাজ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখেন : মুজিবর–সেতো কোনো মানুষের নাম মাত্র নয়।/আমাদের আকাঙ্ক্ষার অদ্বয় প্রতিমূর্তি/সুগন্ধ, আলোর ধ্যান শাশ্বত বাঙালীর হৃদয়-পদ্মের/মনুষ্যত্ববোধে দীপ্ত নতুন জীবন রচনার/দুর্জয় সম্পন্ন অঙ্গীকার। –সমস্ত সূর্যের বিস্ময়,/সমস্ত সমুদ্র ইচ্ছা, মাটির মমতা যত, মেঘের বিনম্র/আর আগ্নেয় আনন্দ হৃদয়ের/ হে বাঙালী, ঐ নামে উৎসর্গিত কর এবং সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় 'বিদ্রোহী' কবির বিখ্যাত কবিতার অনুসরণে আনন্দধ্বনি করে ওঠেন এই বলে : তোরা সব জয়বাংলা কর,/স্বাধীন বঙ্গের কেতন ওড়ে/ নেতা মুজিবর/ তোরা সব জয় বাংলা কর।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জুড়ে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বাংলার প্রধান ও নবীন প্রায় সব কবিই কবিতা লিখেছেন। তরুণ থেকে তরুণতর কবিরা তো ছিলেনই এবং শুধু পশ্চিম বাংলা কেন, ত্রিপুরাসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কবিরাও বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের বন্দনায় আমূল প্রাণিত হয়েছেন। তাঁরা এমন সব কবিতা বা প্রবন্ধ সঙ্কলনও বের করেছিলেন, সেগুলোর বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দান করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে। এ-প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বখ্যাত সেতার বাদক রবিশঙ্কর, বব ডিলান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'বিটল্‌স্' গ্রুপের সদস্যদের যৌথ উদ্যোগে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আমার ব্যক্তিগত সন্ধান-তৎপরতায় পশ্চিম বাংলার আর যেসব প্রধান কবি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কবিতা লিখেছেন, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া না গেলেও যেটুকু পাওয়া গেছে, সেও তুচ্ছ করার মতো কিছু নয়। তাঁদের কবিতা থেকে দু'চার লাইন উদ্ধৃতি দিলেও, এই ভণিতার কলেবর স্ফীত হবার সমূহগ সম্ভাবনার কথা ভেবে কেবল তাঁদের নামগুলোই নিচে উল্লেখ করছি। এঁরা হলেন : বিষ্ণু দে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর সেন, শঙ্খ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র,

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর সেন, পূর্নেন্দু পত্রী, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, শান্তিকুমার ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, নিশিকান্ত মজুমদার, অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়, অমিত বসু, রাধারাণী দেবী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধর, রাজলক্ষ্মী দেবী, সুনীল বসু, কবিতা সিংহ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, সাধনা মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, রত্নেশ্বর হাজরা, শামসুল হক ও মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তসহ আরও অনেকে। অবশ্য বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের লোককবিদের রচিত কবিতা কিংবা জারি এই সঙ্কলনের বাইরে রাখা হলো। তারও ভাণ্ডার বিশাল।

বাংলাদেশের কবিদের পুনরায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কবিতা রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয় স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব লাভের পর থেকে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধীর অপেক্ষায় অপেক্ষামাণ কবি সিকান্দার আবু জাফর এবং কবি আবু বকর সিদ্দিক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ ক'টি কবিতা রচনা করেন। আমাদের অন্য আর কবিদেরও কলম থেমে থাকেনি তখন; কিন্তু তাঁর আকস্মিক ছেদ ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে।" (জনকের মুখ, আখতার হুসেন, কথা প্রকাশ ২০১৫)

এছাড়াও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে হাজার কবি হাজার কবিতা লিখেছেন, আরো হাজার কবিতা লিখবেন। স্থানের অভাবে সবটা উল্লেখ সম্ভব নয়। বাংলা একাডেমি যেহেতু প্রতিনিধিত্বশীল ও সর্ব-সাম্প্রতিককালে এই সংকলনটি করেছে সেহেতু সব দায় ও কৃতিত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা যেতে পারে।

"এরপর এসে যায় ঘটনা পরম্পরায় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণ করা হয় সেই ঐতিহাসিক গান, যার কল্যাণে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি ঘরে সুরে-ছন্দে পৌঁছে যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। গানটি ছিল :

মুজিব বাইয়া যাওরে/নির্যাতিত দেশের মাঝে/জনগণের নাওরে মুজিব/ বাইয়া যাওরে/ও মুজিবরে, ছলেবলে চব্বিশ বছর রক্ত খাইল চুষি/ জাতিরে বাঁচাইতে যাইয়া/ মুজিব হইল দুষীরে...॥

সরাসরি বঙ্গবন্ধু নাম স্বাক্ষরিত করে প্রথম রচনা করেন ওপার বাংলার কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু ১৯৭০ সালের ১২ ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয় কবিতাটি রচনা করেন কবি জসীম উদ্‌দীন। রচনাকাল ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ এবং একই শিরোনামে তৃতীয় কবিতাটি রচনা করেন কবি হাবীবুর রহমান। তার শিরোনাম ছিল 'বঙ্গবন্ধু তুমি আছ বলে'। এটি তিনি রচনা করেছিলেন ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল তারিখে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার প্রায় আট মাস আগে। এর রচনাকালের তারিখসহ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক আজাদ-এর ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি সংখ্যা, যাতে তিনি বলেন : বঙ্গবন্ধু, তুমি আছ বলে– [বিভীষিকাময় অন্ধকারের শব ঠেলে ঠেলে/ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুকে উপক্ষো করে/ আমরা এগিয়ে যাই উদয়াচলের পথে,/ তপ্ত শোণিতের প্রস্রবনে ধুয়ে দেই/ মায়ের মুখের মলিনতা নিজের হাতে।...

৬৮ পঙ্‌ক্তি-দীর্ঘ এই কবিতাটির মাত্র কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত্ত করা হলো। উল্লেখ করার বিষয় এই যে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কবিতার কোনো সঙ্কলনে এ যাবৎ হাবীবুর রহমানের এই কবিতাটি সঙ্কলিত হয়নি।"

(জনকের মুখ, সম্পাদনায় আখতার হুসেন, কথা প্রকাশ)

বিভিন্ন কবির কিছু অমর পঙক্তি এখানে উল্লেখ করা গেল :

পল্লী কবি জসীম উদদীন আমার মনে হয়, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবন তাঁর কবিতায় সঠিকভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর অন্যান্য মহৎ কবিতার মতো এটিও হয়ে উঠেছি বর্ণনাধর্মী ও হৃদয়গ্রাহী। বঙ্গবন্ধু যে কেবল একজন মানুষ নন, তিনি একজন জাতিমানব, ইতিহাসের মানব। তিনি কেবল দেশের স্বাধীনতা এনেছেন, তাই নয়, দেশের মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করবেন, একই সঙ্গে সাম্য ও বণ্টনের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবেন।

ধন্য এ কবি এ যুগে এখনো রয়েচে জীবন লয়ে,
সম্মুকে তার মহাগৌরবে ইতিহাস চলে বয়ে।..
মানুষে মানুষে রহিবে না ভেদ সকলে সকল কার,
একসাথে ভাগ করিয়া খাইবে সম্পদ যত যার।

(জসীম উদ্‌দীন : বঙ্গবন্ধু)

কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন বঙ্গবন্ধুর খুব নিকটজন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে জাতির পিতাকে শুরু থেকে সমর্থন করে গেছেন। ব্রিটিশ বিরোধি আন্দোলনের সময় থেকে, বাংলাভাষা আন্দোলনেরও তার ভূমিকা ছিল। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে খালি পায়ে

হেঁটে প্রভাত ফেরিতে গেছেন। তিনি বসবাসও করতেন বঙ্গবন্ধুর বাসার কাছাকাছি। অথচ তিনি প্রত্যক্ষ করলেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড। এক শোকাবহ পরিস্থিতি বাঙালি জাতি কিভাবে সহ্য করবে- তারই আকুল প্রকাশ তার কবিতায়।

দুর্যোগের রাত্রিভোরে সর্বহারা প্রাণ
শুনি নও-বেলাল আজান
দাঁড়ায়েছে আসি ময়দানে
তোমার আহ্বান তারা শুনিয়াছে কানে।
মানুষে অমানুষে সংঘর্ষের প্রস্তরফলক পেরিয়ে
ফিরে আসছেন তিনি ইতিহাসে অশনাক্ত পথে।
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কান্নায় পাথরে গড়া
সুমসৃণ পথে ফিরে আসছেন তিনি

(সুফিয়া কামাল : মুজিবের জন্মদিনে)

আবুল হোসেন চল্লিশের দশকের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। সর্বদা নিজেকে প্রগতিশীল চেতনার সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন। নতুন ধারার কবিতা রচনাতেও তার ভূমিকা রয়েছে। তিনি তার কবিতায় বঙ্গবন্ধুর এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডকে বাঙালি জাতির বিপর্যয় হিসাবে মনে করেন।

বিশাল এক হৃদয় ছিল যার
শেখ মুজিবুর রহমান নাম তাঁর
ভেতরে বাইরে অভিন্ন মানুষ
সংগ্রামের নিউক্লিয়াস যিনি
শেখ মুজিবুর রহমান তিনি।

(আবুল হোসেন : জাতির পিতা তিনি)

মাহবুব উল আলম চৌধুরী সর্বদা বাঙালির যে কোনো জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন সর্বাগ্রে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরে বাঙালি থেমে যেতে পারে না। তার আদর্শ বুকে নিয়ে শোক থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নবরূপে এগিয়ে যাবে, অসাম্প্রদায়িক শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে।

টুঙ্গিপাড়ার কবর থেকে উঠে এসো
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে

বজ্রকণ্ঠে আবার বলো
এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।
(মাহবুব উল আলম চৌধুরী : গরাদভাঙার সংগ্রামিরা জাগো)

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর কবিতায় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের নিন্দা জানানো হয়েছে। যে বা যারা বঙ্গবন্ধুকে খুন করতে পারে তারা এদেশের কেউ না। এদেশর মাটি মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাদের মানুষ যুগ যুগ ধরে ধিক্কারই জানাবে শুধু।

রাত্রির তৃতীয় যামে হন্তারক তুমি
নির্ধারিত কাজ শেষ করে
অন্ধকারে আবার মিলাও–
হন্তারক তোমাকে দেখি না
দেশের মাটিতে তুমি নেই
দেশের ধিক্কারে তুমি আছো
তোমার আশ্রয় দেশে দেশে
কৌটিল্যের সোনার কুঠিতে
দেশের মাটিতে তুমি নেই
দেশের ধিক্কারে তুমি আছো
(জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : রাত্রির তৃতীয় যামে)

বঙ্গবন্ধু যে আলোবাতাসে বেড়ে উঠেছে। যে শ্যামল প্রকৃতির কবি স্পর্শ পেয়েছে কবি এতেই ধন্য। কবি মযহারুল ইসলাম এভাবেই বাংলা প্রকৃতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নিজের অবিচ্ছেদ্যতা বোধ করেছেন।

আমার এই দেশ সবুজে শ্যামলে অপরূপ
অপরিসীম তার স্নেহের আকর্ষণ
আশৈশব তার মমতার দানে আমি ধন্য।
(মযহারুল ইসলাম : একটি সূর্যের হাত ধরে)

শামসুর রাহমানের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা 'ইলেকট্রার গান' কবিতা হিসাবে অতিবিখ্যাত। গ্রিক পুরাণের রাজা এ্যাগামেমনন্ অন্যায়ভাবে হত্যা হওয়ার পরে তাঁর কন্যার শোক প্রকাশের আকুলতার সঙ্গে কবি বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনাও ঠিক যেন শোক প্রকাশের জন্য বেঁচে আছেন।

যতদিন আমি এই পৃথিবীতে প্রত্যহ ভোরে
মেলবো দু'চোখ, দেখবো নিয়ত রৌদ্র-ছায়ার খেলা
যতদিন পাবো বাতাসের চুমো, দেখবো তরুণ
হরিণের লাভ, ততদিন আমি লালন করবো শোক।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
যে যেমন খুশি যখন তখন বাজাবে আমাকে
নানা ঘটনায় ষড়জে নিখাদে, আমি কি তেমন বাঁশি?
কণ্টকময় রক্ত-পিপাসু পথে হাঁটি একা;
আমার গ্রীবায় এবং কণ্ঠে আগামীর নিশ্বাস।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
(শামসুর রাহমান : ইলেকট্রার গান)

বঙ্গবন্ধু যখন বেঁচে ছিলেন তখন তার সীমাবদ্ধ জৈব শরীরের একটা পরিমাপ ছিল। কিন্তু আজ যখন তিনি নেই, তখন সারা বাংলার প্রতিটি কণায় তিনি মিশে আছেন। বাংলার শ্যাম প্রকৃতি, জলজ উপস্থিতি, সবখানেই আজ তিনি বিরাজমান। কবি হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর কবিতায় সে-কথায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যারা মনে করেছিল, বঙ্গবন্ধুকে সশরীরে হত্যা করলেই তাঁর আদর্শ থেমে যাবে, তাঁর শিক্ষার কোনো মূল্য থাকবে না, তারা ভুল করেছিল। বরং তিনি আজ বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে গেছেন।

এখন পতাকার মতো সে আলাদা, তবু যত খুশি
তাকে ওড়াও ওড়াও। প্রতিবার তোমার হৃৎপিণ্ডের
সমস্ত আরক্ত রং দেখো, তোমার জলজ পরিপার্শ্বের
সমগ্র শ্যামলিমায় ঘন হয়ে যাও। সে আজ
সমস্ত শরীর মেলে দিয়ে একান্ত মানচিত্র বাংলার,
আপামর বাংলার। আজীবন জয়তু সমস্বর হয়ে গেছে।
(হাসান হাফিজুর রহমান : একান্ত মানচিত্র বাংলার)

ঘাতকরা মনে করেছিল, তাঁকে হত্যা করলেই সব নিষ্কন্টক হয়ে যাবে। কিন্তু তারা জানেনি, তিনি নেই, আমরা তো আছি, এখন সব দায়িত্ব আমাদের। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সবটা করতে হবে আমাদের। কবি কায়সুল হক সেভাবেই বিষয়টি দেখেছেন।

এখন সত্যি কি নিষ্কন্টক আমাদের পথ?
সব দায় দায়িত্ব এখন

আমাদের।
তিনি তো আছে মিশে আমাদের সত্তার গভীরে।
(কায়সুল হক : তিনি এবং আমাদের স্বপ্ন)

তিনি দেশের বীর মুক্তি যোদ্ধা, বঙ্গবন্ধুর অনুগামীদের নিষ্ক্রিয়তা দেখে আশ্চর্য হয়েছেন। কবি গাফ্‌ফার চৌধুরী হতাশা ব্যক্ত করেছেন, যখন বীরদের এগিয়ে আসা উচিত তখন কি তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। যখন পতাকা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, ঘাতক খামচে ধরেছে মাটি, তখন চুপ করে থাকার সময় কোথায়।

কোথায় তোমার মুক্তিযোদ্ধা? বাঘা সিদ্দিকী? কর্মী বাহিনি?
কোথায় তোমার বুদ্ধিজীবীরা? তারা তো এখন ক্ষমতা কামিনী,
কেউ ঘরে বসে নেতা হতে চায়
বিদেশে কেউবা আবাস জমায়
গলাবাজি আর মায়াকান্নায় দেশে বাতাস পীড়িত
জনতা ভ্রান্ত : তোমার পতাকা মাটির ধুলায় নমিত।
(আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী : বঙ্গবন্ধু)

সৈয়দ শামসুল হক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তিনি অনেক কবিতাতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। 'প্রয়াত পিতার উদ্দেশ্যে খেদ ও শোকসূচক একটি রচনা' কবিতায় তিনি পিতার মৃত্যুতে পুত্রদের দশা কি করুণ হয়ে যাচ্ছে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। পিতার অবর্তমানে পুত্ররা যে ভালো নেই। শত্রুরা তাদের সঙ্গে থেকে তাদের অর্জন নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে।

পিতা, তোমার পুত্ররা জানে না
তাদের পায়ের কাছে গর্ত করছে ইঁদুর
এবং নিঃশব্দে;
তারা জানে না তাদের হাতের লেখা এই লেখার কালেই
অচেনা ছাঁদের লেখা হয়ে যাচ্ছে
এবং তাদের চারদিকে অনবরত খসে পড়ছে নাট বল্টু চেন।
পিতা, একটি জীবনের শেষে বিদায় নিয়েছিলে তুমি;
আর তোমার পুত্ররা আজ বিদায় নিচ্ছে তাদের জীবদ্দশাতেই॥
(সৈয়দ শামসুল হক : প্রয়াত পিতার উদ্দেশ্যে খেদ ও শোকসূচক একটি রচনা)

বাঙালির ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে বত্রিশ নম্বর। বাঙালির কুতুব মিনার, জয়ের স্মারক বত্রিশ নম্বর। বত্রিশ নম্বর ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস

নেই। এই বাড়িটিকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্রের জন্ম কাহিনি তৈরি হয়েছিল। এখানেই ছিলেন এই দেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এখানেই ঘাতকরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেছিলেন। আর তখন থেকে বাঙালি জাতি এই বাড়িটিকে তাদের নিজের বাড়ি করে নিয়েছে। কবি বেলাল চৌধুরীর 'বত্রিশ নম্বর' নামের কবিতায় তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাস খুঁজতে গেলে
যেতে হবে বত্রিশ নম্বর
বাংলাদেশ ও বাঙালির গৌরবগাথা দেখতে হলে
যেতে হবে বত্রিশ নম্বর
বাঙালি ও বাংলাদেশের স্থাপত্য-ইতিহাস জানতে হলে
পাতা উল্টে দেখতে হবে বত্রিশ নম্বর
বাংলাদেশ ও বাঙালির কলঙ্কচিহ্ন দেখতেও
যেতে হবে সেই বত্রিশ নম্বর;
(বেলাল চৌধুরী : বত্রিশ নম্বর)

হায়াৎ মামুদের 'মুজিবের এপিটাফ' কবিতায় মুজিবের সর্ববিস্তারের কথা বলা হয়েছে। এদেশে ভোর হয়, ফুল ফোটে মুজিবের নামে। মুজিব ছাড়া এ দেশের পরিচয় নেই। একজন মানুষ মারা গেলে তার এপিটাফে যেমন লেখা থাকে তার পরিচয়। এই দেশের পরিচয়ের ক্ষেত্রেও তিনি তাই।

স্খলন ও ভ্রান্তির শেষে মানুষ গেলেও
(যেমন গিয়েছ তুমি ইতিহাসে)
বেঁচে থাকে বৃক্ষলতা, ধূলিকণা- সেও
তারই ঘ্রাণে, স্মৃতি ও সুবাসে।
আমরাও বেঁচে থাকি স্মৃতি নিয়ে তোর
তোর রক্ত ফুল হবে, আঙিনায় ভোর।
(হায়াৎ মামুদ : মুজিবের এপিটাফ)

মানুষ তো কেবল শরীরেই থাকে না, থাকে মনে স্বপ্নে। মানুষ চলে গেলেও থাকে তার বাড়িতে নিজের লোকের কাছে। মুজিব মারা গেলেও তিনি বাংলাদেশ নামে তার ঘরে আছেন। বাঙালিদের স্বপ্নে আছেন। তাকে ছাড়া বাঙালি নেই।

কেবল শরীরই যায়। স্বপ্নের মানুষ–
তিনি তো থেকেই যান নিজের বাড়িতে।

ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি হয়।
তাঁর কণ্ঠস্বর
ঘর থেকে ঘর।
এই বাড়ি ফেরায় না।
কাউকে।

(মনজুরে মওলা : এই বাড়ি)

মুজিব যেহেতু অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন সেহেতু ছোটরা তাকে শরীরে হত্যা করতে পেরেছে। কিন্তু তাতে তো তারা বড় হতে পারেনি। আরো ছোট হয়ে গেছে। রবিউল হুসাইন তার কবিতাতে সেই বার্তাই দিয়েছেন।

যেহেতু তিনি খুব বড়ো ধরনের মানুষও ছিলেন
তাই ছোটোরা খুব সহজেই তাকে আপাত শেষ করে দিলো হয়তো কিন্তু তাতে
নিজেরাই খুব ছোটো জীবে পরিণত হয়ে গেল

(রবিউল হুসাইন : যেহেতু তিনি খুব বড়ো ধরনের মানুষও ছিলেন)

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মহাদেব সাহার কবিতা রচনা একটা বিশিষ্ট্য স্থান অধিকার করেছে। যারা প্রথম পর্যায়ে জাতির পিতাকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন, এমনকি সর্বাধিক কবিতা রচনা করেছেন, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গবন্ধু পরিচয় তুলে ধরতে তিনি 'আমি কি বলতে পেরেছিলাম' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কবিতার মধ্যে এটি একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বঙ্গবন্ধু উচ্চতার কোনো মানুষ যেহেতু এই বাংলায় জন্ম গ্রহণ করেননি, সেহেতু তিনিই বাংলার পরিচয়। কোনো বাঙালি যখন দেশের বাইরে যান তখনো তিনি বঙ্গবন্ধুর পরিচয় নিয়ে যান। কেউ বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধুর কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়। এরচেয়ে বেশি কিই বা আছে একজন বাঙালির কাছে। কারণ একজন লোক সারাজীবন সংগ্রাম করেছিলেন তার জাতির একটি স্বাধীন আবাসের জন্য।

সারা বাংলায় তোমার সমান উচ্চতার আর কোনো
লোক দেখিনি আমি।
তাই আমার কাছে বার্লিনে যখন একজন ভায়োলিন বাদক
বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল
আমি আমার বুকপকেট থেকে ভাঁজ-করা একখানি দশ
টাকার নোট বের করে শেখ মুজিবের ছবি দেখিয়েছিলাম

বলেছিলাম, দেখো এই বাংলাদেশ;
এর বেশি বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানি না!
আমি কি বলতে পেরেছিলাম, তার শেষবার ঘুমিয়ে পড়ার
আগে আমি কি বলতে পেরেছিলাম?

(মহাদেব সাহা : আমি কি বলতে পেরেছিলাম)

বঙ্গবন্ধুর হত্যা কাণ্ডের পর পদ্মা মেঘনা আর বহমান নেই। তাঁর কীর্তিই যদি না থাকে তাহলে এসব বহমান থেকেই বা কি হবে, মাহবুব সাদিকের কবিতায় সে-সবের বর্ণনা আছে।

এই বাংলায় পদ্মা-মেঘনা নেই আর বহমান
তবুও মধুর বাঙালি জীবন হাজার বছর পর
কীর্তি তোমার বঙ্গবন্ধু আজও অবিনশ্বর।

(মাহবুব সাদিক : হাজার বছর পরে বঙ্গবন্ধু ; অন্নদাশঙ্কর রায়ের ঋণস্বীকারপূর্বক)

জাহিদুল হক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ কিছু গান এবং কবিতা রচনা করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে ঘাতকরা হত্যা করলেও বাঙালিদের মনে তিনি এমনভাবে জাগরুক আছেন, তারা ভাবেন হয়তো তিনি আবারো দেখা দেবেন।

পদ্মা ভোলেনি, ভোলেনি মেঘনা নদী,
তোমার পতাকা অমলিন নিরবধি;
তুমি আজ নেই, তবু মানুষেরা ভাবে
হঠাৎ কখনো ফেরে মুজিবুর যদি!

(জাহিদুল হক : স্মৃতি)

কবি সিকান্দার আবু জাফর যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অবলম্বন করে সারাজীবন গান কবিতা লিখেছিলেন, গণ কবিতা রচনা করেছিলেন। কবি কাজী রোজীও সারা জীবন বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে সাহিত্য রচনা করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুকে যারা আঘাত করেছেন তারা সারাজীবন কাঁদবেন। তাঁর মতো একজন মানুষকে আঘাত করা যায় না।

ভোরের আকাশ চিরে ধল প্রহরের আলো
তাঁকে কাঁদালো–তিনি কাঁদলেন
স্বাধীন এ বাংলার আলো মাটি জল
তাঁকে কাঁদালো-তিনি কাঁদলেন
লক্ষ কোটি মানুষের বুকের গভীর ছুঁয়ে
তিনি কাঁদলেন–

কাঁদলেন একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ।
(কাজী রোজী : কাঁদলেন একজন নিপাট মানুষ)

আলতাফ হোসেন বলছেন, যেদিন বঙ্গবন্ধু আমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে পথে নামতে বলেছিলেন, আমরা তার তাই নিয়ে পথে নেমেছিলাম, এবং বাংলাদেশকে পেয়েছিলাম।

সেদিন থেকেই সংগ্রামে, যুদ্ধে নেমে পড়া আমাদের
প্রিয় বঙ্গবন্ধু, তোমার কথামতো যার যা কিছু ছিল
তা নিয়ে পথে নেমে পড়া
আর আমাদের প্রিয় স্বদেশকে ফিরে পাওয়া।
(আলতাফ হোসেন : প্রিয় বঙ্গবন্ধু আমাদের)

শেখ মুজিবুরের নাম নিয়েই এ দেশের পাখি ডাকে ভোর হয়। আবিদ আনোয়ার কবিতায় সে কথা উঠে এসেছে।

সূর্যের আলো ভোরে ও বিকেলে রেঙে ওঠে সেই খুনে;
শিমুল-পলাশ রাঙা হবে আরো অনাগত ফাল্গুনে–
শ্যামা-পাপিয়ারা ডেকে-ডেকে সারা বনে বনে তোলে সুর
স্বজনের মতো ডাকনাম ধরে : মুজিবুর...শেখ মুজিবুর ॥
(আবিদ আনোয়ার : তোমার রক্ত মাটিতে পড়েনি)

আতাহার খান সামরিক জান্তার নিন্দা করেছেন, তার কবিতায় যারা বাংলাদেও নিজস্ব পরিচয়কে মুছে দিতে চায়। মানুষের অধিকার যাদের কাছে ধূলায় লুটায়।

কেন এত রূঢ় তুমি? সদম্ভে ওড়াও পোড়াস্বপ্নে
বিজয়ের ক্রূর হাসি! ভেঙে চুরমার করো শুধু
আমাদের মনের ভিতরে আঁকা রঙিন বাসনা,
সাজানো সংসার–ঘরে ও বাইরে সবখানে আছে
জারি নিষেধাজ্ঞা, ঝুলছে মৃত্যুর পরোয়ানা আর
নিষ্ঠুর বুটের নিচে পিষ্ট হচ্ছে মানবাধিকার–
চাপা কান্নাগুলো বড়ো বেশি বাজে চারদিক!
(আতাহার খান : চেয়ার)

সর্বত্র বঙ্গবন্ধু অবস্থান জরিনা আখতারে কবিতায়-

কোথায় নেই আপনি–

নদীর কলতানে
পাখির কাকলিতে
শিশুর কলরবে
আকাশের নীলে
পাতার সবুজে
চাঁদের আলোয়
সূর্যের কিরণে
আপনি আছেন অবিচ্ছেদ্য অবিচল অবিনশ্বর;
(জরিনা আখতার : বঙ্গবন্ধুর নকশিকাঁথার মাঠ)

রবীন্দ্র গোপ লিখেছেন এখনো বঙ্গবন্ধুই বাঙালির মহামন্ত্র, তাঁকে যতদিন আকড়ে থাকবে, বাঙালি ততদিন শঙ্কা মুক্ত থাকবে।

তুমি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি–মহামানব, মহীয়ান,
তোমার নামে মুক্তির মহামন্ত্রে
আজও গেয়ে যাই গান,
তুমি বাঙালির অপর নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।
(রবীন্দ্র গোপ : বাঙালির অপর নাম)

বঙ্গবন্ধুর হত্যা বাঙালিকে পরাস্ত করার ষড়যন্ত্র ফারুক মাহমুদের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে–

আবার ডাকলাম, কোনো জবাব নেই, বাংলার
উদার আকাশের মতো তাকালেন, শুধু তাঁর পায়ের কাছে
রক্তাক্ত পড়ে আছে পরাজিত পতাকার আধখানা মুখ।
(ফারুক মাহমুদ : বাড়িটার মন ভালো নেই)

মুজিবের কণ্ঠই জাতিকে জাগিয়ে ছিল, বিমল গুহ'র কবিতায়

বীরদর্প মুজিবের বলিষ্ঠ তর্জনী পুনর্বার
জাতির কপালে দেয় টোকা।
(বিমল গুহ : শেখ মুজিবের তর্জনী)

পিতার কাছে অক্ষম পুত্রের ক্ষমতা প্রার্থনা ইকবাল হাসানের কবিতা-

আমাদের ক্ষমা করবেন, পিতা
এরকম স্মৃতিভ্রষ্ট যারা তাদের স্থান নেই মানুষের সুসভ্য অভিধানে।

(ইকবাল হাসান : আমাদের ক্ষমা করবেন, পিতা)

আমরা বঙ্গবন্ধুকে চিনতে পানিনি। চিনলে তার মর্যাদা রাখতে পারতাম, কিন্তু পারিনি। নাসির আহমেদ তার কবিতায় সে কথা বলতে চেয়েছেন।

তোমাকে চিনিনি পিতা তুমি ছিলে কোন্ উচ্চতায়!
মেঘের ওপরে মেঘ ছাপিয়ে গেলেও স্পর্শাতীত
তোমাকে চিনেছে বিশ্ব মুক্তিযুদ্ধে মহত্তম নেতা
বিদেশি পণ্ডিত আর মহাজ্ঞানী-জন অভিভূত!
(নাসির আহমেদ : তোমাকে চিনিনি বহুদিন)

বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর পরে সব বঙ্গবন্ধুর নাম নিয়ে কাঁদে, ত্রিদিব দস্তিদারের কবিতা।

আমাদের বাংলাদেশের মানচিত্রতম দেহ
আমাদের বাংলাদেশ পতাকাতম হৃদয়
সেই থেকে আজও বাংলাদেশের হৃদয়-পতাকা কাঁদে
খোঁজে দেহ মানচিত্র শেখ মুজিব বলে।
(ত্রিদিব দস্তিদার : বাংলাদেশের হৃদয়-পতাকা কাঁদে)

দিলারা হাফিজ–

শ্যামল সবুজ বাংলাদেশ নামের সোনালি এই ভূখণ্ডে
শতবর্ষী এক তরুণ যিনি, আজো তিনি পরাক্রান্ত নবীন।
রাজসিক তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে
সকল শিশুর হাতে আমার আঁকা
এই ছবিটি আমি তুলে দিতে চাই।
(দিলারা হাফিজ : ছবি)

ইকবাল আজিজ–

বঙ্গবন্ধুর ছায়া মেঘ হয়ে ঝরে পড়ে বাংলাদেশে–
বঙ্গবন্ধুর ছায়া দুঃখের নদী হয়ে নদীতে মেশে।
(ইকবাল আজিজ : বঙ্গবন্ধুর ছায়া)

আলমগীর রেজা চৌধুরী তার সন্তানের কাছে, উত্তর পুরুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় তুলে ধরতে চান। বাঙালির এই পরিচয় জানতে হলে তাকে যেতে হবে টুঙ্গিপাড়ায়।

আমার সন্তান টুঙ্গিপাড়া যেতে চায়

আমি কি আসবো পিতা?
(আলমগীর রেজা চৌধুরী : টুঙ্গিপাড়া)

মুজিব কোনো আলাদা সত্তা নয়, মুজিব আমাদের সকলের। সোহরাব হাসান তার কবিতায়-

তবু সে জেনেছে এ মাটির সোঁদা গন্ধে
বাতাসের উদ্দাম বেগে
নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে
আপনি তো পৃথক কোনো সত্তা নন; আমাদের সকলের।
প্রাণের গভীরে অবিরাম ধ্বনিত একটি নাম–শেখ মুজিব।
(সোহরাব হাসান : দশ বছর পর)

যুগে যুগে কালে কালে অধিকার বঞ্চিত, শোষিত, বন্দি মানুষের মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুকে মানুষ স্মরণ করবে, হালিম আজাদের কবিতায় বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুদের মতো মানুষ কালে কালে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে পথ দেখায়।

হে মানুষ গর্বিত কালের মানুষ–তোমাকে আবারও ডাকছে
সেই মহামানব। যাঁর বর্ণিল সংগ্রামে, স্বাধীনতার ঘোষণার
(হালিম আজাদ : তাঁর তর্জনীর গর্জনে)

বঙ্গবন্ধু'র ব্যবহৃত সব কিছু তাঁর জীবদ্দশাতেই এমন এক প্রতীকে রূপ নিয়ে ছিল যে কোনো বাঙালির কাছে তার অনুষঙ্গ ছিল পরিচিত, অপরিহার্য এবং অহংকারের। বঙ্গবন্ধু যে কোট ব্যবহার করতেন, সেই কোটের নাম মুজিব কোট, বঙ্গবন্ধু ধূমপানের জন্য যে পাইপ ব্যবহার করতেন সেটিও তার শৈলীই ধারণ করেছে। তাঁর তর্জনী, কথা বলার ভঙ্গি, গোঁফ, ভ্রু, চুল ব্রাশ- সবটাই বঙ্গবন্ধুর প্রতীক। বঙ্গবন্ধুকে উপস্থাপনের জন্য এর যে কোনো একটির কথা উল্লেখ করলেই বাঙালি বুঝতে পারে, এসব বঙ্গবন্ধুর প্রতিনিত্বশীল উপাদান। কবি মোহাম্মদ সাদিক বঙ্গবন্ধুর প্রিয় পাইপকে ব্যবহার করেছে, সংগ্রাম, লড়াই ও বিপ্লবের প্রজ্জ্বলিত প্রতীক হিসাবে। ঘাতকের আঘাতে যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়, তখন সেই আগুন নিভে যাই; যে আগুন একদিন প্রমিথিউসের মতো বহুমূল্যে বঙ্গবন্ধু অসহায় বাঙালিদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন।

শুধু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট
টকটকে লাল রক্তের ছিটায়, ঘন অন্ধকারে
প্রিয় পাইপটি অকস্মাৎ কাত হয়ে পড়ে, আর

বাংলার সমূহ স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিঃশেষ হতে দেখে
ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে ও ঘৃণায়
বাংলাদেশের প্রিয় পাইপটি নিঃশব্দে নিভে যায়...
(মোহাম্মদ সাদিক : বঙ্গবন্ধুর পাইপ)

পঞ্চাশ দশকের শক্তিমান কবি শহীদ কাদরী বুঝতে খুব কষ্ট হয়, যারা বঙ্গবন্ধুকে মেরেছিল, তারা তো দেখতে মানুষের মতো, তাদের বুট উর্দি সৈনিকের মতো, তারা বাংলা ভাষায় কথাও বলেছিল; অথচ তারা বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলল! তাদের কি নামে ডাকা যায় কবির কাছে তা বোধগম্য নয়।

বাঘ কিংবা ভালুকের মতো নয়
বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা হাঙরের দল নয়,
না, কোনো উপমায় তাদের গ্রেফতার করা যাবে না।
তাদের পরনে ছিল ইউনিফর্ম
বুট, সৈনিকদের টুপি,
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাদের কথাও হয়েছিল,
তারা ব্যবহার করেছিল
এক্কেবারে খাঁটি বাঙালির মতো,
বাংলা ভাষা। অস্বীকার করার উপায় নেই
ওরা মানুষের মতো দেখতে, এবং ওরা মানুষই,
ওরা বাংলার মানুষ
(শহীদ কাদরী : হন্তারকদের প্রতি)

বঙ্গবন্ধু আসবেন এই প্রত্যাশা সব বাঙালির মধ্যেই ছিল। বাঙালিদের যে দীর্ঘকালীন বঞ্চনা বঙ্গবন্ধুর আগমনে সব শেষ হয়ে যাবে। সিকদার আমিনুল হকের কবিতা সেই প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছে।

তোমার আসার অপেক্ষায় ছিল সব...
বাংলার নদনদী থেকে, হাওড়, বিল, দিঘির কাকচক্ষু জল
তোমার অপেক্ষায় ছিল মাছরাঙা, ধবল বক, পানকৌড়ি,
শালিক, চিল, মেটে-রং দোয়েলের বুক
তোমার অপেক্ষায় ছিল সবুজ ধানক্ষেতে কর্মরত
অপুষ্টিতে ভাগো ন্যুব্জপিঠ বাংলার হাড়জিরজিরে
কৃষকের স্বপ্ন
তোমার অপেক্ষায় ছিল কলকারখানার তেলকালি মাখা

ঘর্মাক্ত শ্রমিকের থমথমে চোখ
তোমার অপেক্ষায় ছিল অফিস পাড়ার বুটশার্ট পরা
কেরানি আর তেল চিটচিটে ফাইল হাতে পিয়ন-চাপরাশি
তোমার অপেক্ষায় ছিল ছাত্র, যুবক, গৃহবন্দি নারী আর
হাসপাতালের চটপটে নার্স...
(সিকদার আমিনুল হক : তোমার অপেক্ষায় ছিল সবাই)

রফিক আজাদ তাঁর 'এই সিঁড়ি বাংলার রূপের সঙ্গে একাকার' কবিতায় বলছেন। বঙ্গবন্ধু যেখানে মারা গেছেন, সেখানে নয় সব শেষ। বরং শুরু, যে সিঁড়ির উপরে তার লাশ পড়ে ছিল, সেই সিঁড়িই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নদী বন্দও সমুদ্র ধারণ করে এই লাশ।

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিঁড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে
বত্রিশ নম্বর থেকে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা বয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।
মাঠময় শস্য তিনি ভালোবাসতেন,
আয়ত দু'চোখ ছিল পাখির পিয়াসী
পাখি তার খুব প্রিয় ছিল
গাছ-গাছালির দিকে প্রিয় তামাকের গন্ধ ভুলে
চোখ তুলে একটুখানি তাকিয়ে নিতেন,
পাখিদের শব্দে তার, খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যেত।..
(রফিক আজাদ : এই সিঁড়ি বাংলার রূপের সঙ্গে একাকার)

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনেও বাঙালি আনন্দ করতে পারে না। তার বুক ভরা কষ্ট, পিতৃহত্যার কষ্ট। আসাদ চৌধুরী তার 'এ কেমন জন্মদিন' কবিতায় সেই দুঃখ গাথা রচনা করেছেন।

এ কেমন জন্মদিন, খা-খা বুক, বেলুন-ফুটকা নাই,
লাল-নীল বাত্তি নাই,
কোনোখানে উৎসবের চিহ্নমাত্র নাই।
হে পিতা, তোমার জন্মদিনে
তোমার ও বাঙালির এ কেমন ভিন্ন আচরণ?

মোহাম্মদ রফিক লিখছেন ব্যাঘ্র বিষয়ক কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে বনের রাজার অবস্থান থেকে বর্ণনা করেছেন। যার ভয়ডর বলে কিছু নেই। যারা তাকে হত্যা করেছে তারা নিচ তস্কর।

আগস্টের পনেরো তারিখ উনিশ শ' পঁচাত্তর;
অতর্কিত শিকারীর পদশব্দে অরণ্য শঙ্কিত
বাদুড়ের ডানার ঝাপটায় গজারির মৃত পাতা
খসে পড়ে, বনের গোপন সংকেতে সচকিত
হরিণ-হরিণী, কাক কা-কা, ইতস্তত রাইফেলের
প্রক্ষিপ্ত উন্মত্ত গুলি, বিম্নিত বেজির সহবাস;
বাঘের দু'চোখ বিদ্ধ সার্চলাইটে, হটে না এগায়ে,
আহত প্রচণ্ড ক্ষোভ আলোর চাতুচ্যে মানবিক
(মোহাম্মদ রফিক, ব্যাঘ্র বিষয়ক)

রুবী রহমান 'জাতির জনক' কবিতায় বলেছেন, জনকের হত্যাকাণ্ডে, জনকের রক্তে বাংলার এ মাটি পবিত্র হয়েছে। তাঁর রক্ত আসলে বৃথা যাওয়ার নয়। বাঙালিরা তাঁর রক্ত ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করেছে, একদিন এই জাতি তার নামে বুক উঁচু করে পৃথিবীতে দাঁড়াবে।

বত্রিশ নম্বরে পড়েছিলে জাতির জনক
সিঁড়ি বেয়ে রক্তের স্রোত নেমেছিল
ভিজে গিয়েছিল এই বাংলার সকরুণ মাটি
মৃত্তিকা ভরেছিল পলির কুহক
বাংলাদেশের মাটি রক্তে শপথে দিনে দিনে
উত্তরাধিকার বুঝে গেছে ঠিক
অন্যায় করে কারো পার নেই এদেশ মাটিতে
নবীন এ প্রজন্ম বড় নির্ভীক
(রুবী রহমান : জাতির জনক)

মুজিব ছাড়া বাংলার উৎসব নেই, বাঙালির আনন্দ নেই। মুজিবের চেতনা যখন থাকে না, তখনই মুজিব অন্তরীন হন। যখন মুজিবের চেতনা বাঙালি আকড়ে ধরে তখনই বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দ থাকে, উৎসব থাকে। নূহ-উল-আলম লেনিন তাই তাঁর কবিতায় লেখেন, 'মুজিব মানেই বসন্ত উৎসব।'

তোমার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে
বিংশ শতাব্দীর উনিশটি নিষ্ফল বসন্ত পেরিয়ে গেল

অবশেষে তুমি এলে বিশতম বসন্ত-প্রভাতে-মধুমতি তীরে।
তারপর বাকি ইতিহাস। এই বসন্তেই ঢাকার রাজপথে ভাষার দাবিতে
রক্তজবা ফোটে : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।'
তোমার আহ্বানে আবার দিব্যক জাগে মুক্তির সংগ্রামে। আর এই বসন্তেই
তুমি বজ্রনির্ঘোষে এনে দিলে বাঙালির প্রিয় স্বাধীনতা।
(নূহ-উল-আলম লেনিন : মুজিব মানেই বসন্ত-উৎসব)

বাঙালির মুজিব বাঙালির খোকা কোথায় থাকেন। তার বসবাস কোথায়, কোথায় আমরা তাঁকে পাব। সর্বত্র তার বাস। মাকিদ হাদয়ার ঠিকই বলেন, মুজিবকে বাইরে খুঁজে লাভ নেই, মুজিব আছে, বাঙালির হৃদয়পুরে।

শেষ জন বললেন,
লোকটি কিছুই করেন না তিনি শুধু
সাঁতরে বেড়ান
সোনার বাংলা
প্রিয় নদী। মধুমতী।
বাড়ি
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়।
হঠাৎ জানতে চাইলাম
'খোকা'
লোকটির বসবাস।
এখন কোথায়!
প্রথম জন
দ্বিতীয় জন
শেষ জন
একবাক্যে উচ্চারণ করলেন,
লোকটির বসবাস
বাঙালির হৃদপুরে।
(মাকিদ হায়দার : হৃদপুরে)

কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সারাজীবন অনেক কবিতা লিখেছেন। সে-সব কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁর আমি অপেক্ষা করছি কবিতায় তিনি বঙ্গবন্ধু কিভাবে টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে

পড়লেন। প্রত্যন্ত বাংলাদেশে একটি নামই সত্য সেটি হলো শেখ মুজিবুর রহমান।

আমি তাকে দেখার জন্যে
শেখ লুৎফর রহমানের বসতবাড়িতে প্রবেশ করেছিলাম
আমি তার প্রথম ক্রন্দনধ্বনি শোনার জন্য উদগ্রীব ছিলাম
তার আগমনবার্তা অনুভব করেছিলাম এ মাটির শিরা-উপশিরায়
জলবায়ু ও প্রকৃতির মগ্নমায় ছুঁয়ে দেখেছিলাম
বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে এক নাম
শেখ মুজিবুর রহমান
(হাবীবুল্লাহ সিরাজী : আমি অপেক্ষা করছি)

অসীম সাহার কবিতা 'তাঁর নিজস্ব গন্তব্যে' বঙ্গবন্ধুর কাণ্ডের পূর্বমুহূর্ত চরাচর ও ঘাতকের প্রস্তুতির ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

খুব ধীরে ধীরে তিনি সিঁড়ির প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন।
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে তখনও প্রতিধ্বনিত হয়নি বন্দনাগান
নিদ্রামগ্ন কাকেরা জেগে উঠে উন্মাতাল করে তোলেনি আকাশকে
শিশিরভেজা ঘাসগুলো সূর্য্যের আলোর প্রত্যাশায়
আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠবার আয়োজন করেনি তখনও;
অন্ধকার সরে গিয়ে আলোর পর্দায় প্রতিফলিত হয়নি
পৃথিবীকে স্বচ্ছ করে তোলার প্রস্তুতি;
চরাচরকে এত শান্ত, এত কোলাহলহীন মনে হয়নি আর কখনো
যেন পৃথিবীতে এরকম শান্তি কখনো ছিল না!
(অসীম সাহা: তাঁর নিজস্ব গন্তবে)

ময়ুখ চৌধুরী 'অপরাধ ১৯৭৫' কবিতায় প্রশ্ন করেছেন, কি অপরাধ ছিল জাতির পিতার। এটাই কি তার দোষ যে এই দোআঁশ মাটির দেশে তিনি ফসলের হাসির ভোর এনেছিলেন।

কোন অপরাধে বলো, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিল লাল নদী?
কোন অপরাধে বলো, রাতের আকাশে আজও
নক্ষত্রের ভেজা চোখ জ্বলজ্বল করে?
শস্যের সবুজ আর লাল চাকা তুলে ধরেছিল
অহংকারী আকাশের বুকে-
সেই অপরাধ!

দোআঁশ মাটির বুক চিরে
সবুজের প্রতিশ্রুতি তুলে আনে যারা
তাদের ঘর্মাক্ত হাতে শিউলির সকাল তুলে দেওয়া
এতই দোষের!
(ময়ুখ চৌধুরী : অপরাধ ১৯৭৫)

শিহাব সরকার 'পিতা' কবিতায় বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অনুপ্রেরণায় জেগে ওঠা মানুষের কাছে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

তুমি বলেছিলে, হে পরাজিত লাঞ্ছিত মানুষ
এসো আমরা গোত্রে গোত্রে কালো সাদায় দ্বীপে উপকূলে
সেতু গড়ে তৈরি করি মহাজীবনের মালা।
মানুষকে তুমি বলেছিলে, মেঘ-শ্যামা পাখি
বলেছিলে ধান শস্য।
(শিহাব সরকার : পিতা)

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি আসাদ মান্নান 'এলিজি মুজিব নামে' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। মর্সিয়া সাহিত্যের মতো, মার্ডার ইন ক্যাথেড্রায়েলের মতো হৃদয় নিংড়ানো শব্দরাজি দিয়ে তিনি তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধুর জন্য।

'অতঃপর কত গিরি নদী পথ পার হয়ে আলোর নাবিক
পিতা! তুমি ফিরে এলে বীর বেশে গর্বিত যোদ্ধার মতো-
স্বপ্নের জাহাজে চড়ে তীরে এসে দাঁড়িয়েছ মুক্তির হাওয়ায়-
মাঠে মাঠে সোনা ফলে, কৃষকের হাসি জমে ধানের গোলায় :
ফিনিক্স পাখির মতো চিতাভস্মে জেগে ওঠে তোমার প্রাণের
(আসাদ মান্নান : তোমার স্বপ্নের চেয়ে তুমি যে অধিক প্রিয়)

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পায় ফিরে ভূগোল ছেলেকে' কবিতায় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড, সুবিধাবাদি শ্রেণি, আর যারা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের কথা স্মরণ করেছেন।

বিশ্বাসের গোষ্ঠী হয়ে পথ হেঁটেছিল যারা
মঞ্জিলের চূড়া লক্ষ করে, পেয়ে গিয়েছিল
অন্ন বস্ত্র স্বর্ণ বৈভব নানান কৌশলে-উচ্ছেদের
দখলের, তাহাদের জিভ আর তুমি
সড়ক পাল্টালে, মৃত্যু পড়ে থাকে, রক্তস্রোত

সিঁড়িতে গড়ায়, চশমার চূর্ণ বাট, বটবৃক্ষ-দেহ
সিঁড়িতে গড়ায়, খাখা করে সবশূন্য বাড়ি
বত্রিশ নম্বর, নিথর প্রকোষ্ঠ সব।
(কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় : পায় ফিরে ভূগোল ছেলেকে)

হাসান হাফিজের কবিতা 'দীপ্র বাতিঘর তুমি' একই আহাকার-

স্বাধীন স্বদেশতীর্থে নিজেরই বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হয়?
কৃতজ্ঞতা জন্মঋণ কোনোদিনই শোধবার নয়।
(হাসান হাফিজ: দীপ্র বাতিঘর তুমি)

তুষার দাশ তার 'বামন-গীতি' কবিতায় বলেছেন, বঙ্গবন্ধুই ছিলেন এদেশের দীর্ঘতম মানুষ, তার পরিচয়ে এদেশ পরিচিত ছিল, তার হত্যাকাণ্ডের পর সব আবার খর্বাকার হয়ে গেছে। তাই বঙ্গবন্ধু দেখানো পথই একমাত্র আমাদের মর্যাদার পথে নিয়ে যেতে পারে।

তার পায়ে হাত রেখে বলি-পিতা, তোমার যাবার
পর আমরা সবাই এই খর্বকায় আকার পেয়েছি
বঙ্গোপসাগর থেকে সুন্দরবন-মাছ-বাঘ সবাই কেমন
জানি বামনের বেশ পেয়ে গেছে-আমাদের উত্থানের
জন্যে আজ নতুন গর্জন চাই-চাই তোমাকেই!
(তুষার দাশ : বামন-গীতি)

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের রায় হওয়ার পরে কবি মুহাম্মদ সামাদ 'শাপমুক্তি' কবিতা লিখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ঘাতকরা যে অপরাধ করেছিল, তার পাপ থেকে বাঁচার কোনো উপায় ছিল এদেশের মানুষের, তার খুনিদের বিচারের রায় প্রকাশের পরে তিনি কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। অন্তত এখন কিছুটা হলে সেই শাপমোচন হবে।

পিতা, আজ আমাদের শাপমুক্তি
আজ তোমার নির্মম হত্যা মামলার রায়
আজ আমার মা-ভাই-বোনদের হত্যা মামলার রায়
আজ বাঙালির কলঙ্কমোচন-আজ শাপমুক্তি
(মুহাম্মদ সামাদ : শাপমুক্তি)

আসলাম সানী 'আমি প্রাচীন আর্য-দ্রাবিড় আমি বাঙালি' কবিতায় শ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

আমাকে এখানেই রেখে দিয়ো–
আমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের
পরম পদ্যপাঠে পরিশীলিত হবো–
প্রতিদিন প্রতিরাত প্রতিনিয়ত।
(আসলাম সানী : আমি প্রাচীন আর্য-দ্রাবিড় আমি বাঙালি)

জাফর ওয়াজেদ 'একটি মুজিব' কবিতায় বলেন- জয় বাংলা স্লোগান তুলে যেদিন আমরা যুদ্ধে গেলাম/ সেদিন আমাদের বুকের কাছে ছিল একটি মুজিব।' মুজিবই আসলে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। যুদ্ধে যেমন সেনাপতি না থাকলে যুদ্ধ চলে না, তেমনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাড়াও যুদ্ধ কল্পনা করা যায় না। এই মহান সেনাপতি নির্দেশ বুকে নিয়েই সেদিন সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

জয় বাংলা স্লোগান তুলে যেদিন আমরা ঘরে ফিরলাম
সেদিনও আমাদের বুকের কাছে ছিল একটি মুজিব
জয় বাংলা দিতে দিতে যেদিন তিনি শহিদ হলেন
সেদিনও হৃদয়ে আসীন প্রিয়তম মুজিব।
(জাফর ওয়াজেদ : একটি মুজিব)

আবু হাসান শাহরিয়ার তাঁর 'নক্ষত্রমানব' মানব কবিতায় বলেছেন, কার ইঙ্গিতে সেদিন মানুষ ভয়ঙ্কর পাক হানাদার বাহিনির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সংঘবদ্ধ হয়েছিল, রাস্তায় নেমে এসেছিল, তিনি আর কেউ নয়, শেখ মুজিব ছাড়া। তিনিই ছিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা।

স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল
দাবানল থেকে বাংলাদেশ
উত্তাল মার্চের সাত।
পথগুলো নদী। নামে মানুষের ঢল।
মানবতরঙ্গ। নিরন্তর স্রোতধারা।
হৃদয়সমুদ্রে গিয়ে মেশে।
একই স্বপ্ন জ্বলে ওঠে পুঞ্জীভূত চোখে।
(আবু হাসান শাহরিয়ার : নক্ষত্রমানব)

ঝর্না রহমান 'মানচিত্রের প্রাণপুরুষ' কবিতায়-

যতদিন তুমি বেঁচেছিলে তোমার প্রতি পদক্ষেপে
একটি করে গাঢ় রেখায় শব্দ করে হেসে উঠেছে তৃণভূমি

ক্রমশ তরঙ্গিত শব্দে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল...
তুমি যতদিন বেঁচেছিলে তোমার নিঃশ্বাসপাতন থেকে বিশুদ্ধ
বাতাস নিয়ে তরতর করে বেড়ে উঠছিল দক্ষিণের অরণ্য
(ঝর্না রহমান : মানচিত্রের প্রাণপুরুষ)

মিনার মনসুর তাঁর 'নিষিদ্ধ সংলাপ' কবিতায় একটি সময়ে চিত্র তুলে ধরেছেন। যেদিন এদেশের স্থপতির কথা বলাও ছিল অপরাধ। সে জয়বাংলা মন্ত্রে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, তার উচ্চারণ ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু ঘাতকের ক্ষমতা খুব সীমিত, সে কখনো মুজিবের নাম থেকে বাঙালিকে বিযুক্ত করতে পারবে না।

'জয় বাংলা...জয় বঙ্গবন্ধু...জয়...'
আহারে অভিজ্ঞ ঘাতক!
তুমিও তো পেশাদার খুনি দোহাই তোমার
আমাকে খণ্ডিত করো, আমাকে মুক্ত করো
বক্ষ চিরে কেড়ে নাও মুজিবের নাম
(মিনার মনসুর তাঁর নিষিদ্ধ সংলাপ)

হারিসুল হক 'প্রান্তরের গান' কবিতায় এ দেশের মানুষের স্বপ্ন এবং স্বপ্ন পুরুষের কথা বলেছেন।

মানুষ স্বপ্ন দেখে আর স্বপ্নের ঝিলমিল রথ বেয়ে
পৌঁছে যেতে চায় এক বর্ণিল মেঘ সীমায়
মানুষ স্বপ্ন দেখে আর নোনাজলে পানসি বেয়ে
পা রাখতে চায় অই জেগে ওঠা চরের উষ্ণ বালুতে
মানুষ স্বপ্ন দেখে,
বৃষ্টিভেজা হিজল তমাল
উবু হয়ে নদীর বুকে নকশাকাটা জামদানি বুনছে
মানুষ স্বপ্ন দেখে...
(হারিসুল হক : প্রান্তরের গান)

মারুফুল ইসলাম লেখেন 'বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুঞ্জয়ী গান'। যিনি আমাদের নিজস্ব ভূখণ্ড দিয়েছেন, যার নামে প্রতিটি সকাল পবিত্র হয়ে ওঠে তিনি কিভাবে মারা যেতে পারেন।

না, তার কোনো মৃত্যু নেই
বরং মৃত্যুহীন অভিধায় লেখা হয় তার নাম
অমরত্বের অন্য নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

(মারুফুল ইসলাম : বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুঞ্জয়ী গান)

আমিনুর রহমান সুলতান '৭ই মার্চের তর্জনী' কবিতায় লেখেন-

উত্তোলিত হাতে তর্জনীর ঝড়
বোধের উত্থিত তর্জনী যেন
স্বাধীনতার অঙ্কুরিত বীজ
(আমিনুর রহমান সুলতান : ৭ই মার্চের তর্জনী)

তারিক সুজাত 'আমি আমার আঁতুড়ঘরে পথ হারালাম' কবিতায় বলছেন, ঘাতক যতই শক্তিশালী হোক, যতই ইতিহাস মুছে দেয়ার চেষ্টা করুক, তা করা সম্ভব নয়। কারণ তার মৃত্যু থেকে আমরা নতুন করে শুরু করবো।

যত তুই ছাইচাপা দিস
অপাপবিদ্ধ মহানপিতার মুখচ্ছবি বাংলা জুড়ে
আমি আমার পিতার খুনে হাত রাঙালাম।
(তারিক সুজাত : আমি আমার আঁতুড়ঘরে পথ হারালাম)

সাজ্জাদ অরেফিনের কবিতায় উঠে এসেছে তাঁর শৈশবের রূপকথার এক দয়ালু রাজার প্রতীক—

রূপকথার দয়ালু রাজা
এক বিশাল পুরুষ
যার আশ্চর্য
আলোয়
ছায়ায়
একটি দেশ
(সাজ্জাদ আরেফিন : রূপকথার গল্প)

বায়তুল্লাহ্ কাদেরীও মনে করেন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ঘাতকরা তাঁর আদর্শকে থামিয়ে দিতে পারেনি। বরং আশ্চর্য পুনরুজ্জীবন হয়েছে।

বঙ্গভূমে, শানে, ও সমুদ্রসখা
বলে যাও কোথায় সে হরিদ্রাবণের জাদুকরি
অবাক বাউল
আমরা তো বসেছি সেই ভোররাত থেকে..
মুহুর্মুহু স্বপ্নভঙ্গের রক্তাক্ত সিঁড়ির ভিতরে
বিদেহী পিতার এই আশ্চর্য পুনরুজ্জীবনে!
(বায়তুল্লাহ্ কাদেরী : আশ্চর্য পুনরুত্থান)

প্রত্যেক কবির কবিতা থেকে দুএক পঙক্তি উদ্ধৃতি দিতে পারলে বক্ষ্যমাণ আলোচকের বেশি আনন্দের কারণ ঘটত। কিন্তু খুব বড় এবং ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হবে তাতে।

২.

স্বাধিকারের কবিতা

বিষয় নয়-কবিতা টিকে থাকে তার আঙ্গিক-নৈপুণ্যের ওপর। তবে বিপরীত মত যে নেই তা নয়। কবিতা বিষয় না টেকনিকের ইতিহাস-সে বিতর্ক না ছুঁয়েও বলা যায় কবিতাকে সর্বাগ্রে কবিতা হতে হবে। কবিতা নয়, এমন অনেক মহৎ বিষয়- যার ওপর কবিত্ব আরোপ বাতুলতা বলতে হবে। সংসারে সবকিছুকে তো কবিতা হওয়া দরকার নেই। সবকিছু কবিতা নয়ও। কবিতা মানুষের ভাষা প্রকাশের একটি মাধ্যম। মানুষের আবেগ, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিসমূহ ভাষার সাহায্যে মানুষ বিশেষ কায়দায় প্রকাশ করে থাকেন। বোধকরি ভাষা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভাষা প্রকাশের এই শৈলী আবিষ্কার করে ফেলেছিল। যে-কারণে সকল ভাষা সাহিত্যের আদিরূপের নাম কবিতা।

কেন মানুষ কবিতা আবিষ্কার করেছিল? কেন মানুষ কবিতা লেখে? এসব প্রশ্নের উত্তর কেবল মানুষের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক কারণের মধ্যেই নিহিত নয়। তারও অধিক মানুষের টিকে থাকা এবং সর্বোপরি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তার উত্তর নিহিত। আদিম যুগে মানুষের কবিতার আবিষ্কার তার পরবর্তীযুগের লিপি এবং ছাপাখানার সমান্তরাল বলে বিবেচনা করা যায়। মানুষ লিপি ও ছাপাখানার বাইরে তার মস্তিষ্কে এমন একটি ভাষা সংরক্ষণাগার তৈরি করেছিল-যার মাধ্যমে সে তার পুরনো দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ করতে পারত। কবিতা ছাড়া আর কোনো মাধ্যম ছিল না-যার সাহায্যে সে তার স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ করতে পারে। সুতরাং কবিতা এমন একটি আশ্চর্য আবিষ্কার-যা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে, যে বৈশিষ্ট্যের ফলে তা আমাদের প্রাত্যহিক গদ্যজগৎ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তাই ছাপাখানার আগের কবিতা ও পরের কবিতার মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। তেমন ছাপাখানার আবিষ্কারের পরে কবিতার দায়িত্বও আগের জায়গায় নেই। তাই বলে মানুষ কবিতা লেখার আদি অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেনি। আমরা বিষয়ের শরণাপন্ন হয়ে কবিতা পড়ি না। কিন্তু কবিতা আমাদের বিষয়ের মধ্যে নিয়ে যায়।

যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা মানুষের একটি আদি নন্দন-প্রয়াশ। মানুষের সংগঠন যুগের এমনকি আধুনিককালের মহাকাব্যের বিষয় ঘনীভূত হয়েছে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। যুদ্ধের মাহাত্ম্য, বীরত্ব ও যুদ্ধের রীতিনীতিকে এসব কাব্যে মান্য করা হয়েছে। আবার কখনো বীরধর্ম বাৎসল্য ধর্মের কাছে পরাজিত হয়েছে। বাংলা কবিতাতেও আমরা কমবেশি এর ছিটেফোঁটা দেখতে পাই। তবে চর্যাপদের কবিরা শিকারী হলেও যোদ্ধা নন। মঙ্গলকাব্য কিংবা রোম্যান্টিক প্রণোপাখ্যানেও সে-অর্থে যুদ্ধ নেই। তবে মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানে ভারতচন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। বীরের যুদ্ধ না হলেও কবির যুদ্ধ তিনি ভালোই চালিয়েছেন। পুঁথি ও প্রণোপাখ্যানেও ধর্ম ও ন্যায়যুদ্ধ আছে। এ্যাকিলিস হেক্টরের মতো ট্রয়বীরদের মতো এসব কাব্যেও বীরবন্দনা করা হয়েছে।

তবে বাংলা কবিতার প্রকৃত যুদ্ধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়— 'মেঘনাদবধে'। 'রামায়ন'-'মহাভারত', প্রাচীন গ্রিক কিংবা মিল্টনের ঢঙে মাইকেল বাংলা কবিতার আদ্রভূমিতে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। মাইকেলকে অনুসরণ করে বাঙালি কবিরা এক যুদ্ধ-অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। রঙ্গলাল, নবীন, হেম, কায়কোবাদ-বেশ কিছু যুদ্ধের কাব্য লিখেছিলেন। তখন প্রকৃতই বাঙালির যুদ্ধের দরকার ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বাঙালি তখন প্রস্তুত হচ্ছে। এক অন্যায় সমরে বাঙালির নবাবকে হারিয়ে দিয়েছিল ইংরেজ। সিপাহীদের পরাস্ত করেছিল। বাঙালি তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

কিন্তু বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ সম্পূর্ণ আলাদা। ইতিহাসের আর কোনো আন্দোলন, যুদ্ধ ও সংগ্রামের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচারে এর তুলনা হয় না। এই যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি তার চূড়ান্ত স্বাধিকার অর্জন করেছে। আর এই চূড়ান্ত পর্বে আসার জন্য তার রয়েছে এক বিশাল প্রস্তুতিপর্ব। বাঙালি জাতির চিৎপ্রকর্ষে তাই মুক্তিযুদ্ধ বেড়ে উঠছিল দীর্ঘকালব্যাপী। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাঙালি কবির হৃদয় গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছিল।

আধুনিককালে যুদ্ধের কবিতার ধারণাটি আসে মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। এ সময়ে বেশ কয়েকজন কবি সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিয়েছিলেন। তারা কবিতায় তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। যুদ্ধময়দানে ইংরেজ কবি হিসেবে রূপার্ট ব্রুক, আইজাক রোজেনবার্গ, উইলফ্রেড ওয়েন, চার্লস সোরলি বেশ নাম কুড়িয়েছিলেন। এসময়ের যুদ্ধের কবিতাকে সৈনিক-কাব্য হিসেবেও উল্লেখ করা হতো। ঠিক একই সময়ে বাংলা কবিতায় এ ধারার

কবিতা লিখে মাতিয়ে দিয়েছিলেন হাবীলদার কাজী নজরুল ইসলাম। করাচি ফেরতা বাঙালির এই কবি কামালপাশা, আনোয়ার পাশা কিংবা চল্ চল্ চল্-এর মতো প্রভৃতি কবিতায় যুদ্ধ ময়দানের আবহ তৈরি করেছিলেন। যুদ্ধরত সৈনিকদের নিয়ে রুডিয়ার্ড কিপলিংও কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু যুদ্ধের কবিতা যুদ্ধের উত্তেজক পরিস্থিতি ধারণ করে এমন নয়। যুদ্ধের কবিতার ক্ষেত্রে ডব্লিউ বি ইয়েটস একটি ভালো উদাহরণ হয়ে আছেন। আয়ারল্যান্ডের এই কবির কাছে স্বাধীনতার মানে জানা ছিল। তাঁর দেশ এখনো সে সংকট পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারেনি। সুতরাং তিনি যখন বিদ্রোহী বোমাহত রাজপথকে 'টেরিবল বিউটি' হিসেবে বর্ণনা করেন, তখন আমরা তার অর্থ বুঝতে পারি। তিনি যখন লাল গোলাপের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন; তিনি যখন বলেন, 'রেড রোজ প্রুড রোজ, স্যাড রোজ অফ অল মাই ডেজ/কাম নেয়ার মি, হোয়াইল আই সিং দি আনসিয়েন্ট ওয়েজ।' তখন আমরা গোলাপ, রক্ত, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আলাদা করতে পারি না। যুদ্ধের কবিতার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, অন্তত সত্যের জন্য কবিদের মুখ এখন বন্ধ করতে হবে। সুতরাং, সময়ের প্রয়োজনে যুদ্ধের চেয়ে কবিতা বড় নয়।

যুদ্ধ এমন এক অনিবার্য বাস্তবতা। প্রতিমুহূর্তে অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনায় মানুষ পরম এক সত্যের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। শান্তিকালীন অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধকালের বাস্তবতার কোনো মিল নেই। তাই যুদ্ধের সৌন্দর্য বর্ণনায় কলাকৈবল্যবাদিতার স্থান নেই। একটি ধারণার সত্যকে রূপদান যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। হত্যা কিংবা সন্ত্রাস যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়। হত্যাকে চিরতরে পরাস্ত করা যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। যুদ্ধকালে যোদ্ধা কবিরা যে-সব পারিপার্শ্বিকতার মধ্য থেকে কবিতা রচনা করেন তা-ই মূলত যুদ্ধের কবিতা। মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে লেখা যে কোনো সময়ের কবিতাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের কবিতা বললেও যুদ্ধকালে যোদ্ধা কবিতার সঙ্গে যার তুলনা হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে-কবিতাগুলো বেছে বের করা কঠিন। কারণ ঐ সময়ে যে সব কবি মুক্তিযোদ্ধা রণাঙ্গণে ছিলেন, তাদের পক্ষে কবিতা প্রকাশ সহজ ছিল না। তাছাড়া পরবর্তীকালে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শিল্পোত্তীর্ণ কবিতা লিখেছেন; কিন্তু তাদের অনেকেরই রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা ছিল না। এ ক্ষেত্রে আহসান হাবীবের 'সার্চ' সিকান্দার আবু জাফরের 'বাংলা ছাড়ো', শামসুর রাহমানের 'এখানে দরজা ছিল' কবিতা স্মরণযোগ্য :

১.
হল্ট বলেই হুঙ্কার ছেড়েই যম সামনে খাড়া

লোমশ কর্কশ হাত ঢুকে গেল প্যান্টের পকেট
কিছু পয়সা দুটি ফুল সুতোর বাণ্ডিল অতঃপর
ভারী হাতে কোমর জরিপ। কিছু নেই।
কুছ নেহি? বোমাওমা? সার্চ্ সার্চ্ বাতাও নেহিত...
যুদ্ধকালে এই বাংলাদেশ, এই রাজধানী ঢাকার চিত্র সবার জানা।

২.
রক্ত চোখের আগুন মেখে ঝলসে যাওয়া
আমার বছরগুলো
কণ্ঠনালীর খুন পিয়াসী ছুরি
কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে
কেউটে সাপের ঝাঁপি।

৩.
এখানে দরজা ছিল, দরজার ওপর মাধবী
লতার একান্ত শোভা। এখন এখানে কিছু নেই,
কিছু নেই। শুধু এক বেকুব দেয়াল শেল-খাওয়া
কেমন দাঁড়ানো একা।

বাঙলা কবিতায় বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পরিধি ব্যাপক। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আগে এবং পরে প্রায় অর্ধশত বছর ধরে এ-দেশের কবিরা মুক্তিযুদ্ধের কবিতা লিখেছেন। এসব কবিতায় মুক্তিকামী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন যাত্রা প্রতিফলিত হলেও রণাঙ্গনের নয় মাসে রক্ত দিয়ে লেখা কবিতার সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

মুক্তিযুদ্ধের কবিতাকে কালের দিক দিয়ে তিন পর্যায়ে ফেলা যায় :

১. চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লিখিত কবিতা।
২. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লিখিত কবিতা।
৩. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে লিখিত কবিতা।

বিষয়ের দিক দিয়েও এ-কবিতাগুলোর বহুমাত্রিকতা রয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে সাহিত্য বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়। কবি শব্দের মাধ্যমে তার অবিনশ্বর ধারণার জগৎ নির্মাণ করতে চান। কখনো একটি বা দুটি শব্দের

মাধ্যমে তিনি পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। যেমন : সৈয়দ শামসুল হকের 'বস্তুর আকার', জগন্নাথ হল', 'শূন্য পটভূমিতে শূন্যতার স্থির চিত্র', 'গেরিলা' কিংবা আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ঘাতক ১৯৫' কবিতাটি। কবির কাজ পাঠকের চেতনালোকে ঘটনার অস্তিত্ব তুলে ধরা।

এ-সময়ে লিখিত আল মাহমুদের 'ক্যামোফ্লাজ' কবিতাটি এখানে স্মরণযোগ্য। কবি টোটাল ধারণাকে একটি অস্তিত্ববাদী চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে তার পরিবেশের বিবর্তনবাদের সঙ্গে। যে-যুদ্ধ অনিবার্য সে যুদ্ধ প্রাকৃতিক। প্রকৃতির অনিবার্যতা থেকে কবি মুক্তিযুদ্ধকে আলাদা করে দেখেননি। প্রকৃতি ও উদ্ভিদবিদ্যার এমন সব ইঙ্গিত কবি এখানে তুলে ধরেছেন-যা বাঁচার যুদ্ধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

নিজেকে বাঁচাতে হলে পরে নাও হরিৎ পোশাক
সবুজ শাড়িটি পর ম্যাচ করে, প্রজাপতিরা যেমন
জন্ম-জন্মান্তর ধরে হয়ে থাকে পাতার মতন।
প্রাণের ওপরে আজ লতাগুল্ম পত্রগুচ্ছ ধরে
তোমাকে বাঁচতে হবে হতভম্ব সন্ততি তোমার।

এছাড়া পঞ্চাশ দশকের কবিদের মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমানের স্মৃতি, তোমার আপন পতাকা, এখন সকল শব্দই, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, মানুষের স্বাধীনতা, কমলের চোখ, আর কত রক্ত দিতে হবে, সাইয়িদ আতিকুল্লাহর আরো একবার ভালোবেসে, তাও যদি কেউ দেখে, আতাউর রহমানের মা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের জার্নাল ১৯৭১, সহজে নয়, ঘৃণা-ক্রোধের বারুদ, সন্তোষগুপ্তের ফেরারি স্বদেশ, আহমদ রফিকের এ দেশ আমার স্বর্গ, আবু হেনা মোস্তফা কামালের ছবি, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মঞ্চে দেখা দাও, অপরাজেয়, আলাউদ্দিন আল-আজাদের স্বাধীনতা ওগো স্বাধীনতা, জুলফিকার মতিনের মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, ফজল শাহবুদ্দীনের এপ্রিলের একটি দিন ১৯৭১, বাংলাদেশ একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাকে, নবান্ন ১৩৭৬, আবুবকর সিদ্দিকের শপথের স্বর, শহীদ কাদরীর নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে, ব্ল্যাকআউটের পূর্ণিমায়, ওমর আলীর স্বদেশে ফিরছি, বেলাল চৌধুরীর স্বদেশভূমি, মর্মে মর্মে স্বাধীনতা উল্লেখযোগ্য।

ষাটের কবিদের অনেকেই সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাই তাদের কবিতায় প্রত্যক্ষ বারুদের গন্ধ ও গ্রেনেডের বিস্ফোরণ শোনা যায়। ষাটের

অন্যতম প্রধান কবি রফিক আজাদের একজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মসমর্পণ কবিতাটি ঠিক এমন :

হাতিয়ার হাতে দুশমনের মোকাবেলা করলাম
বারদের গন্ধ মাখলাম শরীরে
ক্রলিং করে শত্রুর বাংকারে গ্রেনেড ছুঁড়ে
টুকরো টুকরো করে দিলাম শত্রুর সোনালী স্বপ্নকে।

নির্মলেন্দু গুণের আগ্নেয়াস্ত্র কবিতা থেকে :

আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য করে হয়ে গেছি
কোমল বিদ্রোহী– প্রকাশ্যে ফিরছি ঘরে ঘরে
অথচ আমার সঙ্গে
হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র
আমি জমা দিইনি।

মাহবুব সাদিকের যুদ্ধভাসান কবিতার মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। কবি যেখানেই যান সখিপুর তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। হাটফেরা অছিরুদ্দিনের ছিন্নভিন্ন লাশ, গারো রমণীর ভালোবাসা, কিশোর মুক্তিযোদ্ধা কুদ্দুস কবির কাছে সখীপুরের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

খুব বেশি দূরে নয় সখীপুর
শহর ছাড়লে গ্রাম, তারপর গ্রাম, তারপর
পাহাড়ের জানু ছুঁয়ে লাঙলের মতো বাঁকা নদী
তারপর সবুজ যুদ্ধভূমি সখীপুর...
কি করে ভুলব তাকে
যেখানেই যাই সখীপুর সঙ্গে সঙ্গে থাকে

এ-সময়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল হাসান, আল মুজাহিদী, বুলবুল খান মাহবুব, সিকদার আমিনুল হক, আসাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিক, হুমায়ূন আজাদ, রাজীব আহসান চৌধুরী, আবু কায়সার, ফরহাদ মজহার, খালেদা এদিব চৌধুরী, সমুদ্রগুপ্ত, মুহম্মদ নূরুল হুদা, হেলাল হাফিজ, অসীম সাহা, মাকিদ হায়দার, অরুণাভ সরকার, শামসুল ইসলাম, হুমায়ূন কবির, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, জাহিদুল হক, আলতাফ হোসেনসহ অনেক কবিই তখন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন।

ষাটের পরে মূলত সত্তর দশকের কবিরাই প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম। সাদা কাগজ আর শত্রুর বিরুদ্ধে তারা একই সঙ্গে কলম আর বন্দুক ধারণ করেছিলেন। বুকের রক্ত আর কলমের কালি তাদের কাছে সমার্থক ছিল। তারা ছিলেন ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধের সন্তান। দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা আর তারুণ্যের তরতাজা আগুন তাদের কবিতাকে দিয়েছিল একই সঙ্গে দ্রোহ ও টিকে থাকার ক্ষমতা। নান্দনিক বিচারে যা ছিল তাদের কবিতার দুর্বল দিক তা-ই কালের বিচারে কালোত্তীর্ণ বিষয় সৌন্দর্য নিয়ে টিকে থাকবে বহুকাল।

এ-সময়ের কবিদের মুক্তিযুদ্ধের কবিতার কিছু উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি :

১. ক্রোধের জন্য ক্রোধ নয়? আমি যুদ্ধ করেছিলাম ভালোবাসার জন্য
(গ্রেনেড : আবিদ আজাদ)

২. খুব মনে পড়ে নজরুলকে ডিসেম্বর মাসে
(নজরুলকে মনে পড়ে : শিহাব সরকার)

৩. প্রত্যেক পালকে আছে বন্ধনহীন মেঘের স্বাধীনতা
(খোলা জানালার দিন : জাহিদ হায়দার)

৪. যুদ্ধ মিছিলে মৃত্যু বারুদে মাখা
সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল সেই মুখখানি
(স্বাধীনতা প্রিয় ছিল : কামাল চৌধুরী)

৫. বিজয়ের বোন দরজায় কড়া নাড়ে
(বিজয়ের বোন কড়া নেড়ে যায় : নাসির আহমেদ)

৭. অন্তহীন মুক্তিযোদ্ধার ছায়া আমার ছায়ার সাথে
(বাঙালির অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ : ইকবাল আজিজ)

৮. ঠিক এমনি বাউল সেজে নয় মাস বসবাস
(মনে আছে কি : হালিম আজাদ)

৯. বিপন্ন এশিয়ার বুকে ধুঁকে মরছে পৃথিবীর কনিষ্ঠ সন্তান
(বাংলাদেশ ; সোহরাব হাসান)

মুক্তিযুদ্ধের কবিতা বাংলা কবিতায় নিঃসন্দেহে একটি বাঁক ও বিপ্লব। যে কোনো সময়ের কবিতা থেকে তা আলাদা করে চেনা যায়। যুদ্ধের ভয়াবহতা, জীবন-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা, রণাঙ্গনের চিত্র, তৎকালীন ব্যবহার্য মারণাস্ত্র এই সময়ের কবিতার অঙ্গ গঠনে সহায়ক হয়ে ওঠে। এ-সময়ের শব্দ ও বাকপ্রতিম, উপমা ও উৎপেক্ষা, ছন্দ ও ছন্দপতন বাংলা কবিতাকে এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

যে কোনো কবিতা কবির দায় নয় আনন্দ। প্রকৃত কবি কবিতার মাধ্যমে তার সত্যের মুখোমুখী হন। এক্সটার্নাল রিয়ালিটির অবসান ঘটলেও কবির ইন্টারনাল রিয়ালিটি নতুন সত্যের দিকে ধাবিত হয়। তেমনি মুক্তিযুদ্ধ আজ ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু বাঙালি কবিরা যে-সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্যতে পরিণত করেছিলেন। তার জাতির আবেগকে ভাষায় গেঁথে তুলেছিলেন। যার স্পন্দন আজকের পাঠকও স্পষ্ট শুনতে পায়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্বীয় রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হলো।

আমি এক মুক্তিযোদ্ধাকে চিনি
যুদ্ধে যার একটি পা খোয়া গেছে
এখন এক পায়ে লাফিয়ে চলে
আগে তাকে দেখলে কষ্ট হতো
আমাদের স্বাধীনতা তার একটি পা নিয়েছে
বর্তমানে সে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা
এখন তাকে দেখলে অন্যরকম মনে হয়
ভাবি, মানুষকে চলতে গেলে
সামনে এগুতে গেলে তো
এক পায়ের ওপর দাঁড়াতে হয়
অন্য পা তো সব সময় উপরে উঠে থাকে
দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ এগুতে পারে না
দুপায়ে ভর দেয়া মানুষ কোথাও যেতে পারে না
মুক্তিযোদ্ধাকে তো অনেক দূর যেতে হবে।
(আমি এক মুক্তিযোদ্ধাকে চিনি : মজিদ মাহমুদ)

সংযুক্তি :

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতার শিল্পগুণ নিয়ে একটি বিতর্ক হয়ে গেল সামাজিক মিডিয়ায়। সোহেল হাসান গালিব লিখেছিলেন– "বাংলা ভাষায় সর্বাধিক কবিতা লেখা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। তারপর সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ। এই তালিকা থেকে আমি বাদ রাখছি রাধা, কৃষ্ণ ও হযরত মুহম্মদকে। কারণ সেটার পরিসংখ্যান উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব।

বাংলা ভাষায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট কবিতাগুলিও রচিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। এইসব কবিতায় যেমন আছে ভক্তপ্রাণের সৎ ও সরল আবেগ, তেমনি আছে ধূর্ত অকবিদের মুনাফেকি প্রেম।

কবিতার কৃষ্টতা বিচারের ক্ষেত্রে আমরা যে ভুলটা করি সে সম্পর্কে আজ ছোট একটা খুতবা দিতে চাই এই পোস্টে। কবিদের জন্য এই খুতবা ততটা নয়, যতটা কবিতা-ক্রিটিকদের জন্য।

কন্টেন্ট ও কন্টেক্সটের গরিমা যে কোনো টেক্সকে বাই-ডিফল্ট মহিমান্বিত করে। যেমন ধরেন, আপনি মা-কে নিয়ে একটা গান গাইলেন। অমনি নিখিল-সন্তানেরা হামলে পড়বে, হাইমাউ করে কেঁদে উঠবে। এই কান্নার কারণ এক চিলতে রিচুয়াল, এক চিলতে ব্যক্তিগত স্মৃতি-সব মিলিয়ে 'মা' সম্পর্কে করুণ ও আর্দ্র একটি পারসেপশন। এখানে আর্টের ভূমিকা খুব সামান্য। একটা অ্যালার্ম ঘড়ির মতো, সে শুধু ঘুম ভাঙাবে। বাকি কাজ আপনিই করবেন।

ঠিক তেমনি, আপনি যখন নাজি-হলোকাস্টের ওপর কোনো উপন্যাস পড়েন, কিংবা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ওপর, আপনার আবেগ-তাড়িত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ১২ আনা, যদি সে উপন্যাস ১৬ আনা ফালতুও হয়। কারণ এখানে আপনি পরিচালিত হন কনটেক্সট দিয়ে, টেক্সট দিয়ে নয়।

কিন্তু যখন একটা তেলাপোকার জন্য, একটা কালকেউটের জন্য আপনার বুকে হাহাকার জাগে, জানবেন অনেক বেশি আপনি মোটিভেটেড বাই আর্ট। উদাহরণ হিশেবে বলতে পারি সেলিম আল দীনের 'প্রাচ্য'। দেখবেন শেষ পর্যন্ত একটা সাপের জন্য আপনার মায়া তৈরি হবে। যে সাপটি এক নববধূকে দংশন করেছে।

দুর্ভাগ্য এই, আমাদের গুরুগম্ভীর আলোচকবৃন্দ প্রায়শই টেক্সট ফেলে দিয়ে, সগৌরবে, কনটেক্সটের ওপর ফোকাস করেন বেশি, কারণ আর্টের ব্যাখ্যা তাদের জানা নেই। আর জানা থাকলেও, সেই ব্যাখ্যা দিয়ে ঐ টেক্সট তারা সামলাতে পারেন না।' বক্তব্য রেখে বিতর্কটা আমরা এড়িয়ে গেলাম। সোহেল হাসান গালিবের একটি নমুনা কবিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে।'

(সামাজিক যোগাযোগে এই কাব্যিক বিতর্ক খুব স্বাস্থ্যপদ ছিল আমার বিবেচনায় যেখানে কবি নির্মলেন্দু গুণ অংশ নিয়েছিলেন। ফলে গালিবের কবিতাটি দলছুট মনে হবে না)।

একটি পাইপ

ধোঁয়ার ফণা তুলে দুঃখমেশা ক্রোধে
কবেই উড়ে গেছ মেঘের অনুরোধে

ধুলায় লুণ্ঠিত পাইপ নিয়ে তাই
ছড়িয়ে দিল কেউ বিষাদমাখা ছাই

নিষাদ ছিল বনে, বিছিয়ে জালখানা
বোঝে নি কেউ তার বাঁধন আলগা না

ছিল তো ঠিকই প্রেম রক্ত-ফাল্গুনে
কেটেছে কত দিন নিষেধে গাল শুনে

দেখেছি মানুষের আগুনে-ফুলগুলি
বাতাসে ঘ্রাণময় ধোঁয়ার কুণ্ডুলি

স্মৃতির কণা ছুঁয়ে সময় ধরে রাখি-
যে কেউ দেবে টান, সুবাস পাবে না কি?

বঙ্গবন্ধু বাংলা গল্পে রূপকথার রাজপুত্র

"ফতেহপুর সিক্রি অনেক বড়। এই ফতেহপুর সিক্রির সামনেই যে বিরাট ময়দান দেখা যায় এর নামই খানওয়া। এখানেই সম্রাট বাবর সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। কেন যে আকবর বাদশা এখানে দুর্গ তৈরি করেন তা বলা কষ্টকর।" – (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

১.

কবিতার মতো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্পও কম লেখা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় সব গল্প উপন্যাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ছায়াপাত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে যে সর্বব্যাপ্ত যেখানে বঙ্গবন্ধু সদা উপস্থিত। উল্লেখযোগ্য সব কথাসাহিত্যিকই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোনো না কোনো পর্যায়ে লিখেছেন। বঙ্গবন্ধুর উপর সম্প্রতি ৫৫টি ছোট গল্প নিয়ে 'জনকের মুখ' নামে আখতার হুসেন একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। 'সবগুলো গল্প তাঁকে নিয়ে লেখা, যিনি বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশের স্থপতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গল্পগুলোতে মূর্ত হয়েছেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। জেলবন্দী মুজিব থেকে শুরু করে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনা পর্যন্ত বইটির ব্যাপ্তি। বইটির শুরু হয়েছে আবুল ফজলের লেখা 'ইতিহাসের কণ্ঠস্বর' গল্প দিয়ে। একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে নিহত হওয়ার ঘটনা এসেছে এই গল্পে। আর শেষ গল্পটা লিখেছেন মোজাম্মেল হক নিয়োগী। নাম 'মৃত্তিকার করতলে।' শওকত ওসমানের 'দুই সঙ্গী'র মতো বেশ কয়েকজন লেখকও সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখেছেন গল্প। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় লেখকদের অসংখ্য গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের লেখা 'বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি এবং 'বাংলাদেশে

বঙ্গবন্ধু চর্চা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় বঙ্গবন্ধুর উপর ১২২ টি গল্প উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে।

আবুল ফজল (ইতিহাসের কণ্ঠস্বর); শওকত ওসমান (দুই সঙ্গী); আবু ইসহাক (মৃত্যু-সংবাদ); ফজলুল হক (চরিত্র); কাজী ফজলুর রহমান (পঁচিশে মার্চ); আবদুল হাফিজ (লাল পল্টন); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৫ মার্চ এবং হিন্দু-মুসলমানের গল্প; সৈয়দ শামসুল হক (নেয়ামতকে নিয়ে গল্প); রাহাত খান (দীর্ঘ অশ্রুপাত); আনোয়ারা সৈয়দ হক (সংকট); বিপ্রদাশ বড়ুয়া (ফিরে তাকাতেই দেখি); রশীদ হায়দার (শেষটাই সত্য); রেজাউর রহমান (উল্কাপাত); আখতার হুসেন (সেই ব্যর্থতার পর); সুব্রত বড়ুয়া (বুলি তোমাকে লিখছি); জুলফিকার মতিন (ভোররাত্রির হত্যাকাণ্ড); সেলিনা হোসেন (আগস্টের এক রাত); শেখর দত্ত (ওরা চারজন); হুমায়ুন আজাদ (জাদুকরের মৃত্যু); হারুন উর রশীদ (বত্রিশ নম্বরে এক বিকেল); অসীম সাহা (ভ্রূণ); সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় (সেই ছায়া); দিলারা মেসবাহ (বঙ্গের বন্ধু); মাহবুব আলম (সে কাজটিই করতে যাচ্ছি); শিহাব সরকার (হায়েনার রাত); শরীফ খান (সেগুন কাঠের নাও); সৈয়দ ইকবাল (একদিন বঙ্গবন্ধু); সাহিদা বেগম (সোনালী ভোর); ইমদাদুল হক মিলন (নেতা যে রাতে নিহত হলেন); রফিকুর রশীদ (অহংকারের শেকড়বাকড়); শেখ লুৎফর (নরকের লু); দিলওয়ার হাসান (জয়নাল মাস্টার) আফরোজা পারভীন (নয়ন সমুখে); সুজন বড়ুয়া (একদিন পাহাড়ে বঙ্গবন্ধু); ঝর্না রহমান (অলৌকিক ত্রিচক্রযান); মোসাদ্দেক আহমেদ (অযান্ত্রিক); গোলাম শফিক (বজ্রে গাঁথা কাব্য); বিলু কবীর (তাঁর জন্যে); বকুল আশরাফ (রিফাত ও একটি থ্রি ব্যান্ডের রেডিও); স.ম. শামসুল আলম (একজন মিরধা ভাই অথবা তার বন্ধু); আহ্সান ওয়াহিদ (দ্য পাওয়ার); আহমাদ মাযহার (বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্প); আনিস রহমান (আগস্ট উপাখ্যান); অমল সাহা (দিব্য পুরুষ); জাকির তালুকদার (পিতৃপরিচয়); রাশেদ রহমান (দেবদূত); আনিসুল হক ('আমি মাথা নিচু করি না'); ইকবাল খোরশেদ (স্বাগতম); রাজীব নূর (যখন কান্নায়ও আড়াল তুলতে হয়েছিল); মনি হায়দার (শেখ মুজিবের রক্ত); মাহবুব রেজা (মানুষটা); আহমেদ রিয়াজ (গর্জন); সমীর আহমেদ (দাওয়াল); সোলায়মান সুমন (একটি সাদা কবুতরের প্রতীক্ষা); মোজাম্মেল হক নিয়োগী (মৃত্তিকার করতলে)। এ ছাড়া আনিসুল হক এর (কালো ভোর); আবুল ফজল এর (মৃতের আত্মহত্যা); আমীরুল ইসলাম এর (জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু); খালিদ মারুফের (তিব্বত ৫৭০); নাহার মনিকার (কণ্ঠস্বর); মাজহারুল ইসলামের

(জালাল মাস্টারের সংসার); শাহ্নাজ মুন্নীর (আমার বন্ধু); সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের (তিন পুরুষ); সিরাজুল ইসলাম মুনিরের (সাবজেল)। 'মুজিবকে নিয়ে সৃজনে-মননে ঘটেছে বিপ্লব' এই সৃজন বিপ্লবের শস্যরূপে আমরা পেয়েছি সহস্রাধিক গল্প, পেয়েছি অজস্র কবিতা, উপন্যাস ও গান। পেয়েছি নাটক, চলচ্চিত্র ও কাব্যনাট্য। ছড়া ও শিশুতোষ সাহিত্যে মুজিবের জীবন এসেছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। গানে-প্রবন্ধে মুজিব ছড়িয়ে পড়েছেন মননশীল জগৎ হতে বিনোদন ও দেশাত্মবোধের অপ্রতিম সাম্রাজ্যে। প্রতিদিন আজো মুজিবকে নিয়ে নতুন কিছু না কিছু কেউ না কেউ সৃষ্টি করে চলেছেন। মুজিব আজ এক অনন্য সৃজন-বিপ্লবের নাম। মুজিবকে নিরন্তর সৃজনশস্যে আবিষ্কারের প্রয়াস আজ বর্ণিলভাবে বহমান।

বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে সাহিত্যিক আবুল ফজল প্রথম উদিত হন রাঙা অরুণ হয়ে তাঁর ছোটোগল্প 'আত্মহত্যা'য়। এমনিভাবে পরবর্তীতে তাঁর আরো অন্যান্য গল্প 'ইতিহাসের কণ্ঠস্বর', 'কান্না', 'নিহত ঘুম' ইত্যাদিতে উঠে আসে বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ। এছাড়া রশীদ হায়দারের 'এ নহে পতন' খালেদা এদিব চৌধুরীর 'রক্তে ভেজা দিন', রশীদ হায়দারের 'রাখালপুত্র ও রাজপুত্রের গল্প', সৈয়দ ইকবালের 'একদিন বঙ্গবন্ধু', শরীফ খানের 'নক্শি কাঁথায় শোকগাথা', আমীরুল ইসলামের 'ভয়ানক সকালের গল্প', ইমতিয়ার শামীমের 'যে ভোরে শিউলি ঝরে', সারওয়ার উল-ইসলামের 'প্রিয় বঙ্গবন্ধু" গল্পে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ফুটে উঠেছে।

২.

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সেলিনা হোসেন একটি গল্প গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি নিজেও একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু জীবনের বিভিন্ন সময় নিয়ে। তাঁর জবানিতে- 'এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটা ছোট গল্পের বইয়ে হাত দিয়েছি। ১৫টি গল্প লিখে ফেলেছি। এই গল্পগুলোর মধ্যে তিনি জেলখানায় কী করতেন, টুঙ্গিপাড়ায় কী করতেন- এসব বিষয় উঠে এসেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্পগুলো লিখছি। আরও কয়েকটা লেখার পরিকল্পনা আছে। বইটার নাম দিব 'গল্পের ছায়ায় বঙ্গবন্ধু।' বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন, নাম 'আগস্টের এক রাত।' এই উপন্যাসের পটভূমি নিয়ে তাঁর লেখায় জানা যায়- '২০০৯ সালের

২১ সেপ্টেম্বর। একটি অনুষ্ঠানে আমার দেখা হয়েছিল অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুব আলম সাহেবের সঙ্গে। তিনি কাছে এসে বললেন, আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। একটি উপন্যাস লেখার জন্য কিছু উপাদান আমি আপনাকে দিতে চাই। আপনি সময় করে হাইকোর্টে আমার অফিসে আসবেন।'

'কিছুদিন পর অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেবের অফিসে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি তার লোককে বললেন, ওনার জন্য যে ফাইলটা রেখেছি ওটা নিয়ে এসো। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে একটি বড়সড় ফাইল নিয়ে এলো। তিনি বললেন, এই ফাইলটি হলো বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষীদের জবানবন্দি। ১৫ আগস্ট রাতে কী ঘটেছিল তার বিবরণ।'

সেলিনা হোসেনের 'আগস্টের এক রাত' উপন্যাসটিতে এক মহাকাব্যিক বিস্তার ধারণের চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। বাঙালির সত্যিকারের মহানায়ক যেহেতু তার এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সেহেতু সব মমতা তিনি এই চরিত্রে ঢেলে দিয়েছেন। ঠিক কবিতার মতো করেই বর্ণনা করেছেন। সমগ্র বাংলাদেশের সবপ্রান্তরের সব মানুষকেই তিনি এই উপন্যাসের অনুষঙ্গ করেছেন। একই সঙ্গে এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, একই সঙ্গে কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের সৃজনশীল শৈলীর অনন্য প্রকাশ। তাঁর উপন্যাস থেকে একটু বর্ণনা দিলে আরো পরিষ্কার হবে, 'তাঁর শরীর এখন আর বত্রিশ নম্বরের সিঁড়িতে নেই। এই শরীর ক্রমাগত প্রতিটি গ্রাম, শস্যখেত, কুঁড়েঘর, মেঠোপথ, খেলার মাঠ, শহর, রাজপথ, অলিগলি, শহরতলি, দালানকোঠা, ফলের বাগান, টিলা-পাহাড়, বনভূমি। কোনো জায়গায় বাদ নেই। যে কেউ যে কোনো জায়গায় হাত রাখলে ছুঁতে পারে তাঁর তর্জনী। কিংবা পায়ের বুড়ো আঙুল, হাতের কড়ে আঙুল, চোখ, নাক, বুক, পিঠ, চুল- শরীরের সবটুকু।"

প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আবুল ফজল 'ইতিহাসের কণ্ঠস্বর' গল্পে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পরে জাতির পিতার পরিত্যক্ত আবাস ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর নিয়ে এই গল্পটি লিখেছেন। একদিন এই বাড়ি থেকে বাংলার প্রতিটি বাড়িতে স্বাধীনতার ডাক ছড়িয়ে পড়েছিল, অথচ সেই বাড়ি আজ ভয়ঙ্কর ভূতড়ে ইতিহাসের এক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটির এই শূন্য অবস্থার কথা বিবেচনা করে গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র শেখ আহমদ আলী, বঙ্গবন্ধুর ছোট চাচা, যিনি ভাবলেন, যতদিন তার

নাতনি দুটি বিদেশ থেকে ফিরে না আসে, ততোদিন সে-ই না হয় থাকবে। কিন্তু থাকবে বলেই তো থাকা যায় না। এক. তৎকালীন সব বৈরি সরকারের অনুমতি পাওয়া, দুই. দেশের সেরা এই বাড়িতে বাঙালিশ্রেষ্ঠ সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন। সরকারের অনুমতি যদিও পাওয়া গেল। থাকাও শুরু হলো, কিন্তু এক অতিলৌকিক ভয় বাড়ির বাসিন্দাদের আকড়ে ধরল। কেউ আর রাতে ঘুমাতে পারে না। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের মতো অতৃপ্ত আত্মারা রক্তের সমুদ্রে নিজেদের নিপতিত করছিল। সপ্তাহ খানেক না যেতেই চাকর-চাকরানি এক সঙ্গে এসে বলল, 'এই বাড়িতে সড়াব কী কইরা থাকন যাইব? সাঁঝ হইতে হ্যাঁ ছমছম করতে থাকে। চাপা কান্নার শব্দ যেন সারা রাত ধরইরা চশুনতে পাই।... স্বপ্নে শুধু রক্ত দেখতে পাই ভয়ে বাঁচি না।' আবুল ফজলের গল্পটি সত্যিই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে এক ভয়াবহ অনন্য সৃষ্টি। এই গল্প পাঠককে সক্রিয় করে তোলে ইতিহাসের এই ভয়াবহ নির্মমতার ব্যাপারে। তিনি রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের প্রতীকি ব্যবহার করেছেন এই গল্পে। যেন মেহের আলী বলছে 'এখন থেকে প্রায় রাতেই শুনতে পান। তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুট হায় সব ঝুট হায়। কী ঝুট হ্যায়? সেদিনের ইতিহাস? সেই রক্তাক্ত ভোররাত্রির কাহিনি, না তার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ? না আমদের এই বাড়িতে অবস্থান? মেহের আলী কি চিরজীবী, না চিরন্তনের প্রতিনিধি? না আবহমান ইতিহাসের এক অবিনশ্বর কণ্ঠস্বর?'

শওকত ওসমান বঙ্গবন্ধুর জীবনের এক সত্য ঘটনার গল্পে রূপ দিয়েছেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেও ঘটনাটি আছে। একবার বঙ্গবন্ধু নৌকাযোগে রাত্রি বেলা যাচ্ছিলেন। তখন রাতে নদীতে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটত, জলদস্যুদের উৎপাত ছিল বেশি। বঙ্গবন্ধু যে নৌকায় যাচ্ছিলেন, সে নৌকা ডাকাতদের কবলে পড়ল। বঙ্গবন্ধু ঘুমাচ্ছিলেন বলে মাঝি তাঁকে জাগাতে চাননি। ডাকাত সদ্দার বারবার জিজ্ঞাস করতে লাগলে, নৌকায় কে যায়। যখন শুনল, এই নৌকায় বঙ্গবন্ধু আছে, তখন মাঝিকে জোরে একটা থাপ্পর দিয়ে বলে গেল, তুই এতক্ষণ বলিসনি কেন। তারপর তার নাও ছেড়ে চলে গেল। শওকত ওসমানের দক্ষ হাতে জানা গল্পটি পুনরায় নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে।

'সূর্য দীঘল বাড়ি'র বাড়ির রচয়িতা আবু ইসহাকের গল্প 'মৃত্যু-সংবাদ' গল্পটি পড়তে পড়তে মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে তারই ঘনিষ্টজন,

তারই দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকারী, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য কিভাবে খুনিদের মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিল। এই সত্য ঘটনাকেও কথাশিল্পী তাঁর রূপদক্ষতা দিয়ে অপূর্ব পরিবেশন করেছেন।

সৈয়দ শামসুল হকের 'নেয়ামতকে নিয়ে গল্প'টি বেশ দক্ষতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এক প্রতীকি গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। নেয়ামত যে ভবিষ্যৎ বলতে পারে, এবং তা ঠিকও হয়। মোতাহার নামে এক যুবক বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিবাদ করে ঢাকার দিকে রওনা হয়, তার সঙ্গে যোগ দেয় বহু মানুষ, কিন্তু মোতাহার বন্দী হয় পুলিশের হাতে। তাঁর আট বছরের জেল হয়। পরে রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে তাকে মুক্তিও দেয়া হয়। মোতাহার এবং তার উত্তম পুরুষ বন্ধুর গল্প। এই গল্পের মধ্যে এক পরাবাস্তবতার ছাপ আছে। কিন্তু এই গল্প বয়ানের মুন্সিয়ানায় পাঠকের হৃদয়ে এক করুণ রসের সৃষ্টি করে।

"সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে বঙ্গবন্ধুকে ইতিমধ্যেই উপস্থাপিত করেছেন, সেটা তাঁর পূর্ণ জীবন-কাহিনির সাহিত্য-ভাষ্য না হলেও। হোক না খণ্ডিত সেই উপস্থাপনা। সময়ের অপেক্ষামাত্র, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মাটি থেকেই আরভিং স্টোন বা হাওয়ার্ড ফাস্ট-দের মতো অনেকেই এগিয়ে আসবেন, যাঁরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করবেন বঙ্গবন্ধুকে তাঁদের রচিত উপন্যাসের পর উপন্যাসের ভেতর দিয়ে। আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনুকূলে দৃষ্টান্ত হাজির করা যেতে পারে অতি সহজেই। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জীবন-কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যিক আনিসুল হকের দুই খণ্ডের উপন্যাস যথাক্রমে 'উষার দুয়ারে' ও 'যারা ভোর এনেছিল' এবং সেলিনা হোসেনের 'আগস্টের এক রাত'। পাশাপাশি স্মর্তব্য কথাসাহিত্যের জোরালো শাখা ছোটগল্পেও বঙ্গবন্ধুকে চিত্রিত ও চরিত্র করার ঘটনা। এসব ছোটগল্পের কোনো কোনোটিতে তিনি সরাসরি নায়ক, কখনো উপস্থাপিত রূপকাশ্রয়ে, কখনো ঘটনা আবর্তিত তাঁর প্রচ্ছন্ন অথচ সরব উপস্থিতিতে।

কবি ও কথাশিল্পী খালেদা এদিব চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর সপরিবার হত্যার বিষয়কে অবলম্বন করে 'রক্তমাখা দিন' নামে এক প্রতিবাদী গল্প লিখেছেন। যেখানে জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। 'চারদিকে জয়বাংলা স্লোগান। লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছিল শুধু জয় বাংলা, জয় বাংলা...সে কথা কেমন

করে ভুলবে তপু। ওর দুপা অবশ হয়ে আসে। যেন পথ চলতে পারবে না আর। এই মানুষটাকে ঘাতকেরা মেরে ফেলল? পরে পরিবারসহ বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই পুত্র বধূ কেউ তো বাঁচতে পারল না। বাঁচতে পারল না আট বছরের ছোট্ট ছেলে রাসেল! ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সকালে বাবার মুখে শোনা রেডিওর ঘোষণা মনে পড়ছে আবার।'

(খালেদা এদিব চৌধুরী : রক্তমাখা দিন)

কথাসাহিত্যিক রশীদ হায়দার 'রাখালপুত্র ও রাজপুত্রের গল্প' শিরোনামে রূপ কথার আদলে একটি গল্প লিখেছেন। গল্পটি মাটি মানুষ প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা জন্মানোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। এই গল্পের মূল বার্তা বঙ্গবন্ধুকে জানলে একটি এ দেশকেও সঠিকভাবে জানা যাবে, ভালোবাসা যাবে। 'বঙ্গবন্ধুও পারেননি ভুলতে। তিনি যে সত্যিই আকাশছোঁয়া মানুষ ছিলেন, তা তোমরা আরও বেশি করে জানতে পারবে, যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পড়। এই ইতিহাসই বলে দেবে, তিনি রূপকথার রাজপুত্র বা রাজার চাইতে অনেক বেশি ছিলেন বাঙালির রাজা, মানুষের রাজা।'

(রশীদ হায়দার : রাখালপুত্র ও রাজপুত্রের গল্প)

বিপ্রদাস বড়ুয়া 'ফিরে তাকাতেই দেখি বঙ্গবন্ধু' নামে বর্তমান সময় নিয়ে একটি স্মৃতিবিধুর গল্প লিখেছেন। বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে এখনকার রাজনীতি কেমন হতো, তাঁর ভূমিকা কি হতো এবং এখন আমাদের কি করা উচিত, এই মহান নেতাকে মনে করে। তার গল্পের একটি জিজ্ঞাস্য– 'বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি তো চিরকাল তোমাদের লোক। আন্দোলন করে দেশের মানুষকে জাগিয়ে তোলাই আমার কাজ।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'আমি তো আন্দোলন করতে পথে নামিনি, আমি তো রাজনীতি করি না, ভাড়াটে লোকও নই।'

'খুব ভালো কথা। সবাই রাজনীতি করে না। তবে রাজনীতি না করলেও তোমার ভাগ্য রাজনীতি ও দেশের ভাগ্যের সঙ্গে মিলেমিশে আছে। পালিয়ে এক চুলও যেতে পারবে না।' (বিপ্রদাশ বড়ুয়া : ফিরে তাকাতেই দেখি বঙ্গবন্ধু)

ইমদাদুল হক মিলন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা তার 'নেতা যে রাতে নিহত হলেন' বাংলাদেশের রাজনীতির কপটচারিতা তুলে ধরেছেন। যারা শহুরে মধ্যবিত্ত, ধনি তারাই সর্বদা সুযোগ সুবিধা পেতো চেষ্টা করে, তাদের সব

কাজের পেছনে একটা স্বার্থ যোগ থাকে। নেতার প্রতিও তাদের ভালোবাস অকৃত্রিম নয়, এমনকি বঙ্গবন্ধুকেও তার আশেপাশের চাটার দল ঠিকমতো ভালোবাসতে পারেনি। কিন্তু সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ ঠিকই বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসতেন, তিনি ছাড়া তাদের আর কোনো দরদি নেতা ছিলেন না। 'এতক্ষণের হাসি মুখটা মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে গেল রতনের। একবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল সে। কাতর গলায় বলল, 'না সাহেব, না। আমি একটাও মিথ্যা কথা বলি নাই। আমরা মিথ্যা কথা বলি না। মানুষ গরিব হতে পারি সাহেব কিন্তু আমাদের ভালোবাসাটা খাঁটি। আমাদের মতো গরিব মানুষরাই নেতাকে বেশি ভালোবাসে সাহেব। আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি নেতাকে দেখতে আসছি। এ আমার ম্যালা দিনের স্বপ্ন। আপনে বিশ্বাস করেন।'

(ইমদাদুল হক মিলন : নেতা যে রাতে নিহত হলেন)

সৈয়দ ইকবাল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখেন 'একদিন বঙ্গবন্ধু এবং' । তাঁর গল্পের বর্ণনা 'এলিফেন্ট রোড দিয়ে বিরাট মিছিল এগিয়ে আসছে হাজার হাজার জনতার। নীলক্ষেত-বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে আসছে দুর্বার ছাত্রলীগের মিছিল। বায়তুল মোকাররম পল্টন ঘুরে হুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে আসছে শ্রমিক লীগ; আর অগণিত শ্রমিকের মিছিল। স্লোগানের হুঙ্কারে কেঁপে উঠছে রাস্তা, পাশের প্রত্যেক বাড়ির জানালার কাচ, গাছগাছালির প্রতিটি পাতা কাঁপছে। মানুষের প্লাবন খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নল উঁচানো হাতে ছড়ি তুলে জনতাকে ভয় দেখানো ট্যাঙ্ক, ভূতের মতো কালো পোশাকের সৈন্যদের। কোনো কিছু প্লাবনের স্রোতে দাঁড়াতে পারছে না।

হঠাৎ ঢং ... ঢং ... ঢং লাইট পোস্টে রড পেটানো শব্দে মান্নানের ইচ্ছেস্বপ্ন ভেঙে গেল।

রমনা পার্কের পাশে এক পাগলী বারবার লাইট পোস্টে ঢং-ঢং রড পিটে চিৎকার করছে, 'দেশে একটা বেটা নাই! একটা বেটা মানুষ নাই! সব চিকা! সব চিকা! আয় কোন্ বাপের বেটা আছে আয়, আমার কাছে আয়।'

মান্নান হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সবুজ পার্কে। লতায়-পাতায় ঢাকা প্রায় অন্ধকার হয়ে থাকা একটা বেঞ্চে পা তুলে চিৎ হয়ে কান খাড়া করে বারবার শুনতে লাগল লাইটপোস্টে রড পেটার শব্দ ঢং... ঢং... ঢং...।'

(সৈয়দ ইকবাল : একদিন বঙ্গবন্ধু এবং)

কবি ছড়াকার আমীরুল ইসলামের সাহিত্য সাহিত্যকর্মের একটি বিশদ অংশ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত। তিনি শিশুদের জন্য যেমন লিখেছেন বড়দের জন্যও লিখেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 'ভয়ঙ্কর এক সকাল' নামে গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পটা প্রতীকি, যে দেশে জাতির জনকের নিরাপত্তা নেই, সে দেশে গাছ ফুল পাখি কিভাবে নিরাপদ থাকে। এ দেশের মানুষ যেন সুন্দরে বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। শাপলা দোয়েলের এই বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়া মানেই সেই চেতনার চির অবসান। 'সেই সকালে দুটো সাহসী দোয়েল ৩২ বাড়ির সামনে একটা কৃষ্ণচূড়ার ডালে এসে বলল। আজ তাদের ভয়ানক মন খারাপ। মন খারাপ সেই কৃষ্ণচূড়া গাছেরও।

দোয়েল দুটো মৃতপ্রায়। তাদের ওড়ার শক্তি যেন নেই। চোখ ছলছল। কৃষ্ণচূড়ার কিছু পাতা ঝরে ঝরে পড়ে। সেই পাতার আস্তরনে সবুজ হয়ে যায় গাছতলা। পাখি দুটো নেমে আসে।

রাস্তার ধারে তারা চুপচাপ বসে। একটা বন্দুকের নল উদ্যত হয় তাদের দিকে। দোয়েল দুটো কিছুই বলতে পারে না। কারণ সেই সকালে নিহত হয়েছে জাতির জনক।

জনকের মহাপ্রয়াণে দোয়েল পাখি বা কৃষ্ণচূড়ার গাছ কারও কোনো নিরাপত্তা নেই। দোয়েল দুটো ভাবতে থাকে–বাংলার ইতিহাসে এ রকম ভয়ানক, দুর্ভাগা সকাল যেন আর না আসে।'

(আমীরুল ইসলাম : ভয়ঙ্কর এক সকাল)

জাতির জনককে নিয় ইমতিয়ার শামীমের 'যে ভোরে শিউলি ঝরে' গল্পটি বড় হৃদয় বিদারক। বড় প্রশ্নবোধক, কিভাবে এ রকম একটা পবিত্র ভোরে ঘাতকরা তার জনককে হত্যা করতে পারে। এ ব্যাথা নিয়ে কিভাবে একটা কচ্ছপ দীর্ঘ জীবন পার করবে! তার কাছে আজ মনে হচ্ছে তাঁর আয়ু যদি কিছু কম হতো তাহলে তার এই শোকের অবসান হতো সহজে। 'তবু বিড়ালটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে কচ্ছপটা এক সময় বলে, 'মনটা ভীষণ খারাপ, বুঝেছ? আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। তোমার আয়ু তো মাত্র পাঁচ বছর। কিছুই জান না। ওই শিউলি ফুলটা এক রাত বাঁচলেও যতটুকু বুঝতে পারে ততটুকু বুঝতে পার না। আর আমাকে বাঁচতে হয় আড়াইশ' থেকে তিনশ' বছর। কত কিছু দেখলাম! আচ্ছা তুমিই বল বিড়াল ভায়া এই যে সুন্দর ভোর, মিষ্টি আলোর

আভাস, মেঘের দলের নাচ আর শিউলি ফুলের মায়া–এই রকম ভোরবেলায় মানুষগুলো কী রকমভাবে শেখ মুজিবকে মেরে ফেলল? বলতে পার?'

তারপরেই একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবারও বলে, ওহ্‌হো, তুমি তো আবার শেখ মুজিবকে চেন না–তোমার বয়সই তো মাত্র দু-তিন বছর!

(ইমতিয়ার শামীম : যে ভোরে শিউলি ঝরে)

২. স্বাধিকারের কথাসাহিত্য

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পটি লিখেছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও সাহিত্যিক শহীদ বুদ্ধিজীবী জহির রায়হান। মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনা এই গল্পের অকাট্য সময়ের দাবি প্রমাণ করে। তবে এটি প্রথম গল্প কিনা তা নিশ্চয় করে বলতে পারব না। জহির রায়হানের গল্পটির নাম 'সময়ের প্রয়োজনে'। চলচ্চিত্রকার ও সাংবাদিক এই লেখকের নিজস্ব ঢঙের সঙ্গে গল্পের আঙ্গিকের মিল রয়েছে সর্বাঙ্গে। উত্তম পুরুষে গল্পটি বর্ণিত হলেও কেন্দ্রীয় চরিত্রের একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। লেখক মুক্তিযুদ্ধের একটি ক্যাম্পে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে কমান্ডার তাকে একটি ডায়েরি দেন। ডায়েরির পাঠ্য-বিষয় লেখক এখানে তুলে ধরেন। ছোট গল্পের সাধারণ কাঠামো এখানে রক্ষিত হয়নি। ভালেরি ওসিপভের না 'পাঠানো চিঠি'র ঢঙে গল্পটি লিখিত। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধ কিভাবে মানুষকে দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের অনুভূতি, জীবন-মরণ বোধ এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে। প্রতিদিনই মুক্তিযোদ্ধারা সম্মুখসমরে তার সঙ্গীদের হারাচ্ছেন। আবার নতুন সহযোদ্ধা এসে যোগ দিচ্ছেন। গত দিন যে বন্ধু ছিল আজ সে শত্রুতে পরিণত হচ্ছে। এসবই জহির রায়হানের গল্পের বিষয়। তবু এই গল্পের মধ্যে লেখক দর্শনের গভীর সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। তিনি সবচেয়ে গভীর কথাটি বলেছেন, কেন এই যুদ্ধে লড়তে হচ্ছে তাদের। 'দেশ তো ভূগোলের ব্যাপার। হাজার বছরে যার হাজারবার সীমারেখা পাল্টায়। পাল্টাচ্ছে। ভবিষ্যতেও পাল্টাবে। তাহলে কিসের জন্য লড়ছি আমরা? বন্ধুরা নানাজনে নানারকম উক্তি করেছিল। কেউ বলেছিল আমরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য লড়ছি। ওরা আমাদের মা-বোনদের কুকুর বেড়ালের মতো মেরেছে তাই। তার প্রতিশোধ নিতে চাই। কেউ বলেছিল, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি। ওই শালারা বহু অত্যাচার করেছে

আমাদের ওপর। শোষণ করেছে। তাই ওদের তাড়াবার জন্যই লড়ছি। কেউ বলেছিল অতশত বুঝি না মিয়ারা। আমি শেখ সাহেবের জন্য লড়ছি। কেউ বলেছিল, কেন লড়ছি জানো? দেশের মধ্যে যত গুণ্ডা বদমাশ, ঠগ দালাল ইতর, মহাজন আর ধর্মব্যবসায়ী আছে তাদের পাছায় লাথি মারতে। আমি ওদের কথাগুলো শুনছিলাম। ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে তর্ক করেছিলাম। কিন্তু মন ভরছিল না। কিসের জন্য লড়ছি আমরা? এত প্রাণ দিচ্ছি, এত রক্তক্ষয় করছি? হয়তো সুখের জন্য শান্তির জন্য। নিজের কামনা-বাসনা পরিপূর্ণতা দেবার জন্য। কিংবা শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। অথবা সময়ের প্রয়োজনে। সময়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্য লড়ছি আমরা।' গল্পটি যে যুদ্ধকালে লিখিত হয়েছিল তার প্রমাণ তখনো মুক্তিযুদ্ধের হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণ হয়নি। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের ধারণা ছিল যুদ্ধ শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। পাকিস্তানের মতো ঝানু সামরিক বাহিনির হাত থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে না। আর তাদের র্বর বাহিনির হাতে নির্বিচারে বাঙালি হত্যার ঘটনা নাৎসি হত্যা অতিক্রম করবে বলেই মনে হয়েছিল। যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে সে আশঙ্কা সত্য হতে পারতো।

বাংলা ছোটগল্প বয়সে নবীন। টেনেটুনে শতখানেক বছর। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেইএ ভাষায় সাহিত্যের সবচেয়ে বলবান শাখা হয়ে উঠেছে ছোটগল্প। এ কথা ঠিক এক রবীন্দ্রনাথের হাতেই ছোট গল্পের ঋদ্ধি তাকেই উৎকর্ষের চূড়া বলা যায়। তাই বলে রবীন্দ্র-পরবর্তী ছোট গল্পের বিকাশ থেমে থাকেনি। রবীন্দ্র-পরবর্তীরা ছোটগল্পকে করে তুলেছেন আরো তীক্ষ্ণ ও ইংগিতবাহী। ছোটগল্পের বিষয় সচেতনতাকে নিয়ে কমবেশি আমাদের ধারণা আছে। কিন্তু গত শতকের একাত্তর সালের ২৫ এপ্রিল কালরাত্রির আগে বাংলা ছোটগল্পের লেখকরাও এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে বিষয় করে তোলার কথা ভাবতে পারেননি। আর পারলেও তা গল্প না হয়ে ফ্যান্টাসি হতে পারতো।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জীবনের সম্পূর্ণ আলাদা অভিজ্ঞতা হাজার বছরে ভাষা-জাতির ইতিহাসে তা যেমন ছিল না। ভবিষ্যতে থাকার যুক্তিসংগত কারণ নেই। আগেও হত্যা গণহত্যা বিদ্রোহ আন্দোলন ও রাজ্যবদল হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট সব থেকে ভিন্ন ও বৃহত্তর। এমন একটা সর্বাত্মক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছোটগল্পে তুলে ধরা কি সম্ভব? ছোটগল্প বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর প্রতিবিম্ব

হলেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হাজারো কাহিনি, হাজারো অভিজ্ঞতা ছোটগল্প কীভাবে ধারণ করে এ প্রশ্নটি অস্বাভাবিক নয়। নেপোলিয়নের যুদ্ধের কাহিনি ধারণে তলস্তয় যেমন বৃহৎ উপন্যাস ফেঁদেছিলেন, তেমন একটা উপন্যাসেই কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুপুঙ্খ বর্ণনা করা যায়? জহির রায়হান তার গল্পে এর ইংগিত দিয়েছেন। এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল বহুজনে বহুরকম। এই জনপদের প্রায় প্রতিটি মানুষ তার নিজেদের মতো করে মুক্তিকামনা করছিলো। প্রতিটি মানুষের মুক্তির ছোট ছোট ইচ্ছেগুলোর সম্মিলনই ছিল মুক্তিযুদ্ধ। আর সেদিক দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য বলতে ছোটগল্প সঠিক উপায়। আর সবগুলো ছোটগল্প মিলেই মুক্তিযুদ্ধের একটি গল্প। একটি মহাগল্প। বাঙালি তথা এই জনপদের মানুষের সংগ্রাম ও স্বপ্নযাত্রা মানুষ হিসেবে টিকে থাকার লড়াই, জীবনদান ও বিশ্বাসঘাতকতা, তার কুটিল ও জটিল মনের পরিচয় এই গল্পগুলোতে ধরা পড়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় মুক্তিযুদ্ধ হলেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মুক্তিযুদ্ধের গল্পকে আমরা বহুভাবে পল্লবিত হতে দেখেছি। রচনাকালের দিক দিয়ে তা প্রধানত তিন প্রকার।

১. '৭১ সালে চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মুক্তির চেতনা নিয়ে যেসব গল্প লিখিত হয়েছিল, এ ধারার সূচনা মূলত '৫২-র ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

২. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লিখিত মুক্তিযুদ্ধের গল্প।

৩. চূড়ান্ত স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে অবলম্বন করে লিখিত মুক্তিযুদ্ধের গল্প।

তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধার রয়েছে নানা চরিত্র। কেউ যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে হিজরত করেছিলেন। কেউ দেশের মধ্যেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। কেউ প্রশিক্ষণ ছাড়াই লড়াই শুরু করেছিলেন। কেউ গেরিলা যুদ্ধ করেছিলেন। কেউ সম্মুখ যুদ্ধ। যুদ্ধের মারণাস্ত্র ছাড়া এমনকি দা বটি লাঠিসোটাও হানাদার বাহিনির বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়েছিল। আবার অনেকেই ছিলেন চোরাই মুক্তিযোদ্ধা। আসলে দলমত ধর্ম বর্ণ বয়স লিঙ্গের পার্থক্য ছাড়াই এ জনপদের প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হয়েছিল। সেই সঙ্গে এদেশের ভূপ্রকৃতি ও ঋতুবৈচিত্র্য অপরিচিত পাকসেনাদের সুযোগমত বেকায়দায় ফেলেছিল। আর দেশের মধ্যে

যারা পাকবাহিনির দোসর ছিল, তাদের রাজনৈতিক অংশটা বাদ দিলে অধিকাংশই ছিল অনাহারী ভীতু ও সুবিধাবাদী শ্রেণির।

মুক্তিযুদ্ধ এখন চার দশক অতিক্রম করে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই এখনো জীবিত। লেখক এবং পাঠক-জনতার প্রায় এক-চতুর্থাংশের কোনো না কোনোভাবে এখনো রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্মৃতি। মুক্তিযোদ্ধা, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট আত্মীয়-স্বজন এমনকি পাক-হানাদার বাহিনির দুষ্কর্মের সহযোগীদের অনেকেই এখনো রয়েছে জীবিত। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ঘটনা নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখার কাল এখনো বিদ্যমান। সম্প্রতি যুদ্ধ অপরাধের বিচার নিয়ে কিছুটা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে হুমায়ুন আহমেদের 'জলিল সাহেবের পিটিশন' গল্পটির বেশ মিল রয়েছে।

জলিল সাহেব দুজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বাবা। দুই দশক আগে লেখা এই গল্প সমকালীন প্রেক্ষাপটেও তার আবেদন হারায়নি। এ গল্পের নায়ক জলিল সাহেব যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য জনে জনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বেড়িয়েছেন। তিনি বিচার চান এজন্য নয় যে যুদ্ধে তার দুই ছেলে নিহত হয়েছেন। এ গল্পে হুমায়ূন আহমেদ যুদ্ধের বাস্তবতা অস্বীকার করেননি। এমনকি যুদ্ধে নিহত তার পুত্র হারানোর কষ্টের চেয়েও তার প্রাণে বাজে যেসব নিরাপরাধ লোককে সে সময় ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করা সময়ের প্রয়োজনে অপরাধ ছিল সত্য কিন্তু তারচেয়ে জঘন্য অপরাধ ছিল নিরপরাধ লোক হত্যা, শিশু ও নারী হত্যা, নিরস্ত্র ও বৃদ্ধ হত্যা তদুপরি ধর্ষণ, লুণ্ঠন, বাড়িঘর ও ফসলের মাঠ জ্বালিয়ে দেয়া। জলিল সাহেব বলছেন, 'ত্রিশ লাখ লোক মরে গেল। কোনো বিচার হলো না মনে হলে বুকের মধ্যে চিনচিন ব্যথা হয়।'

হুমায়ূন আহমেদ অবশ্য এ গল্পে বিচার বহির্ভূত কোনো শাস্তি প্রত্যাশা করেননি। তাই জলির সাহেব বলেন, 'শুধু দস্তখত যোগাড় করলেই হবে না। কেস চালানোর মতো এভিডেন্স থাকতে হবে। বিনা অপরাধে লোকজন ধরে ধরে মেরেছে– এটা প্রমাণ করতে হবে না?'

হুমায়ূন আহমেদের চিরাচরিত উত্তম পুরুষে লেখা এ গল্পে তিনি বিদেশকালীন তার গল্পের নায়কের কাজের প্রতি সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন।

তার মনে হলো 'ঠিকই তো ত্রিশ লাখ লোক হত্যা করে পার পেয়ে যাওয়া উচিত নয়। জলিল সাহেব যা করেছেন ঠিকই করেছেন। এটা মধ্যযুগ না। এ যুগে এত বড় অন্যায় সহ্য করা যায় না।'

তবে এ আলোচক গল্পের মধ্যযুগ সম্পর্কে লেখকের এ মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগে কি এ ধরনের হত্যার ইতিহাস আছে। মধ্যযুগে কি এত মানুষ হত্যা করা যেত? বলা চলে, তরবারিই তো একমাত্র মারণাস্ত্র। যাদের তরবারি দিয়ে হত্যা করা হতো, তাদের হাতেও তো তরবারি থাকতো। প্রতিপক্ষকে আঘাত করার এই জঘন্য অপরাধ আধুনিক কালের। অহেতুক আমাদের মধ্যযুগকে উল্লেখ করে আধুনিককালের বর্বরতাকে লঘু করার সুযোগ নেই। তাছাড়া প্রশিক্ষিত পাক বাহিনি অস্ত্র ধরেছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র বাঙালিদের বিরুদ্ধে। এমনকি বর্বর সেনাবাহিনির ইতিহাস ও ভূগোল জ্ঞানে বাঙালিরা সত্যিকার মুসলমান নয় বলেও তাদের নিধন করা।

তবে যাই হোক, জলিল সাহেবের শেষ আশা কিন্তু পূরণ হয়নি। যুদ্ধাপররাধীদের বিচার করা সম্ভব হয়নি। স্বাক্ষর সংগ্রহের এক পর্যায়ে তিনি মারা যান। বিচারের জন্য মামলা রুজু করতে পারেননি। গল্পের বর্ণনাকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যিনি ভেবেছিলেন, জলির সাহেবের অসমাপ্ত কাজ তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এই অসমাপ্ত কাজ এতদিনেও এগিয়ে নেয়া কেন সম্ভব হয়নি তার একটি যুৎসই কারণও গল্পকার উল্লেখ করেছেন, 'আমি জলিল' সাহেব নই। আমাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। মিরপুরে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি কেনার জন্য নানা ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়। জলিল সাহেবের বত্রিশ হাজার দরখাস্তের ফাইল নিয়ে রাস্তায় বেরোনোর আমার সময় কোথায়?' গল্পের শেষটায় লেখক আপোষকামী মধ্যবিত্তের টিকে থাকার সংকট ঠিকমতই চিহ্নিত করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের ছোটগল্পের রয়েছে বহুমুখী চরিত্র। এ সময়ের তীক্ষ্ণ ও প্রতিভাবান গল্পকারদের দৃষ্টি যে সব এড়িয়ে যায়নি। তাই মুক্তিযুদ্ধের ছোটগল্পগুলোর রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা বিস্তার। একঘেয়েমি ও একরৈখিকতা থেকে মুক্ত– কে মুক্তিযোদ্ধা আর কে মুক্তিযোদ্ধা নয়, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সর্বব্যাপ্ত পরিধি বোঝার জন্য এ সময়ের ছোটগল্পই সবচেয়ে জীবন্ত ও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। মুক্তিযোদ্ধাদের যে কত রকমফের ছিল তা বোঝার জন্য,

আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'কলিমদ্দি দফাদার', শওকত ওসমানের দুই ব্রিগেডিয়ার', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেনইকোট', ইমদাদুল হক মিলনের 'লোকটি রাজাকার ছিল', মঈনুল আহসান সাবেরের 'কবেজ লেঠেল' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার বিচিত্ররূপ ও চরিত্র ধরা পড়েছে। কলিমদ্দি দফাদার যুদ্ধের সময় বহাল তবিয়তে তার সরকারি দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নামাজী মানুষ। তাকে বিশ্বাস করতে মিলিটারিদের কষ্ট হয়নি। কিন্তু সুযোগ পেলেই মিলিটারিদের বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে সে। একবার মুক্তিবাহিনির আস্তানা দেখিয়ে দেয়ার সময়ে বর্ষার খরস্রোতা নদীর উপর কাঠের নড়বড়ে সাঁকো ঝাকিয়ে মুক্তিবাহিনি বলে চিৎকার করে তাদের নদীতে ফেলে দিয়ে খতম করেছিলেন। কলিমদ্দি দফাদার এখনো ইউনিয়ন পরিষদে চাকরি করেন। তার সঙ্গীরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। সবার কাছে তার একটু আলাদা মর্যাদা রয়েছে।

দুই ব্রিগেডিয়ার গল্পে শওকত ওসমান যুদ্ধের আকস্মিকতা এবং সয়ীদ ভূঁইয়া নামের এক দমকল বাহিনির ব্রিগেডিয়ারের আগুন নেভানো কাহিনী বর্ণনা করেন। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে যখন পলাশী এলাকায় পাকবাহিনি ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তখন সয়ীদ ভূঁইয়া তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাক বাহিনির গুলিতে নিহত হয়। তাকে কেন গুলি করা হয় জানতে চাইলে পাক ব্রিগেডিয়ার বলে, 'শোন বাঙালিকে বাচ্চা হামভি ডিউটি যে নিকলা। মেরা আর ডিউটি হ্যায় আগ (আগুন) বাগানা জায়গা তোমরা হ্যা বুজানা (নেভানো)...সমঝা?'

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট' গল্পের মুক্তিযোদ্ধা একজন কলেজ শিক্ষক। নাম নূরুল হুদা। সে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে গমন করেনি। কিন্তু মিলিটারির কাছে সে ঠিকই ধরা পড়ে যায়। আর মিলিটারির কাছে ধরা পড়া মানেই অমানুষিক নির্যাতন। সেই নির্যাতন নূরুল হুদাকে সইতে হয়েছিল। এই গল্পটির নাম 'রেইনকোট' কেন। ইলিয়াস ঠিকই তার প্রতিভার মাপে গল্পটি রচনা করেছেন। শিল্প সৌকর্য বিবেচনায় ইলিয়াসের গল্পটি মনে রাখার মতো। গল্পের নায়ক নূরুল হুদাকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ছাদের হুকের সঙ্গে উল্টো করে বাঁধা হয়। তার পাছার উপর যথেচ্ছা সপাং চাবুক মারা হয়। এই নির্যাতনে এক সময় নূরুল হুদা আবিষ্কার করে রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ। অর্থাৎ তার চামড়াকে রেইনকোট আর মিলিটারির অত্যাচারকে বৃষ্টির অত্যাচারের অধিক কিছু মনে হয় না। কারণ নূরুল হুদা আগেই জানতেন,

রাশিয়ার জেনারেল উইন্টার যেমন রাশিয়াকে রক্ষা করেছিল তেমন বাঙালির জেনারেল মনসুন ও পাক হানাদারদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।

ইমদাদুল হক মিলন একটি সম্পূর্ণ রাজাকার চরিত্রের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা আবিষ্কার করেছেন। তার গল্পে প্রকৃত শিল্পীসুলভ দরদ ও উদ্বোধন ধরা পড়েছে। তার গল্পের 'লোকটি রাজাকার ছিল' তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় কথা রাজাকার এবং মুক্তিযুদ্ধের তফাৎ সে জানতো না। পেটের দায়ে চেয়ারম্যানের কাছে গেলে চেয়ারম্যানই তাকে রাজাকারের চাকরি দেয়। সে তো একটি কাজ হিসেবেই এটিকে দেখেছে। এমন সরল বোকা মানুষ যে পেটের দায়ে রাজাকারী ফাঁদে পড়েছিল–গল্পকার সেকথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু যখন সে জানলো দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছে, বিদেশি খারাপ মানুষদের পক্ষে কাজ করছে তখন তার হুশ ফেরে। তার এই বেঈমানীর শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত সে ব্যাপারে সে নিজেই রায় দেয়। আর সে এজন্য মৃত্যুদণ্ড পেতে চায় যাতে অন্য কেউ আর রাজাকার হতে সাহস না পায়।

মঈনুল আহসান সাবেরের 'কবেজ লেঠেল' গল্পের কবেজও অতসব বোঝে না। বংশপরম্পরায় লেঠেল। আকমল প্রধানের লেঠেল। বাছবিচার ছাড়াই খুনটুন তার পেশা। যুদ্ধের সময় সুযোগ সন্ধানীরা যে তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করে মুক্তিবাহিনির ওপর দোষ চাপাতো–দুই রাজাকারের কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে সাবের তা তুলে ধরেছেন। কিন্তু কবেজ লেঠেল এই প্রথমবারের মতো নিজের বিবেচনা মতো রমজান শেখকে খুন করে। কারণ মিলিটারিদের হত্যা ধর্ষণে রমজান শেখ প্রকাশ্যে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছিল। কবেজের কাছে মিলিটারি বা মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে প্রকাশ্য অত্যাচারীকে খতম করাই ছিল প্রধান কাজ।

মুক্তিযুদ্ধ যে এখনো শেষ হয়নি সৈয়দ শামসুল হকের 'ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে' গল্পে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে। এরূপ দক্ষ শিল্পী মুক্তিযুদ্ধের একটি চেতনা-প্রবাহ তৈরি করতে চেয়েছেন। পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনরায় আবির্ভাব দেখে অপরাধীদের মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে পড়ে। তাই ইমাম সাহেব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কন, বাহে, শুনি হামরা। মুক্তিযুদ্ধ কি ফির শুরু হইয়া গেইছে?' আবু ইসহাক একটা ময়না পাখি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গল্প রচনা করেছেন। চিন্তা ও বিষয় বিবেচনায় গল্পটির একটি মূল্য রয়েছে। যুদ্ধের সময় একটি ময়না পাখি জয়বাংলা শব্দটি রপ্ত করেছিল। পাক

মেজর এই পোষা ময়নাটি এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবার থেকে জব্দ করে। ময়নাটিকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ শেখাতে চেষ্টা করে। কিছুতেই ফল হয় না। গল্পকার বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশেও জয়বাংলা ডাকটি বহুদিন শোনা গেছে। এখন আর ডাকে না। পাহাড়ি ময়না হয়তো পাহাড়েই চলে গেছে। চার দশকের রাজনৈতিক বাস্তবতায় জয়বাংলা তার আগের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকালে শব্দটিতে একটি জাতির সমষ্টিগত উজ্জীবনী শক্তি ছিল সে সত্য অস্বীকার করা মিথ্যার নামান্তর।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'আমাকে একটি ফুল দাও' মাহমুদুল হকের 'বেওয়ারিশ লাশ' রাহাত খানের 'মধ্যিখানে চর' প্রভৃতি গল্পে যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যেও স্বাভাবিক প্রেম ও কামের জয় অক্ষুণ্ন রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী কালপর্বের নিখুঁত বর্ণনা উঠে এসেছে শহীদুল জহিরের 'কাঁটা' গল্পে। গল্পের অনুপঙ্খ বর্ণনায় লেখকের রয়েছে মুন্সিয়ানা। স্বপ্ন ও বাস্তবতার মাধ্যমে তার এ কাহিনী এগিয়ে চলে। তিনি এ বর্ণনায় শৈলী হিসেবে বেছে নিয়েছেন একই সঙ্গে জাদুবাস্তবতা ও চেতনা প্রবাহ রীতি। যুদ্ধের সময় ভূতের গলির বাসিন্দারা একটি হিন্দু পরিবারকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছিল কিংবা আসলেই হয়েছিল কিনা তাদের এই ধন্ধই গল্পের মুখ্য উপজীব্য। পাক মিলিটারি এবং তাদের দোসর রাজাকার আবু বকরের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে আসলে তারা নিজেরাই সুবোধ ও তার স্ত্রী স্বপ্নাকে একটি কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। একটি এলকার জনগণের সামষ্টিক কষ্ট একটি অভিন্ন চরিত্র নিয়ে এ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প লেখেননি, প্রকৃতপক্ষে এমন গল্পকার নেই। আর মুক্তিযুদ্ধের গল্পই বর্তমান গল্প লেখকদের বাংলাদেশ পূর্ববর্তীকালের লেখক থেকে আলাদা করেছে। অনেকেই লিখেছেন একাধিক গল্প কিংবা সম্পূর্ণ গল্পগ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধের গল্প নিয়ে হয়েছে একাধিক গল্প সংকলন। এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি গল্পে রয়েছে আলাদা রূপ ও মাত্রা। তবু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কিছু গল্প এবং গল্পকারের কথা না বললে পুরোপুরি অসম্পূর্ণতার অপরাধ থেকে যায়। এর মধ্যে আবু রুশদের খালাস, সুচরিত চৌধুরীর সে দিন রাত শান্ত ছিল, আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর রোদের অন্ধকারে বৃষ্টি, আবু বকর সিদ্দিকের জাল যোদ্ধা, শহীদ আখন্দের ছিন্নভিন্ন ভালোবাসা, রাবেয়া খাতুনের যেদিকে তাকাই কেবলি কালো, শওকত আলীর পুনর্বার বেওনেট, বশীর আল হেলালের শবের

নিচে সোনা, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের আমার আল্লারে, হাসান আজিজুল হকের ভূষণের একদিন, হাসনাত আব্দুল হাইয়ের একাত্তরের মোপাঁসা, জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের দিন ফুরানোর খেলা, রিজিয়া রহমানের একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্ম, মাহবুব তালুকদারের শরণার্থী, রশীদ হায়দারের আপনজন, বিপ্রদাস বড়ুয়ার বাবর স্বপ্ন ও একজন রাজকন্যা, আব্দুল মান্নান সৈয়দের ব্ল্যাক আউট, সুব্রত বড়ুয়ার নির্বাসনে একজন, সেলিনা হোসেনের আমিনা ও মদিনার গল্প, রবিউল হুসাইনের পাথরের ফুল, বুলবুল চৌধুরীর নদী জানে, কায়েস আহমদের নচিকেতাগণ, শাকের চৌধুরীর সংশয়ের ঘর, জুলফিকার মতিনের খোঁজা, শাহরিয়ার কবিরের একাত্তরের যিশু, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের গ্লানি, অসীম সাহার ভ্রূণ, আফসান চৌধুরীর ধর, সুশান্ত মজুমদারের রাজা আসেনি বাদ্য বাজাও, মঞ্জু সরকারের রাজাকারের ভূত, মুহম্মদ জাফর ইকবালের নূরুল এবং তার নোট বুক, আবু সাঈদ জুবেরীর নিরপেক্ষ জীবন, ভাস্কর চৌধুরীর গন্তব্য কোথায়, শাহীন আখতারের আরো এমন রাত ছিল, নাসরীন জাহানের বিশ্বাস খুনি, শাহাদুজ্জামানের অগল্প, সেলিম মোরশেদের বিপক্ষে ব্রজন, পারভেজ হোসেনের স্তব্ধতার অনুবাদ, মশিউল আলমের অযোদ্ধা, হামিদ কায়সারের এক বোন চন্দ্রভানুসহ রয়েছে অসংখ্য ছোটগল্প। মুক্তিযুদ্ধের গল্প নামে কোনো কোনো লেখকের আলাদা গল্পের বই রয়েছে। লেখিকা সংঘ থেকে কেবল মহিলাদের লেখা মুক্তিযুদ্ধের গল্প নিয়ে একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। আবুল হাসনাত এবং হারুন হাবীবসহ অনেকেই করেছেন মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন লেখকের ছোটগল্প সংকলন। এসব সংকলনের বাইরেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধের গল্প। বরং এমন সব গল্প হারিয়ে যেতে বসেছে যা যুদ্ধের নয় মাসকালে অসংখ্য অখ্যাত গল্পকাররা মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা যোগাতে লিখেছিলেন। বর্তমানে ছোটগল্পের বাজার মন্দা। তবুও মুক্তিযুদ্ধের গল্প লেখা থেমে নেই। বিশেষ করে স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীর খোরাক হিসেবে এবং অসংখ্য লিটলম্যাগের পরিশ্রমী লেখকদের কল্যাণে। তবু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কালজয়ী কোন সাহিত্য রচনা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত লেখক তো কালজয়ী লেখার জন্য থেমে থাকেন না। একজন লেখক মূলত তার নিজের লেখাটিই লিখে যান। আর জনশ্রুত যে লেখা দাবি করে তা তো কোনো একজন লেখক কোনো একদিন লিখবেন। তাহলে কিছুই হচ্ছে না বলে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার চেয়ে যা হয়েছে তার দিকে

চোখ ফেরালেও দেখা যাবে নিজ ঘরে বাছা রতনের রাজি। আর প্রকৃতই এ লেখকের বিশ্বাস মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংগঠিত করতে চাইলে ছোটগল্পের কাছে ফেরা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বঙ্গবন্ধুর নিজের জীবন গল্পের অধিক গল্প

১.

১৯৭৫ সালের সাতে মে। ৮ দিন আগে পিতা শেখ লুতফর রহমানকে হারিয়েছেন। শোকে মুহ্যমান সে সময়, তবুও নেতা কর্মীদের সকলকে নিয়ে জাহাজে করে রওনা দিলেন টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে, পিতার চেহলাম এর জন্য। রাতের খাবার সেরে সিনিয়র নেতারা যে যে যার কেবিনে চলে গেলেন। কেউ কেউ ডেক এই বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন। জাহাজের ঢুলুনিতে মধ্যরাতে মাহবুব তালুকদার এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভেঙ্গে তিনি অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন তার মাথার নিচে একটি বালিশ। অথচ, সবাই যখন কেবিনে কিংবা ডেকে যার যার মতো শুয়ে পরেছিলেন, তিনি খেয়াল করেছিলেন তার জন্য ঘুমানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। তিনি মাথার নিচে হাত দিয়ে একটা সোফায় টান হয়ে শুয়ে পরেছিলেন যতোদূর মনে পরে। পাশেই এডিসি রব্বানী জেগে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এডিসি সাহেব, মাথার নিচে বালিশ আসলো কোথা থেকে?'

এডিসি রব্বানী জানালেন, রাতের সাড়ে ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু দেখতে এসেছিলেন, সবার ঠিক মতো শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কি না। আপনার কাছে এসে দেখলেন, মাথার নিচে হাত দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। বললেন, 'মাহবুব এইভাবে শুইয়া আছে। একটা বালিশ ওরে যোগাড় কইরা দিতে পারলা না?' এরপর উনি নিজের কেবিনে গিয়ে নিজেরই একটা বালিশ এনে আপনার মাথার নিচে দিয়ে দেন। মাহবুব সাহেব একইসাথে বিপন্ন ও বিস্মিত হলেন, কারণ তিনি জানতেন যে বঙ্গবন্ধু মাথার নিচে দুইটি বালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারতেন না। তিনি একবার ভাবলেন, বালিশটি ফেরত দিয়ে আসবেন কি না। আবার ভাবলেন, এতোক্ষণে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন, এখন ডাক দেয়া সমীচীন হবে না।

ভোরবেলা, সূর্য ওঠার আগেই মাহবুব সাহেব দেখলেন, জাহাজের ডেকে একটি চেয়ারে হেলান দিয়ে পা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করছেন, 'নম নম নম

সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি'। মাহবুব সাহেবকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রাত্রে ভালো ঘুম হইছে তো?' মাহবুব সাহেব বললেন, 'জ্বি না। ভালো ঘুমাতে পারি নি।'

–ক্যান? আমি তো তোমার মাথার তলে বালিশ দিয়া গ্যালাম। ঘুম হয় নাই ক্যান?

–ওই জন্যই তো ঘুম হয় নি। আপনি নিজের মাথার তলের বালিশ আমার আমার মাথায় দিয়ে গেলে ঘুম হওয়া কি সম্ভব?

(বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, মাহবুব তালুকদার)

২.

নিচের গল্পটি অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাক্ষাৎকার থেকে নেয়া। সাক্ষাৎকারটি 'ইন্দ্রপাত' নামে ছাপা হয়েছিলো। সাক্ষাৎকারটিতে খুবই চমকপ্রদ কিছু তথ্য আছে! বিশেষ করে, যারা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চায় যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা চান নি, এই অংশটুকু তাদের থোঁতা মুখ আরেকটু ভোঁতা করে দিবে, কী দুঃখজনক!

"শেখ সাহেবকে আমরা প্রশ্ন করি, 'বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এল?' 'শুনবেন?' তিনি মুচকি হাসলেন। 'সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি ও শরতচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙ্গালির এক দেশ। বাঙ্গালিরা এক হলে কী না করতে পারতো। তারা জগত জয় করতে পারতো। They could conquer the world.'

বলতে বলতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন। তারপর তিনি বিমর্ষ হয়ে বলেন, 'দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সোহরাওয়ার্দী আর শরত বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি নয় তাদের প্রস্তাবে। তারা হাল ছেড়ে দেন। আমিও দেখি আর কোনও উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে আরম্ভ করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নেই, কিন্তু আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা। সে স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে এই আমার চিন্তা। হবার কোন সম্ভাবনাও ছিলো না। লোকগুলা যা কমিউনাল ! হঠাৎ একদিন রব উঠলো, আমরা চাই বাংলা ভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দেই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে এমন একদিন আসে, যেদিন

আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞেস করি, আমাদের দেশের নাম কি হবে? কেউ বলে পাক বাংলা, কেউ বলে পূর্ব বাংলা। আমি বলি- না, বাংলাদেশ। তারপর আমি শ্লোগান দেই, জয় বাংলা। তখন ওরা বিদ্রুপ করে, জয় বাংলা না জয় মা কালী ! কী অপমান ! সে অপমান আমি সেইদিন হজম করি। আসলে ওরা আমাকে বুঝতে পারেনি। জয় বাংলা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালি জাতির জয়। যা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে।

'জয় বাংলা' আসলে একটি মন্ত্র। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' বা, দাদাভাই নওরোজীর 'স্বরাজ' বা, গান্ধীজির 'কুইট ইন্ডিয়া' বা, নেতাজী সুভাষের 'দিল্লি চলো'। এ হলো শব্দ ব্রহ্ম। একটি শব্দের বা শব্দের সমষ্টির মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত। সে শক্তি অসাধ্যসাধনপটিয়সী।" (ইন্দ্রপাত, অন্নদাশঙ্কর রায়)

৩.

"সেবার শেখ সাহেব তার এক সহকর্মীর বাড়িতে গেলেন বেড়াতে। বাড়ির উঠানে পা দিতে না দিতেই ৫-১০ বছর বয়েসি শিশুদের একটা দল তুমুল মিছিল আর শ্লোগান শুরু করে দিলো! কাঠির মাথায় কাগজ লাগিয়ে, মাথায় নিশান লাগিয়ে হুলস্থুল অবস্থা! ছোট্ট উঠানে চক্রাকারে ঘুরছে আর বলছে– "তোমার নেতা, আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব", "ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো", "ইয়া হিয়া খানের মুসলমানি, এক পোয়া দুধে তিন পোয়া পানি" ঘুরে ফিরে আবারও, তোমার নেতা আমার নেতা- শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। শিশুদের এই কাহিনি দেখে শেখ সাহেবের মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে চিৎকার করেছেন, আমি বাঙ্গালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে দুইবার মরে না। তিনি শিশু মোর্চার সামনে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম ভয় পাওয়ার ভঙ্গী করে তাদেরকে বললেন, "আরে বাবা! তোদের নেতা শেখ মুজিব! এমন বিচ্ছুদের নেতা হওয়ার সাহস আমার নাই।"

(বঙ্গবন্ধু প্রবন্ধ : সরদার ফজলুল করিম, সম্পাদনায় অভিনয় কুমার দাস)

৪.

মর্নিং নিউজ-এর বাঙালি বিরোধী ভূমিকার জন্য উত্তেজিত জনতা দুবার পত্রিকাটি পুড়িয়েছে। আগরতলা মামলার সময়ে পত্রিকাটি শেখ মুজিবের

বিরুদ্ধে আদালতের রিপার্টে পর্যন্ত বিকৃত করে ছেপেছে। ব্যক্তিগতভাবে তার বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়েছে পত্রিকাটি। কিন্তু শুধু এই কারণে পত্রিকার সম্পাদক বদরুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে কোনো তিক্ততা সৃষ্টি হয়নি। বড় মন নিয়ে তিনি এসবই উপেক্ষা করেছেন, তাই দেশে ফিরে তিনি বদরুদ্দিনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, খোঁজ করলেন বেঁচে আছেন কি , নিরাপদ ও সুস্থ রয়েছেন কি না। ভাসা-ভাসা খোঁজ নিয়েই শান্ত হলেন না আমাকে ডেকে বললেন, বদরুদ্দিন ভাই কোথায় আছে, নিয়ে আসো। বিহারি ভদ্রলাকে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে ছিলেন, খোঁজ পাওয়া সহজ ছিল না তবু এর-ওর মাধ্যমে খোজ পেলাম লালমাটিয়ার একটি বাড়িতে, নিয়ে এলাম গণভবনে। তারপর যা ঘটল, সংক্ষেপেই বলি।

বিহারি বদরুদ্দিনকে গণভবনে মুজিব ভাই জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বদরুদ্দিনের সে কী কান্না! মুজিব ভাই জানতে চাইলেন বদরুদ্দিন কী করবেন, কোথায় থাকবেন অথবা যাবেন। বদরুদ্দিনের চাহিদা অনুযায়ী তাঁকে নেপাল হয়ে পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো। আসাদ অ্যাভিনিউতে তাঁর পরিত্যক্ত বাড়িটি বিক্রির অনুমতিও দিলেন, যে বাড়িটি কিনলেন চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট, পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের প্রতিমন্ত্রী আতা খান। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বিশেষ অনুমতি দিলেন বিক্রয়লব্ধ টাকা বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নিতান্তই এই ঘটনাটি নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরাট আঁত্মার পরিচয় পেয়েছেন তাঁর সমসাময়িক সকল রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সমাজের সকল স্তরের মানুষ। রাজাকারি কার্যকলাপের জন্য তাঁর প্রত্যাবর্তনের আগেই যাদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা বিষয়টি যতই অস্বীকার করুন, জানে বেঁচে গিয়েছিলেন, তা স্বীকার করতেই হবে। ফজলুল কাদের চৌধুরী, শাহ আজিজ বেঁচে গিয়েছিলেন, বেচারা ফরিদ আহমদ সময়ে ধরা পড়েননি বলে মারা গেলেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন মরতে মরতে পার পেয়ে গেলেন। শেখ মুজিব ফিরে না এলে জেলেও তারা নিরাপদ থাকতেন কি না, সন্দেহ। তৎকালীন পরিস্থিতির কারণে শেখ সাহেব তাঁদের জেলের বাইরে আনতে পারেননি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যে প্রত্যেকের খোঁজখবর নিতেন, কারও কারও পরিবারের যে নিজেই ভরণপোষণ করেছেন, তা কেউ কেউ জানেন বৈকি। প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজাকারদের জন্য এত দরদের কী দরকার ছিল? উত্তর হচ্ছে, প্রয়োজন বা যুক্তি দিয়ে হৃদয় চালিত হয় না। অপর

দিকে হৃদয় যদি প্রাধান্য পায়, তবে মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হতে পারে না। প্রশাসনিক কাজে যদি বঙ্গবন্ধু ব্যর্থ হয়ে থাকেন, সরকার পরিচালনায় যদি ছোটখাটো শৈথিল্য দেখিয়ে থাকেন, তার জন্য কোনো অনুপযুক্ততা দায়ী নয়। বাঙালির স্বভাবসুলভ আবেগই প্রাধান্য পেত বঙ্গবন্ধুর অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে, যদি কোনো অপরাধে তিনি। অপরাধী হয়ে থাকেন, তবে তার চিন্তাবৈকল্যকে দায়ী করতে হবে। (এবিএম মুসা : প্রথম আলো ১৪ আগস্ট ২০০০)

৫.

ক্যারিশমা যাকে বলে তা শুধু শেখ মুজিবের ক্ষেত্রে এক শ ভাগ প্রযোজ্য ছিল। এ নিয়ে একটি কাহিনি আমি আগেও কয়েকবার বলেছি। ফেনীর মরহুম রুহুল আমিনকে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ভুসির ব্যবসা করত বলে নামই দিয়েছিলেন ভুসি। দেশে গেলেই আমার কাছে ভ্যানভ্যান করত, 'আমার কিছু হলো না, দেশ ও দলের জন্য এত কিছু করেছি, সর্বস্বান্ত হয়েছি। মুজিব ভাই প্রধানমন্ত্রী হলেন অথচ আমি কিছুই পেলাম না। এত সব ঘ্যানর ঘ্যানর শুনে বিরক্ত হয়ে বললাম, "চলো তোমাকে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়েই যাই, যা বলার তাকে বলো। ঢাকায় এল ভুসি, বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়িতে নিয়ে গেলাম। বঙ্গবন্ধু তাকে জড়িয়ে ধরলেন, 'ওরে আমার ভুসি আসছে' বলে। হইচই করে উঠলেন। ভুসি মাখনের মতো একেবারে গলে গেল। বঙ্গবন্ধু যতই বলেন, "কেমন আছিস, কোনো অসুবিধা নেই তো', ততই খালি তোতলায় আর বলে, 'ভা-ভা ভালোই আছি। ক-ক কোনো অসুবিধা নেই।

'আধঘণ্টা পর ভুসিকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম, রেগে বললাম, কী হলো, এত। প্যানপ্যানানি গেল কই, কিছুই তো বললে না, চাইতে পারলে না। ভুসি আমতা আমতা করে বলল, 'কী করব, নেতাকে দেখে যে সবই ভুলে গেলাম। বুঝলাম এরই নাম ক্যারিশমা, ইনিই হচ্ছেন এক একমেবাদ্বিতীয়ম শেখ মুজিব, জনগণের শেখ সাহেব, কর্মীদের মুজিব ভাই, সহকর্মীরা তাঁকে সম্বোধেন করেন 'নেতা' বলে। এসবই হতে পেরেছিলেন তিনি যেহেতু বিরাট একখানি হৃদয় নিয়ে জনগণের কাছে যেতে পেরেছিলেন, জনগণ তাঁর কাছে আসতে পেরেছিল। বিবিসিতে ডেভিড ফ্রস্ট তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি কী, হোয়াট ইজ ইওর স্ট্রেনথ? বঙ্গবন্ধু জবাব দিয়েছিলেন, 'মাই পিপল। আমার জনগণ। তার পরের প্রশ্ন, 'হোয়াট ইজ ইওর উইকনেস?

আপনার সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা কী? উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার জনগণ, মাই পিপল। শেখ মুজিবুর রহমানই একমাত্র নেতা, যিনি গর্বের সঙ্গে এমনটি বলতে পারতেন। তার সারা জীবনের সাফল্য এবং ব্যর্থতা যা-ই বলা যাক, সবকিছুর মূলেই ছিল এই জনগণ। তোদর অধিকার আদায়ে হৃদয়ের দৃঢ়চিত্ততা আর তোদরই কারও কারও ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা। গ্রহণে ছিল হৃদয়ের দুর্বলতা। তার কথাগুলো তাই একটু অন্যভাবে বলতে চাই। শেখ মুজিবের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট, সম্পদ ছিল তার বিশাল হৃদয়, তাঁর লায়েবিলিটি, দুর্বলতা ও সবচেয়ে বড় শত্রুও ছিল তার মহত্ত্বে ভরা মহান হৃদয়খানি।

(এবিএম মুসা : প্রথম আলো ১৪ আগস্ট ২০০০)

৬.

একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে হেঁটে হেঁটে মুজিবের সঙ্গে গিয়েছি শহীদ মিনারে ফুল দিতে। মুজিব বলেছে, আহা, আমার বোনটা, আমার আপাটা এ রকম করে হেঁটে যাবে? আপা, আপনি হেঁটে যাবেন না। আপনি রিকশায় যান। আমরা হেঁটে যাই।

আমি বলেছি, না ভাই, আমি হেঁটেই যেতে পারব। এভাবে মুজিবের সঙ্গে হেঁটে গিয়ে মিটিংয়েও যোগ দিয়েছি। আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। মুজিব সব সময় আমাকে বড় বোনের মতো আগে আগে সঙ্গে রেখেছে। রাস্তায় দেখা হলে গাড়ি থামিয়ে বলেছে, আপা, শিগগিরই আসেন, গাড়িতে আসেন।

আমি বলেছি, না ভাই, এইটুকুন পথ তো-এইখান থেকে এইখানে হেঁটে যেতে পারব।

মুজিব বলেছে, না, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। ড্রাইভারকে বলেছে, আমার বোনকে আমার বোনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসো।

মুজিবের বাড়িতে গিয়েছি। শত মিটিং হলেও মুজিব এসে বলেছে, আপনি এসে আমাকে খবর দেন কেন? আপনি সরাসরি আমার কাছে চলে আসবেন। আপনি এসে কেন নিচে বসে থাকেন? আমার বাড়ি আপনার বাড়ি। আমি আপনাকে বড় বোন বলে মনে করি।

মুজিব প্রতিদিন ভোরবেলা তার বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটে এক চক্কর দিত। একদিন আমাকে দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে

বলল, গতকাল মনে হলো যে আমার বাড়িতে তো পিঠা হচ্ছে, আপাকে একটা ডাক দেব নাকি। কিন্তু অত ভোরে আপাকে আর ডাক দিলাম না। তার আন্তরিকতা এমন ছিল যে আমাকে নিয়ে পিঠা খাওয়াবে।

আমার মেয়ের স্বামী আবদুল কাহার চৌধুরী চাটগা রেডিওর অফিসার। ছিল। একাত্তর সালে পাকিস্তানি বাহিনির হাতে মারা যায়। দেশে ফেরার পর মুজিব এ ঘটনা শুনল। বলল, কই, দুলু কোথায়? আমার মেয়ে বিধবা হলে। যে রকম কষ্ট পেতাম, ওর জন্যও আমি সে রকম কষ্ট বোধ করছি। দুলু যা চায়, আমি ওকে সব দেব।

আমি বললাম, হাজারো মানুষ এ রকম গেছে। আমার জামাইও গেছে। তার জন্য শুধু দোয়া কোরো।

মুজিব আবার বলল, আপা, আমি আপনার কাছে হাতজোড় করে বলছি, আপনি বলেন, দুলুকে আমি কী সাহায্য করতে পারি?

আমি বললাম, ভাই, রক্তের বিনিময়ে আমার মেয়েকে কিছু দিতে হবে। দেশের হাজারো মেয়ের মতো আমার দুলুও বিধবা হয়েছে। অনেক বিধবা তো আমার আশ্রয়েই রয়েছে। ওদের জন্য শুধু দোয়া কোরো।

এরপর যখন সে রাষ্ট্রপতি হলো, আমাকে বলেছে, একবার এসে আমাকে দোয়া করে যান। গাড়ি পাঠাল। আমি গেলাম। ওই প্রথম যাওয়া। ওই শেষ। যাওয়া তার প্রেসিডেন্ট হাউসে।

তখন বাকশাল গঠিত হয়েছে। মুজিব বলল, একটা লোক পাচ্ছি না, যাকে আমি বাকশালের ভার দেব। আপা, আপনি যদি রাজি হন, তবে বাকশালের সভানেত্রী হয়ে থাকুন। আপনি যে রকম বলবেন, সে রকমই হবে।

আমি বললাম, ভাই, আমি রাজনীতি বুঝি না। আমাকে মাফ করো।

আমি তার সেই বাকশালে গেলাম না। কিন্তু যখনই কোনো মিটিং হয়েছে, আমি মুজিবের সঙ্গে গিয়েছি। আগেও আমাকে বলেছে, আওয়ামী লীগের মহিলা কমিটি গঠন করে সেখানে আপনি সভানেত্রী থাকুন। সব সময় আমাকে সে সম্মানের পদ দিতে চেয়েছে। আমি বলেছি, ভাই, রাজনীতির মধ্যে আমি যাব না। অন্য যা বলবে আমি করতে পারব। রাস্তায় নামতে পারি কিন্তু রাজনীতির কোনো সংশ্রবে আমি থাকব না।

তখন মুজিব বলেছে, আপা, আপনাকে আমি মাথায় রাখব, না আপনার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করব? আমি আপনার কাছে মিনতি করছি।

আমি বলেছি, ভাই, আমিও মিনতি করছি। ধানমণ্ডি পাড়ায় মুজিবের আগে আসি আমি। তাকে গ্রেপ্তারের সময়গুলোতে তার ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার বউ একটা বাড়ি খুঁজে পাচ্ছে না। এই দুর্দশার ভেতর দিয়ে মুজিবুর রহমান নেতা হয়েছে। মুজিবের ত্যাগের কোনো সীমা নেই। তার নিষ্ঠার কোনো পরিসীমা নেই। দেশকে যে সে কতখানি ভালোবাসত, তার পরিমাপ কোথাও নেই। মানুষের জন্য মমত্ববোধ, আত্মার একটা টান তার ছিল। আজকের দিনে তার মতো একটি মানুষ সারা বিশ্বে আমি দেখতে পাচ্ছি না। পলায়নি মনোবৃত্তি ছিল না মুজিবের। যেখানে সংকট, যেখানে সংগ্রাম, যেখানে সংঘাত দেখেছে, সে এসে আগে দাঁড়িয়েছে। মরণকে ভয় করেনি। তার পেছনে লাখো জনতা 'মুজিব ভাই' বলে লাফিয়ে পড়েই না এই দেশকে স্বাধীন করেছে।

(আমার দেখা মুজিব, সুফিয়া কামাল, ১৫ আগস্ট ১৯৯৬)

প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্গবন্ধু : বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা

রাত্রে এমনিই একটু ঘুম কম হয়। তারপর আজ আবার দুইটা পাগল একসাথে চিৎকার করতে শুরু করে। একজন পাগল ৪০ সেল থেকে চিৎকার করতে থাকে। সে একটু চুপ করলে আর একজন ঠিক কুকুর, বিড়ালের মতো ডাকতে থাকে। এইভাবে চলতে থাকে। প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল। পরে মশারির ভিতর থেকে হেসে উঠি। কারণ, একজন পাগল সত্য সত্যই একদম কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে পারে। –(কারাগারের রোজনামচা)

১.

কবিতার পরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লেখা হয়েছে নিবন্ধ প্রবন্ধ জাতীয় লেখা। তবে অধিকাংশ লেখা প্রবন্ধের মানে উন্নীত হতে পারেনি। অধিকাংশ লেখা ফেনানো উচ্ছ্বাস, যুক্তি, তথ্য ও তত্ত্বের বিন্যাস সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিষয়বৈচিত্র্যের অভাব, ভাবের গভীরে যেতে না পারা এবং লেখাকে একটি অনপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখা কিছু ক্ষমতা পরিভাষার মধ্যে আটকে থাকতে দেখা গেছে। আবার একটি লেখার সঙ্গে অন্য লেখার পার্থক্য খুব কম। বঙ্গবন্ধু জীবনের দীর্ঘ রাজনীতি কারাবাস এবং তার দর্শনের গভীরতার চেয়ে সমকালীন তাঁর প্রতিষ্ঠিত পার্টির মনোরঞ্জনও এ সব লেখার উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এই দুর্বলতার একটি কারণ লেখকের পল্লবগ্রাহিতা, অপরটি লোকরঞ্জন।

বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় অনেকে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেগুলো ধারাবাহিক অবলম্বন করা হয়নি। এমনকি যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের অনুগামী তারাও ভাবতে পারেননি, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির আদৌ কোনো বিশিষ্ট দর্শন ছিল কিনা। আবার যারা তাঁর রাজনীতির বিরুদ্ধ পক্ষ, এমনকি পুরনো ধারার ক্লিশে রাজনীতির অনুগামী তাদের কাছেও বিষটি প্রতিভাত হয়নি। যারা মার্কসবাদি কিংবা কেবল গণতন্ত্রী, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধ্বজাধারীরাও রাজনীতিকে দেখেছেন নিছক অতীতের কিছু

কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে। কিংবা যে সকল মহান ব্যক্তিত্ব তাদের রাজনীতির গুরুস্থানীয় বলে পূজিত হয়ে আসছেন, তারা যা লিখেছেন, তারা যা বলেছেন- সেসবই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। অথবা পণ্ডিতি ব্যাখ্যার দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে- সেগুলোকে আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু সমকাল এবং মানুষ অধিকাংশ সময়ে তত্ত্বের কাছে গৌণ হয়ে গেছে। অথচ তারা খুব কমই ভেবে দেখেছেন, যে-সব মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল একটা কালে, তাদের লড়াইটিও ছিল তাদের কালের সমস্যা ও সম্ভাবনার সঙ্গে। তারই আলোকে তারা যেমন মানব জাতির ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন, আবার কালের শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান শ্রম সামাজিক বন্ধকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তৎকালীন মানুষের যে সংকট ছিল, সেই সংকট উত্তরণ তাদের প্রধান দায় ছিল এবং সেইরূপ কর্ম করে তারা নিজেদের জীবনে যেমন সফল হয়েছিলেন, তেমন মানুষের রাজনৈতিক সামাজিক জীবনেরও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অথচ আমাদের দেশে যারা তথাকথিত আদর্শিক রাজনীতির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তারা যতটা তাদের তথ্য ও তত্ত্বের উপরে আস্থাশীল, ততটা মানুষের প্রতি নয়। এই বিষয়গুলো বঙ্গবন্ধু খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং কালের সমস্যাকে সামনে রেখেই তিনি কালোত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তার একটি পর্যবেক্ষণ এখানে উপস্থাপন করতে চাই।

"ছাত্রলীগই সরকারের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেছিল। কোনো বিরুদ্ধ দল পাকিস্তানে না থাকায় সরকার গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে একনায়কতন্ত্রের দিকে চলছিল। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সর্বময় ক্ষমতার মালিক হলেন। তিনি সমালোচনা সহ্য করতে পারছিলেন না।

দুই চারজন কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছাত্র ছিল যারা সরকারকে পছন্দ করত না। কিন্তু তারা এমন সমস্ত আদর্শ প্রচার করতে চেষ্টা করত যা তখনকার সাধারণ ছাত্র ও জনসাধারণ শুনলে ক্ষেপে যেত। এদের আমি বলতাম, 'জনসাধারণ চলছে পায়ে হেঁটে, আর আপনারা আদর্শ নিয়ে উড়োজাহাজে চলছেন। জনসাধারণ আপনাদের কথা বুঝতে পারবে না, আর সাথেও চলবে না। যতটুকু হজম করতে পারে ততটুকু সাধারণের কাছে পেশ করা উচিত। তারা তলে তলে আমার বিরুদ্ধাচরণও করত, কিন্তু ছাত্র সমাজকে দলে ভেড়াতে পারত না।'

আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুর এই পর্যবেক্ষণ এখনো পরিবর্তন হয়নি, সেটা কমিউনিস্টদের জন্যও সত্য, অনেকাংশে সরকারের জন্যও সত্য। বঙ্গবন্ধু মূলত কাজ করতেন, জনগণের হয়ে জনগণের জন্য। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছে পূরণ, কিংবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে জনগণের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা তার ধাতে ছিল না। তিনি আসলে সেই কাজটিই করেছেন, যেটি জনগণেরই করার কথা, কিন্তু তাদের সাহস, সময় ও ঝুঁকি নেয়ার সামর্থ্য কম থাকায় বঙ্গবন্ধু নিজেই তাদের পক্ষে কাজ করতেন। তিনি যখন জেল খাটছেন, তখনো জনগণের হয়ে খাটছেন, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন, তখনো জনগণের হয়ে করছেন। তাঁর নিজের জীবনের আনন্দ এবং সুখ দুঃখ বলে তেমন কিছু ছিল না, শুধু অনুভূতি ছিল। পাকিস্তানের রাজনীতিতে তিনি মাত্র তিরিশ/পয়ত্রিশ বছরের মধ্যে গুরুত্ব ও ক্ষমতার মধ্যগগনে পৌঁছে গিয়েছিলেন, সুখ ভোগ এবং অর্থ কামানো তার জন্য ছিল কেবল ইচ্ছের ব্যাপার। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তিনি কঠিন থেকে কঠিনতর যাত্রার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন অবলীলায়- যেখানে মরতে মরতে বাঁচা, বাঁচতে বাঁচতে মরা। একটা গরীব দেশের মানুষ, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা। কোলকাতা থেকে ঢাকা আসছেন কোথাও তাঁর থাকার জায়গা নেই, খাওয়া শোয়ার জায়গা নেই। অথচ জেলের চারদেয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকছেন, অনশন করে মরতে মরতে বেঁচে যাচ্ছেন, ছেলেমেয়েরা তাঁর জন্য ভালো স্কুলে পড়তে পারছেন না। কিন্তু তার ওই এক গোঁ 'মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতত।'

বঙ্গবন্ধুর আগে কেউই এই বাংলা তথা ভারতে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারেননি। অথচ তিনি ব্যক্তিগতভাবে কিংবা তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে ধর্মহীনতা ধর্মবিরোধিতার, কিংবা ধর্মের পক্ষে কোনো শিক্ষা প্রচারণা চালানো হয়নি। হিন্দু মুসলিম ধর্মীয় বিবাদমান দুটি গোষ্ঠী, এমনকি কমিউনিস্টরাও বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন- শেখ মুজিবের রাজনীতি শিক্ষার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। আরো এগিয়ে বললে বলা যায়, কারো মনে এ প্রশ্নই উদয় হয়নি যে তাঁর সম্ভাব্য রাষ্ট্র পরিকল্পনার মধ্যে কোনো ধর্মগোষ্ঠীর আলাদা শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতা আছে। রাষ্ট্র হিসাবে সব ধর্মকেই সমান পরিপোষণ করবে। অথচ মাত্র কিছুদিন আগে তিনি সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মুসলিম লীগের হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন; পাকিস্তান বিরোধী শেরে বাংলার প্রতি আস্থা না রেখে পাকিস্তানপন্থী সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহ'র প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখছিলেন। এমনকি দেশ বিভাগের পরেও তিনি আওয়ামী

মুসলিম লীগ নামে রাজনৈতিক দল গঠনের পরেও কারো মনে এ প্রশ্ন উদয় হয়নি তাঁর দল একটি সাম্প্রদায়িক দল। অবশ্য এই শিক্ষাটা তাঁর হয়েছিল দেশ বিভাগের আগেই সোহরাওয়ার্দী, গান্ধী, জিন্নাহ, নেহেরু ও মওলানা আবুল কালাম আজাদের দ্বারা। তাঁরা উপমহাদেশের হিন্দু মুসলিম দুটি প্রবল বিবাদমান ধর্মীয় সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও তাদের নিজেদের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। এমনকি দেশ বিভাগের পরেও তিনি তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের বিপরীতে অবস্থান করলেও গান্ধী ও জিন্নাহ সম্বন্ধে কখনো শ্রদ্ধা হারাননি। তিনি এই দুই ক্যারিশমাটিক লিডার সম্বন্ধে মনে করতেন, তারা থাকলে হয়তো সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সৃষ্টি হতো না, যদিও তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে দেশ ভাগ করেছেন।

মাহাত্মাগান্ধী উগ্র হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠীর নিহত হওয়ার পরেও যে স্বাধীন ভারতে নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য অবদান রেখেছিলেন বলে বঙ্গবন্ধু মনে করতেন। যখন মুসলমানদের অমীমাংসিত অধিকার পাইয়ে দেয়ার জন্য মহাত্মা আন্দোলন করছিলেন, তখন নাথুরাম গটসে গ্যাং তাঁকে হত্যা করে। তিনি হত্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পরিস্থিতি অনেকটা পাল্টে যায়। মুসলমানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। ভারতবাসী মনে করেন, এখনই এই উগ্র হিন্দু মৌলবাদ ঠেকাতে হবে; যারা এতদিন দেশভাগের কারণে মুসলমানদের বিরোধিতা করে আসছিলেন, তারাই মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। আমি জানি না, গান্ধী সম্বন্ধে এমন মহত্তম ব্যাখ্যা আর কেউ দিতে পেরেছেন কিনা কেউ তার আগে। এই ব্যাখ্যা ঠিক যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গেই কেবল তুলনীয়। যিনি নিজে ক্রুসিফাইড হয়ে অসহায় মানুষদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। যিশুর সঙ্গে সহক্রুশবাহি ভয়াবহ ডাকাত বারাব্বা মুক্তি পাওয়ার পরে যেমন ভাবতে শুরু করলেন, সত্যি হয়তো তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, না হলে কিভাবে নিজের জীবন দিয়ে আমার মতো এক ডাকাতের জীবন রক্ষা করলেন।

জিন্নাহ সম্বন্ধেও তিনি একই শ্রদ্ধা ধারণ করতেন। তিনি ভাবতেন, জিন্নাহ'র অকাল মৃত্যু না হলে পাকিস্তান এত দ্রুত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও জনগণহীন হয়ে পড়েতেন না। এখানে আমরা একটা উপসংহারে আসতে পারি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাপারে। তাহলো বঙ্গবন্ধু মূলত ছিলেন একজন শান্তিকামী নেতা, সব কিছু ঠিকঠাক মতো চললে তার রাজনীতি করার কোনো দরকার নেই। কিন্তু যা হওয়ার কথা তা না হলেই বিপদ- তিনি জীবন বাজি রেখে সেখানে নেমে পড়বেন। সেখানে অন্যায়, যেখানে গণতন্ত্রহীনতা, যেখানে

সাম্প্রদায়িকতা, যেখানে শোষণ সেখানেই বঙ্গবন্ধু। তাঁরও কথা ঠিক তাঁর প্রিয় কবি নজরুলের মতো– "যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না -বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত!"

২.

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে আমার কাছে মনে হয়েছে, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী ও মোনায়েম সরকার সম্পাদিত 'রক্তরঞ্জিত শতপ্রবন্ধ' সংকলনটি অপেক্ষাকৃত সুনির্বাচিত। এই বৃহদায়তন সংকলনে যাদের লেখা ছাপা হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য :

আনিসুজ্জামান (জননায়কের আবির্ভাব ও তিরোধান); আনিসুল হক (বঙ্গবন্ধু কী বলেছেন, আমরা কী করছি!); আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (বঙ্গবন্ধুর নতুন করে ফিরে আসা); আবদুল মান্নান (বঙ্গবন্ধু হত্যা : সূক্ষ্ম পরিকল্পনার নিখুঁত বাস্তবায়ন); আবদুল হালিম (বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর স্থান); আবদুল লতিফ সিকদার (পনেরোই আগস্ট হত্যাকাণ্ড জায়েজ করার অপপ্রচার প্রসঙ্গে); আশফাক-উল-আলম (শোকাবহ আগস্টের চিরন্তন স্মৃতি); এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার (কলঙ্কিত আগস্ট মাসের কথা); এ কে এম শহীদুল হক (বঙ্গবন্ধু হত্যা : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার হত্যার অপপ্রয়াস); এম হাফিজউদ্দিন খান (আগস্ট ট্রাজেডি ও বর্তমান বাংলাদেশ); ওবায়দুল কাদের (মুছিবে না চিহ্ন তার শত যুগান্তরে); কবীর চৌধুরী (বাংলাদেশের মুকুটবিহীন প্রমূর্ত রাজ); কাইয়ুম নিজামী (রাত পোহাবার একটু আছে বাকি); কাজী আহমেদ কামাল (শেখ মুজিব ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা); কামাল উদ্দিন আহাম্মদ (স্মৃতিতে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট); কামাল লোহানী (ইতিহাসের নির্মম হত্যাকাণ্ড); কে এম নুরুল হুদা (বঙ্গবন্ধু হত্যা : আদমজী জুট মিলে প্রকাশ্য প্রতিবাদ); কে এম সফিউল্লাহ (ফিফটিনথ আগস্ট আ ন্যাশনাল ট্রাজেডি); কেয়া চৌধুরী (বঙ্গবন্ধু মরে নাই...); খান আলতাফ হোসেন ভুলু (১৯৭৫ সালের মর্মান্তিক ১৫ আগস্ট); জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (বঙ্গবন্ধু বাঙালির স্মৃতিতে); ড. আতিউর রহমান (বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থ); ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া (১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট : দুঃসহ সেই দিনটি); ড. এম এ মাননান (বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : নেপথ্যের নীলনকশা প্রণয়নকারীদের বিষয়ে শ্বেতপত্র চাই); ড. এম. শাহ্ নওয়াজ আলি (মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ও আত্মপ্রত্যয়ের বাংলাদেশ); ড. এএইচএম

মোস্তাফিজুর রহমান (অসাম্প্রদায়িক বঙ্গবন্ধু, মানবিক বঙ্গবন্ধু); ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ (বাঙালির ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং বঙ্গবন্ধুর বাঙালি); ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, বীরবিক্রম (স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক মুজিবনগর); ড. মসিউর রহমান (বঙ্গবন্ধু ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠন); ড. মীজানুর রহমান (১৫ আগস্ট : বাঙালিত্বকে পাকিস্তানিকরণের চেষ্টা); ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া (বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের পর্যটন); ড. শেখ আবদুল সালাম (বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের গোটা ইতিহাস); ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী (স্বপ্ন বাস্তবায়নের কারিগর); ডা. এস এ মালেক (বঙ্গবন্ধু হত্যার রহস্য কি গোপনই রয়ে গেল); ডা. কামরুল ইসলাম খান (মুজিব আদর্শ ও রাজনীতি); ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল (যদি রাত পোহালে শোনা যেত...); তোফায়েল আহমেদ (স্মৃতির পাতায় জাতির জনক); ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু (শোকাবহ আগস্ট এবং আমার কিছু স্মৃতি); নীলিমা ইব্রাহিম (১৫ আগস্টের আগে ও পরে); নূরে আলম সিদ্দিকী (১৫ আগস্ট জাতির জন্য শুধু শোকের নয়, লজ্জারও); প্রণব মুখোপাধ্যায় (নিরলস এক রাষ্ট্রনায়ক); ফকির ইলিয়াস (বঙ্গবন্ধুর চেতনায় চলমান উন্নয়নের বাংলাদেশ); ফজলুল হক খান (যে শোকে আজও ইতিহাস কাঁদে); বদিউল রহমান (এত কার্পণ্য কেন?); বেবী মওদুদ (১৫ আগস্ট ১৯৭৫); বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (সামরিক সমাজের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর স্ট্র্যাটেজি); মমতাজ উদদীন আহমদ (বিরুদ্ধে ও পক্ষে); মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী (বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : দ্বিতীয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নীলনকশা); মতিউর রহমান (খুনি-চক্রকে রক্ষা করেছে জিয়া, এরশাদ ও খালেদা সরকার); মহিউদ্দিন আহমদ ('সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোন শোন পিতা'); মালেকা বেগম (সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কী ঘটেছিল?); মাসুদা ভাট্টি (১৫ ও ২১ আগস্ট : এদেশের রাজনীতির অন্ধকার দুটি দিন); মাহমুদ রেজা চৌধুরী (আত্মজিজ্ঞাসার দিন); মিনার মনসুর (ভয় হতে অভয় মাঝে); মিল্টন বিশ্বাস (বঙ্গবন্ধু নদী হয়ে শুয়ে আছেন বাংলার মাটি ভালোবেসে); মুসা সাদিক (১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডি : বঙ্গভবন ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অজানা অধ্যায়); মুহম্মদ জাফর ইকবাল (বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু); মুহম্মদ শফিকুর রহমান (ইতিহাসের জঘন্যতম ট্র্যাজেডি এবং তারপর); মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (আমার 'মুজিব ভাই'); মুস্তাফিজ শফি (বঙ্গবন্ধুর পথেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশ); মোনায়েম সরকার (যেভাবে আমরা জানাই প্রতিবাদ); মো. জাকির হোসেন (রাজনীতি যার যার, বঙ্গবন্ধু সবার); মোহাম্মদ নাসিম (তাঁর সংগ্রামী জীবনটাই ছিল বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য);

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (বাংলাদেশ গড়ায় বঙ্গবন্ধুর ব্রত); মো. মাহবুবুর রহমান (মুক্তিদাতা শেখ মুজিব); মোহাম্মদ শাহজাহান (জাতির জনক হত্যা : দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র); মোহাম্মদ হাননান (বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল); মো. সাখাওয়াত হোসেন (বাঙালির শোকের মাস); মোস্তাফা জব্বার (বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের পিতা শেখ মুজিব); যাহিদ হোসেন (হত্যাকারীদের মূল সমস্যা ছিল সেনানিয়ন্ত্রণ); রণেশ মৈত্র (বঙ্গবন্ধু হত্যা : নেতৃত্ব সংকট ও আদর্শিক বিপর্যয়); রফিকুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধু ও শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ); রশীদ হায়দার (তাঁর মৃত্যুর পরে); রাশেদ খান মেনন (ব্যক্তি নয়, রাজনীতি হত্যা করাই ছিল উদ্দেশ্য); রাহাত খান (অসম্ভবকে যিনি সম্ভব করেছিলেন); লে. কর্নেল মহিউদ্দিন সেরনিয়াবাত (অব.)); শওকত ওসমান (তোমার স্মরণে, বঙ্গবন্ধু); শামসুল হুদা হারুন (বঙ্গবন্ধুকে ১৫ আগস্টের কালরাত্রে নৃশংস খুন : জাতিসত্তার অস্তিত্বে আঘাত); শাহ এ এম এস কিবরিয়া (১৫ আগস্ট : জাতীয় শোক দিবস); শেখ রেহানা (মানুষের সমুদ্রে তিনি এক মহামানব); শেখ হাসিনা (ভাইয়েরা আমার); শেখর দত্ত (পিতা ও কন্যা : ভিন্ন প্রেক্ষিত একই ধারা); সরদার ফজলুল করিম (এই সেই ১৫ আগস্ট '৭৫); সন্তোষ গুপ্ত (চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু); সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত (বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি); সারোয়ার কবীর (বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়ার সমর্থন); সালাহ্ উদ্দীন আহ্মদ (পনেরোই আগস্টের অঙ্গীকার); সুবার সিংহ রায় (বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা); সুলতানা কামাল (পর্বতপ্রমাণ অটল ব্যক্তিত্ব); সোহরাব হাসান (টমাস উইলিয়ামস ও বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত); সৈয়দ আবুল মকসুদ (বঙ্গবন্ধু ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিয়তি); সৈয়দ জাহিদ হাসান (আততায়ী আগস্ট : এখনো উদ্যত ঘাতক বুলেট); সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম (পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশ); সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন (বঙ্গবন্ধু : ইতিহাসের মহানায়ক); সৈয়দ হাসান ইমাম (তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ); সৌমিত্র শেখর (নজরুলের কল্পপুরুষই বঙ্গবন্ধু); হারুন হাবীব (বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ও রাষ্ট্র-উপলব্ধি); হাসান আজিজুল হক (যে নৃশংসতা কল্পনারও অতীত); হাসান ফেরদৌস (বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম)। গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে আলোকপাত করা যাক

৩.

প্রথমে বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার একটি প্রবন্ধ নিয়ে আলোকপাত করব। এই লেখাটি বলা চলে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির জীবনের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের এটি

একটি সাক্ষ্য। এই রচনায় তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নন, দক্ষ রাজনীতিক শেখ হাসিনাও নন, তিনি তখন তাঁর পিতার হাচু। যিনি এই লেখায় কেবল ৭ই মার্চের সেই মহাভাষণের প্রাক্কালের মুহূর্তটি বর্ণনা করেছেন।

"রেসকোর্স ময়দান। সকাল থেকেই দলে দলে লোক ছুটছে ময়দানের দিকে। গ্রামবাংলা থেকে মানুষ রওয়ানা দিয়েছে ঢাকার পথে। সকাল দশটা-এগারোটার মধ্যেই আমরা শুনতে পারলাম, ময়দানে লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। একটা মঞ্চ তৈরি হচ্ছে, খুবই সাদাসিধে। মাথার ওপর কোনো চাঁদোয়া নেই, শুধু একটা খোলা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিমদিকের মুখ করে মঞ্চটা তৈরি। পূর্বদিকে রাস্তার পাশ থেকে একটা সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। মাঠজুড়ে বাঁশ পুঁতে পুঁতে মাইকের হর্ন লাগানো হচ্ছে। যতই মানুষ বাড়ছে, ততই হর্ন লাগানো হচ্ছে। মাইক যারা লাগাচ্ছেন, তাঁরাও যেন হিমশিম খাচ্ছেন, কোনো কূলকিনারা পাচ্ছেন না। কত মানুষ হবে? মানুষ বাড়ছে আর তাঁরা তার টানিয়ে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভলান্টিয়াররা খুবই তৎপর। মানুষের মাঝে প্রচণ্ড এক আকাঙ্ক্ষা, শোনার অপেক্ষা, কী কথা শোনাবেন নেতা। যাঁরা আসছেন, তাঁদের হাতে বাঁশের লাঠি, নৌকার বৈঠা ও লগি। তাঁদের মুখে-চোখে একই আকাঙ্ক্ষা : স্বাধীনতা। দীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এ মানুষগুলির মুখে-চোখে। এ ময়দানে শরিক হয়েছে সর্বস্তরের মানুষ– নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-শিক্ষক, কিষান-কিষানি, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি, রিকশাওয়ালা, নৌকার মাঝি, শ্রমিক– কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ ঘরে নেই।

ঢাকা শহরে এত মানুষ কোথা থেকে এলো! এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, বিস্ময়কর চিত্র। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি। মিরপুর রোড থেকে প্রবেশ করলে অর্থাৎ, পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে গেলে পঞ্চম বাড়িটি। এ বাড়িতেই বাস করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে বাড়িটিও লোকে লোকারণ্য। সড়কে মানুষের ঢল। লেকের পাড়ে সড়ক, তার পাশে বাসা। ছোট বাসা। নিচতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের আনাগোনা। এ ছাড়াও শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, ছাত্রনেতারা একের-পর-এক আসছেন। সবাই ব্যস্ত নেতা শেখ মুজিব আজ কী বক্তব্য দেবেন, তা জানার জন্য। সবার যার যার মতামত দিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে লেখা কাগজ দিচ্ছেন। আজকের এই সমাবেশে কী ভাষণ দেওয়া উচিত তা নিয়েও আলোচনা করছেন। কোনো কোনো ছাত্রনেতা এ কথাও বলছেন, 'আজকেই সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা

দেন, আমরা প্রস্তুত।' আরো বলছেন, 'এটা যদি না বলেন, মানুষ হতাশ হয়ে যাবে।' খুবই উত্তেজিত তাঁরা।" এই বর্ণনার মধ্যে যেমন বিশ্বাসযোগ্য বয়ান আছে, তেমন আসে ৭ মার্চের বাঙালির সেই মহেন্দ্রক্ষণের গতিময় বর্ণনা।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সবাই সাক্ষী হতে চায়, দাবিদার হতে চায়। সাধারণ মানুষ বুঝতে প্রায় অক্ষম, যে নেতা তাদের এতটা দূর নিয়ে এসেছেন, স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সেই নেতার কাছে প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তিনি কখন কি করবেন, কিভাবে করবেন, কিভাবে জনস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করবেন সবই তার নখদর্পনে। শেখ হাসিনার লেখায় আমরা কেবল এই জনস্রোতের জলজ্যান্ত চিত্রই পাই না, এর নেপথ্যের কিছু ইঙ্গিতও উঠে এসেছে। ভিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মীনি শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবের দক্ষ ভূমিকা। এবার লেখকের বর্ণনায় আসি। তাঁর এই রচনা থেকে আমরা জানলাম ঠিক রেসকোর্স ময়দানে যাওয়ার ঠিক আগ মুহর্তেরঘটনা।

"নিচের অফিসঘর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উপরে দোতলায় এলেন। মা বেগম ফজিলাতুননেছা এক কাপ চা লেবুর দুফোঁটা রস দিয়ে আব্বার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, 'তুমি এখানে বস, চা খাও, খাবার প্রস্তুত করছি।' সেখানে আমাদের অনেক নেতা উঠে এসেছেন, আত্মীয়স্বজন আছেন, ছাত্রনেতারাও আসছেন-যাচ্ছেন। সময় প্রায় হয়ে এলো। মা টেবিলে খাবার দিলেন। বেশি কিছু আহামরি খাবার নয়, বাঙালির সাধারণ যে খাবার– ভর্তা, সবজি, ভাজা মাছ, মাছের ঝোল।

তিনি খেলেন। সঙ্গে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও খেলেন। সাথে বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা চলছেই। খাওয়া শেষ হলে মা সবাইকে বললেন, 'আপনারা এখন মাঠে চলে যান।'...

আমি আব্বার মাথার কাছে বসে আব্বার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। এটা আমার সবসময়ের অভ্যাস। মা একটা মোড়া টেনে বসলেন। হাতে পানের বাটা। পান বানিয়ে আব্বার হাতে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'দ্যাখ, তুমি সারাটা জীবন এ দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছ, দেশের মানুষের জন্য কী করতে হবে তা সবার চেয়ে তুমিই ভালো জানা। আজকে যে মানুষ এসেছে, তারা তোমার কথাই শুনতে এসেছে। তোমার কারও কথা শোনার প্রয়োজন নেই, তোমার মনে যে কথা আছে তুমি সেই কথাই বলবে। আর সেই কথাই সটিক কথা হবে। অন্য কারও কথায় তুমি কান দেবে না।'

সেদিন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পিতা এবং কন্যা এক গাড়িতে সেখানে যান নাই। আলাদা আলাদা গাড়িতে গিয়েছিলেন।

তারপর তিনি সমবেত উত্তাল জনসমুদ্রের দিকে তাকালেন। বলে উঠলেন বজ্রকণ্ঠে : 'ভাইয়েরা আমার।'

যে বিষয়গুলো এই রচনায় উঠে এসেছে–

১. এ ঐতিহাসিক ভাষণ যখন তিনি দেন, তাঁর হাতে কোনো কাগজ ছিল না, ছিল না কোনো নোট।

২. চোখের চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে তিনি ভাষণটা দিলেন, ঠিক যে কথা তাঁর মনে এসেছিল, সে কথাগুলিই তিনি বলেছিলেন। বাংলার মানুষের মনে প্রতিটি কথা গেঁথে গিয়েছিল।

৩. 'স্বাধীনতা ', এ শব্দটা বুকে ধারণ করে তিনি যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তা দেশের মুক্তিকামী মানুষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বিজয় অর্জন করেছিল। শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

৪. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে সামরিক শাসন জারি করা হয়, মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতা দখল করে, তখন এ ভাষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বজ্রকণ্ঠের যে ভাষণ মানুষের মাঝে শক্তি জুগিয়েছিল, রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছিল– সে ভাষণ ছিল নিষিদ্ধ।

৫. আজ এ ভাষণ 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' বা বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের ইউনেস্কো তার 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৬. বি এন আহুজা সম্পাদিত 'দ্য ওয়ার্ল্ডস গ্রেট স্পিচেস' শীর্ষক রেফারেন্স বইয়ে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে। লেখক ও ইতিহাসবিদ জেকব এফ ফিল্ড-এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস : দ্য স্পিচেস দ্যাট ইনস্পায়ার্ড হিস্ট্রি' গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ।

৭. বিশ্বের বিখ্যাত যত ভাষণ বিশ্বনেতারা দিয়েছেন, সবই ছিল লিখিত, পূর্বপ্রস্তুতকৃত। আর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত, উপস্থিত বক্তৃতা।

৮. এই ভাষণ ছিল একজন নেতার দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও আগামীদিনের কর্মপরিকল্পনা।

৯. 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল', 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না', 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশল ছিল এ ভাষণে।

১০. কিন্তু ৭ মার্চের ভাষণের রণকৌশলে বাঙালি জাতি আশ্বস্ত হয়ে সব প্রস্তুতি নিতে ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামবাংলায়, প্রস্তুতি নিয়েছিল যুদ্ধের। প্রতিটি ঘরই পরিণত হয়েছিল এক-একটি দুর্গে।

৭ মার্চের ভাষণ ছিল পৃথিবীর অন্যতম সেরা রাজনৈতিক বক্তব্য। তার একটি বক্তব্যের মাধ্যমে একটি জাতি স্বাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো রাজনৈতি নেতাকে এ ধরনের বক্তৃতা দিতে হয়নি। এটা কোনো বাগাড়ম্বড় নয়, এখন নেটের যুগে, উইকিপিডিয়ার যুগে একটু চাইলে যাচাই করা সম্ভব। আমরা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর চার্চিলে ভাষণ, এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষণের সাথে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তুলনামূলক বিচার করতে পারি। ব্রিটিশ ও মার্কিন দুই নেতার ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল মূলত যুদ্ধের পরবর্তী কালের বিষয়। যেখানে ছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের প্রতি, নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, জাতি গঠনের রূপরেখা এবং দেশের সবার জন্য সরকারের কর্তব্য। কিন্তু ৭ মার্চের ভাষণ ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যেখানে একই সঙ্গে তিনি একজন নির্বাচিত সম্ভাব্য রাষ্ট্র প্রধান, সেই পাকিস্তান শামরিক রাষ্ট্রের সারি সারি সেনাবাহিনি, অপর দিকে জনতা। জনতা কি চাচ্ছে, কার কাছে চাচ্ছে তাকে ওই সভায় তাৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে তার নিজের জীবনসহ উপস্থিত জনতার প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। তিনি ঐ ভাষণে সকল দিক বিবেচনা করে। স্বরের উত্থান পতন, গঠন ও প্রতিরোধের ইঙ্গি দিলেন। বললেল, তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তোলো। তিনি পাকিস্তার সরকারকে সব রকম অসহযোগিতার ডাক দিলেন, খাজনা ট্যাক্স বন্ধের ঘোষণা দিলেন। বললেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির

সংগ্রাম। তার এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল বাঙালির সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাঙালি তার বাণীকে পাথেয় করে এগিয়ে গেল সম্মুখ পানে।

৪.

আনিসুজ্জামানের 'জননায়কের আবির্ভাব ও তিরোধান' শীর্ষক প্রবন্ধ নিয়ে দুএকটি কথা বলতে চাই। এই প্রবন্ধটি যে কারণে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তার কারণ খুব ছোট্ট অথচ ধারাবাহিকভাবে তিনি স্পষ্ট করেছেন। কোন সব ঘটনা বঙ্গবন্ধুকে ধীরে ধীরে একজন জননায়ক রূপে তৈরি করেছে। কারণ নেতা তো আর একদিনে হয়ে ওঠে না। তার নিজের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, এবং তার জাতির আস্থার স্থলে পরিণত হতে হয়। আনিসুজ্জামান শুরু করেছেন ঠিক বঙ্গবন্ধুর জন্ম সময় থেকে,

১. ফরিদপুর জেলার (এখনকার গোপালগঞ্জ জেলার) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন একজন জোতদার ও স্থানীয় আদালতের নাজির। সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কথা শুনে এবং ঘরের কাছে (বাঘা যতীনের সহকর্মী) মাদারীপুরের পূর্ণচন্দ্র দাসের বিপ্লবী প্রয়াসের কথা জেনে, মুজিব আকৃষ্ট হন স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি।

২. দুটি ঘটনা তাঁকে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির দিকে ঠেলে দেয় বলে মনে হয়। তাঁর সহপাঠী ও নিকট প্রতিবেশী ননীগোপাল দাস একদিন তাঁর (কাকার) বাড়িতে মুজিবকে নিয়ে যান এবং থাকার ঘরে বসান। পরে ননী কাঁদো-কাঁদো হয়ে মুজিবকে বলেন, তাঁদের বাড়িতে আর না যেতে। কেননা, মুজিবকে ঘরে নিয়ে বসানোর জন্য তাঁর কাকিমা। (যিনি মুজিবকে খুব ভালোবাসতেন) ননীকে খুব বকেছেন এবং নিজে ঘর ধুয়ে ফেলেছেন, ননীকেও ঘর ধুতে বাধ্য করেছেন। পরে মুজিব লেখেন, এই ঘটনা। 'আমার মনে দাগ কেটে গিয়েছিল, আজও সেটা ভুলি নাই।'

৩. দ্বিতীয় ঘটনা ১৯৩৮ সালের। বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গোপালগঞ্জ সফর উপলক্ষ্যে একটি জনসভা ও প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। স্কুলের ছাত্র মুজিব হন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা। স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের নির্দেশে বর্ণহিন্দু তরুণরা শেষমুহূর্তে এই আয়োজন থেকে সরে দাঁড়ায় (তফসিলি ছেলেরা অবশ্য রয়ে যায়। কারণ, মন্ত্রী মুকুন্দবিহারী মল্লিকও আসছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে)। পরে মুজিব লিখেছেন, "আমি এ-খবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ

আমার কাছে তখন হিন্দু-মুসলমান বলে কোনো জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান-বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ানো-সব চলত।' এই সংবর্ধনা নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা সত্ত্বেও সৌভাগ্যবশত শান্তিপূর্ণভাবে সবকিছুর সমাধা হয়। হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদের জন্য পরে মুজিব অনেক দুঃখ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অন্তর্নিহিত কারণ যেমন করে রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসু অনুধাবন করেছিলেন, আর কেউ তেমনটা করেননি।

৪. তারপর সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরিচয় এবং মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়ে ওঠে তাঁর ধ্যানজ্ঞান। পাকিস্তান বলতে তিনি বোঝেন দুটি রাষ্ট্র– একটি পুবে অন্যটি পশ্চিমে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে তখন দুটি উপদল ছিল– একটি মোহাম্মদ আকরম খাঁ-খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে, অপরটি সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন। শেষোক্ত উপদলটি পরিগণিত হতো প্রগতিপন্থি হিসেবে, কেননা এ দলের সদস্যরা চাইতেন মুসলিম লীগকে 'জমিদার, জোতদার ও খান বাহাদুর নবাবদের' প্রভাবমুক্ত করে জনগণের প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে আর চাইতেন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করতে। মুজিব এই শেষোক্ত উপদলভুক্ত হন এবং আবল হাশিমের প্রেরণায় হয়ে ওঠেন মুসলিম লীগের সর্বক্ষণের কর্মী।

৫. পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে শেখ মুজিব সারা দিন লঙ্গরখানায় কাজ করেছেন, রাতে কখনো হোস্টেলে ফিরেছেন, কখনো মুসলিম লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে রাত কাটিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে মুসলমান ছাত্রীদের উদ্ধার করা, আহতদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা, এলাকা পাহারা দেওয়া ইত্যাদি নানারকম কাজ করেছেন। মুসলমানদের যেমন উদ্ধার করেছেন, তেমনই হিন্দুদের উদ্ধার করেও নিরাপদ এলাকায় পাঠিয়েছেন।

৬. ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে জিন্নাহ দিল্লিতে ডাকলেন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের লীগদলীয় সদস্যদের সম্মেলন।

৭. পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি তিনি কিছুদিন আস্থা রেখেছিলেন, কিন্তু তার কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে সরকার-পৃষ্ঠপোষিত নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বিপরীত পক্ষে

সমমনা ছাত্রনেতা-কর্মী নিয়ে তিনি গঠন করলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ।

৮. ১৯৪৯ সালে আবার গ্রেফতার হন- এবারে মাস-ছয়েকের জন্য। তিনি কারাগারে থাকতেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে গঠিত হয় সরকারবিরোধী নতুন রাজনৈতিক দল, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, আর মুজিবকে নির্বাচিত করা হয় তার একজন যুগ্ম সম্পাদক।

৯. ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যখন সমাগত, তখন তিনি কারাবন্দি হিসেবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেখান থেকেই এই আন্দোলনের নেতাদের তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। অনশনরত মুজিবের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর কতবার যে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন, তা বলা শক্ত।

১০. ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার গুণে এই সংগঠন জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত স্থান করে নেয়। মুজিবও কর্মী থেকে নেতায় উন্নীত হন।

১১. ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের আগে মুজিবের সায় না থাকলেও বিরাধী দলগুলোর একটি যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় এবং নির্বাচনে তা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৫৫ সালে শেখ মুজিব পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এই গণপরিষদ যখন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা করে, তখন তিনি প্রদেশের নাম 'পূর্ব বাংলা' রাখার পক্ষে, দেশের নামে ইসলামি প্রজাতন্ত্র যুক্ত করার বিপক্ষে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখার জন্য জোরালো বক্তব্য দেন। এ সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে যে 'মুসলিম' শব্দটি বর্জিত হয়। ১৯৫৬ সালে তিনি পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন, তবে দলীয় কাজে অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার ইচ্ছে থেকে অল্পকালের মধ্যে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন।

১২. ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়, ১৯৬১ সালে তা প্রত্যাহার করা হলেও আইয়ুব খানের কর্তৃত্ববাদী শাসন অব্যাহত থাকে। মুজিব কয়েক বছর কারাগারে ও স্বগৃহে অন্তরীন থাকেন। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তিনি আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন।

১৯৬৪ সালে তিনি পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

১৩. ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে তিনি ৬-দফা দাবিনামা পেশ করেন। প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসন ছিল এর মূলকথা। তিনি বলেন, এই দাবিনামা লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত। সরকার বলে, এ হলো পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্টির প্রয়াস। পূর্ব বাংলার সর্বত্র জনসভা করে ৬-দফার পক্ষে মুজিব জনমত সৃষ্টিতে সমর্থ হন। উত্তরে সরকার তাঁকে বারংবার গ্রেফতার করে। ততদিনে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে আসীন। পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বন্দী অবস্থায়ই ১৯৬৮ সালে তাঁকে প্রধান আসামি করে এবং আরো ৩৪ জন সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু করা হয়। ঢাকা সেনানিবাসে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয় বিশেষ আদালতে। এর প্রতিক্রিয়া হয় সরকারের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব বাংলায় ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের ফলে মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। তাকে জনগণ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে পদত্যাগ করতে হয়।

১৪. পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন করেন ১৯৭০ সালের শেষে। তার আগে আওয়ামী লীগের ঘোষণায় প্রথমবারের মতো বলা হয় যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে শেখ মুজিব এ নির্বাচনকে অভিহিত করেছিলেন ৬-দফার পক্ষে গণভোট বলে। নিবাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং ৬-দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অনিচ্ছুক, তা স্পষ্ট হয়ে গেলে মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সে আন্দোলনের সাফল্য সারা বিশ্বকে অবাক করে দেয়। অধিকাংশ দেশবাসী, বিশেষত তরুণ সমাজ চাইছিল বঙ্গবন্ধু একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দিন।

১৫. এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ৭ মার্চের জনসভায় যে ভাষণ দেন, তা এখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুত এই ভাষণের সময়টাই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের সেরা সময়। তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি বটে, কিন্তু বক্তৃতার শেষে সুস্পষ্টই বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ক্ষমতাসীন চক্র আলোচনার

নামে সময়ক্ষেপণ করে এবং ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ইতিহাসের অতি নৃশংস গণহত্যার সূচনা করে। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন, কিন্তু তার স্বাধীনতা ঘোষণার দুটি ইংরেজি ভাষ্য ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছিল, অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে গিয়ে মানুষের প্রকৃতিও বদলে গিয়েছিল। বৈরী আবহাওয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রে ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যত একদলীয় শাসন প্রবর্তিত হয়। গণতন্ত্রের, বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্যে শেখ মুজিবের আজীবন সংগ্রামের সঙ্গে তা সংগতিপূর্ণ ছিল না। তিনি অবশ্য বলেছিলেন, এটি সাময়িক অবস্থা। কিন্তু তার ফল কী হয়, তা দেখার আগেই ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। এই প্রতিবিপ্লব অনেক রক্তক্ষয়, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির অনেক পরিবর্তন, মানুষের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয় অনেক সময় ধরে, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় থেকে তাঁকে অপসারণ করা যায়নি।'

৪.

বঙ্গবন্ধুকে যে কোনোভাবেই মুছে ফেলা যায়নি তার ইঙ্গিত মেলে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী : বঙ্গবন্ধুর নতুন করে ফিরে আসা' শীর্ষক প্রবন্ধে- 'বঙ্গবন্ধুর জীবনের ওপর লেখার জন্য এত বেশি অনুরোধ পেয়েছি যে, সব লেখা লিখে উঠতে পারা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য হয়েছে, 'দানবের মূঢ় অপব্যয়, গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিহাসে শাশ্বত অধ্যায়।' বঙ্গবন্ধু স্বীয় মহিমায়ই ইতিহাসের অনন্য পুরুস হিসেবে তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। খলনায়করা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। অতীতের সেই দুঃখময় ও যাতনাময় দিনগুলোর কথা মনে পড়ে আজ চোখ আনন্দের অশ্রুতে ভরে যায়। আমরা জয়ী হয়েছি। অন্ধকারের অপদেবতারা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিষ্ঠা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রতিজ্ঞা হোক– বঙ্গবন্ধুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করা। তাহলে এই জন্মশতবার্ষিকী পালন সফল ও সার্থক হবে।'

কবীর চৌধুরী তার 'বাংলাদেশের মুকুটবিহীন প্রমূর্ত রাজ' নামক প্রবন্ধে বলেন- 'জনতা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা প্রমুখের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। সেসব হত্যাকাণ্ড হীন, বর্বর ও পৈশাচিক বলে নিন্দিত

হয়েছে, হত্যাকারীরা গণ্য হয়েছে নরপশু বলে। মুসলিম ইতিহাসের প্রথম চার খলিফা তথা রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে তিনজনই গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন, তাদের মধ্যে একজন মসজিদের ভেতর। ভারতের জাতির পিতা মহাত্ম গান্ধীও নিহত হন আততায়ীর হাতে, তিনিও যাচ্ছিলেন প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী এবং পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নাম আমাদের সহজেই মনে পড়ে। আমাদের নিকট প্রতিবেশী দেশ বর্মার স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যার অবদান ছিল কেন্দ্রীয় সেই আউং-সানও একদল আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালে দেখি সে দেশের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন, জে.এফ. কেনেডি ও রবার্ট কেনেডি আততায়ীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। আফ্রিকার স্বাধীন গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা সামরিক স্বৈরতন্ত্রীদের হাতে নিহত হন। আর আমাদের জাতির পিতা, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, 'রাজনীতি কবি' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও নিহত হন বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারী একটি সেনাচক্রের হাতে। কেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো? একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্নিগর্ভ প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।'

স্বাধীনতার পরে এই মহাননেতা কি কিছুটা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, ছাটার দল কি তাকে দখলে নিয়ে এসেছিল- এই সব নানা দুঃখ সংকটের কথা তুলে ধরেছেন, নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর '১৫ আগস্টের আগে ও পরে' পঁচিশে মার্চের পর দেশে কী ঘটেছিল, কিভাবে স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল, সেসব কথাও বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করার সময় ও সুযোগ বঙ্গবন্ধু দিলেন না। যুদ্ধকালীন এক নেতা 'তাজউদ্দীন ভারতের দালাল...' তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের এ ধারণাকে কিছুটা হলেও মৌনভাবে গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু। দুর্দিনের বন্ধু জনারণ্যে হারিয়ে গেল। তার ওপর আরেক অস্বস্তি, আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে কখনো এক কথা বলতে পারতাম না। দু-চারজন উপস্থিত থাকতেনই। সংকোচ এড়িয়ে যদি বলতাম, 'বঙ্গবন্ধু আমার কিছু নিজস্ব কথা আছে।' বলতেন : 'আরে এরা আমাদের লোক। বলেন কী কথা আছে।' বক্তব্য বুকে নিয়ে ব্যথা-বেদনা ও অসম্মানের জ্বালা নিয়ে ফিরে আসতাম। কিন্তু শেষের দিকে তিনি সব বুঝেছিলেন; রীতিমতো ধমক দিয়ে বলতেন : 'বাইরে যা, কথা বলতে দে।' কিন্তু ততদিনে সর্বনাশ হা হওয়ার হয়ে গেছে।' হাসান ফেরদৌসের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম' নামক লেখাতেও

এমন একটা বিষয় ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি। তিনি চেয়েছিলে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে বাধ্যতামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক ভাষণে প্রস্তাব রেখেছিলেন, 'গ্রামের প্রত্যেকটি কর্মঠ মানুষ এই বহুমুখী সমবায়ের সদস্য হবে। যার-যার জমি সে-ই চাষ করবে, কিন্তু ফসল ভাগ হবে তিন ভাগে– কৃষক, সমবায় ও সরকার।' এই গ্রামীণ সমবায়কে তিনি নতুন গ্রাম-সরকার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁদের হাতেই উন্নয়ন বাজেটের অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হবে, ওয়ার্কস প্রোগ্রামও থাকবে তাঁদের হাতে। তিনি বলেছিলেন, 'এরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে একসময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের টাউটদের বিদায় দেওয়া হবে।'

প্রণব মুখোপাধ্যায় এর 'নিরলস এক রাষ্ট্রনায়ক' প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু চারিত্রিক স্থৈর্য এবং জীবনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মোকাবেলার কথা উঠে এসেছে। 'মুজিবুর রহমানের বিমল কর্মময় জীবন যা তাঁর ধৈর্য্য, মানসিকতা, দৃঢ়তা এবং অপরিসীম আত্মসংযমের পরিচায়ক, তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা দুরূহ। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের রাতে মুজিবকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনি করাচিতে বন্দী হিসেবে নিয়ে আসে। করাচি বিমানবন্দরে দুজন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে তোলা তাঁর ছবি বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তার থেকে মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি জেলে ছিলেন। সেটি রাওয়ালপিন্ডির কাছে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বের কোনো খবর তাঁর কাছে ছিল না। এই সময়ে মানসিক এবং শারীরিক চাপ তৈরির জন্য প্রচণ্ড গরম এবং নিদারুণ ঠাণ্ডার মধ্যে প্রায় ন'মাস তাঁকে রাখা হয়। একটিমাত্র কম্বল শীত নিবারণের জন্য দেওয়া হয়েছিল। কোনো ডাক্তারি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়নি। একজন মিলিটারি অফিসার হিসেবে জেল গভর্নর মাঝে মাঝে আসতেন। যুদ্ধের খবরও তাঁর কাচে ছিল না।' মমতাজউদদীন আহমদ : 'বিরুদ্ধে ও পক্ষে' লেখায় নেতার নির্মল নিরুদ্বিগ্ন জীবন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি 'শেখ মুজিবকে আমি পাঁচবার নিকট হইতে দেখিয়াছি। কখনো তিনি সোহরাওয়ার্দীর সহিত ছিলেন, কখনো তাঁহার সহিত তাজউদ্দীন ছিলেন। কখনো সীমান্তের আবদুল গাফ্ফার খানের সহিত তাঁহাকে দেখিয়াছি। আবার কখনো তাঁহাকে এককভাবে হাস্য-হট্টরোলের মধ্যেও দেখিয়াছি। সব সময় তাঁহার চপল চঞ্চলতা, পূর্ণ জীবন-উচ্ছ্বাস দেখিয়া

ভাবিয়াছিলাম, রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম একপ্রকার সদা-সরব সহাস্য এবং স্বতঃস্ফূর্ত জীবনপ্রবাহ। এখানে কোনো বিষাদ নাই, বিপদ নাই।'

কিভাবে বঙ্গবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে আসলেন এ কথা আমরা জানতে পারি ড. রফিকুল ইসলামের প্রবন্ধ থেকে। 'বস্তুত কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের নেপথ্য ভূমিকা ছিল। ড. নীলিমা ইব্রাহিমের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে বাংলা বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেকা করে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য। বঙ্গবন্ধু এই আবেদনে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নজরুলকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিকে ভাস্বর করে রাখার অভিপ্রায়ে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা বিভাগ থেকে আগের সেই প্রতিনিধিদল আবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রায়েরবাজার বা মিরপুর বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান।'

ড. সৌমিত্র শেখর তাঁর লেখায় 'নজরুলের কল্পপুরুষই বঙ্গবন্ধু' বঙ্গবন্ধুতে ব্যাখা করেছেন তাদের মানস সাজুয্যের কথা।

'বাঙালির বাঙলা' : খুবই ছোট, মাত্র ৭৫০ শব্দের মতো– কিন্তু অগ্নিগর্ভ একটি রচনা। এই রচনায় নজরুল প্রাজ্ঞ ও দিব্যজ্ঞানীর মতো কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং দিশা দিয়েছেন স্বাধীনতার। স্বাধীনতা– শুধু ভারতের স্বাধীনতাই নয়, ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাংলার স্বাধীনতাও। ১৯৪২ সালে যখন ভারতের স্বাধীনতার জন্যই সবাই ভাবিত, সে সময় বাংলার মুক্তির কথাও ভেবেছিলেন নজরুল।

কাজী নজরুল ইসলাম এই প্রবন্ধটি রচনা করার ১০ বছর পরে বাঙালি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পন্ন করে এবং এর পর থেকেই মূলত ভাষাভিত্তিক একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনের সংগ্রাম বেগবান হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং'জয় বাংলা' স্লোগানকে বীজমন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসে বাংলার স্বাধীনতা– প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। ফলে বলাই চলে, কাজী নজরুল ইসলামের কল্পপুরুষই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি বিদেশি শক্তিকে 'খবরদার' বলেছিলেন; তাঁর উচ্চারিত 'বাঙলার জয় হোক' বচনই বঙ্গবন্ধুর 'জয় বাংলা'– যে স্লোগান হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের বীজমন্ত্র।

বাঙালি মুসলমানের সঙ্কটের কথা তুলে ধরেছেন, 'শওকত ওসমান : তোমার স্মরণে, বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক রচনায়। 'শত শত বছর গোলাম বাঙালি মুসলমান, বাইরের লোকের পয়জারের নিচে থাকতে অভ্যস্ত– হঠাৎ স্বাধীন হয়েছিল তোমার নেতৃত্বে। তোমারও অভিজ্ঞতা ছিল না, যে স্বাধীনতার পর কোথায় ফেলবে, কীভাবে ফেলবে। তাই ভুলচুক হয়েছে। কিন্তু দেশের মানুষকে তুমি ঠকাতে চাওনি। যদি তা চাইতে, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরা এগিয়ে আসত না এত চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের ফাঁস নিয়ে। তাদের সঙ্গে হাত মিলালে তোমার অলৌকিক জনপ্রিয়তা পুঁজি করে দিব্যি রাজত্বের দিন কাটিয়ে দিতে। তুমি বিশ্বের জনগণের শিবিরে থাকতে চেয়েছিলে, তাই পথ থেকে তোমার মতো পথের কাঁটা না সরিয়ে দেওয়া ছাড়া ওদের অন্য গতি ছিল না। কিন্তু তোমার দেশবাসী রাজনীতির আড়তদারেরা এই সোজা ব্যাপারটাও চোখে দেখে না। বরং তোমার বিনাশে উল্লসিত হয়। কারণ, সিংহ বন ছেড়ে গেলে ভেড়া সিংহ বনে যায়। যুগ-যুগান্তের গোলামেরা যখন রাজনীতি করে, তাদের দাসচেতনা নিয়েই জগৎকে দেখে। সাবেক খাসলত কী করে ছেড়ে দেবে? ওদের চিন্তাবাদ বিদেশি ভাবধারায় এমন ঠাসা থাকে যে দেশের মাটি আর পায়ের তলায় থাকে না। ওদের মগজ যেন টাইপরাইটার– রিড টিপে যা পায় তা-ই অনড় সত্য হয়ে ওঠে। বাইরের দিকে সদা চোখ ইরান-তুরান করে করে শত শত বৎসর কাটিয়ে দিলে এদেশের মানুষ। দেশের মাটি কী করে দেখবে বা বিদেশি ভাবধারা দেশের আবহাওয়ায় জারিয়ে তুলবে?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সরদার ফজলুল করিম 'এই সেই ১৫ আগস্ট '৭৫' তার রচনায় বঙ্গবন্ধুর নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করেছেন। 'আমি শেখ মুজিবের দলের সদস্য ছিলাম না। আমি শেখ মুজিবের সরকার গৃহীত অনেক সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করতাম না। কিন্তু মানসিকভাবে আমি চাইতাম, দেশ যেন অতিক্রম করতে পারে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত নেতৃত্বের পর্যায়টি। ব্যক্তিটি অতিক্রম করে যেন সাধারণের যৌথ সংঘশক্তি প্রকাশিত হতে ক্ষমতা, অপার ক্ষমতাবান ব্যক্তির ওপর সবকিছুতে নির্বর করার প্রবণতা। সাধারণ মানুষের এই সব চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য, ভালো-মন্দ, কটু কথায় নানা অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে ক্রমান্বয়ে দূরীভূত হয়ে সংগঠনের যৌথ নেতৃত্বকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠন, তথা যৌথ সাধারণ অতিক্রম করে উঠুক, সেই পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকুক, এই ছিল আমাদের চেতন-অচেতন মনের কামনা।

শেখ মুজিবকে আয়ুদানের ক্ষেত্রে এখানেই হত্যাকরীদের অবদান। গান্ধীজি স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে যতখানি অমর হতেন, তাঁর হত্যাকারী ব্যক্তিবর্গ তাঁর চাইতে অধিক আয়ু গান্ধীজিকে দান করেছে। শেখ মুজিব স্বাভাবিকভাবে প্রয়াত হলে তাঁর দান-অবদান, শক্তি ও সীমাবদ্ধতার যে মূল্যায়ন সম্ভব হতো এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে যে আয়ু এবং অবস্থান তিনি লাভ করতেন তাঁর হত্যাকারীর দল সেই মূল্যায়নকে রুদ্ধ করে মুজিবের দিকে আয়ুকে দীর্ঘতর করেছে, মুজিবের অবস্থানকে দৃঢ়তর করেছে। শেখ মুজিবের দিকে নিক্ষিপ্ত হত্যাকারীর বুলেটের আওয়াজ থেকে মুহূর্তের মধ্যে জন্ম নিয়েছে অপর এক আওয়াজ : 'এক মুজিবের রক্ত থেকে লক্ষ মুজিব জন্ম নেবে।' ইন্দিরা নেহেরুর কন্যা। কিন্তু আজ ভারতে 'নেহেরু' শব্দের যত না উচ্চারণ, তাঁর অধিক উচ্চারণ 'ইন্দিরা' শব্দের। এখানে অবশ্যই কন্যা পিতাকে অতিক্রম করে গেছেন এবং তাঁর অতিক্রমণে তাঁর দেহরক্ষীদের নিক্ষিপ্ত বুলেটের যে একটি অবদান রয়েছে তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।'

বাঙালির রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু কেন সেরা 'সন্তোষ গুপ্ত : চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু' রচনায় তার ইঙ্গিত আছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি জাতিকে তাঁর রাষ্ট্রিক সর্বোচ্চ অধিকার স্বাধীনতা অর্জনেই নেতৃত্ব দেননি, তিনি মূঢ়তা থেকে, কুসংস্কার থেকে, বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্থান দিয়েছেন, ধর্মের নামে যে বিভেদের শক্তি এই উপমহাদেশে পরশাসন দীর্ঘতর করেছে, যার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও আমরা নতুন করে শৃঙ্খলাবদ্ধ হলাম, তিনি তাকে উপড়ে ফেলেছিলেন রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক করে। রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে ইহলৌকিতা বা সেকুলারিজমই গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান দেয়, সেই পরম সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উন্মার্গগামী বাম বুদ্ধিজীবীরা সেক্যুলারিজমের কথা বলেন বটে, কিন্তু শেখ মুজিব ভারতের পরামর্শে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করেছেন বলে যখন বই লিখে আন্তর্জাতিকতাবাদের জয়গান করেন, তখন তারা যে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির সহচর সে কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলতে হবে।

সুভাষ সিংহ রায় এর 'বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা' রচনায় বাঙালি সংস্কৃতি ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি সাহিত্যিকরা যে এত এত কবিতা লিখেছেন, তারপরও বলা যায়, তাঁর জন্য এই অর্ঘ্য যথেষ্ট নয়। 'বঙ্গবন্ধু নিয়ে দেশে ও দেশের বাইরে অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা

লিখেছেন। সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডকে চরম হৃদয়বিদারক ঘটনা হিসেবে দেখেছেন।'

সৈয়দ হাসান ইমাম তাঁর রচনায় বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্বন্ধে বলতে চেয়েছেন- 'সভার সূচনায় বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা এবং বাঙালির সংস্কৃতির প্রিয়তার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেন। শেষে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবমতো 'মুক্তধারা' নামে একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য স্থির হয় শুদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও গবেষণা। বঙ্গবন্ধু প্রধান পৃষ্ঠপোষক, একেএম আহসান সভাপতি, নুরুল আলম ভাই সাধারণ সম্পাদক এবং আমরা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নির্বাচিত হলাম। সারা পূর্ব পাকিস্তানে শাখা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। দুঃখের বিষয় এই সংগঠন কার্যক্রম শুরু করার আগেই সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করলেন আইয়ুব খান। বঙ্গবন্ধুসহ রাজনৈতিক নেতারা গ্রেফতার হলেন। গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইট, বলাকা সিনেমা, জিন্নাহ অ্যাভিনিউয়ের ন্যাশনাল ব্যাংক ভবনসহ নুরুদ্দিন ভাইয়ের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল।'

বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের মধুর গুণ, শিশুদের প্রতি ভালোবাসা এবং অদ্ভূতভাবে তিনি সব শ্রেণির ও বয়সের মানুষকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, সুলতানা কামাল এর 'পর্বতপ্রমাণ অটল ব্যক্তিত্ব' লেখা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। 'ছয় কি সাত বছরের ছোট্ট শিশু আছফার। তার তিন চাকার সাইকেল নিয়ে আমাদের বাড়ির বারান্দায় চক্কর দিয়ে স্লোগান দিতে থাকে– 'আমার নেতা, তোমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব'। কী করে তার মনের মধ্যে এই নামটি গেঁথে গেল, জানি না! কিন্তু ৬ মার্চ আছফার ভীষণভাবে ধরে বসল আমার বাবাকে– সে মুজিবকে না দেখে বাড়ি ফিরবে না। আমরা সকাল থেকে ব্যস্ত নানা শোভাযাত্রা, মিটিং-মিছিল নিয়ে। দুপুরে বাড়ি ফিরে শুনলাম আছফার তার প্রতিজ্ঞায় অটল। বাবার পরামর্শে বর্তমান মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানালেন, বঙ্গবন্ধু সকাল থেকে 'চার খলিফা' বলে অভিহিত ছাত্রনেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছেন। সেদিন তার কাছে কোনো বার্তা পৌঁছানো যাবে কিনা সন্দেহ। তারপরও একটা সম্ভাবনার কথা হলো, বিকেল ৪টায় বঙ্গবন্ধু চায়ের জন্য হাসিনাকে ডাকবেন। তখন একটা সুযোগ করা যেতে পারে। আমি হাজির হলাম বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। ঠিক ৪ টায় বঙ্গবন্ধু নিচতলায়

বসে সভা করছিলেন। সে ঘরের দরজা খুলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে ডাকলেন। তিনি সেই ফাঁকে বাবাকে জানালেন, একটি শিশু তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব। শিশুটি তাঁকে একপলক দেখার জন্য সকাল থেকে অপেক্ষায় আছে। বঙ্গবন্ধু সেই কথা শুনে করিডোরে বের হয়ে এলেন। আছফারকে কোলে নিয়ে নিজের গলার মালাটি কুলে তাকে পরিয়ে দিলেন। এ শুধু বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব। এত গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও একটি ছোট্ট শিশুর আবদার তাঁর কাছে এত মূল্যবান ছিল। এ কারণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সব মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। একজন পর্বতপ্রমাণ অটল ব্যক্তিত্ব। বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সবাই স্বীকার করে নেবেন এই কথাটি।'

বঙ্গবন্ধু একাধিকবার জনসভায় বলেছেন, 'আমার অবস্থা যদি আলেন্দের মতোও হয়...।' ওই বক্তব্যের অর্থ ছিল এই : চিলির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর ষড়যন্ত্রে এক সামরিক অভ্যুত্থানে ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে নিহত হন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাঁর সোশ্যালিস্ট পার্টি ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করে এবং যৌথ উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তন করে। তাঁর বামপন্থি আর্থসামাজিক কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁর মিত্রদের গাত্রদাহের কারণ ঘটায়। যুক্তরাষ্ট্র চিলিতে আলেন্দের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে মদত দিয়ে শক্তিশালী করে। বিরোধী রাজনীতিবিদ, বিচার বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তা, আইন পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্য, সাংবাদিক নেতা প্রভৃতি শ্রেণি-পেশার মানুষ আলেন্দের বিরুদ্ধে চলে যান। বিশেষ করে সেনাবাহিনিকে তাঁর বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। জেনারেল অগাস্তো পিনোশের নেতৃত্বে সেনাবাহিনি এক রাতে প্রেসিডেন্টের লা মনেদা প্রাসাদে আক্রমণ চালিয়ে আলেন্দেকে হত্যা করে। গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে সামরিক শাসন প্রবর্তন করা হয়। [সৈয়দ আবুল মকসুদ : বঙ্গবন্ধু ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিয়তি]

বঙ্গবন্ধুর সুবুদ্ধি ছিল, সারল্য ছিল কূটবুদ্ধি ছিল না আর সেটিই হয়তো তাঁর জীবনে কাল হয়ে দেখা দিয়েছিল কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তার লেখায় তেমনটিই বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে বাঙালিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে একজন পূর্ণাঙ্গ নেতার যতরকম গুণ থাকা দরকার সে গুণগুলো তাঁর ছিল। তাঁর মধ্যে একটি বিষয়ের অভাব ছিল, সেটি হচ্ছে কূটবুদ্ধি। সরলমনে মানুষকে খুব সহজেই বিশ্বাস করতেন তিনি। আর এ কারণেই তাঁকে অকালেই

জীবন দিতে হয়েছিল। যাঁর নেতৃত্বে একটি দেশের অভ্যুদয়; তিনিই দেশবিরোধীদের অস্ত্রে নির্মম হত্যার শিকার; এমন নৃশংসতা বাংলাদেশে ঘটতে পারে, তা আমাদের কল্পনারও অতীত।'

ফকির ইলিয়াস বলছেন, বঙ্গবন্ধু চিরনিদ্রায় শায়িত থেকেই বাঙালি জাতির আলোকবর্তিকা হয়ে যুগে যুগে পথ দেখাতে থাকবেন। 'শেখ মুজিব এখন চিরনিদ্রায় শায়িত তাঁর জন্মস্থান সবুজ টুঙ্গিপাড়ায়। তার শয্যাপাশে গিয়ে এই প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা নিজের শৌর্য, শক্তি এবং রক্তস্রোতেরই সন্ধান করে। কোনো অপশক্তিই এই গতিধারা থামাতে পারবে না। আলোকিত মানুষের জীবনকর্ম আরেকটি জীবনকে আলোকিত করে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির আলোকবর্তিকা হয়েই থাকবেন চিরদিন।'

'বঙ্গবন্ধু হত্যার খেসারতটি জাতিকে ভালোভাবেই দিতে হয়েছে। হত্যাকারীদের কিছু হয়নি। তারা বরং পদোন্নতি পেয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে, ১৫ আগস্ট সকালে কর্নেল ফারুক ক্যাপ্টেন হুদাকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর করেছে বঙ্গবন্ধুর ওই বাড়ির উঠানেই, তাঁর লাশ যখন সিঁড়িতে পড়েছিল। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারা কূটনৈতিক চাকরিও পেয়েছে। দেশের শাসনতন্ত্র মসিলিপ্ত করে তাদের 'অস্পৃশ্য' করে গিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। এরশাদ ওই সংযোজনটিকে সযত্নে আগলে রেখেছেন। এই একটি বিষয়ই প্রমাণ করে '৭৫-পরবর্তী দেশটির অবস্থা। খুনিরা পুরস্কৃত হয়, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নায়কদের বিদেশে পাঠানো হয় দেশের প্রতিনিধি করে এবং জনগণের পয়সায় কেনা ট্যাঙ্ক-কামান দিয়ে জনগণের নির্বাচিত সরকারপ্রধানকে পরিবারসহ যারা হত্যা করে, তাদের ভবিষ্যৎ যেকোনো বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয় সংবিধান সংশোধন করে! যে দেশটি মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে, সেই দেশের জন্য এতবড় নৈতিক পরাজয় সামলে ওঠা খুব সহজে সম্ভব হওয়ার কথা নয়।

(সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশ)

কিন্তু বঙ্গবন্ধু মরেননি, মৃত্যুর পরে তিনি নতুন করে জেগে উঠেছেন, ছড়িয়ে গেছেন, বাঙালির চিরন্তন সত্তায়। ওবায়দুল কাদের ঠিকই বলেছেন, 'আমি তো দেখি আজ সমাধি থেকে জেগে ওঠা নতুন এক বঙ্গবন্ধুর বিশাল আবেদন। বাংলাদেশের মানচিত্রের সমানই যার অস্তিত্ব, চরিত্রহননের কোনো ছুরা দিয়ে তাঁকে কি নিধন করা হয়ে গেছে? না, শত ষড়যন্ত্র ও হাজারো চেষ্টার পরও মুজিব মরেননি।'

পরিশেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানার 'মানুষের সমুদ্রে তিনি এক মহামানব' একটি প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয় কেন বাঙালি জাতির এই মহামানবকে হত্যা করা হয়েছিল। তবু তার আশীর্বাদ থেকে বাঙালি জাতি বিচ্ছিন্ন হয়নি। এই মহামানব যুগ যুগ থেকে যাবেন বাঙালির মনে। 'এই আত্মত্যাগী নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক মানুষটির অপরাধ ছিল তিনি তাঁর দেশবাসীকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। তাই তাদের মুক্তির দাবি উচ্চারণ করেছেন। তাদের ওপর দমন-পীড়ন, বৈষম্য-শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন। তিনি বাঙালির প্রিয় নেতা ছিলেন, প্রিয় বন্ধু ছিলেন। কোনো শাসকই তাঁকে দমাতে পারেনি, তাঁর মাথা কখনো নত হয়নি, ক্ষমতার লোভে তাঁকে কেউ বশ করতে পারেনি। সবকিছুর ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন এক সাহসী ও আদর্শবাদী নেতা। এক দূরদর্শী কাণ্ডারি, যিনি তাঁর লক্ষ্যে ছিলেন পর্বতসমান অটল, দৃঢ় ও শক্তিশালী। তাঁর পেছনে ছিল মানুষ, সামনে ছিল মানুষ, পাশে ছিল মানুষ। বাংলার মানুষের হৃদয়ে ছিল তার অবস্থান। মানুষের সমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি হয়েছে এক মহামানব।'

টেলেমেকাস ও এ্যাগামেমনন্ : মিথ ও বাস্তবতা

আমার মন যেন সান্ত্বনা পেল না তানসেনের বাড়ি দেখে। যা হোক, বহুদিনের কথা, এ বাড়িতে তিনি ছিলেন কি না শেষ পর্যন্ত তারই বা ঠিক কি? সম্রাট তো এত অর্থ খরচ করে যে প্রসাদ ও দুর্গ তৈরি করলেন, দু'বছরের বেশি থাকতে পারেন নাই, আবার আগ্রা দুর্গে ফিরে যেতে হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, পানির অভাবের জন্য। আমার মন স্বীকার করতে চায় না যে, পানির জন্য তিনি চলে যান। মনে হয় অন্য কোন কারণ ছিল।

– (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা নিয়ে শামসুর রাহমানের কবিতা সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। সম্ভবত অন্যদের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি। কবি স্বয়ং মুক্তিযুদ্ধে না গিয়েও মুক্তিযুদ্ধকালে ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনকালে তিনি কবিতার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের স্বপক্ষে কাজ করেছিলেন। তিনিই মনে হয় তিরিশ পরবর্তীকালে বাঙালির অন্যতম প্রধান কবি যিনি সকল আন্দোলন ও পরিবর্তনশীল ঘটনার প্রতি সমর্থন জানিয়ে সবচেয়ে বেশি কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর এ ধারার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'নিজ বাসভূমে' (১৯৭০), 'বন্দী শিবির থেকে' (১৯৭২), 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' (১৯৭৩), 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাটা' (১৯৭৪)। তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ক এত কবিতা লিখেছেন যে, তাঁকে অনেকে 'স্বাধীনতার কবি' বলে উল্লেখ করে থাকেন।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও শামসুর রাহমান অনেক কবিতা লিখেছেন। বিশেষত জাতির পিতাকে উদ্দেশ্য করে রচনা বলে খ্যাত হয়ে আছে তার মধ্যে 'টেলেমেকাস', 'ইলেকট্রার গান', 'ধন্য সেই পুরুষ' নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি' 'এক রাতে হযরত ওসমান'। এ ছাড়া অনেকে ধারণা করেন 'ধূলায় গড়ায় শিরোস্ত্রাণ', 'আমি উঠে এসেছি সৎকার বিহিন'- এ ধরনের আরো কিছু কবিতায় বঙ্গবন্ধুর অনুষঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাহমানের কবিতা বড় বেশি মিথের আড়াল হওয়ায় সঠিককতা নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়ে। মিথ যেমন কবিতার

জন্য উপযোগী, বিষয় ও ভাবের বিস্তার বাড়ানো গেলেও অধিকাংশ সময় ব্যাখ্যার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মিথ পুরাণ প্রতীক ও রূপকের আড়ালে শিল্পের শৈলী রক্ষিত হলেও বিষয় হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রাহমানের কবিতার ক্ষেত্রে সে কথা বলা যায়। এই কবিতাগুলো পটভূমি হারিয়ে ফেললে, ব্যাখ্যার ভিন্নতা ঘটলে বিষয়কে সঠিকভাবে সংযুক্ত করা যায় না। এমনকি সময়ের পরিবর্তন ও ব্যাখ্যার ভিন্নতার কারণে অর্থ আলাদা হয়ে পড়ে। তবু কবিতার কাছে নগ্নতা কেউ আশা করে না। শামসুর রাহমানের মতো শিল্প সচেতন কবির পক্ষে তা সম্ভবও নয়। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা শামসুর রাহমানের কথিত সাতটি কবিতা এখানে একটু পরীক্ষা করা যেতে পারে। ১. টেলেমেকাস ২. ইলেকট্রার গান ৩. ধন্য সেই পুরুষ ৪. এক রাতে হযরত ওসমান ৫. অভিশাপ দিলাম ৬. তোমারই পদধ্বনি ৭. গাছ, কফিন এবং নৌকা।

উল্লিখিত সাতটি কবিতা সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে এগুলো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখিত হয়েছে। এই কবিতাগুলো অন্তরে বঙ্গবন্ধুর মিথ নিশ্চয় আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মিথ হলো সর্বজনীন। স্থান কাল পরিবর্তনের সঙ্গে মিথের অর্থও কিছুটা পরিবর্তন হতে থাকে। কিভাবে বোঝা সম্ভব- তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতাগুলো লিখেছেন। এটি একই সঙ্গে মিথের সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা। কবির এই কবিতাগুলোতে এমন কোনো শব্দ, শব্দবন্ধ ব্যবহার হয়নি- যা দ্বারা অকাট্য প্রমাণ করা সম্ভব যে, এখানে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত রয়েছেন। মিথ ও প্রতীকের আড়াল এতটাই যে, কেবল মিথের কাহিনি হিসাবে এটি দারুণ খাপ খেয়ে যায়। কবিতাগুলোতে 'বঙ্গবন্ধু', জাতির পিতা, জাতির জনক, ফাউন্ডার ফাদার, শেখ মুজিবুর রহমান, মুজিব, খোকা, টুঙ্গিপাড়া, মুজিব কোট, তর্জনী, পাইপ, বত্রিশ নম্বর, ১৫ই আগস্ট, পঁচাত্তর, বাকশাল, আওয়ামী লীগ - এ জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার হয়নি। ফলে কাহিনির সঙ্গে যারা জড়িত নন তাদের পক্ষে সম্পর্ক নির্ণয় করা যথেষ্ট কষ্টকর। আবার যারা মিথের গল্প জানেন, তারা মিথের গল্পের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। তাহলে প্রশ্ন কবিতাগুলো কবি শামসুর রাহমান কি কোনো লক্ষ্য ছাড়াই লিখেছিলেন? এ কবিতাগুলো নিশ্চয় তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখেছিলেন। সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাঁর পাঠক ধরে নিয়েছেন- তাঁর টেলেমেকাস, এ্যাগামেমনন্ বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কেউ নন। কবি মুখে স্বীকার করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সংকলনগুলোতে শুরু থেকেই তা ছাপাও হয়েছে। এগুলো বঙ্গবন্ধুর করুণ জীবনের সঙ্গে দারুণ

খাপ খেয়ে গেছে। বিভিন্ন আবৃত্তিকাররা নিয়মিত কবিতাগুলো বঙ্গবন্ধু স্মরণে পাঠ করার মাধ্যমে এগুলো আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। মহাকাব্যের নায়কের দুঃখ সাহস ও পরিণতি মহাকাব্যিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু মিথের বিপর্যয়ও কম নয়।

এখানে একটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাই। কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজীর 'হর্ষবর্ধনের হাতি' কবিতাটা নিয়ে বেশ সোরগোল উপস্থিত হয়েছিল, যখন তিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসাবে নিয়োগ পেলেন। কিছু দুষ্ট লোক বলতে শুরু করল এই কবিতাটি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে রচিত নয়, বরং সূক্ষ্ম ব্যজস্তুতি রয়েছে। সে সময়ে কিছু সামাজিক যোগাযোগের পোস্টে এ ধরনের কথা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এতে কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী যথেষ্ট বিব্রত হয়েছিলেন। অথচ তিনি কবিতাটি লিখেছিলেন বঙ্গবন্ধুর হত্যার করুণ গাথা তুলে ধরার জন্য। সে সময়টি সরাসরি কবিতা লেখার কোনো উপায় ছিল না বলেই তাঁকে মিথ পুরাণের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এই কবিতাটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই কবিতা যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ এই কথা চাউর হওয়ার পরে অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন হয়তো কবিতাটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত নয়। এমনকি যারা কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজীকে ভালোবাসতেন, বাংলা একাডেমির ডিজি হিসাবে চাইতেন তাদেরও অনেকে মনে করতেন এই কবিতাটির অন্য অর্থও হতে পারে। ঠিক ওই সময়ে আমার কোলকাতার কবি বন্ধু ড. ইমানুল হক ও আমি বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ও তৎকালীন সভাপতি শামসুজ্জামান খানের বাসাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে নানা গল্প প্রসঙ্গে তিনি সেই সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। হাবীবুল্লাহ সিরাজী রাজু আলাউদ্দীনের সঙ্গে এক বিশদ সাক্ষাৎকারে এসব নোংড়ামির ইঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন। নিচে তার একটি সাক্ষাৎকারের কিছুটা উল্লেখ করা হলো :

'হাবীবুল্লাহ সিরাজী : এই কবিতাটা ওখানে রাখিনি এই কারণে, এটার ভেতর নিজের প্রতি নিজের ক্ষোভ বলি আর দুর্বলতা বলি- আমিও 'দাও বৃক্ষ দাও দিন' নামে একটি বই লিখছিলাম এবং এই নামে আমার একটি কবিতা আছে। সবাই তো গ্রন্থভুক্ত যে কোনো একটা কবিতার নাম দিয়ে বই করে, আমি একটু উল্টা পথে হাঁটলাম, দ্বিতীয় বইতে এসে পাঠককে মনে করালাম যে দাও বৃক্ষ দাও দিন নামে আমার একটা বই আছে।

"কিন্তু ওইটাকে আমি না বলে সোনার মুকুট হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অধিষ্ঠানকে বললাম যে উনি আমাদের সোনার মুকুট। সঙ্গে গেল হিরের আঙটি, লাল নাকফুল, টিপ"

রাজু আলাউদ্দিন : কিন্তু কবিতাটা প্রথম বইয়ের সময়েই লেখা?

হাবীবুল্লাহ সিরাজী : হ্যাঁ, ওই সময়েই লেখা। ইচ্ছা করে প্রথম গ্রন্থে রাখিনি।

রাজু আলাউদ্দিন : আচ্ছা। এটা নিয়ে আমার একটা রহস্য ছিল আর কি! তৃতীয় গ্রন্থের বছর খানেক পরেই বেরোল আপনার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'হাওয়া কলে জোড়া গাড়ি'। এই গ্রন্থের কবিতাগুলোর কোনো শিরোনাম নেই। যেমন ছিল না শঙ্খ ঘোষের দিনগুলি রাতগুলি গ্রন্থে। ওখানে যদিও সরাসরি বলেননি, তবে মনে হচ্ছে, 'আট কোটি মানুষের সাহসী সঞ্চয়' বলতে আপনি বঙ্গবন্ধুকে বোঝাতে চেয়েছেন। এটার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যদি বলেন।

হাবীবুল্লাহ সিরাজী : এইটার 'প্রেক্ষাপট জোছনাময় মধ্যরাতে চুরি গেল সোনার মুকুট'- আপনি দেখবেন কয়েক দিন আগেই তাঁর বড় ছেলের বিয়ে হয়েছে এবং বিয়ের উপহার হিসেবে উনি সোনার মুকুট পেয়েছিলেন। ওইটা মাথায় এসেছিল; কিন্তু ওইটাকে আমি না বলে সোনার মুকুট হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অধিষ্ঠানকে বললাম যে উনি আমাদের সোনার মুকুট। সঙ্গে গেল হিরের আঙটি, লাল নাকফুল, টিপ।

রাজু আলাউদ্দিন : এগুলোকে তাঁর সন্তান বোঝাচ্ছেন। এই অনুষঙ্গগুলো জীবিত মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করছে।

হাবীবুল্লাহ সিরাজী : হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। 'রক্তে ভেজা একখণ্ড সবুজ কাপড় উড়তে উড়তে' এটা হচ্ছে বাংলাদেশ।

রাজু আলাউদ্দিন : অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখেন, দেশাত্মবোধক কবিতা লেখেন, হয়তো সেগুলো আবেগ দিয়ে লেখেন; কিন্তু কেনো জানি সেগুলো এক ধরনের কৃত্রিমতায় কিংবা এক ধরনের স্লোগানধর্মীতায় গিয়ে শেষ হয়। ...

হাবীবুল্লাহ সিরাজী : "আমি যে আড়াল করেছি বা উপরে একটা আবরণ দেয়ার চেষ্টা করেছি- এটা হয়তো আমাকে বাঁচাবে। আবার এটা ভুল বোঝাবুঝিও তৈরি করতে পারে, পক্ষ-বিপক্ষ হয়ে যায় অনেক সময়। এরকম

একবার ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল আমার 'হর্ষবর্ধনের হাতি' কবিতাটি নিয়ে। এটা অহেতুকভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য পক্ষকে বিপক্ষে টেনে নেয়া যায়।'

(বিডিনিউজ ডটকম আর্টস ৭ মার্চ ২০২০)

হাবীবুল্লাহ সিরাজীর এই সাক্ষাৎকারে মিথ মেটাফরের দুর্বলতা উঠে এসেছে। শামসুর রাহমানের কবিতার ক্ষেত্রেও এই দুর্বলতা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তাঁর পাঁচটি কবিতার বিশদ অংশ এখানে উদ্ধার করতে চাই। আমার বিবেচনায় তাঁর 'ধন্য সেই পুরুষ' কবিতাটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা অন্যতম সেরা কবিতা। এই কবিতায় তিনি কোনো মিথের আশ্রয় নেননি। আবার সরাসরি বঙ্গবন্ধুর বাহ্যিক প্রতীকীয় কাঠামোর আশ্রয়ও নেননি। শেষের কয়টা পঙক্তি হয়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর প্রতীকি অর্জন।

ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।

এখানেও শামসুর রাহমান কবিতায় বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করেননি, মিথ ব্যবহার করেননি, তবু সব শ্রেণির পাঠকের জন্য বুঝতে অসুবিধা হয় না কে এই কবিতার উদ্দীষ্ট ব্যক্তি। কিছুটা বর্ণনাধর্মী হওয়া সত্ত্বেও কবিতার বিষয় ও শৈলী তাতে ক্ষুণ্ন হয়নি।

'অভিশাপ দিচ্ছি' কবিতাও কবি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের কথা ভুলে যাননি। যদিও কবিতাটি সম্পূর্ণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত নয়। যে সব ঘাতকদের জন্য দেশের দুর্ভোগ গণহত্যা তাদের সবার উদ্দেশ্যে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। এই কবিতাতেও মিথের ব্যবহার আছে। মিথ এখানেও উচ্চবর্গীয় চেতনার অংশ হয়ে আছে- সহজে বোধগম্য নয়। যেমন- 'না আমি আসিনি ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রাচীন পাতা ফুঁড়ে, দুর্বাশাও নই, তবু আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধূলিতে অভিশাপ দিচ্ছি।

আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ দিয়েছিলো সেঁটে
মগজের কোষে কোষে যারা পুঁতেছিল
আমাদেরই আপন জনেরই লাশ দগ্ধ, রক্তাপ্লুত'

এখানে কবির অভিশাপের কারণ ওল্ড টেস্টামেন্ট, ও দুর্বাশা মুনির মিথ কল্প কাহিনি বিপরীত হিসাবে দেখা হয়েছে। এই দুর্ভোগ, এই অভিশাপ কেবল

অতিপ্রাকৃতিক বিষয় নয়, কবির জীবদ্দশায় ঘটে গেছে জাতির জীবনের বিপর্যয়। যে সব কাহিনি একদিন আমাদের শিহরিত করেছিল, মস্তিষ্কে ভয়ের আবহ তৈরি করেছিল; অথচ বাস্তব নয় বলে কিছুটা রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম। কিন্তু নিজের জীবনে যা ঘটে গেছে তার জন্য নিজেকেই দুর্বাশা মুনির মতো, ওল্ডটেস্টামেন্টের বর্ণনার মতো মনে হচ্ছে।

'আমি তো তাদের জন্য অমন সহজ মৃত্যু করি না কামনা।
আমাকে করেছে বাধ্য যারা
আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙ্গে যেতে
ভাসতে নদীতে আর বনেবাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে,
অভিশাপ দিচ্ছি, আমি সেইসব দজ্জালদের।'

এই কবিতায় কবি যখন বলেন 'আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙ্গে যেতে' তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না, কবিতাটি কার জন্য লিখিত হয়েছে। কবি শামসুর রাহমান সর্বদা সময়ের বিবেক ছিলেন, সকল বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, গণ আন্দোলন কিছুই বাদ পড়েনি তার কবিতা থেকে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যাই ১৯৭৫ সালের পনেরই আগস্ট- এমন ভয়াবহ শোকের দিনে , কবি ভঙ্কর বিষণ্ন ছিলেন, থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু তার মনে একটি কবিতার উদয় কি সেদিন হয়নি। হয়তো পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর ছিল, প্রকাশের উপযুক্ত ছিল না, সরকারি ট্রাস্টের কাগজে কাজ করতেন। কিন্তু তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন, সেই স্বীকারোক্তিও তো উপর্যুক্ত লেখায় থাকতে পারত। অন্তত নীরব ঘৃণা।

"আজ এই আষাঢ়ের মেঘলা ভোরবেলা লেখার টেবিল ঘেঁষে বসে প্রায় সিকি শতাব্দী আগেকার একটি সকালের কথা ভাবছি। সেই সকালটি মেঘলা ছিল না, ছিল রৌদ্রস্নাত; কিন্তু আমার মন ছিল নিদারুণ মেঘলা। কেউ যেন আমার অশ্রুধারাকে জমাট বরফ করে ফেলেছিল। ভীষণ উদ্ভ্রান্ত, বেখাপ্পা মনে হচ্ছিল নিজেকে। বাড়ির সবাই হকচকানো, স্তম্ভিত, কেমন যেন ছায়া-ছায়া। অবিশ্বাস্য ঠেকছিল সবকিছু। রেডিও সেট থেকে এ কী বার্তা, কী অশুভ, কী মর্মবেদনা ছড়িয়ে দেওয়া হলো ইথারে। প্রথমে নিজের শ্রবণশক্তিকে প্রতারিত মনে হয়েছে, কেউ যেন চরম নিষ্ঠুর এক তামাশা করছে আমার সঙ্গে, বাড়ির সবার সঙ্গে। কিন্তু পরক্ষণেই বিভ্রম কেটে গেল টেলিফোন পেয়ে। কে করেছিলেন, আজ আর মনে নেই। তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে জানালেন সেই ভয়ঙ্কর খবর-বঙ্গবন্ধু আর নেই, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

এ ধরনের কথা শুনতে হবে বাংলাদেশে চরম দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায় না। শুধু তিনিই নিহত হননি, নিহত হয়েছেন তাঁর পরিবারের আরও অনেকে। এমনকি শিশু রাসেলও নিস্তার পায়নি নরঘাতকদের অস্ত্রের স্বৈরাচার থেকে। আমি নিজের চোখে রক্তপ্লাবিত সেই ট্রাজেডি দেখিনি, কিন্তু আমার মনের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি সবকিছু, আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘৃণ্যতম, বর্বরতার শীর্ষ-স্পর্শী ঘটনা। সেদিন রেডিওতে কোনো কোনো ঘাতকের যে আস্ফালনময়, হঠকারী, পৈশাচিক উচ্চারণ শুনেছি তা কখনও ভালোর নয়।

সারাদিন কেটে গেল শোকের স্তব্ধতা বয়ে সত্তায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কোনো কোনো কাজ আমার পছন্দ হয়নি। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অবিমিশ্র ছিল না। কিন্তু বাঙালির সবচেয়ে সাহসী নেতা এবং বড়ো মাপের অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক, বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তাঁকে ভক্তি করেছি, ভালোবেসেছি। তিনি নিহত হওয়ার পর এই ভক্তি ও ভালোবাসা গভীর হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছর পর বন্ধু কায়সুল হক এবং আমি রিকশায় এলিফ্যান্ট রোড হয়ে পিজি হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের গাড়ি দ্রুত চলে গেল। উৎফুল্ল রিকশাওয়ালা বলল, শেখ মুজিব যাইতাছে। ওর হাস্যময় মুখ আর আনন্দিত কণ্ঠস্বর শুনে ভালো লাগল। রিকশাওয়ালার গায়ে ছেড়া জামা। আমরা ওকে পরীক্ষা করার জন্য বললাম, তাতে কী হয়েছে? আপনার অবস্থা তো আগের মতোই আছে, পরে আছেন ছেড়া গেঞ্জি।'

রিকশাওয়ালা হেসে বলল, আমি ছেড়া কাপড় পরতাছি বইলা দুঃখ নাই। উনি আমাকে পাঞ্জাবিগো হাত থাইকা বাঁচাইছেন। আল্লাহ তারে বাঁচাইয়া রাখুক। আমি সারা বছর পেটে পাথর বাইন্দা থাকতে পারুম।

সেই আধবুড়ো রিকশাওয়ালার কথা আজও কায়সুল হক এবং আমার কানেবাজে।

আমি তখন 'দৈনিক বাংলা'র সহকারী সম্পাদক। পনেরোই আগস্ট আমার অফিসে যাওয়ার কথা। শোকার্ত আমি মানসিক যন্ত্রণায় এমনই কাতর হয়ে পড়েছিলাম যে সেদিন আর অফিসে যাইনি। যাব না যে এ ব্যাপারে অফিসকে এত্তেলাও দিইনি। সারাদিন বিছানায় শুয়েছিলাম প্রায় নিঃসাড়। শুধু দুপুর বেলা গৃহিনীর পীড়াপীড়িতে কোনো মতে কিছু খেয়ে উঠেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিনের আমার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বেদনা

এবং নিষ্ফল। এক ক্রোধ সারাক্ষণ দখল করে রেখেছিল আমাকে। সেদিন সন্ধ্যা কিংবা রাতে কোথাও যাইনি। পরদিন এগারোটায় অফিসে গেলাম। মনের মেঘলাভাব কাটেনি তখনও। চুপচাপ বসেছিলাম নিজের চেয়ারে। ক'জন সহকর্মী এলেন আমার কাছে। কখনও অস্বস্তিকর নীরবতা, কখনও টুকরো টুকরো কথা। একেক জনের মুখে একেক ধরনের কথা। আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করে বললাম, 'This man is going to rise from his grave one day. তিনি অনেকের মনের ভেতরে ছিলেন বরাবরই, তিনি ফিরে এসেছেন, ফিরে এসেছেন পনেরোই আগস্টের ঘোর অমাবস্যা ছিড়ে এক অসামান্য ইতিহাস স্রষ্টা বিজয়ী বীরের মতো।' (গদ্যে পদ্যে শেখ মুজিব, পৃ. ১২১) লেখাটা খুব বাস্তব, হৃদয়স্পর্শী। তিনি বাকশালে যোগ দেননি, সেটি কবি হিসাবে তাঁর অধিকার। তবে এই দিনে একটি কবিতা পাঠক চাইতেই পারে। কেননা তিনি যে শামসুর রাহমান, তার কাছে প্রত্যাশা বেশি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা শামসুর রাহমানের লেখা ৩টি কবিতা এখানে উদ্ধার করা হলো :

'টেলেমেকাস' এবং 'ইলেকট্রার গান' কবিতা দুটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বলে বহুল আলোচিত হলেও 'এক রাতে হযরত ওসমান' কবিতাটিকে খুব একটা উদ্ধৃত হতে দেখা যায় না। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত 'অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই' কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত ওসমান একই সঙ্গে প্রাচ্যের মুসলিম মিথ ও ইতিহাস হওয়ায় সহজেই তার মর্ম উদ্ধার করা যায়। একটু মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই কবিতার মর্মমূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর জীবনের করুণ গাথা। ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে যাদের অবদান ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অর্থ ও সংগ্রাম ইসলামের অগ্রযাত্রাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। মহানবী তাঁকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, তাঁর এক কন্যার মৃত্যুর পরে অপর কন্যাকে হযরত ওসমানের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত ওসমানের হস্তক্ষেপে এবং বীরত্বে অনেকবার আরববাসী প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি খলিফার দায়িত্ব পাওয়ার পরে কিছু স্বার্থন্বেষী লোক তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপ্রচার চালায়, প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং তার সঙ্গে মিশে থাকা ঘাপটি মারা সুযোগ সন্ধানীরা তাঁকে হত্যা করে।

আগেই বলেছি মিথ কবিতার ভাব প্রকাশে সব সময় সরলার্থ দান করে না। কখনো কখনো বাধার সৃষ্টি করে। শামসুর রাহমানের অন্য দুটি গ্রিক মিথের

চেয়ে এই কবিতাটি অধিক বোধগম্য, কিন্তু খুব কম লোককে বলতে শুনেছি এই কবিতাটি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে লিখিত। তার অবশ্য কারণ হতে পারে, এই কবিতায় এত বিশদভাবে হযরত ওসমানের করুণ কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে- যা তাঁর জীবনের মধ্যে খাপ খেয়ে গেছে। অবশ্য মিথের সবচেয়ে বড়গুণ তা যে কোনো পরিবর্তিত অবস্থাতে মানুষকে ভাষা দিতে থাকে। এমনকি একই সঙ্গে একই মেটাফর পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষের সান্ত্বনার ভাষা হয়ে ওঠে।

আমি নিজেও হযরত ওসমান কবিতাটি জানতে পেরেছিলাম 'দৈনিক বাংলা'য় চাকরি করার সুবাদে। যদিও তখন কবি শামসুর রাহমান সেখানে ছিলেন না, তবু তাঁর অনেক ভক্ত ছিলেন সেখানে, যারা নিয়মিত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাদের মধ্যে 'দৈনিক বাংলা'র সহকারী সম্পাদক জনাব সালেহ চৌধুরী অন্যতম। তিনি আমায় এই কবিতাটির কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'একদিন শামসুর রাহমান এই কবিতাটি তাঁকে পড়তে দিয়ে বলেছিলেন, দেখেন তো বুঝতে পারেন কিনা? তিনি নাকি একবার পড়েই বুঝেছিলেন, এটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা। কবি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটি কেউ সহজে ধরতে পারছে না।' আমি আসলে বলতে চাই, এটি আসলে একই সঙ্গে হযরত ওসমানকে নিয়ে লেখা আবার এটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও লেখা। কবিতাটি এখানে উদ্ধার করা হলো :

এক রাতে হযরত ওসমান

কে আমাকে এমন সতর্ক করে আজ বারংবার
ভয়ার্ত রাত্তিরে? ঘোড়াগুলি আস্তাবলে
করছে চিৎকার,
উটেরা উৎকর্ণ বড়। ওরা টের পায়,
ঘোর অমঙ্গল কাছে এলে ওরা টের পেয়ে যায়।
বেদনার্ত চোখ মেলে দেখি।
আকাশে বিদ্যুচ্চমক ঘন ঘন,
অথচ বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।
আমি কি ছিলাম অন্ধ অথবা বধির?
আমার বিরুদ্ধে কত হাত
মরুভূর জহরিলা সাপের মতন।
তুলেছে ব্যাপক ফণা ক্রমাগত, দেখতে পাইনি। কেউ কেউ

বলেছে আমার চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর ফাঁদ পাতা,
অথচ দিইনি কান রটনায় কোনোদিন। ওরা
আমার রক্তের লোভে ঘোরে।
রাত্রিদিন শ্বাপদের মতো অন্তরালে,
কখনো প্রকাশ্যে জনসভা করে শাসায় আমাকে–
যেন আমি অপরাধী আপাদমস্তক, যেন আমি
প্রিয় স্বদেশের জন্যে ফেলি নি মাথার ঘাম পায়ে,
আরববাসীর ধু-ধু পানিকষ্ট দ্রুত
লাঘবের জন্যে যেন।
করি নি খনন কূপ শহরে শহরে,
গ্রাম-গ্রামান্তরে।

একবার ভেবে দেখ হে-নগরবাসী
কে আমি, কী কাজ আমি করেছি নিঃশব্দে এতকাল।
বাজাই নি ঢাকঢালে আত্মপ্রচারের
মোহে নগরকে
কখনো দিই নি মুড়ে রঙিন কাগজে।
নিজেই নিজের কথা বলা।
সমীচীন নয় কোনাকোলে, তবু কিছু কথা বলি,
কেননা অত্যন্ত ক্ষীণ জানি জন-স্মৃতি।
জনগণ যাতে সুখী হয়,
সে-জন্যে এ-আমি।
করেছি নির্মাণ পথ, বাঁধ, সুস্নিগ্ধ সরাই;
করেছি সত্যের জন্যে রোকেয়ার সঙ্গে
ন'বছর নির্বাসিত জীবনযাপন;
শত বিপর্যয়ে
রেখেছি নিজেকে খাড়া মসজিদের মিনারের মত।
মানব কল্যাণ আর প্রগতি সর্বদা
ছিল ধ্রুবতারা
আমার জীবনে, কিন্তু যারা নিত্য বিপক্ষে আমার
করে কানাঘুষা,
দেয় অপবাদ

স্বজনপ্রীতির আর আমার সকল কাজে ধরে
খুঁত সর্বক্ষণ, তারা
কলঙ্ক লেপন করে আমার নামের অবয়বে,
যেমন অবুঝ শিশু দোয়াত উপুড় করে সফেদ কাগজে
খেলাচ্ছলে। আমার বিরুদ্ধে ওরা নানান ফিকিরে
নিয়ত খেপিয়ে তোলে অগণিত মানুষকে শুধু।

আমার সকল কীর্তি যেন উটের পায়ের ছাপ
মরুর বালিতে-বাতাসের ঝটকায় মুছে যায়
নিমেষেই; হত্যাকারিগণ।
হচ্ছে তৈরি অন্ধকারে, শানাচ্ছে বিষাক্ত হাতিয়ার
এবং অপ্রতিরোধ্য ওরা আসবেই দলে দলে
জোট বেঁধে বর্বর নেশায় মেতে। কিন্তু তারা মূঢ় অর্বাচীন;
জানে না যে-রক্ত ধারা বইবে আজ আমার শরীর থেকে, তার
গতি থামবে না কোনোকালে।
এই রক্তস্রোত
অবিরল বয়ে যাবে দশকে দশকে আর শতকে শতকে।

টেলেমেকাস

"টেলেমেকাস বিদেশী প্রভুদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি ও বহুবিধ অশোভন আচরণে বিধ্বস্ত ইথাকার যে চিত্র তুলে ধরেছেন, বাংলাদেশর সেই রকম দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। 'নয়তো নগণ্য দ্বীপ সুজলা সুফলা শস্যশ্যাম/ ইথাকা আমার ধনধান্যে পুষ্পেভরা' বলার সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় যেন বাংলাদেশের হৃদয়খানিই তার আপন ঐশ্বর্যের অতীতসহ উপস্থিত হয়। নিজ দেশে পরবাসী জীবনযাপনের গ্লানি কবি টেলেমেকাসের জবানীতে তুলে ধরেছেন।

'অডিসি মহাকাব্যে হোমার টেলেমেকাসের অপেক্ষার ভেতর দিয়ে পরাধীন জাতির বিড়ম্বনাকে তুলে ধরেছেন। শামসুর রাহমান এই বীর্যবান যুবকের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাঙালি জাতির স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। ফলে আমাদের অপেক্ষাও মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, আর মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে রচিত হয়েছে অমর মহাকাব্য বাংলাদেশ। তাই টেলেমেকাসের

পালিয়ে বেড়ানো, জনসমাবেশে বাধা সৃষ্টি পরাধীন বাংলাদেশের বিপন্ন এবং ভয়াবহ বাস্তবতাকেই বিবৃত করে। অডিসিউসের জন্য টেলেমেকাসের এই অপেক্ষা বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য অপেক্ষাকেই রূপায়িত করে। এই মহান নেতা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য বারবার কারাবরণ করেছেন। টেলেমেকাসের বীরোচিত আহ্বান বাঙালির স্বপ্নপুরুষ বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায় ব্যাকুল দেশবাসীর আবাহনের সঙ্গে একীভূত হয়ে বাংলাদেশ নামক মহাকাব্যের মহানায়ক শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভূমিকাই শিল্পিত হয়েছে।"

(শামসুর রাহমানের কবিতায় মিথ, তারেক রেজা)

আগেই বলেছি টেলেমেকাস কবিতাটি 'বঙ্গবন্ধু'কে নিয়ে লেখা এটি আমার সন্দেহ না হলেও আলোচনার দাবি রাখে। এমনকি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথমদিকে কবিতার তালিকাতেও কবিতাটির নাম আসে না। বলা হয়, নির্মলেন্দুগুণই প্রথম লিখেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 'প্রচ্ছদের জন্য' কবিতা ১৯৬৭ সালের ১২ নভেম্বর। ১৯৬৯ সালের আগে তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হননি। তার আগে তাকে জাতির পিতা বা পিতা বলার কোনো নজির ছিল কিনা আমার জানা নেই। কারণ এই সময়ের আগেই কবিতাটি লেখা হয়েছিল। কবি হিসাবে দূরদর্শী কেউ হতে পারেন, এতে আপত্তির কিছু নেই। তবে ঐতিহাসিক বিপত্তি আছে। এখানে বিজ্ঞান এবং মেটাফরের পার্থক্য সংকট প্রবল হয়ে ওঠে। যে কোনো দিকে তা মোড় নেয়া যায়। তাছাড়া কবি শামসুর রাহমানও তখনো পাকিস্তান ট্রাস্টের পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেন, তার স্বভাবও বিপ্লবীদের মতো নয়। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ কালেও তিনি দীর্ঘদিন সেখানে চাকরি করেছেন। অবশ্য মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাঁর সমর্থন শুরু থেকে ছিল। কবি মহাদেব সাহার লেখা থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দশ বছর পরেও বঙ্গবন্ধুর প্রতি সহানুভূতিশীল অনেক কবি তাঁর উপরে সরাসরি একটি কবিতা লিখতে ভয় পেতেন। 'টেলেমেকাস' কবিতাটি এখানে উদ্ধার করা হলো। পরে 'টেলেমেকাস' মিথ সম্বন্ধে এডিথ হ্যামিল্টনের একটি অনুবাদ তুলে ধরা হলো পাঠকদের জন্য। তবে বঙ্গবন্ধুকে হৃদয়ে রেখে এই কবিতা পাঠ কোনো দোষের দেখি না। আবার নিছক বীর অডিউস এবং তার পুত্র টেলেমেকাসের কাহিনি হিসাবে পড়লেও কোনো ক্ষতি নেই।

টেলেমেকাস

তুমি কি এখনো আসবে না? স্বদেশের পূর্ণিমায়
কখনো তোমার মুখ হবে নাকি উদ্ভাসিত, পিতা,
পুনর্বার? কেন আজো শুনি না তোমার পদধ্বনি?
এদিকে প্রাকারে জমে শ্যাওলার মেঘ, আগাছার
দৌরাত্ম্য বাগানে বাড়ে প্রতিদিন। সওয়ারবিহীন
ঘোড়াগুলো আস্তাবলে ভীষণ ঝিমোয়, কুকুরটা
অলিন্দে বেড়ায় শুঁকে কতো কী-যে, বলে না কিছুই।

নয়কো নগণ্য দ্বীপ সুজলা সুফলা শস্যশ্যাম
ইথাকা আমার ধনধান্যে পুষ্পেভরা। পিতা, তুমি
যেদিন স্বদেশ ছেড়ে হলে পরবাসী, ভ্রাম্যমাণ,
সেদিন থেকেই জানি ইথাকা নিষ্পত্র, যেন এক
বিবর্ণ গোলাপ। আমি একা কৈশোরের জ্বলজ্বলে
প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কোন্ কাক-তাড়ুয়ার মূর্তি দেখে
ভুলে গেছি হাসি। 'কেন আপনার ঠোঁটের দিগন্তে
হাসির হরিণ-শিশু পালিয়ে বেড়ায় অবিরত?'–
কখনো করেন প্রশ্ন ধীমান প্রবীণ সভাসদ।

বিদেশীরা রাত্রিদিন করে গোল ইথাকায়; কেউ
সযত্নে পরখ করে বর্শার ফলার ধার, শূন্য
মদের রঙিন পাত্র ছুঁড়ে ফেলে কেউ, লাথি ছোঁড়ে,
কেউ-বা উক্ত্যক্ত করে পরিচারিকাকে। মাঝে-মাঝে
কেবলি বাড়ায় হাত প্রোষিতভর্তৃকা জননীর
দিকে, যিনি কী-একটা বুনছেন সুচারু কাপড়ে
দিনে, রাতে খুলছেন সীবনীর শিল্পে। কোলে তাঁর
সুতোর বলের সাথে খেলা করে মোহন অতীত।
লুকিয়ে কাঁদেন তিনি ছড়িয়ে জলজ দৃষ্টি ধু-ধু

সমুদ্রের প্রতি, কালো বেড়ালের মতো নিঃসঙ্গতা
তাঁর শয্যা, অস্থিমজ্জা জুড়ে বয় আজো সর্বক্ষণ।

সবুজ শ্যাওলা-ঢাকা পুকুরেও ছুঁড়ে দিলে ঢিল,
সেখানে চকিতে ওঠছে ঢেউ আর বাতাসের ডাকে
এমন কি পত্রহীন গাছও দেয় সাড়া, কিন্তু এই
আমার মুখের রেখা সর্বদাই নির্বিকার, তাই
পালিয়ে বেড়াই ভয়ে ভয়ে, পাছে কেউ জন-সমাবেশে
পৌরপথে নানাবিধ প্রশ্নের পেরেক ঠুকে ঠুকে
আমাকে রক্তাক্ত করে। জানি, এ-বয়সে প্রাণ খুলে
হাসাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ঘরে শত্রু নিয়ে মুখে
হাসির গোলাপকুঁড়ি ফোটানো কঠিন। নানা জন
রটায় নানান কথা : শুনি তুমি নাকি মৃত, তুমি
শার্সির সবুজ চুলে বাঁধা পড়ে আছো, বলে কেউ।
কূলে একা বসে থাকি। কোথায় ভরসা? ঘুরে ঘুরে
প্রতিদিন ফিরে আসি অলক্ষ্যে বাড়ির সীমানায়,
দাঁড়ায় যেখানে সিঁড়ি শব্দ করে জানায় চকিতে
এখন বয়স কতো বাড়িটার আর আমি নিজে
আনাচেকানাচে ঘুরি, নিরালম্ব, বিদেশীর মতো।
মনে হয়, ক্রমাগত সশব্দে আমাকে দিচ্ছে কারা
কবরে নামিয়ে শুধু; পাগুলো মাটিতে লেগে লেগে
কেমন নির্বোধ হয়ে রয়েছে তাকিয়ে, যেন ওরা
পৃথিবীতে বাস্তবিক হাঁটতে শেখেনি কোনোদিন।

তুমি নেই তাই বর্বরের দল করেছে দখল
বাসগৃহ আমাদের। কেউ পদাঘাত করে, কেউ
নিমেষে হটিয়ে দেয় কনুই-এর গুঁতোয় আবার
'দুধ খাওগে হে খুকুমণি' বলে কেউ তালেবর
দাড়িতে বুলোয় হাত। পিপে পিপে মদ শেষ, কতো

ঝলসানো মেষ আর শুয়োর কাবার, প্রতিদিন
ভাঁড়ারে পড়ছে টান। থমথমে আকাশের মতো
সমস্ত ইথাকা, গরগরে জনগণ প্রতিষ্ঠিত
অনাচার, অজাচার ইত্যাদির চায় প্রতিকার।

আমিও বাঁচতে চাই, চাই পড়ো-পড়ো বাড়িটাকে
আবার করাতে দাঁড়। বাগানের আগাছা নিড়ানো
তবে কি আমারই কাজ? বুঝি তাই ঋতুতে ঋতুতে
সাহস সঞ্চয় করি এবং জীবন তুরঙ্গের
বর্ণিল লাগাম ধরে থাকি দৃঢ় দশটি আঙুলে।
কখনো এড়িয়ে দৃষ্টি ছুটে যাই অস্ত্রাগারে, ভাবি
লম্পট-জোচ্চোর আর ঘাতকের বীভৎস তাণ্ডব
কবে হবে শেষ? সূর্যগ্রহণের প্রহর কাটবে
কবে? জননীর মতো চোখ রাখি সমুদ্রে সর্বদা।

ইথাকায় রাখলে পা দেখতে পাবে রয়েছি দাঁড়িয়ে
দরজা আগলে, পিতা, অধীর তোমারই প্রতীক্ষায়।
এখনো কি ঝঞ্ঝাহত জাহাজের মাস্তুল তোমার
বন্দরে যাবে না দেখা? অস্ত্রাগারে নেবে না আয়ুধ
আবার অভিজ্ঞ হাতে? তুলবে না ধনুকে টঙ্কার?*

'ইলেকট্রার গান' কবিতাটি ১৯৮২ সালে প্রকাশিত 'ইকারুসের আকাশ' কাব্যগ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে। কালের দিক থেকে কবিতাটি সঠিক সময়ে লিখিত হয়েছে। হয়তো কবির হৃদয়ে বীর এ্যাগামেমনন্ বঙ্গবন্ধুর প্রতীকে হাজির ছিলেন। আর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ইলেক্ট্রর প্রতীকে। যিনি নিহত পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অধীর অপেক্ষা করেছিলেন।

ইলেকট্রার গান

শ্রাবণের মেঘ আকাশে আকাশে জটলা পাকায়
মেঘময়তায় ঘনঘন আজ একি বিদ্যুৎ জ্বলে।
মিত্র কোথাও আশেপাশে নেই, শান্তি উধাও;
নির্দয় স্মৃতি মিতালি পাতায় শত করোটির সাথে।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, করবে শায়িত আজ।

সে কবে আমিও স্বপ্নের বনে তুলেছি গোলাপ,
শুনেছি কত যে প্রহরে বনদোয়েলের ডাক।
অবুঝ সে মেয়ে ক্রাইসোথেমিস্ আমার সঙ্গে।
মেতেছে খেলায়, কখনো আমার বেণীতে দিয়েছে টান।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

পিতৃভবনে শুনেছি অনেক চারণের গাথা,
লায়ারের তারে হৃদয় বেজেছে সুদূর মদির সুরে
একদা এখানে কত বিদূষক প্রসাধ কুড়িয়ে
হয়েছে ধন্য, প্রধান কক্ষ ফুলে ফুলে গেছে ছেয়ে।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

প্রজাপতি খুশি ফেরারী এখন, বিষাদ আমাকে
করেছে দখল; কেমন বিরূপ কুয়াশা রেখেছে ঘিরে।
রক্তের ডাকে দিশেহারা আমি ঘুরি এলোমেলো,
আমার রাতের শয্যায় শুধু কান্নার স্বাক্ষর।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

সেইদিন আজো জ্বল্‌জ্বলে স্মৃতি, যেদিন মহান
বিজয়ী সে বীর দূর দেশ থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
শুনেছি সেদিন জয়ঢাক আর জন-উল্লাস;
পথে-প্রান্তরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তিদূত।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

নন্দিত সেই নায়ক অমোঘ নিয়তির টানে
গরীয়ান এই প্রাসাদের মতো বিপুল গেলেন ধসে।
বিদেশী মাটিতে ঝরেনি রক্ত; নিজ বাসভূমে,
নিজ বাসগৃহে নিরস্ত্র তাঁকে সহসা হেনেছে ওরা।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

আড়ালে বিলাপ করি একা একা, ক্ষুধার্ত পিতা
তোমার জন্যে প্রকাশ্যে শোক করাটাও অপরাধ।
এমন কি, হায়, আমার সকল স্বপ্নেও তুমি
নিষিদ্ধ আজ; তোমার দুহিতা একে গুরুভার বয়!
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

মাথার ভেতরে ঝোড়ো মেঘ ওড়ে, আমি একাকিনী
পিতৃভবনে, আমার কেবলি শোক পালনের পালা।
পিতৃহন্তা চারপাশে ঘোরে, গুপ্তচরের
চোখ সেঁটে থাকে আমার ওপর, আমি নিরুপায় ঘুরি।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

কখনো কখনো মাঝরাতে আমি জেগে উঠে শুনি
পায়ের শব্দ, আস্তাবলের ঘোড়ার আর্তনাদ।
শিকারী কুকুর ঘরের কপাট ঠ্যালে অবিরত,
আমার রক্তে দাঁত-নখ তার সিক্ত করতে চায়।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

যতদিন আমি এই পৃথিবীতে প্রত্যহ ভোরে
মেলবো দু'চোখ, দেখবো নিয়ত রৌদ্র-ছায়ার খেলা,
যতদিন পটাবো বাতাসের চুমো দেখবো তরুণ
হরিণের লাফ, ততদিন আমি লালন করবো শোক।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

অন্ধের দেশে কে দেবে অভয়? ভাই পরবাসে;
যে নেবে আমার মহা দায়ভাগ, তেমন জীবনসঙ্গী কই?

কেমন ছাদের নিচে সহোদর ছেঁড়ে তার রুটি?
কোন্ প্রান্তরে ওড়াচ্ছে ধূলি ওয়েস্টেসের ঘোড়া?
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

কান পেতে থাকি দীপ্র কণ্ঠ শোনার আশায়,
কাকের বাসায় ঈগলের গান কখনো যায় কি শোনা?
ক্রাইসোথেমিস, অবুঝ তন্বী, দূরে সরে থাকে,
বিকচোন্মুখ শরীরে এখন লায়ারের ঝঙ্কার।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

আমার উপমা দাবানলে-পোড়া আর্ত হরিণী;
মৃতের মিছিল খুঁজি দিন-রাত, আঁধারে লুকাই মুখ।
করতলে কত গোলাপ শুকায়, ঝরে জুঁই বেলী;
আমার হৃদয়ে প্রতিরোধ জ্বলে রক্তজবার মতো।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

পারবো না আমি হানতে কখনো ক্রূর তরবারি,
যদিও ক্ষুব্ধ হৃদয় আমার, প্রতিশোধ জপমালা।
আত্মশুদ্ধি ঘটে যায় যদি দেখি সন্ধ্যায়
উড়ন্ত দুটি সারস কী সুখে নদীটি পেরিয়ে যায়।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

যে যেমনে খুশি যখন তখন বাজাবে আমাকে
নানা ঘটনায় ষড়জে নিখাদে, আমি কি তেমন বাঁশি?
কণ্টকময় রক্তপিপাসু পথে হাঁটি একা;
আমার গ্রীবায় এবং কণ্ঠে আগামীর নিঃশ্বাস।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

শামসুর রাহমানের কবিতায় বঙ্গবন্ধু শীর্ষক আলোচনা পাঠকের জন্য আরো প্রাণবন্ত ও প্রয়োজনীয় করার জন্য তিনটি সংযুক্তি দেয়া হলো। যারা মনে করবেন পড়ে নিতে পারেন।

এডিথ হ্যামিল্টনের অনুবাদ থেকে 'টেলেমেকাস' ও 'এ্যাগামেমনন্' এর সংক্ষিপ্ত কাহিনি পাঠকের সুবিধার্থে নিচে উদ্ধিতি করা হলো :

সংযুক্তি : ১

টেলেমেকাস

"ট্রয় যুদ্ধে অডিসিউস মৃত্যুবরণ করলেন না, যদিও তিনি অন্যান্য গ্রিকদের মতো তীব্র ভোগান্তির শিকার হননি, কিন্তু তিনি ভুগলেন সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে। নিজ গৃহে ফেরার পূর্বে তাকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে হলো দশটি বছর। যখন তিনি পৌঁছলেন তখন তার সেই ছোট্ট ছেলেটি এক প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক। ট্রয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর অডিসিউস কাটিয়ে দিয়েছেন বিশটি বছর।

তার গৃহ যেই দ্বীপে ছিল, সেই ইথাকার অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়েছে। তার স্ত্রী পেনিলোপী আর তার পুত্র টেলেমেকাস ছাড়া বাকি সবাই ধরে নিয়েছিল যে, তার মৃত্যু ঘটেছে। তারা প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি নয়। সবাই ধরে নিল যে পেনিলোপী একজন বিধবা এবং তার আবার বিয়ে করা উচিত। আশপাশের দ্বীপগুলো এবং ইথাকা থেকে দল বেঁধে পুরুষরা এল তার পাণিপ্রার্থনা করতে। তিনি তাদের কাউকে গ্রহণ করতে পারলেন না ; তার স্বামী ফিরে আসবেই-এই আশা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকল, কিন্তু তা কখনোই পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। উপরন্তু তিনি এবং টেলেমেকাস উভয়েই তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলেন এবং এর কারণও ছিল। তারা ছিল দুর্ব্যবহারকারী লোভী, স্বেচ্ছাচারী মানুষ, যারা তাদের দিনাতিপাত করছিল বিশাল অট্টালিকার ভিতর অডিসিউসের সঞ্চয় গোগ্রাসে গিলে, তার গরু, মেষ ও শূকরগুলো বধ করে, তার মদ্য পান করে, তার কাঠ পুড়িয়ে, তার ভৃত্যদেরকে আদেশ দিয়ে। তারা ঘোষণা করল যে, যতক্ষণ না পেনিলোপী তাদের একজনকে বিয়ে করছে ততক্ষণ তারা যাবে না। টেলেমেকাসের সাথে তারা ব্যবহার করল উপহাস ও তাচ্ছিল্য ভরে যেন সে এক সামান্য বালক এবং তাকে গ্রাহ্য করার কিছু নেই। এটি মা ও পুত্র দুজনের জন্যই ছিল এক অসহনীয় অবস্থা, এবং তবু তাদের করার কিছু ছিল না। তারা ছিলেন কেবল দুজন এবং এর মাঝে একজন আবার নারী, এক বিশাল দলের বিরুদ্ধে।

পেনিলোপী প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন তাদেরকে বিরক্ত করে ফেলার। তিনি তাদেরকে বললেন যে, যত দিন না তিনি অডিসিউসের বৃদ্ধ পিতা ল্যার্টিসের মৃত্যু উপলক্ষে আগাম একটি শবাচ্ছদন বুনন করতে পারছেন ততদিন তার

পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। এমন একটি দিন ধর্মীয় ব্যাপারে তারা মেনে নিল এবং তারা সেই কাজটি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হলো। কিন্তু তা কখনই শেষ হলো না, কারণ দিনের বেলায় পেনিলোপী যা বুনন করতেন রাতে তা খুলে ফেলতেন। কিন্তু অবশেষে কৌশলটি ধরা পড়ে গেল। তার পরিচারিকাদের মধ্যে কোনো একজন রহস্যটি ফাঁস করে দিল। পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে এবং তারা তাকে সেই কাজে নিমগ্ন অবস্থায় আবিষ্কার করল। অবশ্যই এরপর তারা আরও পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর বেপরোয়া হয়ে উঠল। কাজেই পরিস্থিতিটা জটিল রূপ ধারণ করল যখন অডিসিউসের ইতস্তত অনিশ্চিত নৌযাত্রার দশ বছরটি প্রায় শেষ হয়ে আসছিল।

অবশ্য যে কোনো রাগ ধরে রাখার জন্য দশ বছর খুবই দীর্ঘসময়। এর মধ্যে পোসাইডনের ব্যতিক্রমটি ছাড়া অন্য সকল দেবতাই তার জন্য দুঃখিত হলেন এবং সবচেয়ে দুঃখিত ছিলেন অ্যাথেনা। অডিসিউসের জন্য ফিরে এল তার পুরনো অনুভূতি। তিনি তার কষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং তাকে স্বগৃহে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাথেনা অডিসিউসের দুঃখজনক ঘটনাটি সবার সামনে উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে, অডিসিউস তখন দৃশ্যত এক দ্বীপে বন্দী, যা শাসিত হতো উপদেবী ক্যালিপ্সে কর্তৃক, যে তার প্রেমে পড়েছিল এবং তাকে কখনো ফিরে যেতে না দেবার পরিকল্পনা করেছিল। তাকে কেবল স্বাধীনতাটুকু দেওয়া ছাড়া অন্য সকল পথেই অভিভূত করে ফেলল ; তার যা কিছু ছিল সবই তিনি পেতে পারতেন। কিন্তু অডিসিউস ছিলেন চরমভাবে দুর্ভাগ্যপীড়িত। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন তার স্ত্রী আর পুত্রের জন্য। তিনি দিনের পর দিন বসে থাকতেন বেলাভূমিতে, দিগন্তের দিকে তাকিয়ে, একটি জাহাজের আগমনের প্রত্যাশায়, যা আর কখনো আসেনি, এমনকি তার গৃহ হতে যে ধোয়া নির্গত হতো তা ভেবেও তিনি পীড়িত হয়ে পড়তেন।

অ্যাথেনা খুবই পছন্দ করতেন টেলেমেকাসকে, কিন্তু তা শুধু এ জন্য নয় যে, সে ছিল তার প্রিয় অডিসিউসের পুত্র ; এ জন্য যে, সে ছিল সম্ভ্রান্ত ও স্পষ্টভাষী যুবক, সে ছিল ধীর-স্থির, দূরদর্শী এবং নির্ভরযাগ্যে। তিনি ভাবলেন যে, যখন অডিসিউস থাকবেন তার বাড়ি ফেরার যাত্রায় তখন টেলেমেকাসকে নীরব ক্রোধে পাণিপ্রার্থীদের আক্রমণাত্মক ব্যবহার নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করার চাইতে তাকে কোনো ভ্রমণে পাঠিয়ে দেওয়াই সমীচীন হবে। এটি

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণাও জন্ম দেবে যে তার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য হলো তার পিতার কোনো খবরের সন্ধান করা।

দেবীর উপদেশ অনুসরণ করা ছাড়া অডিসিউসের আর কিছু করার ছিল না। পাসোইডন তার উদ্দেশ্যে পাঠালেন তরঙ্গমালার মাঝে ভয়ংকরতম তরঙ্গটিকে, যা ছিল সমুদ্রের এক আতংক। এটি ছিন্নভিন্ন করে ফেলল নৌযানের কাঠের গুঁড়িগুলাকে, যেমন এক তীব্র বায়ুপ্রবাহ এসে ছড়িয়ে দেয় শুষ্ক খড়ের গাদাকে ; তেমনি এটি উন্মত্ত জলের উপর উড়িয়ে নিয়ে ফেলল অডিসিউসকে।

অডিসিউস যখন সকালের নাস্তা তৈরিতে সাহায্য করছিলেন তখন যুবকটি তার দরজায় এল। ইউমেউস তাকে আনন্দাশ্রুসহ স্বাগত জানাল এবং বসতে ও খেতে বলল, তার পূর্বেই তিনি শূকর-পালকটিকে দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন। পেনিলোপীর কাছে, তার প্রত্যাবর্তনের খবর দেওয়ার জন্য। তখন পিতা-পুত্র একাকী একত্রে অবস্থান করছিলেন। ঠিক সেই সময়ে অডিসিউস দরজার ও পাশে অ্যাথেনার আগমন বুঝতে পারলেন তার ইশারায়। তিনি গেলেন দেবীর কাছে এবং মুহূর্তের মধ্যে দেবী অডিসিউসকে ফিরিয়ে আনলেন তার স্বরূপে এবং তিনি তাকে টেলেমেকাসের কাছে তার প্রকৃত পরিচয়টি দিতে বললেন। যুবকটি কিছুই বুঝতে পারল না যতক্ষণ না অডিসিউস ভিক্ষুকের বেশ ছেড়ে ফিরে এলেন তার রাজকীয় রূপ নিয়ে। তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন যেন দেখছেন কোনো দেবতাকে। 'আমি তোমার পিতা, অডিসিউস বললেন, এবং উভয়ে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হলো তাদের চোখ। কিন্তু তাদের সময় ছিল অতি সামান্য এবং অনেক কিছুই পরিকল্পনা করার বাকি ছিল। এরপর চলতে থাকল উৎকণ্ঠিত আলাপচারিতা। অডিসিউস পাণিপ্রার্থীদেরকে বলপূর্বক সরিয়ে দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু দুজন মানুষ কীভাবে একটি বিশাল দলকে মোকাবেলা করবে? অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, পরবর্তী সকালে তাদের বাড়ির ফেরা উচিত। অডিসিউস আবার তার ছদ্মবেশ ধারণ করলেন এবং টেলেমেকাসও সব যুদ্ধাস্ত্র লুকিয়ে ফেললেন, কেবলমাত্র নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে তারা এগুলো সহজেই পেতে পারেন তেমন ভাবে রেখে। অ্যাথেনা দ্রুত সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন।

পরদিন টেলেমেকাস একাকীই চললেন, অপর দুজন তাকে অনুসরণ করতে থাকলেন। তারা শহরে এসে পৌঁছলেন এবং অবশেষে দীর্ঘ বিশ বছর

পর অডিসিউস তার প্রিয় আবাসস্থলে প্রবেশ করলেন। যখন তিনি পৌঁছলেন তখন এক বয়সী কুকুর, তার মাথা তুলল এবং তার কান খাড়া হয়ে গেল। এই সেই আর্গস যেটিকে অডিসিউস জন্মাতে দেখেছেন তার ট্রয় যাত্রার পূর্বেই। এটি তার প্রভুর আগমনী বুঝতে পারল এবং তার লেজ নাড়তে থাকল; কিন্তু এটির সামান্য শক্তিও ছিল না নিজেকে তার কাছে একটু এগিয়ে নেওয়ার। অডিসিউস একে চিনতে পারলেন এবং নিজের অশ্রু সম্বরণ করলেন। শূকর-পালকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে অডিসিউস এর কাছে গেলেন এবং যেই মুহূর্তে তিনি সরে এলেন তখনই মৃত্যু ঘটল বুড়ো কুকুরটির।

বিশাল কক্ষের ভিতর পাণিপ্রার্থীরা ভোজনশেষে অলসভাবে তাদের সময় নষ্ট করছিল, তারা এমন এক মানসিক অবস্থায় ছিল যে অনুপ্রবেশকারী দুর্দশাময় বৃদ্ধটিকে নিয়ে তামাশা করছিল এবং অডিসিউস তাদের ব্যঙ্গাত্মক সব কথা শুনলেন চরম ধৈর্য্য সহকারে। অবশেষে তাদেরই একজন বদমেজাজি লোক বিরক্ত হয়ে উঠল এবং 'অডিসিউসকে আঘাত করল। সে আঘাত করার সাহস দেখাল এমন একজন আগন্তুককে যে প্রার্থনা করছিল আতিথেয়তা। পেনিলোপী এই নিষ্ঠুরতার কথা জানতে পারলেন এবং ঘোষণা করলেন যে তিনি নিজে সেই দুর্ভাগ্য পীড়িত বৃদ্ধের সাথে কথা বলবেন, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথমে সেই ভোজসভার কক্ষে যাওয়ার। তিনি টেলেমেকাসকে দেখতে চাইলেন এবং তার কাছে এও মনে হলো যে, তার নিজের উচিত তার পাণিপ্রার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করা। তিনি তার পুত্রের মতোই ছিলেন দূরদর্শী। যদি অডিসিউস মারা গিয়ে থাকেন তবে এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে মঙ্গলজনক হবে এদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী এবং উদার লোকটিকে বিয়ে করা।

পেনিলোপী কিছু না জেনেই তাদের পরিকল্পনা এগিয়ে নিলেন। রাতে তিনি নিজেই একটি পরিকল্পনা করলেন। যখন সকাল হয়ে এল তখন তিনি গেলেন তার গুদাম-ঘরে যেখানে অন্য অনেক দ্রব্যের সাথে ছিল একটি বিরাট ধনুক এবং একটি তূণীর, যা পরিপূর্ণ ছিল তীরে। এগুলো ছিল অডিসিউসের এবং তার হাত ছাড়া আর কেউ এগুলোতে কখনো তার লাগায়নি বা ব্যবহারও করেনি। এগুলোকে নিজে নিচে নামিয়ে এনে তিনি গেলেন সেখানে, যেখানে জড় হয়েছিল পাণিপ্রার্থীরা। শুনুন, আমার সম্মানিত জনেরা,' তিনি বললেন, আমি আপনাদের সামনে রাখছি দেবতুল্য অডিসিউসের ধনুকগুলো। যিনি এর তার বাঁধতে পারবেন এবং এক সারিতে রাখা বারোটি আংটির ভিতর দিয়ে তীর নিক্ষেপ করতে পারবেন আমি তাকেই আমার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব।'

টেলেমেকাস তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন এটিকে কীভাবে তাদের অনুকূলে নিয়ে যেতে হবে এবং তিনি দ্রুত তার মায়ের কথায় সায় দিলেন। পাণিপ্রার্থীরা সকলেই আসুন, তিনি চিৎকার করে বললেন, কোনো বিলম্ব বা কালক্ষেপ নয়। কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন। আমিই প্রথম চেষ্টা করব এবং দেখুন আমি আমার পিতার অস্ত্র বহন করার যোগ্য কিনা।' এই বলে তিনি আংটিগুলাকে পর্যায়ক্রমে সাজালেন, এদেরকে স্থাপন করলেন একই রেখায়। অতঃপর তিনি ধনুকটি হাতে নিলেন এবং এর তার স্থাপনে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। অডিসিউস তাকে বারণ না করলে তিনি হয়তো অবশেষে তা পেরেও ফেলতেন। তারপর একের পর এক তাদের সকলেই চেষ্টা করল, কিন্তু ধনুকটি ছিল খুবই ঋজু ; সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটিও এটিকে সামান্য পরিমাণ বাঁকাতে পারল না।

কেউ সফলকাম হবে না এটি নিশ্চিত হওয়ার পর অডিসিউস প্রতিযোগিতারস্থল ত্যাগ করলেন এবং চলে গেলেন প্রাসাদ প্রাঙ্গণে যেখানে শূকর-পালকটি কথা বলছিল গো পালকের সাথে, যে ছিল তার মতোই বিশ্বস্ত। অডিসিউস তাদের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করলেন এবং তিনি তাদের কাছে তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করলেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি তাদেরকে দেখালেন তার পায়ের দাগটি যা তারা আগে দেখেছে অনেক বার। তারা এটি চিনতে পারল এবং আনন্দে কেঁদে ফেলল। কিন্তু অডিসিউস দ্রুত তাদেরকে শান্ত করলেন। টেলেমেকাস তার দীর্ঘ বর্শা দ্বারা লোকগুলোকে পেছনের দিক থেকে পাহারা দিয়ে রাখলেন যাতে তারা দরজার ভিতর দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে অথবা অডিসিউসকে যাতে পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে। তারা এক সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো এবং যতক্ষণ তীরের সরবরাহ থাকল ততক্ষণ তারা আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ ছাড়াই মৃত্যুবরণ করল।

ইউরিক্লিয়া এবং তার সহ-পরিচারিকাদেরকে ডাকা হলো স্থানটিকে পরিষ্কার করার জন্য এবং সবকিছু স্বাভাবিক করার জন্য। তারা অডিসিউসকে ঘিরে ধরল, অশ্রুসজল হলো, অতঃপর আনন্দে উদ্বেলিত হলো এবং তাকে স্বাগত জানাল তার প্রাসাদে যতক্ষণ না অডিসিউসের নিজের মাঝেও জেগে উঠল কান্নার প্রবৃত্তি।

অবশেষে তারা কাজে গেল, ইউরিক্লিয়া চলে গেল তার মনিবার কক্ষে। সে তার বিছানার পাশে দাঁড়াল। জেগে উঠুন, আমার প্রিয় মনিবা', সে বলল, কারণ অডিসিউস গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং সকল পাণিপ্রার্থীর মৃত্যু ঘটেছে।' 'হে বিকারগ্রস্ত বৃদ্ধা মহিলা, পেনিলোপী অভিযোগ করলেন এবং আমি

ঘুমোচ্ছিলাম কত মধুরভাবে। তুমি দূর হও এবং এই ভেবে সুখী হও যে, তোমাকে চড় লাগানো হয়নি। কিন্তু ইউরিক্লিয়া তার যুক্তিতে অটল থাকল। আসলেই, আসলেই, অডিসিউস এখানে। তিনি আমাকে তার ক্ষতচিহ্নটি দেখিয়েছেন, যা তার একান্তই নিজস্ব। তখনও পেনিলোপী তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি দ্রুত নেমে গেলেন সভাকক্ষে, তাকে স্বচক্ষে দেখার জন্য।

টেলেমেকাস তার মাকে লক্ষ করে কেঁদে উঠলেন : মা, মা, তুমি কত নিষ্ঠুর! অন্য কোনো নারী কি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারত, যদি তার স্বামী ফিরে আসত বিশটি বছর পর? 'আমার পুত্রধন, তিনি উত্তরে বললেন, আমার নড়ার মতো কোনো শক্তি নেই। যদি তিনি সত্যিই অডিসিউস হয়ে থাকেন, তবে আমাদের রয়েছে। পরস্পরকে চেনার উপায়। এতে অডিসিউস মৃদু হাসলেন এবং টেলেমেকাসকে বললেন তাকে একা রেখে চলে যেতে। আমরা একে অপরকে চিনে নেব, অডিসিউস বললেন।

তখন পরিপাটি সভাকক্ষটি মেতে উঠল আনন্দে। ভ্রাম্যমাণ সুরকার তার বীণায় তুললেন সুমধুর সুর এবং সকলের মাঝে জেগে উঠল নৃত্যের বাসনা। উচ্ছলতায় মেতে উঠল পরিচ্ছদে পরিপাটি নরনারীরা, বিশাল প্রাসাদটি ঝংকৃত হয়ে উঠাল তাদের পদ-শব্দে। কারণ অডিসিউস অবশেষে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ফিরে এসেছেন আপন গৃহে এবং প্রত্যেকের চিত্তে তখন আনন্দধারা।"

(মিথলজি, এডিথ হ্যামিল্টন, অনুবাদ- আসাদ ইকবাল মামুন, প্রকাশক ঐতিহ্য, ২০১৩)

সংযুক্তি : ২

"এ্যাগামেমনন্ নিহত হয়েছিলেন তার স্ত্রীর প্রেমিক কর্তৃক। ঈস্কিলাসের রচনায় মূলত বিস্তারিত পাওয়া যায় এই ঘটনা। এটি এক বিশাল উপাখ্যান যা কৃপাহীন প্রতিহিংসা, বিয়োগাত্মক আবেগ আর অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের বৃত্তান্ত। এ্যাগামেমনন্-কে হত্যার কারণ এখন আর এক জোড়া নর-নারীর প্রণয় নয়, কারণটি হলো এক কন্যার জন্য এক মায়ের ভালোবাসা যাকে হত্যা করেছিল তার নিজ পিতা, এবং সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে নিজ স্বামীকে হত্যা করার জন্য। এক স্ত্রীর প্রতিজ্ঞা। এ্যাগামেনন্নের স্ত্রী ক্লাইটেমনেস্ত্রা রয়েছেন পুরো ঘটনার পটভূমিতে।

অ্যাট্রিয়ুসের দুই পুত্র, ট্রয়ে গ্রিক বাহিনির অধিনায়ক এ্যাগামেমনন্ এবং হেলেনের স্বামী মেনেলাউস, তাদের জীবনের শেষ ভাগ কাটিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। মেনেলাউস প্রথম দিকে কম সফল হলেও তার পরবর্তী জীবনে তিনি

ছিলেন উল্লেখযোগ্যভাবে সফল। তিনি ফিরে আসতে পেরেছিলেন নিরাপদে এবং এরপর হেলেনের সাথে বাস। করেছিলেন সুখে-শান্তিতে। কিন্তু তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

যখন ট্রয়ের পতন ঘটল তখন বিজয়ী দলপতিদের মধ্যে এ্যাগামেমনন্ ছিলেন। সবচেয়ে সৌভাগ্যবান। সেই ঝড়ের মাঝেও তার জাহাজ ফিরে এসেছিল নিরাপদে, যদিও সেই ঝড় অন্য অনেক জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়েছিল বা তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল কোনো দূর দেশে।

রানি ক্লাইটেমনেস্ত্রা ফিরে এলেন অলিস থেকে, যেখানে তিনি তার কন্যাকে মরে যেতে দেখেছেন। তিনি আস্থা রাখতে পারলেন না তার স্বামীর উপর যিনি তার সন্তানকে হত্যা করেছেন, যে ছিল তার নিজেরও সন্তান, তিনি নির্বাচন করলেন এক প্রেমিক এবং দেশবাসী সকলেই তা জানল। এ্যাগামেমননের প্রত্যাবর্তনের খবর পৌঁছানোর পরেও তিনি তার প্রেমিককে দূরে পাঠিয়ে দিলেন না। প্রাসাদের দরজার আড়ালে কী পরিকল্পনা হচ্ছিল? তাদের বিস্ময় ও ভয়কে সত্য প্রতিপন্ন করে এক তীব্র কোলাহল এসে পৌঁছল, রথের শব্দ, কণ্ঠস্বরের চিৎকার। রাজাকে নিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়লো রাজকীয় গাড়ি এবং তার পাশে ছিল একটি সুন্দরী বালিকা, কিন্তু সে দেখতে ছিল অদ্ভুত রকমের। প্রাসাদের লোকজন এবং নাগরিকবৃন্দ তাদেরকে অনুসরণ করছিল এবং যখন তারা থামল বিশাল প্রাসাদের দরজাগুলো প্রসারিত হয়ে খুলে গেল এবং আবির্ভাব ঘটল রানির।

রাজা নেমে এলেন উচ্চস্বরে প্রার্থনা করে, "হে বিজয়, তুমি এখন আমার, চিরদিনের জন্য আমার হও। তার স্ত্রী তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তার মুখ ছিল উজ্জ্বল, শির ছিল উন্নত। তিনি জানতেন যে সেখানে একমাত্র এ্যাগামেমনন্ ব্যতীত সকলেই সাবধান ছিল তার ব্যভিচারী প্রকৃতি নিয়ে, কিন্তু তিনি সবারই মুখোমুখি হলেন এবং তাদেরকে হাসিমুখে বললেন যে, এমন একটি মুহূর্তে তাদের উপস্থিতিতেও তাকে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে যে কত ভালোবাসা তিনি বহন করেন তার স্বামীর জন্য এবং কত যন্ত্রণাদগ্ধ কষ্ট তিনি ভাগে করেছেন তার অনুপস্থিতিতে। অতঃপর উল্লসিত কণ্ঠে তিনি স্বাগত জানালেন তার স্বামীকে। আপনি আমাদের নিরাপত্তা, তিনি তাকে বললেন, 'আমাদের সুনিশ্চিত সুরক্ষা। আপনাকে দেখাটা হলো ঝড়ের পর নাবিকের কাছে উপকূল দর্শনের মতোই কাঙ্ক্ষিত, তৃষ্ণার্ত পথিকের কাছে হঠাৎ নির্গত হওয়া জলধারার মতোই প্রিয়।

এ্যাগামেমনন্ উত্তর দিলেন, কিন্তু সাবধানে এবং তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকতে উদ্যত হলেন। প্রথমে তিনি নির্দেশ দিলেন রথের ভিতর বসে থাকা মেয়েটির দিকে। সে ছিল প্রায়ামের কন্যা, ক্যাসান্ড্রা, তিনি তার স্ত্রীকে বললেন মেয়েটি ছিল তার জন্য সৈন্যদের উপহার, সকল বন্দী নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা। ক্লাইটেমনেস্ত্রা যেন তাকে দেখতে যান এবং তার প্রতি সদাচরণ করেন। এই বলে তিনি প্রাসাদের ভিতর ঢুকে গেলেন এবং স্বামী-স্ত্রীর পেছনে দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। সেগুলো আর কোনোদিন তাদের উভয়ের জন্য খুলল না।

জনতা চলে গিয়েছিল। কেবলমাত্র বৃদ্ধরা অস্বস্তিকর অবস্থায় অপেক্ষা করছিল নীরব অট্টালিকা এবং শূন্য দরজার সামনে। বন্দী রাজকুমারী তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল এবং তারা আগ্রহভরে তার দিকে তাকাল। তারা ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে তার অদ্ভুত খ্যাতির কথা শুনেছিল যাকে কেউ বিশ্বাস করত না এবং ঘটনা ঘটার পর তার ভবিষ্যদ্বাণী সর্বদাই সত্য বলেই প্রমাণিত হতো। সে তাদের দিকে তাকাল ভয়ার্ত চোখে তাকে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে, সে তাদেরকে মরিয়াভাবে প্রশ্ন করল-এটি কোন প্রাসাদ? তারা তাকে আশ্বস্ত করে বলল যে, এটি সেই স্থান যেখানে বাস করেন অ্যাট্রিয়ুসের পুত্র। সে চিৎকার করে উঠল, না। এটি এমন এক প্রাসাদ যাকে ঘৃণা করেন দেবরাজ, যেখানে মানুষকে হত্যা করা হয় এবং মেঝে হয় রক্তস্নাত।' বৃদ্ধরা গোপনে পরস্পরের সাথে বিনিময় করল ভয়ার্ত দৃষ্টি। রক্ত, মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, এই নিয়ে তো তারাও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, অন্ধকার অতীত আরও অন্ধকারের অঙ্গীকার বহন করে। সে কীভাবে জেনে ফেলল সেই অতীত, যে এক আগন্তুক ও ভিনদেশি? 'আমি শুনতে পাচ্ছি ছোট্ট শিশুদের চিৎকার ধ্বনি, সে বিলাপ করে বলল,

...চিৎকার করছে রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে।

এক পিতা ভোজসভায় পরিবেশন করল তার সন্তানের মাংস। থায়েস্টেস এবং তার পুত্রগণ...। সে কোথা থেকে তা শুনল। আরও উত্তেজিত বাক্য বর্ষিত হলো তাদের ঠোঁট থেকে। বছরের পর বছর ধরে এই প্রাসাদে কী ঘটেছে যেন সে নিজ চোখে তা দেখেছে, যখন একটি মৃত্যু অনুসরণ করছিল অপর একটি মৃত্যুকে তখন যেন সে পাশেই দাঁড়িয়েছিল, যেন দেখেছে প্রত্যেকটি অপরাধকে যেগুলো একত্রে কাজ করেছে আরও অপরাধ ঘটনার জন্য। সে চিৎকার করে বলল যে, ঠিক ঐ দিনটিতে সেই তালিকায় যোগ হবে আরও দুটি মৃত্যু, তার নিজেরটিও। আমি সহ্য করব মৃত্যুকে, সে বলল, যখন সে দূরে সরে গেল এবং

চলে গেল প্রাসাদের দিকে। তারা তাকে সেই অশুভ প্রাসাদ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চাইল, সে তা চাইল না, সে প্রবেশ করল এবং দরজাগুলো তার জন্য বন্ধ হয়ে গেল চিরতরে। তার চলে যাওয়ার সময় নেমে এসেছিল যে নীরবতা তা হঠাৎ ও ভয়ংকরভাবে ভেঙে গেল। একটি চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল, একটি পুরুষ কণ্ঠের প্রবল যন্ত্রণা : 'ওহ্ ! আমাকে আঘাত করা হয়েছে। আমার মৃত্যু ধেয়ে আসছে এবং তারপর আবার নীরবতা। বৃদ্ধগণ আতংকিত হয়ে পড়ল, হতভম্ব অবস্থায় তারা ঠাসাঠাসি করে জড় হতে লাগল। সেটি ছিল তাদের রাজার কণ্ঠস্বর। তাদের কী করা উচিত? 'ভেঙে ঢুকে পড় প্রাসাদে দ্রুত, খুব দ্রুত। তারা একে অপরকে অনুরোধ করল। আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে। কিন্তু তখন আর কোনো ভাঙচুরের প্রয়োজন পড়ল না। দরজাগুলো খুলে গেল এবং প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে রানি।

গাঢ় লাল ছাপে ছড়িয়ে ছিল তার পোশাক, হাত এবং মুখমণ্ডল জুড়ে, তবুও তাকে দেখাল অনালোড়িত, দৃঢ়ভাবে নিজের সম্বন্ধে সচেতন ও নিশ্চিত। তিনি ঘোষণা করলেন সকলকে শোনানোর জন্য, কী ঘটনা হয়েছে। এখানে শুয়ে আছে আমার স্বামী, যিনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই আমার হাতে খুন হয়েছেন, তিনি বললেন। এটি ছিল তার স্বামীরই রক্ত যাতে রঞ্জিত হয়েছে তার পোশাক এবং মুখমণ্ডল।

তিনি পড়ে গেলেন এবং যখন তিনি অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছিলেন, ফিনকি দিয়ে বের হলো তার রক্ত এবং গাঢ় রঙে রঞ্জিত করল আমাকে, এ যেন এক মৃত্যুর শিশির, যা আমার কাছে ছিল স্বর্গের বৃষ্টি ধারার মতোই মধুর, যখন পল্লবিত হয় ফসলের ক্ষেত। তিনি তার কর্মের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া বা অজুহাত দেখানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। তার নিজের দৃষ্টিতে তিনি কোনো খুনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন কেবল এক দণ্ড প্রদানকারী। তিনি শাস্তি দিয়েছেন এক খুনিকে যে খুন করেছে তার নিজ সন্তানকে, একটি পশুর মৃত্যুর অধিক মূল্য দিলেন না যিনি, যখন খোয়াড় ভর্তি পশুর দলের ভিতর হতে হত্যা করলেন তার কন্যাকে হত্যা করলেন।

থেসীয় বায়ুর বিরুদ্ধে এক জাদুর জন্য। তার প্রেমিক তাকে অনুসরণ করলেন এবং তার পাশে দাঁড়ালেন-এজিস্থাস, থায়েস্টেসের কনিষ্ঠতম সন্তান, যিনি জন্মেছিলেন সেই ভয়ংকর ভোজের পর।

এ্যাগামেমননের সাথে তার নিজের কোনো বিবাদ ছিল না, কিন্তু অ্যাট্রিয়ুসের সাথে ছিল, যিনি তার সন্তানদেরকে হত্যা করেছিলেন। ইফিজিনিয়া

ছিল তিন সন্তানের অন্যতম। অন্য দুজনের একজন ছিল বালিকা, একজন বালক, যথাক্রমে ইলেক্ট্রা এবং ওরেস্টেস। এজিস্থাস নিশ্চিতভাবেই বালকটিকে হত্যা করত যদি ওরেস্টেস সেখানে থাকত, কিন্তু তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে। যে বালিকাটিকে এজিস্থাস হত্যা করতে তাচ্ছিল্য করলেন ; তাকে তিনি সম্ভাব্য সকল উপায়ে যন্ত্রণাদগ্ধ করলেন, যতক্ষণ না তার সারাটি জীবন কেন্দ্রীভূত হলো একটিমাত্র আশার উপর ; যে ওরেস্টেস ফিরে আসবে এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে। সেই প্রতিশোধটি কী হবে? সে বার বার নিজেকে এই প্রশ্ন করল। এজিস্থাসকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে, কিন্তু কেবল তাকে হত্যা করাটাই ন্যায় বিচারকে সন্তুষ্টি দিতে পারবে না। তার অপরাধ আর একজনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম কালিমালিপ্ত ছিল। এর পর কী? তাহলে এক পুত্র যদি তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার মাকে হত্যা করে তবে তা কি ন্যায়সঙ্গত হবে? তাই সে পরবর্তী বছরগুলারে তিক্ত দিনগুলো ধরে ভাবতে থাকল, যতদিন ক্লাইটেমনেস্ত্রা এবং এজিস্থাস দেশটি শাসন করলেন।

যখন বালকটি প্রাপ্ত বয়স্ক হলো তখন সে তার বোনের চাইতেও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল অবস্থার ভয়বহতাটি। এটি তো পুত্রের কর্তব্য পিতৃহত্যার প্রতিশাধে নেওয়া, যা অন্য যে কোনো কিছুর চাইতে অগ্রাধিকারযোগ্য। কিন্তু যে পুত্র তার মাকে হত্যা করে সে দেবতা ও মানুষ উভয়ের কাছেই ঘৃণ্য। এক পরম পবিত্র নৈতিক বাধ্যতা জড়িত ছিল এক জঘন্য অপরাধের সাথে। সঠিক কাজটি করার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সে এমন এক অবস্থানে বাঁধা পড়েছিল যে, তাকে দুটি জঘন্য ভুলের যে কোনো একটিকে নির্বাচন করতে হবে। তাকে অবশ্যই হতে হবে তার পিতার বিশ্বাসঘাতক অথবা হতে হবে তার মায়ের হত্যাকারী।

সিদ্ধান্তহীনতার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়ে সে ডেলফিতে গেল ভবিষ্যদ্বক্তার সাহায্যের প্রত্যাশায় এবং অ্যাপোলো তাকে স্পষ্টভাবে, নির্দেশ দিলেন, দুজন খুনিকেই হত্যা কর। রক্তপাতের জবাবে ঘটাও রক্তপাত। সে গেল সেই প্রাসাদে যেখানে সে যায়নি সেই বাল্যকালের পর আর কখনো এবং তার সাথে গেল তার চাচাতো ভাই এবং বন্ধু পাইলেডিস। দুজন বড় হয়েছিল একই সাথে এবং তারা পরস্পরের এতটাই অনুরক্ত ছিল যা সাধারণ বন্ধুত্বের তুলনায় ছিল অকল্পনীয়। তারা যে আসছিল সে ব্যাপারে ইলেক্ট্রার কোনো ধারণাই ছিল না, তবুও সে দিন

গুনছিল। তার জীবন কেটে গেছে তার ভাইয়ের প্রত্যাশায় যে তাকে এনে দেবে তার জীবনের একমাত্র প্রাপ্যটুকু যা জীবন তার জন্য ধারণ করে ছিল।

একদিন সে তার পিতার সমাধিতে মৃতজনের জন্য এক বিসর্জনের সময় প্রার্থনা করছিল, "হে পিতা, ওরেস্টেসকে তার গৃহের দিকে দিক-নির্দেশনা দাও। সহসা ওরেস্টেস তার পাশে এসে দাঁড়াল, তাকে দাবি করল তার বোনে বলে, প্রমাণ হিসেবে সে দেখাল তার ছদ্মবেশ যাতে ছিল তার হাতের কাজ এবং যখন সে চলে যাচ্ছিল তখন তার গায়ে এটি জড়িয়ে দিয়েছিল তার বোন। কিন্তু এটি প্রমাণের কোনো প্রয়োজন পড়ল না। ইলেক্ট্রা চিৎকার করে বলল, তোমার মুখশ্রী আমার পিতারই মুখশ্রী। এবং সে তার ভাইটিকে দিল তার সব ভালোবাসা, যা এই সুদীর্ঘ যন্ত্রণার বছরগুলো ধরে কেউ তার কাছে চায়নি :

এসব কিছুই এখন কেবলি তোমার, আমার পিতার জন্য সঞ্চিত ভালোবাসা যিনি এখন মৃত, যে ভালোবাসা আমি দিতে পারতাম আমার মাকে, এবং আমার হতভাগ্য বোনটিকে যাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুর কোলে। তিনজন মিলে তাদের পরিকল্পনা ঠিক করল। ওরেস্টেস ও পাইলেডিস যাবে প্রাসাদে এই দাবি নিয়ে যে তারা এমন এক বার্তা নিয়ে এসেছে যা ওরেস্টেসের মৃত্যুর নিশ্চয়তা প্রদান করবে। এটি ক্লাইটিমনেস্ত্রা ও এজিস্থাসের জন্য হবে আনন্দের খবর যারা সর্বদা তার আতংকে ছিল এবং তারা নিশ্চিতভাবেই বার্তাবাহকদ্বয়কে দেখতে চাইবে। একবার প্রাসাদে ঢুকতে পারলে ভাইটি এবং তার বন্ধু তাদের তরবারির উপর আস্থা রাখবে এবং হঠাৎ আক্রমণ করবে।। তারা অনুমতি পেল এবং ইলেক্ট্রা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। সেটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে মর্মপীড়াদায়ক অংশ। তখন দরজাগুলো ধীরে ধীরে খুলে গেল এবং একজন নারী বেরিয়ে এলেন এবং প্রশান্তভাবে দাঁড়ালেন তার পদচিহ্নের উপর। তিনিই ছিলেন ক্লাইটেমনেস্ত্রা। তিনি সেখানে কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্যই ছিলেন, তখনই একজন ক্রীতদাস দ্রুত দৌড়ে এল আর্তনাদ করে, বিশ্বাস ঘাতকতা! আমাদের সর্বেসর্বা! বিশ্বাস ঘাতকতা ! সে ক্লাইটেমনেস্ট্রাকে দেখল এবং জড়িয়ে ধরে বলল, "ওরেস্টেস জীবিত-এখানে। তিনি তখন বুঝতে পারলেন। সকলই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল ; কী ঘটেছে এবং কী ঘটতে যাচ্ছিল। তিনি ক্রীতদাসটিকে কঠোরভাবে আদেশ দিলেন তাকে লড়াই-এর কুড়াল এনে দেওয়ার জন্য। তিনি জীবনের জন্য যুদ্ধ করতে

দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, কিন্তু তিনি তার মন পরিবর্তন করার পূর্বে তার হাতে কোনো অস্ত্র এল না। একটি মানুষ এগিয়ে এল, তার তরবারি ছিল রক্তে রঞ্জিত, কার রক্ত তাও তিনি বুঝতে পারলেন, কে ধারণ করে আছে তরবারিটি সেটিও বুঝতে পারলেন। তিনি নিজেকে রক্ষা করার একটি নিশ্চিততর উপায় খুঁজে পেলেন। তিনি ছিলেন তার সামনে দাঁড়ানো লোকটির মা। থামা, আমার পুত্র, তিনি বললেন, "দেখ আমার বুক। তোমার ভারী মাথাটি এর উপর এসে পড়ত এবং তুমি ঘুমিয়ে পড়তে যে, কত বার। তোমার নরম মুখ, যাতে কোনো দাঁত ছিল না, আমার স্তন পান করত এবং এভাবে তুমি বড় হয়ে উঠলে- 'ওরেস্টেস চিৎকার করে উঠল, 'হে পাইলেডিস। সে আমার মা। আমি কি তাকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকতে পারি? তার বন্ধু তাকে দৃঢ়ভাবে বলল : না। অ্যাপোলোর আদেশ। দেবতাদেরকে অবশ্যই অমান্য করা যাবে না। আমি অবশ্যই মান্য করব, ওরেস্টেস বলল। তুমি আমাকে অনুসরণ কর। ক্লাইটেমনেস্ট্রা বুঝতে পারলেন যে তিনি হেরে গেছেন। তিনি শান্তভাবে বললেন, 'এটিই মনে হচ্ছে পুত্র আমার, যে তুমি তোমার মাকে হত্যা করবে। ওরেসে তার মাকে প্রাসাদের ভিতরে যেতে বাধ্য করল। তিনি গেলেন এবং সে তাকে অনুসরণ করল। যখন সে আবার বেরিয়ে এল তখন প্রাসাদ প্রাঙ্গণে যারা অপেক্ষা করছিল তাদেরকে আর বলার প্রয়োজন পড়ল না সে কী করে এসেছিল। সে এক ব্যভিচারী। মৃত্যুই তার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু আমার মা সে কি এটি করেছে অথবা করেনি?"

(মিথলজি, এডিথ হ্যামিল্টন, অনুবাদ- আসাদ ইকবাল মামুন, প্রকাশক ঐতিহ্য, ২০১৩)

সংযুক্তি : ৩

পঞ্চাশ দশকের কবিতার কথা বললেই শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ নাম দুটি এখনো একত্রে উচ্চারিত হয়। এক সময়ে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও আশির দশকে মত পথের বিস্তর পার্থক্য নির্ণিত হয়ে যায়। আল মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে গমন করেছিলেন, শামসুর রাহমান দেশেই ছিলেন, সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকায় চাকরি করেছিলেন; কিন্তু দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছিলেন, কবিতা লিখেছিলেন। দেশ স্বাধীনের পরে, মত ও পথের অবস্থান পাল্টাতে থাকে। আল মাহমুদ 'গণকণ্ঠে' কাজ করেন, আশির দশকে জামায়াতে ইসলামি রাজনীতি সমর্থন করে মূলধারা থেকে কিছুটা সরে যান।

শামসুর রাহমান আশির শেষের দিকে ট্রাস্টের পত্রিকা ছেড়ে মোটামুটি বিপরীত মৌলবাদ বিরোধী শিবিরে অবস্থান নেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখেননি এমন কবি কম আছেন, আল মাহমুদ তো বটেই। তাঁর জীবনে বঙ্গবন্ধুর অবদান আছে। আল মাহমুদের একটি কবিতা পাওয়া গেছে বেবী মওদুদের সংকলন থেকে। কবিতাটি এ ক্ষেত্রে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এই কবিতাতেও সরসরি বঙ্গবন্ধু শব্দটি নেই, আবার মিথের আশ্রয়ও নেই; তবু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। এই কবিতায় কেবল 'ভাইসব' 'ভাইয়েরা আমার' 'গ্রেনেডের ফল' 'কবিরা কলম ও বন্দুকের পার্থক্য ভুলে হাঁটতে লাগলো' এই জাতীয় শব্দ ও বাক্যের তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিখুঁত এঁকেছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত যে কোনো ভালো কবিতা বিবেচনায় এটি অন্যতম প্রধান। পাঠকের জন্য কবিতাটি এখানে সংযুক্ত করা হলো।

নিশিডাক

তার আহবান ছিলো নিশিডাকের শিসতোলা তীব্র বাঁশীর মত।

প্রতিটি মানুষের রক্তবাহী শিরায় কাঁপন দিয়ে তা বাজত
নদীগুলো হিসহিস শব্দে অতিকায় সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়াতো
অরণ্যের পাখিরা ডাকাডাকি করে পথ ভুলে উড়ে যেত সমুদ্রের দিকে।

সে যখন বলল, 'ভাইসব।'
অমনি অরণ্যের এলোমেলো গাছেরাও সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল
সে যখন ডাকলো, 'ভাইয়েরা আমার।'
ভেঙ্গে যাওয়া পাখির ঝাঁক ভীড় করে নেমে এল পৃথিবীর ডাঙায়
কবিরা কলম ও বন্দুকের পার্থক্য ভুলে হাঁটতে লাগলো
খোলা ময়দানে।

এই আমি
নগন্য এক মানুষ
দেখি, আমার হাতের তালু ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে

এক আগুনের জিহবা।

বলো, তোমার জন্যই কি আমরা হাতে নিইনি আগুন?
নদীগুলোকে ফণা ধরতে শেখায় নি কি তোমার জন্য-
শুধু তোমার জন্য গাছে গাছে ফুলের বদলে ফুটিয়েছিলাম ফুলকি,
আম গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফলেছিল
গ্রেনেড ফল। আর সবুজের ভেতর থেকে ফুৎকার দিয়ে
বেরিয়ে এল গন্ধকের ধোঁয়া। আহ্
আমি এখন আর চোখ মেলতে পারছি না।

সেই রাত্রির কল্পকাহিনি : মহানায়কের আবির্ভাব

'আমি জেলে এসে এবার ভালোই পাকা হলাম। গলার ভিতর 'খোকড়' বা ভাণ্ডার করা শিখলাম। পেশাদার ডাকাত চোরদের গলায় এক প্রকার গর্ত করা থাকে; এরা গলার ভেতর অপারেশন করে খোকড় করে। এই খোকড়ে ৫/৭টি মোহর অথবা আট থেকে দশটি গিনি এক সাথে রাখা যায়।' – (কারাগারের রোজনামচা)

এটি প্রায় নিশ্চিত যে দুস্কৃতিকারীদের হাতে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরে প্রথমের দিকে তাঁকে নিয়ে যে সব কবি কবিতা লিখেছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর এসব কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। কবিতাগুলো একই সঙ্গে যেমন শিল্পগুণ সমৃদ্ধ, তেমনি কালের প্রয়োজনে রচিত।

এ কথা বলে নেয়া দরকার নির্মলেন্দু গুণ অন্যতম প্রধান কবি যিনি সর্বদা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় যেমন তিনি এই মহান নেতাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন, তেমনি তিনি নিহত হওয়ার পরেও সর্বাগ্রে কবিতা লিখেছিলেন। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হয় তিনি এমন একটা সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তখন বিষয়টি মোটেও সহজ ছিল না। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তখন কবিতা লেখা রীতিমত অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হতো শাসকগোষ্ঠীর কাছে। ফলে এই সময়ের কবিতার প্রধান লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্রোহ ও মুক্তি; অর্থাৎ যে কারণে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখা নিষিদ্ধ, সেই কারণকে কবিতার দ্বারা অস্বীকার করা। এই কবিতার মাধ্যমে একজন কেবল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখেন না, তার রাজনীতি ও দর্শনের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন। কালের এই সব কবিতায় তথাকথিত শিল্পমূল্য খোঁজা অশৈল্পিক আচরণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কবিতা একই সঙ্গে বিষয় ও শৈলীর সমন্বয়ে গঠিত শব্দের শিল্প। শিল্প অনেক

ক্ষেত্রে কালের সৃষ্টি বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহাকালের। শৈলীর সঙ্গে শব্দ ও প্রকাশের রীতি জড়িত থাকে, কালের অনুধাবনের সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান ঘটে। কিন্তু বিষয়ে পুনরাবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। যেমন মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিমের নূরনামা কাব্যগ্রন্থের বঙ্গভাষা নিয়ে রচিত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী' কবিতাটি পাকিস্তান পর্বে হিন্দির আধিপাত্যের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে পুনরাবৃত্তি ঘটে।

নির্মলেন্দু গুণের 'মুজিবমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত ত্রিশটির মতো কবিতা। যেমন 'প্রচ্ছদের জন্য : শেখ মুজিবুর রহমানকে', 'সুবর্ণ গোলাপের জন্য', 'শেখ মুজিব ১৯৭১', 'সেই খুনের গল্প ১৯৭৫', 'ভয় নেই', 'রাজদণ্ড', 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি', 'মুজিব মানে মুক্তি', 'সেই রাত্রির কল্পকাহিনি', 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো', 'শোকগাথা : ১৬ আগস্ট ১৯৭৫', 'পুনশ্চ মুজিবকথা', 'আগস্ট শোকের মাস, কাঁদো', প্রভৃতি। এই কবিতাগুলো বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা হয়েছে।

নির্মলেন্দু গুণ একই সময়ে একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক জনপ্রিয় বিষয়কে তার কবিতা-কর্মে বিষয় হিসাবে পেয়েছিলেন; তার সদ্ব্যবহার করাও তার জন্য যুৎসই হয়েছিল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের ষাট দশকের কবিরা এই ভূখণ্ডের ইতিহাস নির্মাণকালে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন; সেদিক থেকে তারা মূলত কালের সৃষ্টিও বটে। সাতচল্লিশে বিভাজিত স্বাধীনতার কালে বাঙালি জাতি তার সম্পূর্ণ জাত্যভিমান তৈরি করতে পারেননি; পাকিস্তান-পর্ব ছিল তার উৎকৃষ্ট নির্মাণকাল। পাকিস্তান-পর্বের প্রায় সিকি-শতাব্দী ধরে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ প্রথমে বুঝতে শিখল তার জাতীয়তা মূলত ভাষা কেন্দ্রিক, তারপর স্থান কেন্দ্রিক– পাকিস্তানি শাসক ও জনগণের সঙ্গে তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিগত কোনো সুদৃঢ় সম্পর্ক নেই। ধর্মগত যে সম্পর্কের ভিত্তিতে দুটি বিশাল বিচ্ছিন্ন অঞ্চল এক রাষ্ট্র ধারণায় একত্রিত হয়েছিল, তা ইতিহাস-সম্মত ছিল না; যদি ধর্ম রাষ্ট্র-গঠনের প্রধান উপাদান হতো তাহলে তো আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে একত্রীকরণ কিংবা কনফেডারেশনের প্রশ্ন উঠতো। কিন্তু এখানকার মুসলমানরা কিংবা পাকিস্তানি শাসকেরা কখনো এ ধরনের উদ্ভট প্রশ্ন উত্থাপন করেনি; অথচ তারাই যখন দুটি ভিন্ন ভাষাভাষী ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে একটি রাষ্ট্র-কাঠামোতে রূপ দিচ্ছেন। অপরদিকে উপাদান হিসাবে তারা পূর্বের ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে সামনে এনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির

নিজস্বতাকে লঘুত্বে পরিণত করছেন; সে সময় বাঙালির আর্থ-সামাজিক মুক্তি ও মর্যাদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আর কোনো বিকল্প ছিল না; ঠিক এ সময়ে নির্মলেন্দু গুণ এবং তার আরও কিছু শক্তিমান কাব্য-সতীর্থ তাদের মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতাকে জাতি নির্মাণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে প্রয়াস পেলেন। তবে নির্মলেন্দু গুণের জন্য তার চারিত্রিক অকপটতা, সত্য প্রকাশের দুর্নিবার আগ্রহ তাকে প্রাতস্বিক করে তুলতে সহায়তা করলো।

নির্মলেন্দু গুণ কবিতার বিষয় হিসাবে সমকালীন বাস্তবতা ও জাতির আকাঙ্ক্ষাকে প্রথমত প্রাধান্য দিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি নিজেই জাতির আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ উন্মোচনের দ্বারা যুব ও প্রতিবাদী তরুণ সমাজের কণ্ঠস্বরে পরিণত হওয়ার দিকে আগ্রসর হলেন। পাশাপাশি সমকালীন প্রপঞ্চ হিসাবে মার্কসবাদী দর্শনকে নির্যাতিত মানবতার মুক্তির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে গ্রহণ করলেন। এই দর্শন মানব জাতির শোষণের ইতিহাসই কেবল তুলে ধরে না; কিভাবে অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত মূল্যের সূচনা এবং এই একই প্রক্রিয়া সকল সমাজের অর্থনীতি বিকাশের উপায় হিসাবে দেখায় ক্রমান্বয়ে সম্পদ ভোগের পার্থক্য দুর্মোচনীয় হয়ে ওঠে– এ সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণ হাজির করে থাকে। এখানেই এই দর্শনের মৌল-চেতনা কিংবা চূড়ান্ত স্বার্থকতা নয়; এই দর্শন মূলত চেতনাশীল মানুষের সমন্বয়ে একটি আন্দোলন সংগঠনের মাধ্যমে বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী। নির্মলেন্দু গুণ একই সঙ্গে বাঙালি জাতিগঠনের ভূগোল ও ভাষা ভিত্তিক চেতনা তার কবিতা নির্মাণের প্রধান উপাদানের পাশাপাশি মার্কসবাদী বীক্ষাকেও গ্রহণ করলেন। আর ঠিক এই সময়ে আলোকিত ও সংঘবদ্ধ তারুণ্যের প্রাণের দাবি হিসাবে কাজ করছিল। যদিও মূল ধারার স্বাধীনতাকামীদের রাজনীতির সঙ্গে সর্বোত্তভাবে তা ক্রিয়াশীল থাকেনি। কিন্তু গুণের প্রধান চাওয়া শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন একটি সমাজ ব্যবস্থা; তাই স্বাধীনতার পরেও আমরা দেখি তিনি লিখছেন, 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র'। কিন্তু তিনি সর্বদা বঙ্গবন্ধুকে রেখেই সমাজতন্ত্র চেয়েছেন। পাকিস্তান পরে পাকিস্তানি শাসকরাও বঙ্গবন্ধুকে সমাজতন্ত্রী মনে করতেন। আরও একটি উপাদান নির্মলেন্দু গুণ তার কবিতাতে এবং জীবনে চর্চা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, ষাট দশকের কবিতার হ্যাংরি বা এ্যাংরি জেনারেশনের আপত উলোট-পালট কর্মকাণ্ডের দ্বারা সুশোভন নিষ্ক্রিয় চেতনাকে আঘাত হানা। আর এ ধরনের বিষয় যে, গ্রাম থেকে রাজধানীর দিকে ছুটে আসা তারুণ্যকে পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট

করবে তাতে তো সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে নির্মলেন্দু গুণের প্রতিভার কৃতিত্ব হলো– সময়ের এই স্বীকৃত বিষয়কে ধারণ করতে পারা।

নির্মলেন্দু গুণের কবিতা মূলত তার যাপিতজীবন, তার আকাঙ্ক্ষা ও চেনা-পৃথিবীর গান। ফলে তার কবিতার প্রতীক ও অলঙ্কারে আকীর্ণ না হওয়ায় অতি সহজেই কাব্য পাঠককে আকৃষ্ট করে থাকে। নির্মলেন্দু গুণের আগে বাংলা কবিতা মূলত প্রকরণ শৈলীকে প্রাধান্য দিয়ে আসছিল; যদিও বিষয় ভিত্তিক কবিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে শামসুর রাহমানের কৃতিত্বের স্পষ্টতা থাকা সত্ত্বেও কবিতার একটি সহজ মুক্তি গুণের কাছেই প্রথম পাওয়া গেল। তাই বলে কবিতার যে সাধারণ ব্যাকরণ তা পরিত্যাগ গুণ কখনো করেননি। এতদ্‌সত্ত্বেও গুণের অসম্ভব উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও বিষয় নির্মাণ তাকে কালের ঈর্ষান্বিত স্রষ্টায় রূপ দিয়েছে। তবে কবিতার জন্য, তার ভড়ং ও বৈষয়িক মানুষের কাছে ভণ্ডামি প্রচারণায় প্রভাবকের কাজ করেছেন। তবে জীবন যাপনে ও রচনায় তার চেয়ে সাধুতা তার সমকালে আর কেউ তার মতো প্রকাশ করতে পারেননি। গুণের চরিত্রে বিপ্লব ও দ্রোহ থাকলেও তার মূল প্রবণতা রোমান্টিক, পরিণামে টিকে থাকার জৈবিক চেতনাতাড়িত– যা তিনি কখনো লুকাতে চেষ্টা করেননি। ফলে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ এমন একটা নাম ধারণ করছে, যা মধ্যবিত্ত চরিত্রের সঙ্গে দারুণ যুৎসই, 'না প্রেমিক না বিপ্লবী।' আসলে এটি পরিষ্কার থাকা জরুরী যে, সদা দ্রোহ ও বিপ্লব মানুষের কাম্য হতে পারে না। মানুষ কখন দ্রোহী হয়, যখন তার আপন বিকাশে এবং প্রাপ্যতায় বাধাগ্রস্ততা পেয়ে বসে, তখন উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা তাকে দ্রোহী করে তোলে। সকল বিদ্রোহী কবিদের মতো নির্মলেন্দু গুণও পরিণামে রোমান্টি কবি চেতনার অধিকারী। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছি, এমন বক্তব্য ও শব্দালঙ্কার প্রধান কাব্য শৈলী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের কাছেই গুণের সর্বাধিক ঋণ; এবং কখনো মনে হয় একমাত্র ঋণ। অর্থাৎ গুণের কবি হওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন একমাত্র সহায়। এই প্রমাণ তার কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে; কখনো রাবীন্দ্রিক ইডিয়ম ও ফ্রেজের ব্যবহারের মাধ্যমে, কখনো উইট ও স্যাটায়ারের মাধ্যমে কখনো প্যারোডি রচনার মাধ্যমে তার প্রকাশ ভাষা খুঁজে পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথকেই তিনি আসলে এ কালের করে বানিয়েছেন, নিজে রবীন্দ্রনাথের মতো একটি সন্ত চেহারা নির্মাণে প্রয়াসী থাকলেও তিনি তার কালে স্থাপন করে যাচ্ছেতাই করে কাজে লাগিয়েছেন। তার জীবনী থেকে জানা গেছে, গুণ নিজে একজন ক্ষয়ীষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান; যে রবীন্দ্রনাথের বিত্ত নেই; যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে

হুলিয়া জারি আছে সেই রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে নতুন করে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কিছুটা বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও গুণের কবিতায়, বাঁশি, ফুল, চাঁদ, নক্ষত্র, বকুল, কোমলগান্ধার, কৃষ্ণচূড়াঞ্জলি, বোষ্টমী, আমি বিষ খাচ্ছি অনন্ত,– এ ধরনের শব্দবন্ধের প্রতি তার রয়েছে পক্ষপাত; আর রবীন্দ্রনাথের বাঙালি আর বাঙালির রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। তবে গুণের কবিতায় 'বকুল' আর ফুল হিসাবে নতুন চরিত্র প্রকাশ করছে; বকুল আর প্রেমিকার পায়ে কোনো তপাৎ থাকছে না। হয়তো মধুসূদনের পঙক্তি একটু ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি নিজের মতো স্বাধীনতা নিচ্ছেন– 'আমি কি ডরাই সখি, ভালোবাসা ভিখারি বিরহে।' এবং কবি নিজেও রবীন্দ্রনাথের কাছে শেষপর্যন্ত নত হচ্ছেন– 'তোমার কবিতা পড়ে ভালো থাকি, গান শুনে দিন যায়, স্বপ্নভ্রষ্টক্ষত বিশ্বে সেরে উঠি তোমার সুরের শুশ্রূষায়।

১৯৬৯-৭০ সালের উত্তাল গণ-আন্দোলন ও নতুন দেশের জন্মের প্রাক্কালে, যখন সব কিছু ভেঙে পড়ছে তখন যে নায়ক-চরিত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, গুণ ঠিক সে সময়ে 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' রচনার মাধ্যমে তা পূরণ করলেন। তার প্রথম কবিতা 'হুলিয়া' একটি কালের নায়ক-চরিত্র নির্মাণে দারুণভাবে কাজ করলো। আমাদের শৈশবে এই কাব্যের চলচ্চিত্রায়ন সেই স্মৃতিকেই জাগিয়ে দেয়। তবে এই নায়ক কোনো প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় অপরাজেয় বীর-পুরুষ নন; তার মধ্যে ভয় ও সংশয়; তবে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা কখনো তিরোহিত হয়নি। হুলিয়া নিয়ে তিনি পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ালেও পরিবর্তন থেমে নেই; প্রাচীন দেবতাদের জায়গায় নতুন ত্রাতাগণের আবির্ভাব হচ্ছে। গণেশের ছবির পরিবর্তে লেনিনের মার্কসের প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। কিন্তু তিনি নিরন্ন বিপ্লবীদের চরম আশার কথা শোনাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তবে তার নায়ক যে পথে হেঁটে চলেছেন সেই তো বাংলার আসল ভূপ্রকৃতি ও জিওগ্রাফি। যখন তার বন্ধুরা জানতে চাচ্ছেন–

আমাদের ভবিষ্যৎ কী?
আইয়ুব খান কোথায়?
শেখ মুজিব কি ভুল করেছেন?
আমার নামে আর কতদিন এভাবে হুলিয়া ঝুলবে।
আমি কিছুই বলব না
আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকা সারি সারি চোখের ভিতরে
বাংলার বিভিন্ন ভবিষ্যৎকে চেয়ে চেয়ে দেখবো।

উৎকণ্ঠিত চোখে চোখে নামবে কালো অন্ধকার, আমি চিৎকার করে
কণ্ঠ থেকে অক্ষম বাসনার জ্বালা মুছে নিয়ে বলবো;
'আমি এ-সবের কিছুই জানি না,
আমি এ-সবের কিছুই জানি না।'

"বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর তার প্রতিবাদে, বিচারের দাবিতে অন্যতম প্রথম কবিতা লিখেছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের পর সারা দেশের মানুষ যখন ভয়ে তটস্থ তখন কবি সমস্ত ভয়ভীতি তুচ্ছ করে লিখেছিলেন বঙ্গবন্ধুর কথা। কবিতার পঙক্তিতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রতিবাদ। জানিয়েছিলেন বিচারের দাবি। তার কবিতার পঙক্তিমালা তখন গোটা জাতির মানুষের চেতনায় ছড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহের আগুন। 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি' কবি নির্মলেন্দু গুণের এ কবিতাটি পৃথিবীর জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার করে তুলেছিল দেশের মানুষকে।

১৯৭৭ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে বাংলা একাডেমির কবিতার আসরে তিনি কবিতাটি পাঠ করেন। 'সমবেত সকলের মতো আমারও স্বপ্নের প্রতি পক্ষপাত আছে,/ ভালোবাসা আছে? শেষ রাতে দেখা একটি সাহসী স্বপ্ন গতকাল/ আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। / আমি তার কথা বলতে এসেছি।.... আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি,/ আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম।' পরে তার এই কবিতা বিভিন্ন লিটলম্যাগে প্রকাশিত হয়। তরুণ সংস্কৃতি কর্মীরা লিফলেট আকারে প্রকাশ করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয় কবিতাটি। সেই অবরুদ্ধ সময়ে মানুষের মনের অনুচ্চারিত এই দাবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতার মধ্য দিয়ে সারা দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিল।' বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতা সম্বন্ধে গুণের নিজের লেখায়- "তখন আমি প্রচ্ছদের জন্য শিরোনামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে কবিতাটি পূর্ব বাংলার উদীয়মান নেতা শেখ মুজিবকে উৎসর্গ করি। শেখ মুজিবের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণে সামরিক ফরমানে নিষিদ্ধ সংবাদ তখন। সবে হাইকোর্টের নির্দেশে মুক্তি পেয়ে চালু হয়েছে। 'ইত্তেফাক' তখনো বন্ধ। আমার কবিতা নিয়ে সাহিত্যিক-সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার মহাবিপদে পড়েন। কিছুদিন ফেলে রাখার পর তিনি ঝুঁকি নিয়ে ওই কবিতা সংবাদ-এর সাহিত্য পাতায় প্রকাশ করেন [১২ নভেম্বর ১৯৬৭]। মনে হয় ওটাই ছিল শেখ, মুজিবুর রহমানকে নিবেদন করে রচিত প্রথম বাংলা কবিতা। কবিতাটি জেলখানায় শেখ মুজিবের কাছে পৌঁছে দেন ছাত্রনেতা আবদুল লতিফ

সিদ্দিকী। শেখ মুজিব আমার কবিতাটি পড়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। সে কথা আমি জানতে পারি ১৯৬৯-এ, গণ-অভ্যুত্থানের ফলে মুক্তি পাওয়া কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক রণেশ দাশগুপ্তর মুখে। রণেশদা শেখ মুজিবের অনুরোধে তাকে কবিতাটির মর্মার্থ বুঝতে সাহায্য করেছিলেন। জেনে আমার খুব আনন্দ হয়। তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানারে লক্ষ্যে দায়ের করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি বুমেরাং হয়ে শেখ মুজিবকে আরও দ্রুত জনপ্রিয় করে তোলে। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তানের লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের পতনের পটভূমিতে রচিত আমার 'হুলিয়া' কবিতায় আমি শেখ মুজিবকে নায়কের আসনে বসাই। তত দিনে আইয়ুব-মোনায়েমের সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিড়ে, প্রথমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এবং পরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্তিলাভ করে শেখ মুজিব বাঙালি জাতির সর্বকালের প্রিয়তম নেতায় পরিণত হয়েছেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত রেসকোর্সের বিশাল সমাবেশে কয়েক লাখ মানুষের উপস্থিতিতে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেখ মুজিব পরিণত হন বঙ্গবন্ধুতে। এই 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটা তিনি। ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী বা পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজমের মতো গোপনে পাননি। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'। প্রকাশিত হয়। প্রফেসর আহমদ শরীফ আমার এই কাব্যগ্রন্থটিকে গণঅভ্যুত্থানের বিশ্বস্ত কাব্যদলিল হিসেবে স্বাগত জানান। আশা করি, আমার কবি হয়ে ওঠা আর শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার মধ্যকার পরস্পরনির্ভর সম্পর্ক এতক্ষণে আমি পাঠকের কাছে কিছুটা স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছি।

তাই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করার পর তাঁর অকুতোভয় সংগ্রামী জীবনের সুবর্ণফসল স্বাধীন বাংলাদেশে নেমে আসা শ্মশানের নীরবতা ভেঙে আমি কেন বাংলা একাডেমির একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরের কবিতা পাঠের আসরে (১৯৭৭) তাকে নিয়ে লেখা কবিতা আমি আজ কারও রক্ত চাইতে আসিনি পাঠ করে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম, আশা করি পাঠক তা বুঝতে পারবেন। যে একজন কৃতজ্ঞচিত্ত বাঙালি কবি হিসেবে এটাই ছিল আমার পক্ষে স্বাভাবিক। মনে পড়ে, কিছুটা বিলম্বে হলেও ওই কাজটি করতে পেরে আমি খুব নির্ভার বোধ করেছিলাম। ওই কবিতাটি পাঠ করার পর আমি দ্রুতই আমার মানসিক ভারসাম্য হারানো অবস্থা থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হই। তার জন্য যে

বিরূপতা আমাকে সইতে হয়েছিল, তা আমার সহ্যসীমাকে যে অতিক্রম করেনি, সে আমার পরম সৌভাগ্য।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন 'চিত্তনামা'। চিত্তনামা'র কবিতাসংখ্যা মাত্র পাঁচ। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা আমার কবিতার সংখ্যা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। তার কারণ, দেশবন্ধুর তুলনায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ছিল অনেক বেশি বীর্যভাস্বর, অনেক বেশি মহাকাব্যিক উপাদানে সমৃদ্ধ এবং অনেক অনেক বেশি বেদনাবিধুর।

আমি আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম রেখেছিলাম 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'। এই প্রেমাংশুটা কে? আমি বলতাম প্রেমাংশু হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম সম্ভব করার জন্য প্রাণদানকারী আমাদের তিরিশ লাখ প্রিয়জনের প্রতীক। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের রক্তধারা সেখানে অনুপস্থিত ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের জন্য সপরিবার রক্ত দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই প্রেমাংশুতে পরিণত হলেন।"

(আগস্ট, শোকের মাস কাঁদো, নির্মলেন্দু গুণ, বঙ্গবন্ধু, শ্রদ্ধায় ভাবনায় স্মৃতিতে, সম্পাদনা মতিউর রহমান)

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা নির্মলেন্দু গুণের ৩টি কবিতা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এখানে উদ্ধার করা গেল।

সংযুক্তি : ৩টি কবিতা

আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি

সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি,
রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের একটি গোলাপ
গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শহিদ মিনার থেকে খসে-পড়া একটি রক্তাক্ত ইট

গতকাল আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।
সমবেত সকলের মতো আমিও পলাশ ফুল খুব ভালোবাসি, 'সমকাল'
পার হয়ে যেতে সদ্যফোটা একটি পলাশ গতকাল কানে কানে
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শাহবাগ এ্যভিন্যুর ঘূর্ণায়িত জলের ঝরনাটি আর্তস্বরে আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

সমবেত সকলের মতো আমারো স্বপ্নের প্রতি পক্ষপাত আছে,
ভালোবাসা আছে- শেষ রাতে দেখা একটি সাহসী স্বপ্ন গতকাল
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

এই বসন্তের বটমূলে সমবেত ব্যথিত মানুষগুলো সাক্ষী থাকুক,
না-ফোটা কৃষ্ণচূড়ার শুষ্কভগ্ন অপ্রস্তুত প্রাণের ঐ গোপন
মঞ্জরীগুলো কান পেতে শুনুক,
আসন্ন সন্ধ্যার এই কালো কোকিলটি জেনে যাক-
আমার পায়ের তলায় পুণ্য মাটি ছুঁয়ে
আমি আজ সেই গোলাপের কথা রাখলাম, আজ সেই পলাশের কথা
রাখলাম, আজ সেই স্বপ্নের কথা রাখলাম।
আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি,
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম।

সেই রাত্রির কল্পকাহিনি

তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে
তারপর গেছে তোমার পুত্রবধূদের হাতের মেহেদি রং,
তারপর তোমার জন্মসহাদের ভাই, শেখ নাসের,
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্য বিবাহিতা পত্নী,
আমাদের নির্যাতিতা মা।

এরই ফাঁকে এক সময় ঝরে গেছে তোমার বাড়ির
সেই গরবিনী কাজের মেয়েটি, বকুল
এরই ফাঁকে একসময় প্রতিবাদে দেয়াল থেকে খসে পড়েছে
রবীন্দ্রনাথের দরবেশ-মার্কা ছবি
এরই ফাঁকে এক সময় সংবিধানের পাতা থেকে মুছে গেছে
দু'টি স্তম্ভ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।
এরই ফাঁকে এক সময় তোমার গৃহের প্রহরীদের মধ্যে
মরেছে দু'জন প্রতিবাদী,
কর্নেল জামিল ও নাম না-জানা এক তরুণ
যারা জীবনের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

তুমি কামান আর মৃত্যুর গর্জনে উঠে বসেছো বিছানায়,
তোমার সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরেছো চোখে,
লুঙ্গির উপর সাদা ফিনফিনে ৭ই মার্চের পাঞ্জাবি,
মুখে কালো পাইপ, তারপর হেঁটে গেছো বিভিন্ন কোঠায়।
সারি সারি মৃতদেহগুলি তোমার কি তখন খুব অচেনা ঠেকেছিল?
তোমার রাসেল? তোমার প্রিয়তমা পত্নীর সেই গুলিবিদ্ধ গ্রীবা?
তোমার মেহেদি-মাখা পুত্রবধূদের মুজিবাশ্রিত করতল?
রবীন্দ্রনাথের ভূলুণ্ঠিত ছবি?
তোমার সোনার বাংলা?
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মতো
পাপস্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উল্টিয়েছো

বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে।
মেখেছো কপালে-ঐ তো তোমার কপালে আমাদের হয়ে
পৃথিবীর দেয়া মাটির ফোঁটার শেষ-তিলক, হায়!

তোমার পা একবারও টলে উঠলো না, চোখ কাঁপলো না।
তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয়
বন্ধ করতে, কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি।
কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য একজন
শ্রমিকের এক বেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশি।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন, পিতা।

তুমি হাত উঁচু করে দাঁড়ালে, বুক প্রসারিত করে কী আশ্চর্য
আহ্বান জানালে আমাদের। আর আমরা তখন?
আমরা তখন রুটিন মাফিক ট্রিগার টিপলাম।
তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার পাখির ঝাঁক
পাখা মেলে উড়ে গেল বেহেশতের দিকে...।
তারপর ডেডস্টপ।

তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে
আমাদের চোখের সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে থামলো।
-কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামলো না।
সিঁড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টকটকে রক্ত বাংলার দূর্বা ছোয়ার আগেই
আমাদের কর্নেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

একটি কবিতা লেখা হবে
তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে :
"কখন আসবে কবি?"
এই শিশুপার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল সেদিনের বেলাটি?
তা হলে কেমন ছিল শিশুপার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?
জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ...।
হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশুপার্কের রঙ্গিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিনের এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, -এইসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দুর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুন কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের : "কখন আসবে কবি?" "কখন আসবে কবি?"
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্য্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি :
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।

যিসাস মুজিব ও ইথাকা

মোগলদের স্থাপত্য শিল্পের গল্প করতে করতেই আমরা এসে পড়লাম ফতেহপুর সিক্রিতে। আকবর বাদশা নিজেই ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ করেছিলেন। এখানে সম্রাট আকবর তাঁর রাজধানী করেছিলেন। আগ্রার দুর্গের সাথে এর বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

– (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

১.

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতায় মৌল প্রবণতা তাঁর ইতিহাসচেতনা; মহাকালের ইশারা থেকে উৎসারিত যে সময়চেতনা, সেই সময়ের মধ্যে সংস্থাপিত মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব এবং পরিণতি লিপিবদ্ধ করা। বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্মাণ, সংগ্রাম লড়াই ও স্বপ্নযাত্রা তাঁর কবিতার প্রধান অনুষঙ্গ। তিনি কবি জীবনের শুরু থেকেই বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। কখনো নিছক কবিতা করে তুলছেন, কখনো কবিতায় কবিতার ধারাভাষ্য লিখে প্রমাণ করে চলেছেন। তাঁর এই কাজ নিরন্তর। চর্যার কাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কিভাবে বাঙালি জাতি তার জাতিসত্তা তৈরি করল- এটিই প্রধানত তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধারা ও কবিতা রচনার ফলে তিনি নিজে জাতিসত্তার কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন, তাঁর পাঠকের মধ্যে। তাঁর বোধে ধরা পড়েছে, একটি জাতি পরিপূর্ণতা পাওয়ার জন্য যে সব উপাদানের প্রয়োজন হয়, তার অন্যতম প্রধান 'জাতির পিতা।' বাঙালিও তার একজন জাতির পিতা পেয়েছিল, তিনিই তাদের হাত ধরে একটি জায়গায় এনে জাতি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

বাঙালি জাতির এই ভূখণ্ড কেন্দ্রিক বসবাস কবে থেকে শুরু হয়েছিল, এর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কি- তা হয়তো গবেষণার ফল। কিন্তু বাঙালি জাতি যে বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি বসবাসের অভ্যাস গড়ে তুলেছিল তার চিহ্ন

অঙ্কিত আছে তার ভাষার ইতিহাসের মধ্যে। এই ভাষা এই সাহিত্য ধরে রেখেছে তার আদি পুরুষের চিহ্ন। চর্যাপদের ভুসুকু যেদিন 'বাঙ্গালী ভইলী' বলে আক্ষেপ করেছিলেন, সেদিনই বাঙালি জাতির নিয়তি নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল। ভাষার কারণে বাঙালিকে নানা রকম নির্যাতন সইতে হয়েছে। বৈদিককালে বাঙালিকে অষ্টাদশ পুরাণ, রামের চরিত পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বলা হয়েছে, এই জাতির লোক যারা এসব পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবে তারা অনন্তকালে নরকে পুড়বে। আবার মধ্যযুগে আরবি-ফারসিওয়ালার এই ভাষাকে, ভাষা জাতির লোকের পরিচয় মুছে দিতে চেষ্টা করেছে। ইংরেজ আমলেও খুব একটা সুবিধা পায়নি এই ভাষার লোক। উর্দু আমলে ভাষার দাবিতে প্রাণ দিতে হয়েছে বাঙালিকে। এই ভাষাকে কেন্দ্র করেই বাঙালি সংগঠিত হয়েছে। নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সংগ্রামশীল ইতিহাস মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতার প্রধান প্রবণতা। তিনি যখন বলেন, 'যতদূর বাংলা ভাষা, ততোদূর বাংলাদেশ' তখন পরিষ্কার হয়ে যায়- বাঙালির স্বাধীন সত্তা ও বিস্তারের ইতিহাস।

কিন্তু বাঙালি একদিনে এই জায়গায় আসেনি। তার যে সামুদ্রিক যাত্রা শুরু হয়েছিল, যে নৌকায় বাঙালি যাত্রী ছিল, সেই নৌকায় একজন মাঝি ছিলেন, তিনি বাঙালিকে কুলে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পরাধীন বাঙালি জাতিকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। পরিণামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলে, তিনি আর কেউ নন- তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বাঙালির জাতির পিতা হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে স্বীকৃত হয়েছেন। দুর্ভাগ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় দুষ্কৃতিকারীদের হাতে সপরিবারে তিনি নিহত হন। তারপর শুরু হয় বাঙালির মাতম, বাঙালি কবিরা সেই দুঃখ বুকে নিয়ে কবিতা রচনা করে চলেছেন। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা তাদের অন্যতম প্রধান- যারা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিরলস কবিতা লিখে চলেছেন। একটা দুটি নয়, একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছে কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। তিনি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে উচ্চারণ করেছিলেন- 'নেই তো তাহার জিভ / যে বলেনি- জাতির পিতা মুজিব, শেখ মুজিব।'

কবি সোহাগ সিদ্দিকীর লেখা থেকে জানতে পারি "আশির দশকের প্রথম দিকে কবি তখন বাংলা একাডেমির উপ-পরিচালক পদে কর্মরত। রাজপথের মুজিব আদর্শের সৈনিক কবি ছড়াকার প্রিয় আসলাম সানী গেলেন কবি'র কাছে,

বললেন 'হুদা ভাই, দুটো তুখোড় লাইন লিখে দিন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে।" কবি লিখলেন-

'নেই তো তাহার জিব,
যে বলেনি জাতির পিতা
মুজিব, শেখ মুজিব।'

কবিতাটি হয়ে উঠলো শ্লোগান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর রাজপথের দেয়ালে দেয়ালে চিকা মারা হলো এই অমর বাণী। কবিতাটি ১৯৮৪ সনে 'যিসাস মুজিব' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

একাত্তরের মার্চ, সারাদেশে আন্দোলনের শিখা দাউদাউ করে জ্বলছে। পিছিয়ে নেই লেখক শিল্পী সংস্কৃতির মানুষেরাও। কবি সাহিত্যিকরা প্রকাশ করলেন 'প্রতিরোধ' নামে ট্যাবলয়েড। ছয় মার্চ প্রকাশিত সেই পত্রিকা ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বজয়ী ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার আগে তারা বিলি করেছেন জনতার মাঝে। চলুন কবি'র জবানিতে শুনি সে কথা– "একাত্তরের ছয় মার্চ প্রকাশিত 'প্রতিরোধ' (দ্বিতীয় সংখ্যা, ৬ মার্চ, ১৯৭১) পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে তিনটি কবিতা ও দুটি শ্লোগান। প্রথম কবিতা 'কোনো বাধা মানবো না' লিখেছেন 'সাদকার', মূল নাম সাযযাদ কাদির; দ্বিতীয় কবিতা 'তপ্ত শোণিত স্বাধীন পতাকা আঁকে' লিখেছেন 'রকনদ', মূল নাম রফিক নওশাদ; এবং সর্বশেষ কবিতা 'জীবন এখন জীবনের বিনিময়' লিখেছেন 'মুদনূল', মূল নাম মুহম্মদ নূরুল হুদা। কবিরা গেরিলা কায়দায় ছদ্মনাম নিয়েছিলেন নিজেদের নামের সংক্ষেপায়ন করে।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় মূল প্রতিবেদন 'বাঙলার হাতে স্বাধীন লাটাই ঘোরে'। উপ-শিরোনামগুলো হচ্ছে 'শত্রুদের চিনুন', 'আমাদের কর্তব্য', 'লেখকদের সভা'। দ্বিতীয় প্রতিবেদনেও কিছু ঘোষণা আছে। প্রথম ঘোষণা : 'প্রতিরোধ' স্বাধীন সার্বভৌম শোষণমুক্ত বাঙলাদেশের লেখক শিল্পীদের মুখপত্র'। শ্লোগান আছে, 'খুনের বদলা খুন চাই / বাঙলার স্বাধীনতা চাই /আপোষ আপোষ করে যারা / বাঙলা দেশের শত্রু তারা'।

প্রতিবেদন ও শ্লোগানগুলো সম্মিলিতভাবে লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন জনাব আহমদ ছফা, মুহম্মদ নূরুল হুদা, মুনতাসীর মামুন ও রফিক নওশাদ। এই পত্রিকাটি ৫ই ফেব্রুয়ারি রাতে অত্যন্ত সঙ্গোপনে ওয়ারীর ঠাঠারীবাজার-সংলগ্ন 'পুরবী প্রেস' (৮৭ বামাচরণ চক্রবর্তী রোড ঢাকা) মুদ্রিত হয়েছিলো।

৭ই মার্চ সকাল বেলা এটি আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সেই ঐতিহাসিক সমাবেশে বিলি করেছিলাম। তখন মুনতাসীর মামুন আর খালিকুজ্জামান ইলিয়াসও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। আমরা অধীর চিত্তে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা শোনার প্রতীক্ষায় ছিলাম। এলো সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত যখন তিনি স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ ভাষণের শেষে মাত্র এগারোটি শব্দে উচ্চারণ করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, / এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' 'জয় বাংলা' তাঁর চূড়ান্ত উচ্চারণ। এর পর আর কোনো ধ্বনি বা শব্দ তিনি উচ্চারণ করেননি। সেদিন থেকে বাংলাদেশ ও বাঙালি চিরস্বাধীন।"

১০ জানুয়ারি স্বাধীন দেশের মাটিতে ফিরে এলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শুরু হলো দেশ গঠনের কাজ। অন্যসব প্রতিষ্ঠানের মতো বাংলা একাডেমিতেও স্বাধীন দেশের স্বাধীন ভাষায় শুরু হলো ইতিহাস ঐতিহ্য সাহিত্য সংস্কৃতি সংরক্ষণের কাজ। ডক্টর মযহারুল ইসলামের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' গ্রন্থের অনুবাদ নিয়ে অনুবাদ প্রকল্পে সহকারী পরিচালক হয়ে যোগ দিলেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ৮০-র প্রথম দিকেই প্রকাশিত কবি'র কবিতাগ্রন্থত্রয় 'শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি', অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী' ও 'আমরা তামাটে জাতি' পাঠক সমাদৃত হয় এবং কবির গুণমুগ্ধরা কবিকে 'জাতিসত্তার কবি' হিসাবে অভিষিক্ত করেন। পরবর্তীতে ' যতদূর বাংলা ভাষা ততদূর এই বাংলাদেশ' 'হাজার নদীর দেশ' সহ অন্যান্য কবিতাগ্রন্থে, মাতৃভূমির মানুষ, প্রকৃতি ও তার হাজার ইতিহাস ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি তুলে ধরেছেন কবিতার নান্দনিকতায়। তাই জাতিসত্তার কবি অভিধায় কবি এখন সর্বমহলে সমাদৃত।

১৯৭৫-এর পর দীর্ঘ সামরিক শাসন ও স্বৈরশাসন বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধির সকল লেখক শিল্পীর সাথে কবি যুক্ত ছিলেন সবসময়। যদিও তিনি তখন বাংলা একাডেমির গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, তবুও সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে লেখক শিল্পীদের সাথে একাত্ম ছিলেন। স্বৈরাচারী বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের আন্দোলন যখন বেগবান হয়, তখন তিনিও এদেশের লেখক সাহিত্যিক শিল্পী সমাজ এই আন্দোলনে সাধারণ জনতার সাথে রাস্তায় নেমে আসে।"

বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পরেই তিনি লিখেছিলেন 'যিসাস মুজিব।' ১৯৮৪ সালে এই নামে তাঁর কাব্যগ্রন্থ বেরুচ্ছে। এ কথা ভুললে চলবে না, তিনি

সরকারি চাকরি করা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর কোনো অপমান কোনো সরকারের আমলেই সহ্য করেননি।

বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার দিনে মুহম্মদ নূরুল হুদার জবানীতে 'অভয়দাশ লেনে থাকতাম। চাকরি করতাম বাংলা একাডেমির অনুবাদ বিভাগে। কী অদ্ভুত মিল। ১৯৭৫ সালেও বাংলা একাডেমিতে চাকরি করেছিলাম, অনেক সময় পেরিয়ে বাংলা একাডেমিতে পুনরায়। মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছি। যাই হোক, প্রতিদিনই ভোরে ঘুম থেকে উঠতাম। ১৫ আগস্ট, সেদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উঠেই রেডিও শোনার অভ্যাস ছিল। কিন্তু সেদিনের সংবাদ বিশ্বাস করার মতো না। বঙ্গবন্ধু নেই, এটা কী করে সম্ভব!'

'কিছুক্ষণ থ' হয়ে বসে থেকে, বাংলা একাডেমির নিরাপত্তা বিভাগে টেলিফোন করি। তারা জানায়, নিজেরাও এমনটা শুনেছেন। বিস্তারিত কিছু জানে না। মন খারাপ করে বাহিরে গেলাম। না, পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখলাম না। মানুষজন কম, হাঁটাচলায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। দোকানপাট খুব খুলছে না। গাড়ি নেই, রিকশা আছে। থেমে থেমে চলছে মানুষ। বলাবলি করছে, যেখানে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা হয়নি। সেখানে আমরা তো সাধারণ মানুষ। আমাদের কী হবে!'

'দিনের সময় যত যাচ্ছে, ততই বড় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে- এমনটা আঁচ করা যাচ্ছে। তারপর একটা রিকশা নিয়ে বাংলা একাডেমির দিকে রওয়ানা হলাম। কিন্তু মন ভীষণ খারাপ। আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান, এখানে বঙ্গবন্ধুর আসার কথা। অথচ তিনি আর নেই। মানা যায় না, গতকালও ঘাতকরা তার পাশেই ছিল। তার বিশ্বাস, আন্তরিকতা উদারতাই কাল হলো।'

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মুহম্মদ নূরুল হুদা বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে ১. মুজিবাড়ি ২. যিসাস মুজিব ৩. অনন্ত মুজব জন্ম, ৪. জাতিপিতা ও অন্যান্য কবিতা উল্লেখযোগ্য।

এই স্থলে তাঁর কয়েকটি কবিতা বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাই। কবি শামসুর রাহমানের 'টেলেমেকাস' এবং মুহম্মদ নূরুল হুদার 'ইথাকা' একই মিথের একই লক্ষ্যের দুটি কবিতা। রচনার সময়ের দিক দিয়ে রাহমানের কবিতা কিছুটা নূরুল হুদার কবিতার কয়েক বছর আগের। দুটি কবিতাই রচিত হয়েছে জাতির পিতাকে নিয়ে। ইউলিসিস ইথাকার রাজা। টেলেমেকাস তার পুত্র, যিনি যুদ্ধ যাত্রাকালে ছোট থাকলেও এখন পূর্ণাঙ্গ তরুণ, স্ত্রী পেনিপোলি

দীর্ঘদিন স্বামীর প্রতিক্ষায় অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে আছেন। সময় মতো ইউলিসিস না পৌঁছালে সে চলে যাবে অন্যের দখলে। পিতা না আসলে টেলেমেকাসের মা হয়ে যাবে পর পুরুষের অধীনস্থ। বিদেশি রাজা রাজকুমার স্বামীহীন পেনিপোলির দাবি নিয়ে ইথাকার রাজপ্রাসাদ দখল করে রয়েছে। তাদের একমাত্র ভয় ওডিউসকে, সে ফিরে এলে সবাইকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হবে, প্রাণও যেতে পারে। ট্রয় যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ইউলিসিস নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দেবতাদের রোষানলে পড়েছে। কিছুতেই সে ইথাকায় পৌঁছতে পারছেন না; অনেকটা বঙ্গবন্ধুর মতো পাকিস্তান শাসকদের কারাগারে বন্দি থাকার মতো। এক কারাবাস শেষ হতে হতেই অপর কারাবাসের শুরু। কিন্তু তাকে যে পৌঁছাতেই হবে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী ও পুত্রের কাছে।

উপরোক্ত দুজন কবির দুটি কবিতাই হোমারের বিখ্যাত ওডিসি কাব্যের মিথকে ব্যবহার করা হলেও কবিতা দুটির নির্মাণ শৈলী সম্পূর্ণ পৃথক। একটির সঙ্গে আরেকটির বয়ন ও বয়ানের কোনো মিল নেই। রাহমান এবং হুদা দুজনই তাদের কবিতায় প্রাচ্য মিথ ব্যবহারে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। রাহমানের 'টেলেমেকাস' থেকে হুদার 'ইথাকা'র মূল পার্থক্য স্থান ও কালের। শামসুর রাহমান টেলেমেকাস, ওডিউস ও পেনিপোলিকে তাদের সময় ও স্থানে রেখেই বর্ণনা করেছেন প্রতিতুলনা হিসাবে। কিন্তু কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ইথাকাকে বাংলার জল হাওয়ার সঙ্গী করে তুলেছেন। তাঁর ইথাকা ও ইথাকার বাসিন্দা যুদ্ধ শেষের বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশে সবাই জাতির পিতার অপেক্ষা করছে।

পাঠকের জন্য ওডিসিউসের ইথাকার একটি বর্ণনা উদ্ধার করলাম, যেটি কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার 'ইথাকা' এবং রাহমানের 'টেলেমেকাস' পড়তে কাজে লাগবে।

'ইউলিসিস জাহাজের একেবারে সামনেটায় দাঁড়িয়ে আছে। ভোর ভোর ভাবটা কেটে গিয়ে সকাল হচ্ছে আস্তে আস্তে। সমুদ্রের উপর মিহি কুয়াশা। গতকাল রাত অবধি মাঝিমাল্লাদের ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। আজ ভোরে দূরে দিগন্তে ইথাকার বন্দর দেখতে পাবার পর সবারই গা ছেড়ে দিয়েছে। প্রেক্ষাপট না জানলে দর্শক ভাববেন তারা হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘটনা তা নয়। ইথাকা যে সত্যিই পৌঁছনো যাবে, সে'টা সদ্য উপলব্ধি করছে তারা। দীর্ঘ একটা দশক তারা বাড়ির বাইরে। যতজন রওনা হয়েছিল, তার অর্ধেকও হয়ত এই জাহাজে নেই। যারা আছে, তারা ধরেই রেখেছিল ফিরবে না। ট্রয়ই

জীবন। সমুদ্রই জীবন। এক-দু'বছর বাদে আর বাড়ির জন্য মনকেমনও করত না। অভ্যাস। মানিয়ে নেওয়া। মানুষ যখন বোঝে অতি কাঙ্ক্ষিত কিছু কোনওভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়, তখন পাবার আশা ছেড়ে দেয়। আশা জিইয়ে রাখলে কষ্ট বেশি। তাই এই ওডিসি ও তাদের কাছে আর একটা অভিযান বই কিছু ছিল না। আজ ইথাকার বন্দর দেখে তারা একটা অদ্ভুত জটিল যুদ্ধের মধ্যে পড়েছে। যুদ্ধটা নিজের মনের সঙ্গে। একদিন যে ইথাকার বন্দর তাদের দিনরাত তাড়া করে বেড়াত, নিজের অজান্তেই তাকে মূল্যহীন করে দিয়েছিল সবাই। একবার কোনওকিছু দাম হারালে, তারপর হাতের নাগালে এসে গেলে কেমন লাগে? হিসেব অনুযায়ী ইথাকা দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে আবেগে উছলে ওঠার কথা সবার। কিন্তু তা হচ্ছে না। একটা শহর শুধু বাড়ি তো নয়, প্রিয়জনও। তাদের সবার মুখ মনে পড়ছে। দশ বছর আগে দেখে আসা মুখ। এতদিনে তারা বড় হয়েছে, বুড়ো হয়েছে। বাড়িটাও কি আগের মতো আছে? সামনের রাস্তাটা? মধ্য ইথাকার পেল্লায় বাজারটা? বাজারের বাইরেই দুর্গন্ধময় খাটালটা আরও দূরে সরিয়ে দেবার কথা হচ্ছিল, সরে গেছে নিশ্চয়ই এতদিনে। আর রাজপ্রাসাদটা? ইউলিসিস মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার দৃষ্টি ইথাকা ভেদ করে আরও ওপারে চলে যাচ্ছে। ইথাকা যেন স্বচ্ছ। দেশের মানুষ এক দশকের অনুপস্থিতিতে ধরে নিয়েছে রাজা মৃত। মাঝিমাল্লাদের ক্ষেত্রেও কি তাই? সমুদ্রে ঢেউ তোলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো ইউলিসিস। বলল, "জাহাজের মুখ ঘোরাও। ইথাকা যাচ্ছি না আমরা।" মানুষের ভুল ভাঙানোর প্রয়োজন নেই। আদেশ শুনে মুহূর্তে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল গোটা জাহাজ। সবার ভিতরের কঠিন প্রশ্নটার সমাধান করে দিয়েছে রাজা ইউলিসিস। ক্যাপ্টেন ইউলিসিস। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে কি করছে না, সে'টা এখন অকিঞ্চিৎকর একটা প্রশ্ন। করছে যে না, ইথাকা যে এখন আর তাদের বাড়ি নয়, এই অপ্রিয় সত্যটার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না।' মুহম্মদ নূরুল হুদা'র 'ইথাকা' কবিতাটি পাঠকের জন্য উদ্ধার করা হলো। 'ইথাকা' কবিতা থেকে কয়েক পঙক্তি :

চুপ আজ হে ইথাকা দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো,
দুঃখিনী দ্বীপের মতো সূর্যেরও টলমল চোখে
ভেসে ওঠে সম্রাটের তরী;
দ্যাখো,
মাস্তুলের মতো ঋজু সম্রাটের সুবর্ণ শরীর

অটল, অনড়; দ্যাখো,
স্বজন হারানো শাকে ভারী হলে জীবনের মতো
অশ্রু জমে সম্রাটের চোখে;

মুহম্মদ নূরুল হুদার 'যিসাস মুজিব' কবিতাও একটি বাইবেলীয় মিথ হিসাবে এসেছে। অবশ্য যিসাস মিথ এবং একই সঙ্গে ঐতিহাসি চরিত্র। যিনি খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক। কবির ভাষ্য অনুসারে কবিতাটি লিখিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে ভয়াবহ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পরে। কিছু দুষ্কৃতিকারী জাতির পিতাকে হত্যা করেন। অথচ তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের ফলে মাত্র বছর তিনেক আগে বাঙালিরা একটি দেশ, পরিচয় ও পিতাকে পেয়েছে। যার জন্য এই অর্জন তাঁকেই তার স্বাধীন দেশে হত্যা করা হলো, অথচ পাকিস্তানি সামরিক জান্তাও সে সাহস পায়নি। কারণ তারা জানতো, শেখ মুজিবের গায়ে আঘাত লাগলে বাঙালিদের ঠেকানো যাবে না। কিন্তু যিসাসকে যেমন তার নিজের সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছিল। তেমননি মুষ্টিমেয় বাঙালির বিশ্বাসঘাতকতায় জাতির জনক নিহত হলেন। কিন্তু যিসাসকে যেমন হত্যা করে তার আদর্শকে থামানো যায়নি, বরং বহুগুণে বেগবান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি হত্যাকারীরাও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার ফলে তাঁর হত্যাকারীরা ফুৎকারে উড়ে গেছে, এবং মুজিব পুনরায় তার মানুষের মধ্যে তাঁর স্বাধীন দেশে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, পুনরুত্থিত হয়েছে। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতার মর্ম সেটা বলেছে। 'যিসাস মুজিব' কবিতাটির কয়েক পঙক্তি উল্লেখ করছি।

ফুরাবে না গঙ্গাধারা, ফুরাবে না বঙ্গভাষী কবিদের নিব
ফুরাবে না এই রক্ত, পিতা, তুমি যিসাস মুজিব।

মুজিবের মরণ নেই। এক মুজিব অন্তরালে লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে। মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে, কেউ শারীরিকভাবে নশ্বর নন, মুজিবও একদিন প্রাকৃতিক নিয়মে মারা যেতেন। তিনি যে আদর্শের জন্য বেঁচেছিলেন, সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠাই তার মূল কাজ। আদর্শের মাধ্যমে বেঁচে থাকা। যতদিন স্বাধীন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন। তিনি মারা গেলে তাঁর আদর্শের চেতনার লোক জীবিত থাকবে, নতুন করে মানব শিশুর জন্ম হবে, তারাও মুজিবের কথা শুনে গল্প শুনে নতুন করে উদ্বুদ্ধ হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। মুহম্মদ নূরুল হুদার এই কবিতার বক্তব্যও তাই। 'অনন্ত মুজিব জন্ম' বাঙালি মুজিব জাতি হিসাবে টিকে থাকবে।

মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি জন্ম নাও তোমার ভিতর,
মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি জন্ম নাও আমার ভিতর;
মুহূর্তে অনন্ত জন্ম, এই মাটি আমার বাসর;
বাঙালি মুজিবজাতি, চিরবাংলা মুজিবের ঘর।

২.

মুহম্মদ নূরুল হুদা যে কারণে আলাদা সেটি হলো, এই জনপদের আদিম রূপটি কবিতার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি, সেই জনপদের ভয়াল শ্বাপদ রূপের পাশাপাশি সম্ভাবনাও তিনি আবিষ্কার করেছেন। চিত্রে যে দিকটি আবিষ্কার করেছিলেন এস এম সুলতান, হুদা কবিতায় সেই কাজটি করেছেন। সুলতানের চিত্রকলায় আমরা পাই, কৃষিনির্ভর সমাজের পেশিবহুল মানুষ এবং সেই মানুষের সংগ্রামশীলতা। অবশেষে একটি Pantisocracy ও ধারণা আবিষ্কার করা যেতে পারে। সেইসঙ্গে আধুনিক মানুষের বিবিক্তি, ক্লান্তি, সংশয়, বিতৃষ্ণা ও নৈরাশ্যিক নেতিবাচকতা পরিহার করে নূরুল হুদা একটি ইতিবাচ্য নির্মাণে সক্রিয় হয়েছেন।

তাঁর কবিতায় পড়ুয়ার পাঠ অভিজ্ঞতাকে মাঝে মাঝে অতিক্রম করে যেতে চায়। নূরুল হুদা বৈচিত্র্য পিয়াসী, তাঁর একটি গ্রন্থ থেকে আরেকটি গ্রন্থ দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে আলাদা হয়ে গেছে; যদিও পরিণামে একই লক্ষে তাঁর অভিযাত্রা; হুদার কাব্যগ্রন্থে নাম বিবেচনায় সে সত্য ধরা পড়ে-'শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি', 'অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী', 'আমার তামাটে জাতি', 'শুক্লা শকুন্তলা'; তবে কবির ক্ষেত্রে কোনো বিবেচনা চূড়ান্ত নয়। মানবমনের বিচিত্রমুখী চেতনার যতটুকু সে ধারণা করতে চায়। একই দর্শনে স্থিতি থাকা কবির ধর্ম নয়।

হুদার কবিতায় আদিম বাঙালিয়ানা লক্ষ্য করা গেলেও এর জন্য তাঁর হাহাকার নেই। তাঁর কাছে বর্তমানের মূল্য সর্বাধিক, কারণ তাঁর মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি। হুদার কাছে অতীতের যে মূল্য তা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতার পর্যায় বোঝায়– 'কামুদ হার্মাদ এসে ঘাড়ে তার ফেলে যায় সজোর নিঃশ্বাস'। নূরুল হুদা মানুষের ক্রম উন্নতির সম্ভাবনায় আস্থাশীল।

১৯৭২ সালে মুহম্মদ নূরুল হুদার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শোণিতে সমুদ্রপাত' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে কবির উৎকর্ষ এবং পরিণতিবোধের স্বাক্ষর রয়েছে :

দূরে যাচ্ছো, বৃষ্টিপাত থেকে দূরে যাচ্ছে রিমঝিম পায়

বাজিয়ে শঙ্খের চুড়ি, হাওয়ায় এলিয়ে দিয়ে কালো কেশদাম
ঘূর্ণি নৃত্যে মেতে দূরে যাচ্ছো, দূরে যাচ্ছো তুমিও উর্বশী।

এ গ্রন্থে কবির মধ্যে কিছু প্রস্তাবনা লক্ষ করা যায়, প্রেম-বিরহ নস্টালজিয়া থাকলেও কবি তাতে কাতর নন, কবি তাঁর অতীতকে ফিরে আসতে আহ্বান জানান; তারপর অতীত আর বর্তমানের তফাত মহাকাল চেতনার মধ্যে একাকার করে ফেলেন : 'যেখানেই হাত রাখি তোমার শরীর' সুতরাং 'সুতনুকা, আজ থেকে তোমাকে বিশাল বিদায়।' এ গ্রন্থে কবি কোনো সংকীর্ণ প্রত্যাশা দ্বারা আক্রান্ত নন; কবির দুঃখ বিশাল চেতনা বিশাল; 'যেন বৃদ্ধ সোফোক্লিস/ গ্রীসীয় খাড়ির মতো ক্লান্ত, ভারি পাপড়ি জড়িয়ে অ্যাজিয়ান তীরে এসে দাঁড়ালো হঠাৎ।' সমকালীন দুঃখ এবং প্রতারণা কবি এ গ্রন্থের শব্দায়িত করেছেন, কিন্তু সংকীর্ণ শব্দবন্ধ তিনি পরিত্যাগ করে ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। ম্যাকবেথের 'ডানকানের মুখের মতো চেতনায় ভাসে সেই মুখ', কিন্তু মানুষের আত্মঘাতী লোভের কাছে 'ঝলোমলো গাছপালা ছায়াভস্ম হয়'। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, মানুষের পদচ্ছাপ আজ চন্দ্রপৃষ্ঠ ধারণা করে, কিন্তু আত্মার কি কোনো মুক্তি ঘটেছে? বিশ্বের বয়সী সে আত্মাকে কবি করেছেন লালন। ফসটাস যেমন শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করেছিল, সেই শয়তান জ্ঞানেরই সমার্থক। আধুনিক মানুষকে ফসটাসের মতো সম যাতনা বয়ে নিয়ে চলতে হচ্ছে। কবির বাণী তাই :

জ্ঞানলোভী পাপাত্মারা, তোমাদের থিওলজি প্রসারিত হবে বহুদূর
সঠিক জানবে প্রায় লোকাতীত পৃথিবীর সম্ভাব্য খবর,
নিটোল সঠিক বার্তা সে জগতের, তবু জানি, জানবে এটিই
ফসটাস এখন নরকে।

হতাশা যে হুদার মধ্যে নেই তা নয়, কিন্তু একে পরাজয়ের ভাষা না বলে satire-এর ভাষা বলা ভালো। যেমন তাঁর শামুক কবিতাটি। এই কবিতায় কবি শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন, যদিও 'গহন সুখে জ্বলবে জ্বলুক আলো'।

বিষ্ণুদে'র কবিতাটি অবশ্য এর বিপরীতার্থক :
হে নিঃসঙ্গ শামুক। তোমাদের কুটিল মন।
কথা শোনো, কারো ঘরকে বাহির, আপন পর,
হৃদয়কে কারো আকাশের নীলে উন্মীলন।

নূরুল হুদার ফসটাস যে নরকে জ্বলছে তা থেকে, মুক্তি কোথায়? 'জ্ঞানের বিপুল বিশ্বে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠালোভীরা' তবু :

সময় স্তম্ভের মতো আলোর শরীর নিয়ে
সমুদ্র সঙ্গমে তার আজো অধিবাস
অঙ্গজুড়ে সবুজ আসর
পাখির উড়াল আঁকা ডালপালা
বাতাসের সহগামী করে
তবুও শিকড় তার গভীর গিরির উচ্চে
জালের বিথার।'
(সিজানের গাছ)

নূরুল হুদার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, 'আমার সশস্ত্র শব্দবাহিনি' (১৯৭৫) আমাকে ভাবিয়েছে বেশ। প্রচলিত কাব্যপাঠের অভ্যাসকে ব্যাহত করেছে, eye rhyme-এর আধিক্য ঘটেছে, nonceword এবং nonsense word সন্নিবেশিত হয়েছে। কবিতার অবয়বের দিক দিয়েও পূর্ববর্তী গ্রন্থের কবিতা থেকে পৃথক হয়ে গেছে। কোনো পড়ুয়া যদি প্রথমেই তাঁর এই গ্রন্থটি পাঠ করেন, তাহলে ঠিক কবিকে আবিষ্কার করতে পারবেন না। কেননা, এই কাব্যের অনেক কবিতাই প্রাথমিক পাঠে মনে হয় নিতান্ত সহজ সরল। এই গ্রন্থ থেকে কয়েকটি কবিতা উদ্ধার করা যাক :

১.
পেলুম টাকা একটি টাকা টাটকা পেলুম
বুকে রাখলুম মুখে ঢাকলুম হাতে রইল ফাঁকা
পেলুম টাকা একটি টাকা হাটকা পেলুম-
কেমন টাকা? আরশি টাকা, হাজার মুখ আঁকা
কাহার আরশি? রাজার আরশি, বাজার দরে হাঁকা।
(আরশি টাকা)

২.
হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ
গ্রহ থেকে উপগ্রহ গলগ্রহ মই,
হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ
ল্যাঙ মারে তৈমুরের ক্রাচ গেল কই

হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ
রসাতলে রাজনীতি প্রজানীতি ঐ
হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ
(নগর রাখালের উক্তি)

৩.
মা ভালো, বাবা ভালো
ভালো যে গৃহিণী
যেহেতু অসুস্থ আমি
ওলো স্বৈরিণী
(তার বার্তা : স্বৈরিণীকে)

উপর্যুক্ত কবিতার উদ্ধৃতির কারণ, অনেকেই এইগুলির উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন, মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতা অগভীর এবং ননসেন্স ভার্সে পরিপূণ। আমি তাঁদেরকে অনুরোধ করব, কবিতাগুলোকে যেন রচনাকালের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া হয়। তাহলে কি এই কবিতা তাঁর সময়কে অতিক্রম করতে পারেনি? হুদার কবিতার মৌল প্রবণতা ঐতিহ্য অনুসরণ, অথচ এই গ্রন্থে তিনি সমকালীন অবস্থাকে কাব্য করে তুলেছেন, কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই কবিতাগুলিতে কোনো আন্দোলন নেই, নেই বিবৃতিদানের আধিক্য। হুদার প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন। ঠিক চর্যাপদকর্তাদের মতো, হেয়ালি এবং সান্ধ্য ভাষা আক্রান্ত– বোধকরি এর কারণ রাজনৈতিক। আমার বিশ্বাস এই কবিতাগুলোর কায়িক মূল্য কখনো হ্রাস পাবে না। মুহম্মদ নূরুল হুদার এ গ্রন্থেও আদিম মানুষের সংগ্রামশীলতা প্রেম রিরংসা বিধৃত হয়েছে। সেই খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫৭ সালের মানুষের খাদ্যান্বেষণের গল্পও তৈরি করেছে তিনি :

নেকড়েটা এসো হত্যা করি
ঝলসে খাই কলজেটা তার
হাড় মাংস ইতস্তত : ফেলে রাখতে পারো
রক্তে বসাতে পারো গভীর চুমুক
এখানে আসে না যেন তৃতীয় অমুক।
(খাদ্যান্বেষণ, খৃষ্টপূর্ব ৪৫০৭)

জীবনের তুমুল আলোড়ন, কোলাহল, ইতিহাস আর ভূগোলের অবস্থান নিয়ে হুদার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি' (১৯৭৫)। এ গ্রন্থের নামের

মধ্যেই বিবেচ্য বিষয় সংকলিত হয়ে আছে। এ আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম, ইতিহাসের কালচেতনার মধ্যে হুদার অভিযাত্রা, রোমান্টিক মানসিকতার চেয়ে ক্লাসিক কাঠামোর দিকে তাঁর পক্ষপাতিত্ব; যে বিষয় এবং দার্শনিক বিষয়াদি তিনি রূপ দিতে তৎপর এ গ্রন্থে তার বিকাশ ঘটেছে। এ গ্রন্থে মুহম্মদ নূরুল হুদা যে দ্রাবিড়ার প্রতি নিবেদিত সে 'মিথুনের শেষ নামে শাড়িহীনা, বিবস্ত্র, আদিমা।' তাঁর নায়িকারা রক্ত মাংসের নারী, মাতৃতান্ত্রিক কৃষিপ্রধান সমাজের নারী– যারা শস্যবীজ রোপণ করেছে, ধারণ করেছে মানবজীবাণু। 'তোমার গ্রীবার ভাঁজে কুসমিত ঘাম/ শীত গ্রীষ্মে-অমায়-খরায়/ কাম হয়ে নেমে যায় বুকের ঢালুতে।'

তোমার কাহিনি জানি আমি
তুমি জানো আমাদের বংশের কাহিনি
শক-হুন, অর্থ কি দ্রাবিড়
কে কোথায় কোন পাড়ে সুখে দুঃখে বেঁধেছিল নীড়
সবুজ চরের মতো প্রণয়িনী আঁচালের কাছে
সমর্পিত কে সেই যুবক
(গৃহমুখী)

এ গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য কবিতা, 'শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি', এর তুল্য কবিতা আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন' সনেটগুচ্ছ, এ তুলনা অবয়ব কিংবা বিষয়ে নয়, কেবল এক জাতীয় কবিতার প্রকৃষ্ট বন্ধন বিবেচনায়। এ কবিতাটি মানুষ যে যাত্রা শুরু করেছিল সে যাত্রার অব্যহত মিছিল। সমগ্র মানবচেতনাকে ধারণের এক বিশাল প্রবণতা হুদার এ কাব্যে চিত্ররূপ পেয়েছে। 'দ্বিপ্রহরে' 'জীবন জীবন' স্বরে ফুঁসে ওঠে মানুষের দীঘল মিছিল।' এ মিছিল কখনো শেষ হবে না। 'তোমার পরিধি বাড়ে ক্ষুব্ধ হয় অন্তিম বিলয়।' এ ভাষা এবং চয়নের মধ্যে মহাকাব্যের বিষয়ের সাযুজ্য আছে।

তাছাড়া কবিতাগুলো গঠনের দিক থেকেও হুদার ব্যতিক্রম নির্মাণ : Fourteener এর eight and six meter-কে ভেঙে দিয়ে আট পঙ্‌ক্তিতে বিন্যাস করেছেন। এখানে একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

শ্বাসাঘাতে ত্রস্ত এই মুমূর্ষু রোগীর মতো বেঁচে আছি আজো
ইতস্তত ভেসে যাই কাঙ্ক্ষিত কমল ফুটে ওঠে প্লাবনের জল

তোমার তো নৌকা নেই, তোমার তো ভিন্নতর পরিত্রাণ নেই
গভীরে গভীরে থাকো কোনোদিন সমতলে ওঠেনি জলের
কে পাপিষ্ঠ প্রবঞ্চক রাত্রি দিনে আমাদের ঠকায় এমন
আমি তো ডুবতে চাই, ছুঁতে চাই, হে আমার মাটির শিকড়
আমাকে সাঁতারু করো কি উল্লাসে– ভেসে যাই স্রোতে ভেসে যাই
হে মৈনাক, শির তোলো তোমার শরীর জুড়ে পুনর্বার নিজেকে সাজাই।

'অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী' (১৯৮০) একটি কবিতা গ্রন্থ, এক থেকে পঞ্চাশটি এপিসোড– সবই অগ্নিময়ী মৃন্ময়ীকে নিয়ে কবির অভিযাত্রার কাহিনি। সৈয়দ শামসুল হকের 'বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা' একটি কবিতার গ্রন্থ। কিন্তু সেখানে কবি আত্মমগ্নতা এবং সমকাল নিমজ্জনে ক্লিষ্ট; অবশ্য হুদার কাব্য অন্য বিষয় অন্য ভাষা এবং ভাবে উপরিতল স্পর্শ করে হুদা কাব্য নির্মাণের কঠিন পথে অগ্রসর হননি :

মৌন-মুগ্ধ মন্যুমেন্ট, সঙ্গী তার একাকী তিমির
পাদমূলে রয়েছি দাঁড়িয়ে
ব্যাঘ্রাতুর দুবাহু বাড়িয়ে
কুড়োরে কি ইতস্তত খসে পড়ে প্রতীক্ষা অধীর?
সম্মুখে আনন্দ যাত্রা লক্ষ কোটি ফুল্ল পৃথিবীর।

'আমার তামাটে জাতি' (১৯৮১) আবহমান বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজ এবং কৃষকের কাহিনি। মাটি এবং মাটি সংলগ্নতা কাব্যের প্রধান সুর। ঘুমের ভেতর কবি শস্যপতনের শব্দ শোনেন। অনার্য সমাজের কাহিনি বর্ণনা করেন, যে অনার্য দ্রাবিড় আজ স্বাধীন বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীক। বাঙালির জন্মতিথি রক্তে লেখা ষোলো ডিসেম্বর। এ কাব্যে কবি শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ভাষাভঙ্গিতে শব্দ প্রয়োগ হয়ে উঠেছে জনমানুষ-সংলগ্ন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যের সঙ্গে এ গ্রন্থের শব্দ প্রয়োগের একটি মিল পাওয়া যায়। তবে নূরুল হুদার প্রায় সব কাব্যেই আদিমের প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই তুমুল রক্ত মাংসের মানবীয় পণ্যের সীমারেখা অতিক্রম করে চলেছে, কবি স্বদেশকে দেশমাতৃকা বলেছেন, জননী জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিন্তু এসব বর্ণনার সঙ্গে কেমন যেন হিতোপদেশ জড়িয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে নূরুল হুদার

এই কাব্যের 'মা' কবিতাটি দ্রষ্টব্য। নিয়তিতাড়িত ইডিপাস। 'নারী কি রমণীর অনাবশ্যক আবরণ নামিয়ে তার নগ্ন স্তনে মুখ রেখে মগ্ন স্বরে ডেকে উঠেছি মা'।

মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন হুদার কবিতার প্রধান প্রবণতা হলেও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে মগ্ন থাকেননি তিনি :

নাতাশা আমার বোন দূরে রাশিয়ায়
নাতাশা বাংলা শেখে নাতাশা বাংলা জানে
ভাটির দেশের গান নাতাশার প্রাণে
নাতাশা প্রভেদ বোঝে শালিকে টিয়ায়।
(নাতাশা)

আরেকটি ব্যতিক্রম ধরনের কাব্যগ্রন্থ মুহম্মদ নূরুল হুদার 'শুক্লা শকুন্তলা' (১৯৮৩)। এ ধরনের বিষয়ভিত্তিক সনেটগুচ্ছ যে বাংলা সাহিত্যে নেই তা নয়; এর বিশেষত্ব বিষয় বিনির্মাণ অর্থাৎ সাম্প্রতিক উপযোগিতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। আজকের কোনো কবি যখন শকুন্তলাকে কাব্যের বিষয় করে তোলেন, তখন তিনি পুরাণের ঘটনার সঙ্গে আজকের সম্পর্ক খুঁজে পান। মধুসূদন দত্ত 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' কবিতায় শকুন্তলার মানবিক হাহাকার বাঙালি রমণীর অবজ্ঞা বিরহ বেদনায় একাকার হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্ন' কবিতায় কালের উল্লেখ করেছেন, শিপ্রানদী পারে উজ্জয়িনীপুরে যে প্রিয়ার জন্য তার আকুতি সে প্রিয়া আজ অন্য ভাষায় কথা বলে :

সে ভাষা ভুলিয়া গেছি। নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহ পানে,
অঝোরে ঝরলি অশ্রু নিস্পন্দন নয়নে-

সংস্কৃত কবির বিরহী নায়িকা যখন বাংলা কবির হৃদয় দখল করেছে, তখন সে বেদনা কণ্ঠ মুনির আশ্রম দুহিতার বেদনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেই বেদনা আদিম দ্রাবিড়ার বেদনা, তামাটে নারী আর কৌমসমাজের বেদনা। এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে কালিদাসের শকুন্তলা একটি উপলক্ষ মাত্র। কবি সেই কাহিনির সূত্র ধরে আজকের মানুষ পর্যন্ত প্রলম্বিত করেছেন। উপসংহারের কবিতাটি এখানে উদ্ধার করছি :

শুক্লা এবার উঠি, কালিদাস আপনি থাকুন
আপনারা পাত্রপাত্রী অবশেষে সুখের দম্পতি

আমরা আরেক কালে, আমাদের নেই ভীমরতি
আমরা সুযোগ মতো হত্যা করি রমণীর ভ্রূণ।
দেবতার আশীর্বাদ আজকাল আমরা মানি না
আমরা প্রত্যেক আজ আমাদের কালের দেবতা
প্রেম এক প্রিয় পণ্য, যে কেউই হতে পারি ক্রেতা
বিরহের প্রাচীনতা আমরা তা জেনেও জানি না।
সময় খোদাই করি, গড়ে তুলি মুহূর্ত মিনার
ফাইফরমাস মতো সৃষ্টি করি পাথর প্রতিমা
আমরা পছন্দ করি মাপসিদ্ধ তনুর তনিমা
পাণ্ডুর অতীতলিপি আমাদের পরম ঘৃণার।
আপনি তো প্রিয় কবি, আমাদের প্রিয় কালিদাস;
ঐতিহ্য অমরাবতী; আমরা কি ঐতিহ্যের দাস?

যিসাস মুজিব (১৯৮৪) নূরুল হুদার সামগ্রিক বিশ্বাসের কবিতা; যে বিশ্বাস তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে বিভিন্নভাবে শব্দায়িত হয়েছে এ গ্রন্থে তার ব্যর্থতার কারণ বর্ণিত হয়েছে। আঙ্গিকের বিবেচনা এ আলোচনায় অনুপস্থিত রেখে নূরুল হুদার কবিতার বিষয়গত কোথাও দুটি দিকে ইঙ্গিত করছি। এই পোস্টমডার্নিজম, বিশ্বব্যাপী যে ধারণাটি, কোথাও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। এমনকি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও সম্প্রতি কেউ কেউ এই ধারণাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের যাঁরা এই কর্মটি একটি অবস্থানে নিয়ে যেতে আগ্রহী তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় ঐতিহ্য-পুরাণকে কাজে লাগাতে চাচ্ছেন। কিন্তু পোস্টমডার্নিজম ধারণা আদৌ তেমন নয়, শেকড়ের দিকে প্রত্যাবর্তন, কিন্তু সেই শেকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত? যদি তা ধর্মীয় সভ্যতা ছেড়ে আরো বহুদূরে এগুতে চায় আমরা কি তা রোধ করতে পারব? নরমান ব্রাউন থেকে এডওয়ার্ড সাইদ পর্যন্ত কেউই পোস্টমডার্নিজমকে কোনো সূত্রের মধ্যে বাঁধতে চাননি। তা হবে এমন, মানুষের নিজের, যেখান থেকে সে ফিরে এসেছে। কিংবা কেউ তাকে উৎপাটিত করেছে সে যেখানে ফিরে যাবে, এমনকি বুনো স্বভাবে আদিমের কাছে; আর ঔপনিবেশিকতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করা, তবে দৈশিক জাগরণের মধ্যে বিশ্বকে ধারণ করা– এই অরিয়েন্টালিজমও পোস্টমডার্নিজমের আরেকটি বিবেচনা। আমি যেভাবে নূরুল হুদার কবিতা পাঠ করেছি তাতে আমার মনে হয়েছে একজন কবি পুরোপুরি

বিষয়সচেতন না হয়েও এ ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। হুদার কবিতা কেবলই শেকড়ের দিকে অভিযাত্রা, কেবলই আর্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতা মোচনের হাতিয়ার। 'শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি', 'অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী' 'আমার তামাটে জাতি', 'শুক্লা শকুন্তলা' এসব তো তারই প্রমাণ। হুদার কাব্য-বিশ্বাস কোনো সংকীর্ণ মতাদর্শে আক্রান্ত নয়, জাতিসত্তার পরিচয়ের অহংকারে দীপ্ত। একই সঙ্গে হুদার কাব্য আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ এবং সেই আধ্যাত্মিকতার ধরনও বাউল লোকধর্মনির্ভর, কামগ্রন্থি!

ভালোবাসার মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হচ্ছে
চাষ হচ্ছে তিন একর জমিতে
ধানের রোয়ার মতো বেড়ে উঠছ তুমি
বেড়ে উঠছি তোমার উর্বর মনোভূমি
তার নিচে সোনা
এমন মানব জীবন রয়না পতিত
আবাদ করলে হয় না গোনাহ!
(চাষাবাদ : যিসাস মুজিব)

পরিশেষে বলা যায়, হুদা'র কবিতা অনেকাংশে সরল; আধুনিক জটিলতা যা এসেছে তা সরলতাকে আহ্বান করতে গিয়ে এসেছে। তাই জীবনানন্দীয় যে নগর জটিলতা-কখনো 'যেন আমাদের নিজের মনও নিজের নয়' কিংবা শামসুর রাহমানের মায়ের কাছে 'অচেনা ভদ্রলোকে'র যে মানসিক নির্মিতি, তার বিন্যাস ব্যতিরেকে এ আলোচনা সম্পন্ন করা গেলো।

সংযুক্তি : ৩টি কবিতা

ইথাকা

রৌদ্রনীল সরোবরে তারা কেউ মৎস্যজীবী নয়;
নদীমাতা স্বদেশ তাদের–
বিশাল জালের মতো সুনিপুণ হাতে বোনা
শিরাগ্রাফে
ঢাকা আছে তাদের শরীর;

ঝড়ের শকটে চড়ে জন্মাবধি কুড়িয়েছে তারা
জলের মন্দ্রিত ধ্বনি, বজ্র ও অশনি
যেন মাছ–
তাদের চোখের মতো স্বচ্ছ, নীল মাছ বুঝি
ধৃত হয় দেহে দেহে
বিশাল জালের মতো
সুনিপুণ হাতে বোনা লাল শিরাগ্রাফে;

তবু তারা মৎস্যজীবী নয়, কিংবা
অব্যর্থ ফাঁদের মতো জন্মলীন জাল ফেলে ফেলে
গভীর নদীতে
তারা কেউ কুড়াবে না রূপালী ইলিশ;
এখন সবাই
নিভৃত মাছের মতো শব্দহীন কানকো বাড়িয়ে
কাটছে সাঁতার
উৎসবের উৎসমূলে যাবে বলে ফুলিয়েছে
প্রত্যয়ের ফানা, সুদৃঢ়;
সম্রাটের অভিষেক আজ,
সম্রাট আসীন হবে লতাগুল্ম-সূর্যমুখী–
ধানশীষে সুশোভিত তমাল আসনে
কেননা সিংহাসন নামক শব্দ
প্রচলিত নয় কভু তাদের স্বদেশে
সুপ্রভাতে সম্রাটের তরী
ভিড়বে বন্দরে; যুদ্ধজয়ী যেন য়ুলিসিস;
দুইটি দশক তার কেটে গেছে শ্রমে,

রক্তে-দূরে, দূর দ্বীপে–
জন্মদ্বীপে স্ত্রী তার বারবার নিয়তিকে খোলে আর বোনে
টেলেমেকাস অশ্রুহত,
শোকের মিনার।
চুপ আজ হে ইথাকা দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো,

দুঃখিনী দ্বীপের মতো সূর্যেরও টলমল চোখে
ভেসে ওঠে সম্রাটের তরী;

দ্যাখো,
মাস্তুলের মতো ঋজু সম্রাটের সুবর্ণ শরীর
অটল, অনড়; দ্যাখো,
স্বজন হারানো শাকে ভারী হলে জীবনের মতো
অশ্রু জমে সম্রাটের চোখে;

সম্রাটের চোখে অশ্রু;
সেই অশ্রু নেমে আসে
জনপদে
শহরে নগরে–
ক্রমে ক্রমে রাজপথ খরস্রোতা নদী হয়ে যায়
অশ্রুর বন্যায় ডোবে বিষণ্ন ইথাকা;

মৎস্যজীবী নয় তারা কেউ, তবু মুহূর্তেই
একদাড় ছিপ হয়ে তীরবেগে ছুটে চলে তারা প্রত্যেকেই
বিশাল জনতা নামে আশ্চর্য বাজিতে;
সম্রাটের খরস্রোতা অশ্রুনদী বেয়ে
তারা আজ যাবে তার বুকের গভীরে
অক্ষত নক্ষত্র হয়ে
যেখানে এখনো জ্বলে
তরুণ বৃক্ষের সারি,
শ্যামল স্বজন আর সবুজ ইথাকা।

যিসাস মুজিব

হতে পারতে আইখম্যান, খুনীর কাহিনি
হতে পারতে মৃত্যুদণ্ডে খাস সহি-দাতা
অথচ তোমার বুকে জেগেছিলো
এ কেমন আশ্চর্য ধমনী!

নিস্পাপ বাঙালি রক্তে যে গাদ্দার খেলেছিলো হোলি
শক্তিমদমত্ত সেই সহিংস অশনি
তোমার বিশাল বুকে তারো জন্যে ছিল কিছু ক্ষমা
গুড়িয়ে দাওনি, পিতা সেই খল নায়কের খুলি।

সে-সুবাদে সেই ভণ্ড পুরোহিত প্রাণি
আঁধারের সঙ্গী হয়ে পাঠ করে প্রতিহিংসা-রায়
হাত দুটো প্রসারিত, পিতা, তুমি চূড়ান্ত কোরবানী
তোমার বঙ্গজ রক্তে সন্তানের পাপ ঘুচে যায়।

ফুরাবে না গঙ্গাধারা, ফুরাবে না বঙ্গভাষী কবিদের নিব
ফুরাবে না এই রক্ত, পিতা, তুমি যিসাস মুজিব।

অনন্ত মুজিব জন্ম

মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি জন্ম নাও তোমার ভিতর,
মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি জন্ম নাও আমার ভিতর;
মুহূর্তে অনন্ত জন্ম, এই মাটি আমার বাসর;
বাঙালি মুজিবজাতি, চিরবাংলা মুজিবের ঘর।

কে বলে তোমার জন্ম এই বঙ্গে শুধু শতবর্ষ আগে?
কে বলে তোমার জন্ম থেমে গেছে ঘাতক মৃত্যুতে?
তুমি আছো স্বর্গে-মর্তে উদয়াস্ত অভ্র অনুরাগে,
পলে পলে পল্লবিত, সর্বভূতে, সব ফলন্ত ঋতুতে।

জলেস্থলে অন্তরীক্ষে যে-মুহূর্তে বিশ্ব-মন-মাটি
ত্রিভুবন ঘুরে এসে মিশে গেছো খড়ো বঙ্গনীড়ে,
গণবাঙালির সেই স্বর্গাদপি আদিমাটি, পরিপাটি,
ধারণ করেছে এক বিশ্ব-ভ্রূণ, এই মধু-গঙ্গা তীরে;

অনন্তর অন্তরঙ্গে বাঙালির স্বাধীনতা, সাম্য, সদাচার;
সর্ব-অঙ্গে সর্বপ্রাণে বাঙালি, মানুষ আর প্রাণি একাকার;
প্রমিত স্বরূপ তার প্রমূর্ত বিমূর্ততার, সর্বমানবিকতার;
মানুষ, বাঙালি আর জাতিমৈত্রী : উৎসে শুধু শুদ্ধাচার।

অনন্তর জাতিবাঙালির বুকে মানবিক জনক উদগ্রীব,
অনন্তর অনন্তজন্মের বুকে নৈয়ায়িক জনক মুজিব।

বাঙালির বঙ্গবন্ধু

"আমার উপর ভার দেওয়া হল ইসলামিয়া কলেজে থাকতে। শুধু সকাল সাতটায় আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করতে। আমি ও নূরুদ্দিন সাইকেলে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হলাম। পতাকা উত্তোলন করলাম। কেউই আমাদের বাধা দিল না। আমরা চলে আসার পরে পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল শুনেছিলাম। আমরা কলেজ স্ট্রিট থেকে বউবাজার হয়ে আবার ইসলামিয়া কলেজে ফিরে এলাম। কলেজের দরজা ও হল খুলে দিলাম। আর যদি আধা ঘণ্টা দেরি করে আমরা বউবাজার হয়ে আসতাম তবে আমার ও নূরুদ্দিনের লাশও আর কেউ খুঁজে পেত না।" – (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

স্বীকারোক্তির মতো শোনাতে পারে, তবু বলি- ছোট্ট একটি বই, খুব ছোট্ট, ক্রাউন সাইজের মাত্র চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা, বার পৃষ্ঠা ইনার ও টিকা টিপ্পনি, এখানে হাজার ছয়েক শব্দের বেশি হবে না, হঠাৎ করেই হাতে এলো। অনেকবার নেড়ে চেড়ে দেখলাম, ছোট বলেই সম্ভব হলো, হাতের পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যে এঁটে যায়। বই বলতে যা বোঝায় এটি ঠিক তা নয়, এটি একটি প্রবন্ধ, সেমিনার প্রবন্ধ। একটি নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধ দিয়েই যে এত সুন্দর মনোগ্রাহী বই উপস্থাপন সম্ভব সেটিই আমার মূল বক্তব্য। কারণ এই বইটি আমাকে বঙ্গবন্ধুর উপরে বর্তমান বইটি প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে। বইটি হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, বই হওয়ার জন্য আসলে পরিমাণ নির্ভর করে না, গুণ ও সিদ্ধান্ত। ভাবলাম, আমারও তো কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে বঙ্গবন্ধুর সাহিত্য সংশ্লিষ্টতা নিয়ে লেখা। এগুলো একত্রে করলে একটি বই হওয়া সম্ভব, তখনই সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা। সুতরাং তার লেখা 'বাঙালির বঙ্গবন্ধু'র কাছে আমি ঋণী, তাঁর বইটি যথাসময়ে হাতে না আসলে আমার এই বই প্রকাশ হতো কিনা যথেষ্ট সন্দিহান। সেই সঙ্গে বইটি'র প্রকাশক জার্নিম্যান বুকসকেও কৃতিত্ব দিতে হয়। বইটির কাছে যেহেতু আমি এতটা ঋণী সেহেতু বইটি নিয়ে একটি আলোচনা দাবি

রাখে। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুকে কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা শুরু থেকে বুকে ধারণ করে আছেন কবি কামাল চৌধুরী তাদের অন্যতম প্রধান। এবার বইটির প্রকাশের ভূমিকা নিয়ে লেখকের মন্তব্য শুনে আসি-

"বাংলা একাডেমির আমন্ত্রণে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে ২০১৭ সালের ১২ আগস্ট তারিখে 'বাঙালির বঙ্গবন্ধু' বিষয়ে আমি একক বক্তৃতা প্রদান করি। বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে সভাপতি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। বক্তৃতা প্রদানের পূর্বে এর একটি লিখিত ভাষ্য প্রস্তুত করি। আন্দোলন সংগ্রাম, আত্মত্যাগের মহাপথযাত্রায় বঙ্গবন্ধু কীভাবে ব্যক্তি থেকে নেতা হলেন, নেতা থেকে বঙ্গবন্ধু- বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা ও বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের স্থপতি হিসাবে আবির্ভূত হলেন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণই ছিল আমার বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য। এ বক্তৃতা পরবর্তীতে বাংলা একাডেমির সাহিত্য পত্রিকা উত্তরাধিকার-এ প্রকাশিত হয় ।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা একাডেমির প্রতি, আমাকে একক বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। কৃতজ্ঞতা জানাই জার্নিম্যান বুক্স-এর কর্ণধার বিশিষ্ট কবি তারিক সুজাতকে; মূলত তাঁর আগ্রহেই এ প্রকাশনা। এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ নবপ্রজন্মের অনুসন্ধিৎসু পাঠককে বঙ্গবন্ধু বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনায় যদি উৎসাহী করে তাহলেই আমার আনন্দ।" সত্যিই কবি কামাল চৌধুরীর প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে, এই গ্রন্থকারের বর্তমান কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছে মূলত তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। সেদিক দিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

এবার তাঁর এই গবেষণা পত্রটি নিয়ে সারসংক্ষেপ কিছু আলোচনা করি। তার বিষয় এবং প্রকাশ শৈলীর যথার্থতা প্রমাণিত। তিনি মূলত তাঁর এই রচনায় দেখাতে চেয়েছেন, ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের বাঙালি কিভাবে বঙ্গবন্ধুর মধ্য দিয়ে একটি জাতি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করল। জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বাঙালি এর আগে যে সব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে সেগুলো পুরুপুরি কার্যকরি হয়নি, তার কারণ সেই সব প্রকল্পের মাধ্যমে বহু মত ও পথের মানুষকে একত্রে বসানো বেশ দুষ্কর ছিল।

কামাল চৌধুরীর বর্তমান বইটি যেহেতু একটা সেমিনার প্রবন্ধ সেহেতু এর আলাদা কোনো উপ শিরোনাম নেই। তিনি এই প্রবন্ধটিকে ৭টি উপ বিভাগে

আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশ তিনি দেখাতে চেয়েছেন, বাঙালি জাতি হওয়ার ক্ষেত্রে বিশ শতকের সূচনা লগ্নে একটি সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছিল। এই সময়ে যে সব বাঙালি মহা-মানবের আবির্ভাব হয়েছিল, তারাও বিষয় বুঝতে পেরেছিলেন; তাদের মধ্যেও ছিল এই অপূর্ণতা পূরণের সম্ভাবনা। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মতো এক বিপুল প্রতিভা- যিনি উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে তাঁর প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে আসছিলেন- সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাঙালি চিন্তার সুসংবদ্ধতার ক্ষেত্রে তিনি প্রায় ত্রাতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে এবং জীবনাবসানেও তিনি পরাধীনতা দেখে গেছেন। পরাধীন দেশে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার জন্ম হতে পারে; কিন্তু পরাধীন দেশে শ্রেষ্ঠ জাতির অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্বীকৃতি পাওয়া গেলেও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব তার জন্য অবাধ নয়। তাছাড়া তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও ছিলেন না। আমরা জানি রাজনীতি সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখব, পৃথিবীতে যাদের আমরা জাতি বলে চিহ্নিত করেছি তাদের এই পর্ব আগেই সমাপন হয়েছে। হয়তো রবীন্দ্রনাথও সেটি বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি একজন মহামানবের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যার কর্মধারায় এই জাতি দিশা খুঁজে পাবে, নব জীবনের সঞ্চার হবে, 'জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয় হবে।'

'সকল জাতিই বীরের প্রত্যাশা করে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর *শেষ লেখা* কবিতাগ্রন্থের এই কবিতায় একজন মহামানবের আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখেছেন। বঙ্গবন্ধু কি রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত সেই মহামানব? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আবির্ভূত হয়েছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা হিসাবে, বাঙালির বীর হিসাবে, ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি হিসেবে– এ নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। (পৃষ্ঠা - ১০)

বিশ শতকের আরেকজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি সারাজীবন একটি স্বাধীন জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সমগ্র প্রতিভা লেখনিতে ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, পরাধীন দেশে বাঙালির কোনো মুক্তি নেই। তিনি অখণ্ড বাংলার পক্ষে ছিলেন, পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি কখনো সমর্থন করেননি। কিন্তু একটি জাতির সর্বময় কাণ্ডারী হিসাবে তিনি আবির্ভূত হতে পারেননি।

বিশ শতকের আরেকজন বাঙালি তাঁর মধ্যে সেই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, যিনি একটি জাতির নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। নিজেকে সামগ্রিকভাবে ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন, তার মতো সম্পূর্ণ বাঙালি রাজনীতির ক্ষেত্রে এর আগে দেখা যায়নি। শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দীর চিত্তরঞ্জনের মতো বড় নেতাদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বসু এ ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছিলেন। কবি কামাল চৌধুরীর বইতেও এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনা থেকে– 'এই উপমহাদেশের আরেক বিখ্যাত বাঙালি সুভাষচন্দ্র বসু সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলেন। ভারতবাসীকে আহ্বান করেছিলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। নেতাজীর এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য ভারত তখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি– অনেক বিপ্লবী আন্দোলন হয়েছে, স্বদেশি আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু সর্বস্তরের জনসম্পৃক্ততার অভাবে সফল হয়নি সেসব আন্দোলন।'

এই পর্বে তিনি বাঙালি নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি বিশ্লেষণ করেছেন। কিভাবে বাঙালি জাতির আগমন। তাদের সংস্কৃতি ও খাদ্যাভাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। মাথার খুলি ও চোয়ালের গঠন নিয়েও আলোচনা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র কামাল চৌধুরীর গবেষণা প্রণালীর মধ্যেও এটি দারুণভাবে খাপ খেয়েছে। সেই সঙ্গে বাঙালির ভাষা নিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। আর এসবের সমর্থনে তিনি মান্য নৃতাত্ত্বিক ও ভাষা তাত্ত্বিকদের মহামতের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে নীহাররঞ্জন রায়, অতুল সুর বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি। বাঙালির মাছে ভাতের সঙ্গেও তার নৃতাত্ত্বি সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক সংশ্লেষ রয়েছে।

"নীহাররঞ্জন রায় বাঙালিকে শংকর জন (People অর্থে) বলে উল্লেখ করেছেন। ড. অতুল সুর বাঙালিকে বলেছেন মিশ্র জাতি। তিনি লিখেছেন, "বাঙালীকে মিশ্র জাতি বলা হয়। এ সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে অধুনা লুপ্তপ্রায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ ব্যতীত, জগতে এমন কোনা জাতি নাই, যারা মিশ্র জাতি নয়। অন্তত নৃতত্ত্ববিদগণের কাছে এমন কোনো জাতির নাম জানা নাই যারা বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে। তার মানে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা যেমন মিশ্র জাতি, বাঙালীও তাই।"(পৃষ্ঠা - ১৩)

তিনি উল্লেখ করেন- "নীহাররঞ্জন রায় পাল রাজাদের বাঙালি বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ভিন্নমতও আছে। পাল রাজাদের শাসন স্থায়ী হয় চারশ বছর। তাদের শাসনামলে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও সূচনা হয়। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। অতীশ দীপঙ্কর (৯৮০-১০৫৩ খ্রি.) এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি পণ্ডিত। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে ভুসুকুপাদ, লুইপাদসহ অনেকেই ছিলেন বাঙালি। চর্যাপদে বাঙালি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।" (পৃষ্ঠা - ১৫)

আবার "ড. অতুল সুর লিখেছেন, "প্রথমে 'বঙ্গ' শব্দটি ছিল একটি কৌম গোষ্ঠীর নাম। কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসাবে 'বঙ্গ' নামের সঙ্গে বৈদিক যুগের আর্যরাও পরিচিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা বঙ্গের নাম প্রথম পাই।"

ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমারের মতও এসেছে– সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "ভাষা না হলে Nation বা জাতি হতো না। তিনি বলেছেন, "বাঙালি বলিলে যে জনসমষ্টি বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বা ঘরোয়া ভাষারূপে ব্যবহার করে সে জনসমষ্টিকে বুঝি। সুকুমার সেন বলেছেন, "ভাষা নিয়ে জাতি, জাতি নিয়ে দেশ। বাংলা ভাষার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতির ইতিহাস শুরু।" (পৃষ্ঠা - ১৬)

বাঙালির সংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান তাঁর ভাষা। ভাষা ছাড়া বাঙালি নেই, যতই গঠনতন্ত্রে তার বাঙালির আদি পুরুষের সঙ্গে মিল থাক। তিনি এখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে হাজির করেছে। "ভাষাই বাঙালির ভরসা।" তিনি বলেছেন "জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষা ও একতা (বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮১)।" প্রথম চৌধুরী বলেছেন, "বাঙালি বাঙালি মাত্রের স্বজন, তার কারণ ভাষার যোগ হচ্ছে মানস-কায়ে রক্তের যোগ।" বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। ভাষার ঐক্যই শেষাবধি ঐক্যসূত্র হিসাবে কাজ করেছে।"

সুনীতিকুমার ভাষা কেন্দ্রিক বাঙালির যে সাল তামামি করেছেন, ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তার চেয়ে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। ড, সুনীতি কুমারের মতে বাংলা ভাষার চর্যাকালের রূপটি নিয়েছিল "৯০০ থেকে ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ দশম শতকে মাগধী অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছিল কোমল-মধুর-বিদ্রোহী বাংলা ভাষা। সে হিসাবে বাংলা ভাষার বয়স এক হাজার বছরের বেশি।" এবং তাঁর মতে মাগধি প্রাকৃত থেকে বাংলার উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেব মনে করেন, আরো চার পাঁচশ বছর আগে থেকেই বাংলা

তার রূপ পরিগ্রহ করেছিল; এবং ভাষাটি জন্ম নিয়েছিল গৌড়ি প্রকৃত থেকে। তার যুক্তির অকাট্যতা এই যে গৌড়িয় অঞ্চলের জনগণই তাদের ভাষার জন্ম দিয়েছিল। বহিরাগত উৎস থেকে এই ভাষার উৎপত্তি হয়নি। এই উৎপত্তি আর ব্যুৎপত্তি যা-ই হোক, স্বাধীন সুলতানি আমলে বাঙালি জাতি হিসাবে তৈরি হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখে দিয়েছিল। 'ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ, ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' রূপে উল্লেখ করেছেন।"

"বাঙালি কবিরা তাঁর প্রভূত প্রশস্তি করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে কবিদের কবিতায়, যেমন বিদ্যাপতির কবিতায়– তিনি গৌড়েশ্বর নামে বা পঞ্চ-গৌড়ের অধিপতি নামে বর্ণিত। দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে বাংলা, বঙ্গ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হলেও বৃহত্তর বঙ্গ বা অখণ্ড বঙ্গের ধারণা এসেছে আরও পরে। গোলাম মুরশিদ লিখেছেন অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই লিখিত বাংলায় বৃহত্তর বঙ্গদেশ অর্থে 'বাঙ্গালা' শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।"

ইলিয়াস শাহিদের কারণে বাংলাভাষা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। বাঙালি ভাষা কেন্দ্রিক জাতি হিসাবে সংগঠিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু তার মানে এই নয়, এ জাতি তাঁর অভিযাত্রা শেষ করেছিল। এর পরেও একই সঙ্গে যেমন তারা শত শত বছর দিল্লি ও ব্রিটিশের অধীনে ছিল, আবার বাঙালির মধ্যে ভাষা কেন্দ্রিক সমুন্বতির চেয়ে ধর্ম বর্ণ গোত্র কেন্দ্রিক মর্যাদা ও বিভক্তির বিষয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল। তাই ব্রিটিশ লর্ড কার্জন ধর্মের ভিত্তিতে ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করে দেয়ার সুযোগ পাই। শ্রেণিগত স্বার্থে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি সে বিভাজন ঠেকিয়ে দিতে পারলেও ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাগে তার ভূমিকা রাখে। এই দুটি ঘটনাই ঘটে ধর্মের ভিত্তিতে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, সাতচল্লিশের পরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ বাংলার সপক্ষে। এবং আশ্চর্য বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান এই সত্যটি তাঁর নেতৃত্বে মেনে নেয়। এটি আর কখনো হয়নি যে, বাঙালি বঙ্গবন্ধুর স্বাধিকার আন্দোলনের আগে কিংবা সেই সময়ে আর কাউকে সম্পূর্ণ বাঙালি হিসাবে আস্থায় এনেছে। এমনকি যে সংখ্যালঘুদের কাজ থেকে দেশ বিভাগের চাপ থাকা তারাই বঙ্গবন্ধুকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছে। এখানেই বাঙালি জাতির ভাষা কেন্দ্রিক অভিযাত্রার চূড়ান্ত রূপ নির্ণিত হয়। এর আগে বাংলা বাঙালি ছিল, কিন্তু বাঙালির নিজের বলে স্বাধীনতা ছিল না। লেখক তপন রায় চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। "উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত বাঙালি নতুন আত্মপরিচয়

আবিষ্কার করল। তার আগে আত্মপরিচয় মানে ছিল জাতি, বংশ, গ্রাম শনাক্ত করা। বাঙালি শব্দটা আইন-ই-আকবরীতে আছে। ভারতচন্দ্র মানসিংহের ঘোষণায় "ত্রিপুর, মঘ, বংগালী'র উল্লেখ ছিল লিখেছেন। চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে বর্ষার শেষে চৈতন্যভক্তরা নীলাচল আসা উপলক্ষ্যে উড়িষ্যাবাসীরা বলতেন, গৌড়িয়ারা আসছে।" তাহলে অধ্যাপক সালাহ্উদ্দীন আহমেদ লিখেছেন, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো তিনি আমাদের বাঙালি জাতিসত্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।" (পৃষ্ঠা - ২৫)

বাঙালির বঙ্গবন্ধুর আবির্ভাবের আগে এই বিভক্তিকে দূর করতে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল উভয় সর্বাত্মক কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'রাখীসংগীতে' বলেছেন:

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান–
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান–
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান–
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান! (পৃষ্ঠা - ২২, ২৩)

লেখক 'জয়বাংলা' শব্দটি কিভাবে এলো সেটিও উল্লেখ করেছেন- "মাদারীপুরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের কারামুক্তি উপলক্ষে 'পূর্ণ-অভিনন্দন' গানে নজরুল 'জয় বাঙলা' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছিলেন।" এবার কামাল চৌধুরীর 'বাঙালির বঙ্গবন্ধু' বইতে থেকে সরাসরি আরো কয়েকটি চরণ উদ্ধার করি।

"১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন দুজন বিখ্যাত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী ও সন্তোষ কুমার ঘোষ। সৈয়দ মুজতবা আলীর পর্যবেক্ষণ ছিল যে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু এতে উপমহাদেশের যে সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বিভাজন তার সমাধান হয়নি। এরকম একটি পরিস্থিতিতে বাঙালির একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুজিব নেতৃত্বের এ অভ্যুদয়কে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় বিস্ময় বলেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তি কি কেবল ভূগোল আর ভাষা– বঙ্গবন্ধু মৃদু হেসে বলেছিলেন, না, কেবল ভূগোল বা ভাষা হলে তা আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার-উড়িষ্যার অংশবিশেষ দাবি করতাম– আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সকল ধর্মের সকল বর্ণের মানুষের হাজার বছরের মিলিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি।"

(পৃষ্ঠা - ৩১+৩১)

১৯৭৩ সালে লিখিত বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত নোট থেকে তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন। "একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।"

(পৃষ্ঠা - ৩৩)

বইয়ের শেষপ্রান্তে এসে লেখক বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি কিছুটা ইংগিত করেছেন। সব শেষে তিনি কবি শামসুর রাহমানের 'ইলেকট্রার গান' কবিতার কয়েকটি পঙক্তি দিয়ে শেষ করছেন।

যতদিন আমি এই পৃথিবীতে প্রত্যহ ভোরে
মেলবো দু'চোখ, দেখবো নিয়ত রৌদ্র-ছায়ার খেলা,
যতদিন পটাবো বাতাসের চুমো দেখবো তরুণ
হরিণের লাফ, ততদিন আমি লালন করবো শোক।

২.

এবার বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কামাল চৌধুরীর কিছু কবিতা নিয়ে বলি। কামাল চৌধুরীই প্রথম প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন বলে ভয়েস অব আমেরিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন-

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যার পর সেই কঠিন সময়ে, প্রকাশ্যে শোক প্রকাশ করা ছিল মৃত্যুর সামিল। তারপরও প্রতিবাদ হয়েছে। কবিরা এই প্রতিবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯৭৭ সালের কথা। আমি তখন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। বিশ বছর বয়েস- এখন যখন পেছনে ফিরি , সেই দিনগুলির কথা মনে করি, গৌরববোধ করি এ জন্য যে সেই কঠিন সময়ে সাহস দেখাতে পেরেছিলাম।

সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন প্রকাশ করতো 'জয়ধ্বনি' পত্রিকা। 'জয়ধ্বনি'র ১৯৭৭ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশি) 'জাতীয়তাময় জন্মমৃত্যু' নামে আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। লাইনগুলো ছিল এরকম :

রক্ত দেখে পালিয়ে গেলে
বক্ষপুরে ভয়
ভাবলে না কার রক্ত এটা
স্মৃতিগন্ধময়
দেখলে না কার জন্মমৃত্যু
জাতীয়তাময়।

এই কবিতার লাইন দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের দেওয়ালে পোস্টার সাঁটা হয়েছিলো তখন।

বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা সমকাল প্রকাশিত হতো, ৭, ডি আই টি এভেন্যু, মতিঝিল, ঢাকা-২ থেকে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত মাসিক সমকাল পত্রিকার বিজয় দিবস সংখ্যা ১৩৮৫ তে কবিতাটিকে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে প্রথম প্রকাশিত কবিতা বলে উল্লেখ করা হয়। তাতে আমাকে পচাঁত্তর পরবর্তী বাংলা কবিতার সোচ্চার উচ্চারণের ভোরের পাখি আখ্যা দেওয়া হয়।

পরের মাসে, ১৯৭৭ সালের ২৬শে মার্চ আদমজী জুট মিলের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবিতা পড়ি।...

ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে ১৯৭৬ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। সে সময়ের বাংলাদেশ ছিল এক আতংকিত জনপদ। বঙ্গবন্ধুর এই মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জমা হয়েছিলো হৃদয়ে। কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না এই হত্যাকাণ্ড। বুকের ভেতর তীব্র

প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিলো, প্রতিবাদী হয়ে উঠছিলো মন। কিন্তু সময় প্রতিকূল-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘাতকরা তৎপর, ছাত্রদের মধ্যেও তারা পেটোয়া বাহিনি তৈরি করেছে প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে।

১৯৭৭ সালের শেষদিকের ঘটনা। তারিখটা আজ আর মনে নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাশে তখন কয়েকটি চায়ের দোকান ছিলো। শরিফ মিয়ার স্টলে ষাটের দশকের কবিরা আড্ডা দিতেন। তার পাশেই ছিলো গফুর মিয়ার দোকান। আমরা সত্তরের দশকের তরুণ কবি-লেখকেরা গফুর মিয়ার দোকানে আড্ডা দিতে শুরু করলাম। এখানে বসেই আমি– "মুজিব লোকান্তরে/মুজিব বাংলার ঘরে ঘরে" শ্লোগানটি লিখলাম ।"

সম্প্রতি প্রকাশিত কামাল চৌধুরীর 'স্তব্ধতা যারা শিখে গেছে' কব্যা গ্রন্থ নিয়ে 'দৈনিক সমকালে' আহমাদ শামীমের মূল্যায়ন তুলে ধরছি। এই গ্রন্থের কবিতাগুলোতে তাঁর ব্যক্তিগত শোক, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড জাতীয় শোক মিলে একাকার হয়ে আছে। "গ্রন্থের কবিতাগুলোকে যদি চরিত্রায়ণের চেষ্টা করা হয়, তবে বেশ কয়েকটি চরিত্রের দেখা মেলে। করোনা, মহামারি, বঙ্গবন্ধু, প্রেম-অপ্রেম এবং জীবনবোধ- এই কটি চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় শব্দের মেলবন্ধনে গড়ে তুলেছেন কবির নিজস্ব কাব্যভুবন।

করোনা মহামারিময় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীর কথা, মহামারিতে হারিয়ে যাওয়া মানুষ এবং আপনজনের কথা ঘুরেফিরে এসেছে কাব্যগ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতায়–

'শোক পালন করতে করতে পুকুর পাড়ের বাঁশঝাড় নড়ে ওঠেনি কারও জন্য/একটা পাতা খসে পড়েনি সপ্রাণ আকুলতায়/তবু কেন অশ্রু হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী!' ...'যারা চলে গেছে তাদের তোমরা মৃত বলো না/আমার ভাইকে তোমরা মৃত বলো না/সে মৃত নয়, সে শহীদ/প্রতিটি শতাব্দীর মহামারিকালে শোক মিছিলের পতাকা হাতে/তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি'- কবিতা 'মোহসীন, ভাই আমার'।

দেখো দেখো, তুমি বাইরে তাকাও/কী হাল তোমার বিশ্ব/এত মেরু, এত ক্ষমতা, দম্ভ/এক ভাইরাসে নিঃস্ব!/... তোমার পৃথিবী চিনতে পারো না/ মৃতের মিছিল বাড়ছে/ধনীও জানে না, গরীবও জানে না/কার শত্রুরা আসছে!'- কবিতা 'তোমার পৃথিবী চিনতে পারো না'।

'শতবর্ষে তোমার জন্মদিনে', 'কোটি মানুষের অনুভবে', 'আবার দেখা হবে' কবিতাগুলোয় বাঙালি জাতির মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞ জ্ঞাপন করেছেন বিনম্র শ্রদ্ধায়। কামাল চৌধুরী রঙিন শব্দমালায় বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষ আর প্রকৃতির মাঝে একাকার যেন হয়ে যান–

'মানুষ আসছে, মিছিল আসছে পেছনে/মানুষ আসছে, মুজিবের ডাকে আসছে/স্বাধীনতা চাই, প্রতিরোধ গড়ে ঐক্য/ তুমি জাগরণ, তুমি স্বজাতির ববন্ধু।'-কবিতা 'কোটি মানুষের অনুভবে'।

আবার দেখা হবে রেসকোর্স মাঠে/ স্কুলপড়ুয়া বালকের রাগী বিকেলের রোদে/জনস্রোতে, লক্ষ লক্ষ মানুষের চিৎকারে, স্লোগানে/ ইতিহাস বদলে দেওয়া তর্জনীর পাশে/অপরাহ্নের রক্তপলাশে/প্রতিটি প্রদীপ্ত উচ্চারণে/ প্রতিটি মুক্তির শব্দে, স্বাধীনতায়।'- কবিতা 'আবার দেখা হবে'।

বাংলা ও বাঙালি জীবন কবির কবিতার এক অনালোচিত চরিত্র যেন। কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় বাংলার প্রকৃতি, মানুষ এবং বাঙালিত্ব শব্দ আর চিত্রকল্পের মাধুরীতে রঙিন হয়ে ওঠে। 'বাঙালি জীবন' কবিতার কয়েকটি লাইন উল্লেখ করলেই তা সূর্যালোকের মতোই প্রতীয়মান হয় পাঠকের মনে- 'তবুও আমার ভাষা, জল এবং তৃষ্ণা ভাগাভাগি/এই নিয়ে মানচিত্র, এই নিয়ে আমি বিশ্বায়ন/আমিও ভাতের বন্ধু; হাত ধরো বাঙালি জীবন'।

কবির হৃদয়ডাঙায় কেউ একজন বসত করে, তাকে চেনা যায় না, ধরা যায় না, তার সান্নিধ্য পাওয়া যায় না; কে সেই মানুষ যার খোঁজ পেতে কবি কবি কালো হরফের বর্ণ কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায় গেঁথে চলেন সকাল থেকে সন্ধ্যা-রাত। 'আমি যে তোমার ঘোরো, মৌতাতে আছি/খুব ভোরে আমি মহুয়া পাতার শিসে/ভাবি প্রতিদিন, পাখি হয়ে যাবো ঘ্রাণে/ রঙধনু আর পালকের ওমে মিশে'- কবিতা 'তোমাকে চিনতে চাই।"

কবি কামাল চৌধুরী 'আমরা ব-দ্বীপের লোক/ আমরা ভাত ও মাছের স্বপ্নে বেঁচে থাকি/ আমরা মুজিবের লোক'; (বিজয় দিবস)। বঙ্গবন্ধুর মুখ কবিতার বড়ো ছিল কেননা, সেই মুখখানি স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল, সেই মুখখানি মিছিলে মানব হতো, শিশিরের কাছে পদচিহ্নের মতো সেই মুখখানি ফিরে ফিরে আসে (সেই মুখখানি কবিতার বড়ো ছিল)।

পৃথিবীর ঘাসজুড়ে তাঁর সেই বজ্রকণ্ঠ জেগে থাকে (একজন প্রেমিকের কথা)। তাঁর বজ্রকণ্ঠ কবিকে শিখিয়েছে যৌবনের গান (তোর জন্য নাম)।

তিনি তাঁর 'মার্চ' কবিতায় লিখেছেন- মার্চ এসে গেছে শেখ মুজিবের নামে/ মার্চের ভাষা সাহসের তর্জনী/ জনসমুদ্রে স্বাধীনতা স্বাধীনতা/ আকাশে বাতাসে জয়বাংলার ধ্বনি... এই মার্চ মানে মুক্তি ও স্বাধীনতা/ এই মার্চ মানে বাঙালির জয়গান/ স্বদেশ আমার, সাহসে ও সংগ্রামে/ আমরা সবাই মার্চের সন্তান।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর; দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে পাক হানাদার বাহিনির আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ মুক্তি লাভ করে। কবি তাঁর 'নিয়াজি যখন আত্মসমর্পণ লিখছে' কবিতায় লিখেছেন- 'এই দৃশ্য বজ্রকণ্ঠ, মুজিবের সাহসী তর্জনী/ এই দৃশ্য চির উন্নত মম শির'। কিন্তু যার নামে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ যুদ্ধ করেছে, যার তর্জনী স্ফুলিঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়ে পুরো বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল; তিনি তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। অবশেষে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি; বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীন স্বদেশে ফিরে আসেন; কিশোর কামাল চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন রেসকোর্স ময়দানের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে; যখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'দ্যাখো, আমি মরি নাই। তোমাদের ভালোবাসা আজ আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।' সেদিনের স্মৃতি নিয়ে কবি লিখেছেন-

যেদিন তিনি ফিরে আসলেন, সেদিন
শীতার্ত আলো হাওয়ার মধ্যে ঋতু বদল হলো স্বদেশের
ঝরাপাতায় জেগে উঠলো বসন্ত
.....
তখন সারা বাংলায় অপেক্ষায় অধীর মানুষ
প্রতিটি হৃদয় স্পন্দিত বজ্রকণ্ঠে
পিতার জন্য করছে সন্তান
বঙ্গবন্ধুর জন্য ভাই
নেতার জন্য মুগ্ধ অনুসারী
জনকের জন্য আবহমান এক দেশ। (১০ই জানুয়ারি ১৯৭২)

'বত্রিশ নম্বর সড়কের বাড়ি' কবিতায় লিখেছেন- 'এই বাড়িটার জাতির পিতার, এই বাড়িটার সবার/ এই বাড়িটা মুজিব নামের পলাশ, রক্তজবার... এই বাড়িটা তোমার আমার আত্মপরিচয়/ এই বাড়িটা বঙ্গবন্ধু, জাতির হিমালয়'।

কবি কামাল চৌধুরী তাঁর অধিকাংশ কবিতায় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন–

'আমি প্রতিশোধ নেবো/ আমার রক্ত ও শ্রম দিয়ে/ এই বিশ্বের মাটি ও মানুষের দেখা/ সবচেয়ে মর্মস্পর্শী জঘন্য হত্যার আমি প্রতিশোধ নেবো; (টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে)। 'টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে' কবিতাটি ১৯৭৮ সালে লেখা। তিনি আরও লিখেছেন- পাঁজরের হাড়ে আগুন জ্বালিয়ে আছি/ ছাড়বো না আমি কিছুতেই ছাড়বো না/ যতদিন বাঁচি গোত্রের প্রতিশোধ/ রক্তবর্ণ ক্রোধ জ্বেলে জ্বেলে নেবো; (প্রতিশোধ)। 'বীরের এ রক্তস্রোত' কবিতায় তিনি লিখেছেন- জনক মরতে পারে, কিন্তু তাঁর চেতনা মরে না... দশ কোটি, বারো কোটি, শত কোটি অগ্নিপুত্র বাড়ে/ জননী বাংলায় তারা স্থপতিকে অর্ঘ্য দিয়ে যায়। তিনি তাঁর 'টুঙ্গিপাড়ায় ঘুমাও বাংলাদেশ' কবিতায় লিখেছেন– 'তবু আমি রক্তলেখা লিখি/ তবুও লিখি অশ্রু-সরোবর/ একটি ঝরাপাতার পাশে লিখি/ শোকার্ত ফুল, স্মৃতিও মর্মর'।

সময়ের পথ ধরে জাতির পিতাকে হারানোর ব্যথা ফিরে ফিরে আসে কবির অনুভূতিতে। লিখছেন- 'এখানে করুণ মৃত্যু নামে ঘাতকের ঘৃণ্য হাতে অকস্মাৎ/ ঋতু বদলের মতো বারবার ফিরে আসে পরাজিত মুখ/ আমরা হারাই তাঁকে যাকে পেয়ে দেশ পেলো ভোরের সুষমা; (এখনো দাঁড়িয়ে ভাই)।

কবির স্বপ্ন 'আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়/ আশ্চর্য শব্দের গায়ে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা বিনম্র আকাশ/ সেখানে প্রতিদিন তোমাকে লিখছে বাংলা কবিতা/ মহাদেশ পাড়ি দিচ্ছে তোমার মুক্তির মন্ত্র, জাতিরাষ্ট্র, জাগরণ/ বাঙালির ভোর; (আবার দেখা হবে)'। টুঙ্গিপাড়ার মাটি বাংলার মানুষের চির শক্তি, সাহস ও প্রেরণার উৎস, যেখানে বাংলার মহাকবি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ঘুমিয়ে আছেন। এই পবিত্র মাটি নিয়ে কবি লিখেছেন– 'যেখানে ঘুমিয়ে আছ, শুয়ে থাকো/ বাঙালির মহান জনক/ তোমার সৌরভ দাও, দাও শুধু প্রিয়কণ্ঠ/ শৌর্য আর অমিত সাহস/ টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে আমাদের গ্রামগুলো/ তোমার সাহস নেবে/ নেবে ফের বিপ্লবের দুরন্ত প্রেরণা (টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে)'।

টুঙ্গিপাড়ার সেই পবিত্র মাটি আজ মিশে গেছে আজ বাংলার সমস্ত পলি মাটিতে; মিশে আছে বাংলার অনুভবে এবং নিঃশ্বাসে। অশ্রু, শোক ও রক্তের স্রোত পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু কোথাও নেই; মিশে গেছেন বাঙালির শাশ্বত ও অবিনাশী প্রেরণায়। কবি কামাল চৌধুরী তাঁর 'কোটি মানুষের অনুভবে' কবিতায় লিখছেন–

আমারও কবিতা নিবেদন করি তোমাকে

তোমার মৃত্যু কোথাও যে দেখি না আমরা
অশ্রু ও শোক, রক্তের স্রোত পেরিয়ে
কোটি মানুষের অনুভবে আছো জীবিত।'

এমন অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায় কবি কামাল চৌধুরীর রচনা থেকে। কারণ বঙ্গবন্ধু তাঁর ধ্যান-জ্ঞান আদর্শ পুরুষ। তিনি বাঙালির সকল অর্জনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে খুঁজে পান।

স্বীয় কবিতায় বঙ্গবন্ধু ও স্বাধিকারের কবিতা

'রওয়ানা করলাম সেকেন্দ্রায়, যেখানে সম্রাট আকবর চিরনিদ্রায় শায়িত। এই সমাধি স্থান তিনি নিজেই ঠিক করে গিয়েছিলেন। দিল্লি থেকে শুরু করে অনেক রাজা-বাদশার সমাধি আমি দেখেছি, কিন্তু সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধির ভাবগম্ভীর ও সাদাসিধে পরিবেশটা আমার বেশ লেগেছিল। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে অনেক রকমের গাছপালায় ভরা, ফল ও ফুলের গাছ! সমাধিটা সাদা পাথরের তৈরি।" – (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

(বক্ষ্যমাণ লেখকের কবি জীবন শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষা শেখার কালে মস্তিষ্কের গভীর স্তরে বাসা বেঁধেছিল। তাঁর স্বাক্ষর কবিতার মধ্যে এখন পর্যন্ত অন্যতম পরিচিত 'বাবা'- সেটি ষোল বছর বয়সে লিখিত হয়েছিল। এটি রচনাকালে জাতির পিতা, নিজের পিতা, একটি জাতির ইতিহাসের অভিযাত্রিক পিতা একাকার হয়েছিল। আজ এ কথা বলা দরকার হচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে কোনো কবিই কবিতা লেখার দুঃসাহস দেখাননি, অন্তত যাঁরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন। সময় বড় বৈরি। কিন্তু একটি নতুন প্রজন্ম যারা বঙ্গবন্ধুকে ভাষা শেখা স্তরে ধারণ করেছিলেন তারা তাদের কবিতার উপমায় উৎপ্রেক্ষা রূপক প্রতীকে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বর্তমানে সঠিক ইতিহাস বর্ণনাকারীদের উদাসিনতায় এই অঙ্গনে আগাছার জন্ম হচ্ছে। সেই আগাছা ক্ষেতের আসল ফসল খেয়ে নেয়ার উপক্রম করছে। বঙ্গবন্ধু যেমন বলেছিলেন, 'তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকো'- তেমনি প্রত্যেকের উচিত তাঁর জানা নিজের গল্প প্রকাশ করা। এই অধ্যায়ে আমি প্রথমে ১৯৮৪ সালে লিখিত 'বাবা' কবিতাটি উপস্থাপনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন সময়ের আরো ৪টি কবিতা থাকছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বক্ষ্যমান গ্রন্থাকারের কবিতার উপর লিখিত বিভিন্ন সময়ের দুটি আলোচনা যুক্ত করছি- কবি বঙ্গ রাখাল ও আজাদ এহতেশামের লেখা।)

মজিদ মাহমুদের কবিতায় বঙ্গবন্ধু

স্মৃতির জগত হাতড়ে আমার শৈশবে যে নাম,
বজ্রকণ্ঠে জানান দিলেন কোথায় আমার ধাম।
সেদিন থেকে খুঁজে নিলাম নিজের বাড়ির পথ,
তিনিই আছেন সবার আগে যতই থাকুক মত।
হয়তো আমি ঘুরছি অনেক হয়নি দিকের ভুল,
কারণ আমার লক্ষ্যে আছে দোয়েল-শাপলা ফুল।
সবাই আছে সবার সাথে একটি রঙিন খাম,
তার উপরে লেখা আছে শেখ মুজিবুর নাম।
(ঠিকানা : মজিদ মাহমুদ)

কবি মজিদ মাহমুদ এ সময়ের সর্বাধিক আলোচিত কবি। যার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'মাহফুজামঙ্গল' তিন যুগের বেশি সময় ধরে বহাল তবিয়াতে পাঠকের হৃদয় জয় করে চলেছে। তাঁর চিন্তা-চেতনা মানেই যেন পাঠকদের নতুন নতুন ভাবনাকে উস্কে দেওয়া এবং ভাবতে শেখানো। যা একজন মজিদ মাহমুদ -এর পক্ষেই সম্ভব। সম্প্রতি পড়েছি এই কবির কিছু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতা। যা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কবিতায় স্তুতি প্রকাশ না করেই তিনি– সত্যকেই উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন– যা একজন বীরের মধ্যে কবি দেখেছেন এবং হৃদয়ে অনুভব করেছেন। প্রকৃত নেতা কোনদিন অন্যায়ের সাথে আপোস করেন না তিনি প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন এবং জনগণের ন্যায্য দাবি আদায়ে সর্বদা সোচ্চার থাকেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তেমনি একজন কাদা মাটির ঘ্রাণ হৃদয়ে মেখে বড় হওয়া মানুষ। তিনি জানেন এই বাঙ্গালি জাতির অবহেলা বঞ্চনার ইতিহাস– এ ইতিহাস হাজার বছরের ইতিহাস–

ছাপান্ন হাজার মাইলের লম্বা সেই তর্জনী তুলে
বলেছিলেন একজন- 'কী অন্যায় করেছিলাম?'
সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল বাঙালির বঞ্চনার ইতিহাস
হাজার বছরের মুমূর্ষু নরনারীর ইতিহাস
তারপর তিনি বললেন- 'আপনারা আসুন, বসুন'
'তখনই তারা আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে' পড়ল
(তর্জনী)

শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন– এই জাতি এক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ জাতি– এই জাতিকে সহজে তাদের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না। কিন্তু যাদের মাথায় মসনদের চিন্তা তারা কি করে নিজের স্বার্থ বাদ দিয়ে জনগণের মঙ্গলের

কথা ভাববে? তাই তারা এই জাতিকে তাদের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ধর্মকে বেছে নেয় এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করে অথচ ধর্ম কোন দেশভাগের ভিত্তি হতে পারে না। তবুও... নির্যাতন আর নিপীড়নের স্বীকার এদেশের অতি সহজ সরল বাঙালি কিন্তু কতদিন আর দাবায়ে রাখা যায়। পিছনে পিঠ ঠেকে গেছে– প্রতিবাদ বড় প্রয়োজন– নিজের অধিকার নিজেকেই আদায় করে নিতে হবে– তাইতো স্বাধিকারের প্রশ্নে এদেশের মানুষ আজ প্রতিবাদী– একজন নেতা সুদূর প্রসারি ধীশক্তির অধিকারী আর শেখ মুজিব সেই বীর যিনি সুদূরের ঘটমান বাস্তবতা নিজের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করতেন। সেজন্যই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনগণের মঙ্গলার্থে তাদের সাবধান করে দেন–

তিনি বললেন- 'মনে রাখবে,
শত্রুবাহিনি ঢুকেছে,
নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে
লুটতরাজ করবে
এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান
বাঙালি নন-বাঙালি যারা আছে
তারাও আমাদের ভাই।'
(তর্জনী)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিন্তা- চেতনার দিক থেকে ছিলেন একজন গণমানুষের নেতা। তিনি কোন একক বা বিশেষ কোন গোষ্ঠী বা দলের নেতা ছিলেন না। তার প্রমাণ মেলে ৭ই মার্চের ভাষণে– যা আমাদের সত্যি সত্যিই অবাক করে দেয়– একজন রাজনীতিবীদ কি করে এতটা নির্মোহ হতে পারেন। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন এই নেতাকেই আমরা নিজেদের স্বার্থে হত্যা করেছি। কবি সেই সব স্বার্থন্বেষী মনুষ্যত্বহীন পাতি নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন–

যারা ধর্ষক ক্ষমতালোভী বিচার হীন একরাজ্য চাই
তারাই তোমার হত্যাকারী তারাই তোমার ভাঙিয়ে খায়...
(মহাপিতা)

প্রতিটি মানুষেরই মৃত্যু অনিবার্য। আমরা সবাই এই সত্যকে মেনে নিয়েছি। তবুও কিছু কিছু মৃত্যুকে মেনে নেওয়া স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে পড়ে না। তেমনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। যার জন্মই হয়েছিল বাঙালির মুক্তির জন্য। যার জীবনটাই কাটিয়ে দিয়েছেন বিপ্লব-বিদ্রোহ আর সংগ্রাম করে। তিনি একজন সফল সংগ্রামী বিপ্লবী নেতা। যার জন্ম না

হলে এই বাংলাদেশের জন্ম হত না। তিনি মিশে আছেন বাঙালির– অস্তি-মজ্জায় কিন্তু এই মহান নেতাকেও তো আমরা হত্যা করতে পিছপা হয়নি– কেড়ে নিয়েছি তাঁর প্রাণ সাথে পরিবারের এমনকি ছোট্ট সোনা মণি সবার আদরের ধন তাজা সদ্যফোটা কচি গোলাপের মতো রাসেলের প্রাণ। ৩২ নং বাড়ির সিঁড়ি সেদিন রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল।– সেদিনও বীরদর্পে নেতা আওয়াজ তুলেছিলেন– মনে বল হৃদয়ে সাহস আমার বাঙালি আমার বুকে গুলি চালাবে কার আছে হিম্মত। চারিদিকে নিথর দেহের আর্তনাদ সেদিন থরে থরে কেঁপেছিল পৃথিবী। এই পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের পর পরিবর্তন হয় দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। পালাবদল ঘটে রাষ্ট্রক্ষমতার বদলে যায় স্বাধীন দেশের সংবিধান। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে শুরু হয় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যা বর্তমানেও অব্যহত। দেশদ্রোহীরা বসেছেন ক্ষমতায়। ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট শুক্রবার। ৩২ নং বাড়ির প্রতিটি কোণায় বঙ্গবন্ধুর নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ মিশে আছে। এই বাড়িতে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুকে, সাথে– তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে দূরে থাকায় বেঁচে যায় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

তোমার বিদায়ের বিশাল আয়োজন
উঠেছিল দুলে দেশি বিদেশি খুনিদের মন
গর্জে উঠেছিল সহস্র কামান মেশিন গান
স্তব্ধ হয়েছিল বায়ু
হয়তো থেমেছিল কিছুক্ষণ তোমার পাইপের টান
ছড়িয়ে পড়েছিল ধূয়ার কুণ্ডুলী
রয়েছিল পড়ে খুনিদের খুলি
উঠেছিল ছাপ্পান্ন হাজার মাইলের বান
তারপর ধাতস্ত হয়ে এলো সব-
কোথায় খুঁজব বলো তোমার শব
তোমার তর্জনীর স্পর্শে
বাংলাদেশ হয়েছে পীঠস্থান
তুমি মর নাই, হয়তো মরেছ
তোমায় মেরেছে যারা- এক দুই তিনজন খুনি
অতি তুচ্ছ নগন্য তারা
তাদের এক দুই তিন করে গুনি।
(পীঠস্থান)

সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীন দেশ গঠিত হলেও বারবার সেই সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়েছে। অপরাধীরা নিজেদের ক্ষমতার মসনদে আসিন করে–নিজের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করেছে। জনগণকে করেছে বিপদগামী– রাষ্ট্রদ্রোহীদের নিজেদের জোটের সাথী করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জায়গাকে করেছে শক্ত।

স্বাধীন দেশের অর্থনীতি সমাজতন্ত্র লাল সালাম
ভাবতে ছিলে হয়তো তুমি কৃষক-শ্রমিক নয় গোলাম
কিন্তু যারা স্বার্থন্বেষী দেশ বিদেশে হারাম খোর
তোমায় নাশে জোট বাঁধত ভদ্রবেশি সকল চোর...
(মহাপিতা)

একজন জাদুকরী ভাষার মহান মানুষের আহ্বানে এক হয়েছিল দেশের সর্বস্তরের মানুষ– যাকে আমরা জনযুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করতে পারি। বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় চারটি মূল আদর্শের ভিত্তিতে। যেখানে গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রই একমাত্র মন্ত্র। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বদেশ নিজের শিড়দাড়া টানটান করে দার করে রেখেছিল এই চারটি স্তম্ভের উপরে। কিন্তু এদেশের গণতন্ত্রের স্তম্ভ ধ্বংস হয়েছে বারে বার। অগণতান্ত্রিক উপায়ে অনেকে ক্ষমতার আসনে সওয়ার হয়েছেন। এসময় পরিবর্তনের পরিক্রমায় লাঞ্চিত বঞ্চিত হয়েছে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। আমাদের এই দেশ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত হলেও– এই দেশের মুসলমান বা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান একত্রিত হওয়ার মাধ্যম ছিল ভাষার পরিচয়। এই একই ভাষিক পরিচয়ের মানুষদের কোন আন্দোলন সংগ্রাম থেকে কখনো আলাদা করা যায়নি। কিন্তু বারে বারে তাদের একত্রিত থেকে আলাদা করার চেষ্টা করা হয়েছে– কাল বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আজকের বাংলাদেশ। যে দেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেও তাদের হৃদয়ে স্বস্তির সন্ধান পাননি– কেননা একটি বিপ্লবের নাম বঙ্গবন্ধু, একটা বিদ্রোহের নাম বঙ্গবন্ধু কিংবা একটা চেতনার নাম বঙ্গবন্ধু– তাকে ঢাকায় কোথাও সমাধিস্ত করা যাবে না। তাকে মাটি দেয়া হয় টুঙ্গিপাড়ায় মা-বাবার কবরের পাশে ৫৭০ সাবান, কাফনের কাপড় ও অন্যান্য জিনিস গ্রামের মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তাকে মাটিচাপা দেয়া হয়। কতটা অবিবেচক ঘাতক হলে এই জাতির স্বপ্নদ্রষ্টাকে এভাবে অবহেলা করা যেতে পারে। অথচ পরিবারের অন্য সদস্যদের বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। যে গ্রামীণ আলো বাতাসে একজন বীরের জন্ম সেই মাটিতেই রাখা হল তাকে। এ যেন প্রজ্জ্বলিত প্রদীপে নতুনভাবে দম দিয়ে ছেড়ে দেয়া। যা জ্বলবে নতুন উদ্যোমে নতুন

শক্তিতে। এজন্যই কবি মজিদ মাহমুদ আবার এই বর্তমান সময়ে সেই অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য কবিতায় বললেন–

বিপদ-সঙ্কুলে লড়াই-সংগ্রামে তুমিই সাহস
তোমার বাঁচা ও আত্মদান দেশের জন্য
মৃত্যু তোমাকে চিরঞ্জীব করেছে
একটি জাতি তোমার নামে চিহ্নিত
তুমি যেমন অতীতে, তেমন শত বছরে
সহস্র বছরেও স্পর্শ করবে না মলিনতা
কারণ তুমিই জাতির পিতা।
(সহস্র বছরেও তুমি)

কবি মজিদ মাহমুদ এই মহান বীরের বীরত্ব পরিবারের মানুষের মুখে শুনে শুনে বড় হয়েছেন কিংবা পরিবারের ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ বা এই ১৯৭১ সালের অবরুদ্ধ সময়ে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী জীবন যাপন তার পরবর্তীতে হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে– নিজের বাড়ির ভস্মিত ছাই চোখের সামনে উড়তে দেখেছেন যে কারণে হৃদয়-অভিঘাতে পরবর্তীতে লিখলেন মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি নির্ভর কবিতা– 'বাবা'। এই কবিতাটি কবির 'বল উপাখ্যান' (২০০০) কাব্যের অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।

হানাদারের আঘাত সয়ে ভাইয়া যখন চলে গেলেন
বাড়ির সবাই কাল বোশেখি ঝড়ের মত
দমকা দমকা মূর্ছাহত
বাবা তখন আদর করে ভাইয়ার গালে চুমু খেলেন
কত দিনেই ঝড় বয়েছে
ঘর ভেঙেছে...
(বাবা : বল উপাখ্যান)

মুজিব মানে একটি স্বদেশ একটি মানচিত্র একটি লাল-সবুজ সম্বলিত পতাকা। কবি মজিদ মাহমুদ একজন প্রকৃত বীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি তাঁর 'সর্বাধিনায়ক' কবিতায় বলছেন–

ঈষাণ কোণে মেঘ, আম্রবাগানে নামে সন্ধ্যা
বরফে আচ্ছাদিত ওয়াটার লু, দ্যাখে
পরাজয়ের চিহ্ন; মৃত্যু, তবু প্রকৃত যোদ্ধা
পায় না ভয়-তার পশ্চাতে সমুদ্র
সম্মুখে শত্রুর তরবারি
সবখানে মৃত্যু ওঁত পেতে আছে-

তাই শুনতে পাই বিস্তৃর্ণ ময়দানে তোমার কণ্ঠ
শত্রুর মোকাবেলায় ওঠো জেগে
'মারো না হয় মরো'
মৃত্যুময় পৃথিবীতে কিসের ভয়
কাকে বলে পরাজয়...

শেখ মুজিবুর রহমান– এক জন সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক কবি। যাকে আমরা আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবেই চিহ্নিত করে থাকি। যার মায়াময় চেহারা আর হৃদয়কারুনী কণ্ঠে বিমুগ্ধ করেছিল এদেশের তারুণ্যদীপ্ত জনগণকে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন এদেশের মুক্তি পাগল জনগণ– এই মন্ত্রীয় ডাকতো একজনই দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের জাতির পিতা– এই পিতার মৃত্যু নেই। তিনি কাল হতে কালান্তরে জাগ্রত জনগণের হৃদয়ের চিলেকোঠায়– তাইতো কবি বলছেন–

জেনে রেখো আমাদের সেনাপতির মৃত্যু নেই
পলাশির প্রান্তর থেকে আগরতলা
রেসর্কোস ময়দানে তিনিই তো করেছিলেন
তোমাদের ঘরের বাহির-
যার যা আছে তাই নিয়ে থাক প্রস্তুত।
(সর্বাধিনায়ক)

বাঙালি জাতি এক অবহেলিত তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত নয়– আজ এ জাতি বীরের জাতি– এ জাতি বিশ্বের মাঝে বীরের জাতি হিসেবে পরিচিত হয়েছে। যে বীর এই জাতিকে বিশ্বের মাঝে সম্মানিত জাতিতে পরিণত করলেন– সে কোন রূপকথার বীর পালোয়ান নয়, সে রক্ত মাংসেরই মানুষ। আমাদের জাতির পিতা– আমাদের মহাননেতা– শেখ মুজিব।

শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রে মানুষ নিজের বেঁচে থাকায় অধিকার পাবে– যোগ্য মানুষ পাবে সম্মান। কিন্তু আজ সেই বীর বাঙালির অবস্থা সত্যিই করুন। পিতার স্বপ্নের রাষ্ট্র আজ শ্মশান–স্বার্থন্বেষী–মানুষেরা আজকে পিতা তোমাকে নিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছে– নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য প্রকৃত প্রেমিককে বিপদে ফেলতেও যে কুণ্ঠাবোধ করছে না। যারা একদিন এই মহান নেতার বিরোধিতা করেছে তারা আজ বড় দেশপ্রেমিক হয়ে নিজেকে পিতার যোগ্য প্রেমিক সাজিয়ে অপরাজনীতিতে নিজেদের সামিল করেছে– তাদের উদ্দেশ্যে কবির স্পষ্ট বক্তব্য–

ব্যাংকে টাকা লুটছে যারা শেয়ারবাজার করছে মাত
তুমি তাদের করো না ক্ষমা তুমি থেক না তাদের সাথ
যারা ধর্ষক ক্ষমতালোভী বিচারহীন এক রাজ্য চায়
তারাই তোমার হত্যাকারী তারাই তোমায় ভাঙিয়ে খায়
নিজের দেশের অর্থনীতি অন্য দেশে করে পাচার
সে-সব মানুষ তোমার নামে ফঁন্দি আঁটে পিঠ বাঁচার
গর্জে ওঠো আবার পিতা তর্জনীর ওই ইঙ্গিতে
ভয় ধরে যাক কাঁপন উঠুক লুটেরাদের সঙ্গীতে
(মহাপিতা)

এই সব অন্যায় আর অসাম্যের কর্মযজ্ঞের বিরুদ্ধে পিতা স্বর্গ থেকেই চেঁচিয়ে ওঠেন– তিনি যাদের ভালোবেসে নিজের একান্ত কাছের মানুষ করেছিলেন তারাই তো ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেন। কিন্তু এই জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন আশাকে তারা হত্যা করতে পারেনি। তাঁর শরীরের লয় হলেও স্বপ্নের বাংলাদেশ আজ শত বাধার মধ্যেও নিজের অস্তিত্বকে জানান দিয়েছে। এ যেন জাতির পিতার শোকেরই শক্তিতে পরিণত হওয়ার পূর্ণরূপ।

এই কবির কবিতা বিবেচনা করলে বলা যায় যে তিনি একটি রাষ্ট্রের রক্তাক্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যা বর্তমান কোনো ক্ষমতাবান, রাজনৈতিক, ব্যক্তিও এই তীব্র কটাক্ষতা থেকে রক্ষা পান না। আজ সত্যিই আশ্চর্য হতে হয় যে কবি বঙ্গবন্ধুকে কতটা হৃদয়ে ধারণ করলে এমন দৃশ্যকল্পের সৃষ্টি করতে পারেন।

কেবল একটি তর্জনী তখন মাস্তুলের মতো
নৌকার পালে বাতাস লাগিয়ে ছুটতে লাগল
আর পানির গভীরে দিশা হয়ে থাকল অনড়
এই আঙ্গুল যতদিন থাকবে মাঝিদের মনে
এই আঙ্গুল যতদিন স্থির থাকবে সর্বোচ্চ সম্মানে
ততদিন যাত্রীরা খুঁজে পাবে গন্তব্যের পথ।
(তর্জনী)

সর্বপরি বলতে পারি কবি মজিদ মাহমুদকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দারুণভাবে আন্দোলিত মথিত এবং আবেগ আপ্লুত করেছে– যে কারণে তিনি অভিঘাতে জন্ম দিয়েছেন একের পর এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী কবিতা। এ কবিতা সত্যিই অন্যদের থেকে আলাদা এক ইতিহাসকে আমাদের সম্মুখে হাজির করে– ভাবিত করে, জাগ্রত করে আমাদের ঘুমন্ত সত্তাকে।

স্বাধিকারের কবিতা

বাঙালির জাতীয় জীবনের নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনার এক অধ্যায়ের সূচিত হয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। বাঙালির চিরকালীন মুক্তি ও শোষণ নির্যাতন ও বঞ্চনার এক দীর্ঘ ইতিহাসের পরিসমাপ্তি এই মুক্তিযুদ্ধ। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে অসম পাকিস্তান সৃষ্টির এক আত্মঘাতি সিদ্ধান্তের পরিণতিতে নানা শোষণ বঞ্চনায় ওষ্ঠাগত বাঙালির জনজীবন এক অনিবার্য যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় বাঙালি অপ্রত্যাশিত এক মারণঘাতি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। নয় মাস একটানা যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে ঝরে পড়ে ত্রিশ লাখ মানুষ; বিপন্ন হয় প্রকৃতি ও পরিবেশ।

পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান সরকারের চণ্ডনীতি শিকারে পরিণত হয় বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু বাঙালির প্রবল বিরোধিতা ও আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে থাকে। প্রয়াস পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আন্দোলনই প্রবল উদ্দীপনায় রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে। তারই ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে বাঙালির চূড়ান্ত রায় ও সমর্থন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অঘোষিত বিজয় সূচিত করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের মতো ভয়ংকর এক ক্রান্তিকালে এদেশের সচেতন কবিগণ ব্যথিত চিত্তে কবিতার পঙ্‌ক্তিতে লেখনিতে ধারণ করেছেন ভয়ংকর ধ্বংসলীলার এক জ্বলন্ত ইতিহাস। কবিরা সর্বকালেই সংবেদনশীল তাই, তারা সমকালীনতাকে কখনো উপেক্ষা করতে পারেন না। তেমনি পারেননি ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ভয়াবহতা। যুদ্ধকালীন সময়ে কবিতা লিখেছেন : সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), মযহারুল ইসলাম (১৯২৮-২০০৩), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩২-২০০৬), আসাদ চৌধুরী (১৯৪৩), রফিক আজাদ (১৯৪৩-২০০৬), নির্মলেন্দু গুণ (১৯৫২), প্রমুখ কবিগণ। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে

কবিতার বিষয় বৈচিত্র্যে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এ সময়ে কবিরা রাজনৈতিক পটভূমিতে জাতীয় চেতনাকে ধারণ ও আত্মস্থ করে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাদের কবিতায় বৃহত্তর অংশ জুড়ে থাকে দেশ, দেশের মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধ। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে কবি মজিদ মাহমুদের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস পাব।

সম্পূর্ণ অন্যায় ও অগণতান্ত্রিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে বাঙালির আর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ছাড়া কোনো গত্যান্তর ছিল না। কিন্তু এই ভয়ংকর যুদ্ধে বাঙালির না ছিল পূর্ব প্রস্তুতি না ছিল দক্ষ প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র। অপ্রত্যাশিত ও অনিবার্য এ যুদ্ধে বাঙালিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। পাক সমরাস্ত্র ও প্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনির সাথে যুদ্ধ করা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তবু বাঙালির অমিত ও অপরিমেয় দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কোনো জাতির প্রবল দুর্যোগ ও ক্রান্তিকালে তরুণ যুবকরাই তা প্রতিরোধে অগ্রবর্তী হয়ে থাকে। তখন তাদের প্রস্তুতির দরকার হয় না; পূর্বপ্রস্তুতিরও সময় থাকে না। পরিস্থিতিই মানুষকে যোগ্য করে তোলে; আত্মরক্ষায় কৌশলী করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে এদেশের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মজিদ মাহমুদের 'পক্ষের সৈনিক' কবিতায় সে বিষয়টি মূর্ত হয়ে উঠেছে :

"প্রতিদিন কারা যেন আমার পিছে সারিবদ্ধ হয়ে যায়
বলে সম্মুখে চলুন তরুণ
আমি তো লেফট্ রাইট কুইকমার্চ কিছুই শিখিনি
কিংবা ষোল দাগের চর দখলে না ছিলাম লেঠেল
আমি কি করে হতে পারি এই সব অধিকার আদায়ের মিছিলে
আগামী মানবিক কেতন বাহন।"
("পক্ষের সৈনিক", "গোষ্ঠের দিকে")

দীর্ঘ নয় মাসে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের যে বিভৎসতা ও ভয়াবহতা তা সাত বছর যুদ্ধের ধ্বংসলীলাকেও হার মানিয়েছিল বর্বর পাকিস্তানি হায়েনারা। নির্বিচারে গুলি করে হত্যা, আগুন জ্বালিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে হত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা। লুণ্ঠিত ও বিপর্যিত মানবতায় তাদের বিবেক এতটুকু সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেনি। কতো বাবা মা সন্তান হারান, কতো বোন স্বামী হারান, কতো মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারান ও পঙ্গুত্ব

বরণ করেন তার ইয়ত্তা নেই। যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত দেশে মানবতার এ এক চরম বিপর্যয়কালে তাদের সহানুভূতির কোন ভাষা জানা নেই; নেই সান্ত্বনায় কোনো উচ্চবাচ্য। আছে কেবলই নীরব ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের মহীমায় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আকুতি। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান; মুক্তপথ ও আলোর দিশারী। তাদের প্রতি অন্তর নিঙয়ানে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আরতি। কবি মজিদ মাহমুদের কবিতায় সে কথারই প্রতিধ্বনি উত্থিত হতে দেখি :

"আমি এক মুক্তিযোদ্ধাকে চিনি
যুদ্ধে যার একটি পা খোয়া গেছে
এখন এক পায়ে লাফিয়ে চলে
আগে তাকে দেখলে কষ্ট হতো
আমাদের স্বাধীনতা তার একটি পা নিয়েছে
বর্তমানে সে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা।"
("মুক্তিযোদ্ধা", "ধাত্রী ক্লিনিকের জন্ম")

যুদ্ধে অংশগ্রহণ যে মৃত্যুর হাতছানি তা মুক্তিযোদ্ধারা স্বীকার করে নিয়েই ভয়ংকর এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধে জয়ে হস্তে উড্ডীন বিজয় কেতন অথবা মৃত্যু এমন পণ ও প্রতিজ্ঞা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। যুদ্ধে জয় না হয় সাদরে মৃত্যু গ্রহণ এই যাদের সংকল্প তাদের কোন শক্তি বাধা হতে পারে? প্রকৃত যোদ্ধা যুদ্ধের ময়দান থেকে কখনো পলায়ন করে না; কারণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এক ধরনের মৃত্যু প্রকৃত যোদ্ধার কাছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এমন মরণপণ প্রত্যাশা ছিল বলেই প্রশিক্ষিত একটি সৈন্যবাহিনির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং শেষতক যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। প্রকৃত যোদ্ধার স্পৃহা শক্তি সাহস এ ধৈর্য্য ছিল বলেই মুক্তিযোদ্ধারা অল্প সময়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাধপূরণে সমর্থ হয়েছিল। মজিদ মাহমুদের কবিতার পঙ্‌ক্তিতে সে কথাই সন্দীপিত হতে দেখি :

"মরো না হয় মারো
মৃত্যুময় পৃথিবীতে কিসের ভয়
কাকে বলে পরাজয়
যুদ্ধের ময়দান যদি ছাড়ো, পালাও
তোমার পৃষ্ঠদেশে মৃত্যু হেনে দেবে খঞ্জর
প্রকৃত সৈনিকের আঘাত পৃষ্ঠে লাগে না।
("আহত মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে", "ধাত্রী ক্লিনিকের জন্ম")

পাকিস্তানি শাসক ও শোষক গোষ্ঠির রোষানলে সর্বাগ্রে শিকার এ দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি। তাদের ধারণা ছিল বাঙালি জাতিকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে হলে প্রথমে তাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হবে; তাই তারা কূট-কৌশলে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। মূলত ভাষা আন্দোলনই ছিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা। ভাষার পথ ধরেই পর্যায়ক্রমে পৌঁছে যায় মুক্তির দ্বারপ্রান্ত। পৃথিবীতে মাতৃভাষা স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গের কোনো নজির নেই; অতি অল্প সময়ে মুক্তিযুদ্ধের বিপুল মানুষের প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাসও পৃথিবীতে বিরল। অথচ প্রাচীনকাল থেকেই নানা সম্পদে সমৃদ্ধশালী ও চিত্তাকর্ষক ছিল এই সুজলা সুফলা বাংলাদেশ। মজিদ মাহমুদের কবিতায় প্রতিভাত হয়েছে অপূর্ব শৈল্পিক বাণীভঙ্গিতে :

> "পৃথিবীতে ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছিল কারা। আমরা স্বাধীন হয়েছি; তোমাদের অনেক রাষ্ট্রের চেয়েও বেশি জীবনের বিনিময়ে। অথচ ৪শ বছর আগেও ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার জানতেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ হলো বাংলাদেশ।" ("বাংলাদেশ", "ধাত্রী ক্লিনিকের জন্ম")

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আকস্মিক কোনো যুদ্ধ ছিল না; দীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণ বঞ্চনা ও নিগ্রহের চূড়ান্ত পরিণতি এই মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৭ সালের স্বাধীকার আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এ সকল আন্দোলন সংগ্রাম ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিণতির দিকে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। যুদ্ধের ভয়াল পরিণতিতে নির্বিচারে মানুষ হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসলীলা; তার পরে ১৬ ডিসেম্বর কাঙ্ক্ষিত বিজয় ও স্বাধীনতা। মজিদ মাহমুদের কবিতায় সে ভয়াল চিত্র ফুটে উঠেছে :

> "তারপর মহাকাল ৭১, জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি সবাই
> ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা, ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত স্বাধীনতা
> দুর্ভিক্ষ; কুকুর আর মানুষ, বাকশাল
> ১৫ আগস্ট – জাতির জনক হত্যা।"
> ("এখন দার্শনিক কবিতা লেখার সময়", "ধাত্রী ক্লিনিকের জন্ম")

জীবন মানেই যুদ্ধ; নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। জনম থেকে মৃত্যু অবধি চলে নিয়ত এ যুদ্ধ। কখনো কখনো কোনো জাতি আনুষ্ঠানিক কোনো যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে

থাকে; বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ছিল তেমনই একটি যুদ্ধ। যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত দেশে চলে আবার নতুন করে পুনর্গঠনের যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়েই একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; পরবর্তী দেশ গঠনেও সে ব্রতী হয়। সে যুদ্ধের ময়দানে যেভাবে শত্রুর মোকাবিলা করে তেমনিভাবে যুদ্ধোত্তর দেশগঠনেও স্বাধীনতা বিরোধী দেশদ্রোহীদের পরাজিত করে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। প্রকৃত দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ চলে অবিরত। মজিদ মাহমুদের কাব্য পঙ্‌ক্তিতে সে প্রতিধ্বনিই উত্থিত হতে দেখি :

> "যুদ্ধ শেষে বিগ্রস্ত লাশের ভেতর জেগে উঠি
> লুটিয়ে পড়েছে সেইসব বীর, যাদের প্রসারিত বাহু
> একদিন নিয়েছিল তুলে জাতির পতাকা
> তবু পরাজিত সেনাপতি তার অধীনস্ত
> সৈন্যদের পুনর্গঠিত করতে চায়
> অতীতের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে আবার
> যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দ্যাখে স্বপ্ন"
> ('সৈনিক', 'গ্রাম্যকুট')

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বিদেশী বেনিয়া ও ঠকবাজদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। বর্গী, মগজলদস্যু, ওলন্দাজ, ফরাসি, ব্রিটিশ, বেনিয়া এরা সবাই ছিলো সুজলা-সুফলা এদেশের সম্পদ লুণ্ঠনে সদা তৎপর। প্রায় দুইশো বছর ব্রিটিশ বেনিয়ারা এদেশে শাসনের নামে দেশের মানুষকে শোষণ ও নির্যাতন করছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে তেইশ বছর শোষণ ও নির্যাতন করেছে পাকিস্তান সরকার। এদেশের সম্পদ লাভে মত্ত শাসকেরা কখনোই এ

দেশের মানুষের কল্যাণের চিন্তা কখনো করেনি; বরং হিংসা বিদ্বেষ ও শোষণের যাতাকলে এদেশের মানুষকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। কাজেই এরা আমাদের আজনম শত্রু; অকল্যাণকামী প্রতারক শাসক। মজিদ মাহমুদের কবিতায় তার প্রতিধ্বনি ফুটে ওঠে :

> "তুমি শাদা চামড়ার চতুর ব্রিটিশ! তুমি ভয়াল পাঞ্জাবি! তোমাকে পরাস্ত করা ছাড়া আমার রক্তের উদ্দামতা থামে না। আমাদের এই শত্রুতা

আজনম মাহফুজা। এই যুদ্ধ থেকে পাবে না রেহাই আমাদের সন্ততি। তাই আমরা জেগে উঠি প্রবল আক্রোশে বংশপরম্পরায় এই গেরিলা যুদ্ধে।"

('যুদ্ধ', 'মাহফুজামঙ্গল')

যুদ্ধ মানেই হত্যা; বিপন্ন মানবতা মৃত্যুর বিভীষিকাময় পরিবেশ ও পরিস্থিতি। যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিপক্ষ শত্রু নিধন ভিন্ন কোনো গত্যান্তর থাকে না কিন্তু তাই বলে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে শত্রুকে হত্যা করা যাবে না। রণাঙ্গনের আন্তর্জাতিক নিয়ম আছে, প্রকৃত যোদ্ধা তা উপেক্ষা করতে পারে না। যুদ্ধে আহত বিরোধী যোদ্ধাকে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে হত্যা করা যাবে না। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া কোনো আহত বিপক্ষ যোদ্ধাকে হত্যা করা যাবে না। কবি মজিদ মাহমুদের কবিতায় যুদ্ধাহত বিপক্ষ যোদ্ধার যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার কথা ব্যক্ত হয়েছে :

"যুদ্ধে আহতদের সম্মান উপরে
তাদের মারা নিষেধ তাদের দিতে হয় সঠিক চিকিৎসা
নার্স ও ডাক্তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দেয়, কপালে রাখে হাত
তাদের জন্য আছে মানবাধিকার কমিশন, আদালত
যুদ্ধে কেবল হত্যার বৈধতা রয়েছে।"

("আহত", "সিংহ ও গর্দভের কবিতা")

মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তিকে সাহায্য ও সহযোগিতার অপরাধে মজিদ মাহমুদের পরিবার পরিজনকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। তার বড় ভাই ভারতের বেচুয়াড়াভাঙা ট্রেনিংপ্রাপ্ত একজন সশ্রদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ বাবা যুদ্ধে যেতে না পারলেও প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তার বড় জামাতাও তাঁর অনুপ্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। বয়সের অপ্রতুল্য মজিদ মাহমুদ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও তার পারিবারিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সশ্রদ্ধ অংশগ্রহণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার অপরাধে পাক হানাদার বাহিনির দোসর রাজাকার আলবদর বাহিনির রোষানলের শিকার হয়েছিল গোটা পরিবার। তারা মজিদ মাহমুদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ভস্মীভূত বাস্তুভিটার বিভৎসতায় গোটা পরিবার অসহায় ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ সময়ে পরিবারে সবাই অসহায়ত্ব প্রকাশ করলেন। বৃদ্ধ বাবা ছিলেন পর্বতের মতো অটল তিনি সবাইকে সান্ত্বনা

দিয়েছেন। ধৈর্য্য ধারণ করতে বলেছেন। গর্বে তার বুক ফুলে উঠেছিল এই ভেবে যে তার ছেলে ও জামাতা মুক্তিযোদ্ধা, এ দেশের জন্য তারা যুদ্ধ করছে।

এই সময়ে কিশোর বয়সী কবি মজিদ মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির পারিবারিক প্রভাব ও বলয় প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পরবর্তীতে তার কবিতার পঙ্‌ক্তিতে তুলছেন এক অপূর্ব শৈল্পিক নিরীক্ষণে :

"হানাদারের আঘাত সয়ে ভাইয়া যখন চলে গেলেন
বাড়ির সবাই কালবৈশাখী ঝড়ের মতো
দমকা দমকা মূর্ছাহত
বাবা তখন আদর করে ভাইয়ার গালে চুমু খেলেন
কত দিনই ঝড় বয়েছে
ঘর ভেঙেছে।"

("বাবা", "বল উপাখ্যান")

দেশ-জাতির চরম সংকটকালে মুক্তির সারথি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কবির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রণতি ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতার অজস্র পঙ্‌ক্তিতে। নিজ পরিবার পরিজনদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখেছেন এবং তার ভয়াবহ পরিণতিও ভোগ করেছেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে। কাজেই মুক্তিযুদ্ধ দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা বিষয়ে তার উপলব্ধিজাত প্রগাঢ় আবেগ ও অনুভূতি একজন সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তার চিন্তাচেতনা ও পারিবারিক ঐতিহ্য ও মনীষা আরও বিস্তৃত পরিসরে কাব্যিক অনুধ্যানে গবেষণার দাবি রাখে।

সংযুক্তি : ৪টি কবিতা

পীঠস্থান

তুমি মারা যেতে
তুমি মারা যেতে একদিন
সময় তোমাকে মেরে ফেলত নিশ্চয়
যদিও তোমার ছিল না মৃত্যুর ভয়
তবু যেভাবে মরেছে আদিম প্রপিতামহী
বার্ধক্যের জরাজীর্ণ রোগশোক বহি

হয়তো তুমিও তেমন একদিন যেতে মরে
অমাবস্যা কিংবা নিশিতের কাকডাকা ভোরে
হয়তো বাঁচতে তুমি কিছুদিন জীবনের সংঘাতে
কি-ই বা হতো তাতে
জীবন পেয়েছিল যারা পৃথিবীর পথে
মৃত্যুর ফেরেশতাও চলে যাবে মরণের রথে
কেবল থেকে যাবে সময়, সময়ের পরিহাস
উৎকীর্ণ রবে মানুষের মূর্খতার ইতিহাস
কেউ পৃথিবীতে থাকে না বেঁচে
সবার আয়ু হয়ে যায় শেষ
কিন্তু তুমি ছিলে অশেষ
যেভাবে সক্রেটিস ক্রাইস্ট
পরমায়ু ফুরানোর আগে নিয়েছিল ইস্ট
তাই তোমার বিদায়ের বিশাল আয়োজন
উঠেছিল দুলে দেশি বিদেশি খুনিদের মন
গর্জে উঠেছিল সহস্র কামান মেশিন গান
স্তব্ধ হয়েছিল বায়ু
হয়তো থেমেছিল কিছুক্ষণ তোমার পাইপের টান
ছড়িয়ে পড়েছিল ধূয়ার কুণ্ডলী
রয়েছিল পড়ে খুনিদের খুলি
উঠেছিল ছাপ্পান্ন হাজার মাইলের বান
তারপর ধাতস্ত হয়ে এলো সব-
কোথায় খুঁজব বলো তোমার শব
তোমার তর্জনীর স্পর্শে
বাংলাদেশ হয়েছে পীঠস্থান
তুমি মর নাই, হয়তো মরেছ
তোমায় মেরেছে যারা- এক দুই তিনজন খুনি
অতি তুচ্ছ নগন্য তারা
তাদের এক দুই তিন করে গুনি।

তর্জনী

এই তর্জনী বাঙালির প্রতীক
বাঙালির পতাকার অধিক
বঙ্গোপোসাগরের গভীর জলরাশি থেকে
ছুঁয়েছিল তাজিংডংয়ের চূড়া
পৌষের গাঢ় কুয়াশায় রংপুর তেতুলিয়ায়
গ্রীষ্মের তীব্র খরায়
টেকনাফের ঘনফেনায়
দেখেছিল যারা
ছাপান্ন হাজার মাইলের লম্বা সেই তর্জনী তুলে
বলেছিলেন একজন- 'কী অন্যায় করেছিলাম?'
সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল বাঙালির বঞ্চনার ইতিহাস
হাজার বছরের মুমূর্ষূ নরনারীর ইতিহাস
তারপর তিনি বললেন- 'আপনারা আসুন, বসুন'
'তখনই তারা আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে' পড়ল
তারপর মানুষ দেখল একটি আঙ্গুল-
সেই আঙ্গুল হ্যামিলনের বাঁশি হয়ে
ছড়িয়ে দিল সুরের তরঙ্গ
লক্ষ লক্ষ তরুণ-যুবা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো
ঝাঁপিয়ে পড়ল রক্তের সমুদ্রে
দাউ দাউ করে ভস্মীভূত হলো গ্রামকে গ্রাম
সেই অগ্নিতে দগ্ধ হলো জালিমের প্রাণ
তবু তিনি বললেন- 'মনে রাখবে,
শত্রুবাহিনি ঢুকেছে,
নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে
লুটতরাজ করবে
এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান
বাঙালি নন-বাঙালি যারা আছে
তারাও আমাদের ভাই।'

সারা বাংলা স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর আহ্বানে
আকাশ বাতাস অনুরণিত হলো জলদগম্ভীর গানে
কে এই লম্বমান মানুষ- বাস্তব না অলীক
জাদুকর না নির্ভিক
কেবল একটি তর্জনী মাস্তুলের মতো
নৌকার পালে বাতাস লাগিয়ে ছুটতে লাগল
আর পানির গভীরে দিশা হয়ে থাকল অনড়
এই আঙ্গুল যতদিন থাকবে মাঝিদের মনে
এই আঙ্গুল যতদিন স্থির থাকবে সর্বোচ্চ সম্মানে
ততদিন যাত্রীরা খুঁজে পাবে গন্তব্যের পথ।

বাংলাদেশের বাড়ি

সবারই তো বাড়ি আছে
কেবল যার খেয়ে-পরে বেঁচে আছ
যার জমিতে তোমার ঘর
সেই বাংলাদেশের কোনো বাড়ির কথা বললে
তুমি আতকে ওঠো
একটি নদীকে তুমি বয়ে যেতে দেখ
তাই বলে কি নদীর কোনো উৎসমুখ নেই
নদীর উৎসমুখ থাকে উজানে
স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষ জানতে পারে না
যে বটবৃক্ষের ছায়ায় তুমি বসে আছ
একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজের ভেতর থেকে
সে বেরিয়ে এসেছে
হয়তো পাখির পেটের ভেতর লুকিয়ে ছিল কিছুদিন
হয়তো পাখির বিষ্ঠা-পতনে উদ্গম হয়েছে
কিন্তু বীজের সত্য কিভাবে অস্বীকার করো
তুমি বলবে বাংলাদেশ তো আগেও ছিল

সত্য, তবে ভাষার আগে ভূখণ্ড ছিল
বীজ ও বৃক্ষের মতো, নদী ও পাহাড়ের মতো
ভাষা ও ভূখণ্ড অবিচ্ছেদ্য বেড়ে উঠেছে
কিন্তু তাদের ঘর ও গৃহস্থলি
তাদের মাটি ও মানুষ
ভাষা ও সংস্কৃতি
পাল, সেন, তুর্কি, সুলতান,
নবাব, ইংরেজ ও পাকদের অধীন ছিল
আর বাংলা না তাদের ভাষা, না তাদের
পিতামহ এখানে জন্মেছিলেন
আবার ইতিহাসের সত্য এমন নয় যে
একদিন তারা সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল কিংবা
নটে গাছটি মোড়ানোর মতো গল্প শেষ
হাজার বছরের মিথস্ক্রিয়া, নানা রক্তের মিশ্রণ
তারপর চূড়ান্তভাবে দেশ ও জাতির জন্ম
হয়তো তখন সেটা একটা কুঁড়েঘর ছিল
হয়তো তখন সেটা একটা চারাগাছ ছিল
হয়তো তখন তারা একবেলা না খেয়ে থাকতো
আকবরের সাম্রাজ্য সুসংগঠিত হলেও
বাবর কি তাদের পিতা নয়!
এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিতার প্রতিরূপই তো আজ-
বাঙালির জাতির পিতা
আর সেটি কবে এবং কোথা থেকে শুরু
এ প্রশ্ন তো তুমি এড়িয়ে যেতে পার না
আর এড়িয়ে যাওয়া মানে
তুমি সত্য গোপনকারী
সত্য গোপনকারীকে কেউ পছন্দ করে না।

বাবা

আমার বাবা বড় শক্ত ধাতের মানুষ ছিলেন
পাঞ্জাবিটার বোতাম খুললেই অবাক হয়ে দেখেছি ওই শরীর
কখন বাবা উদোম করেন শরীর
যখন আমার বাবা তিনি শ্বেতশ্মশ্রু কান্তিমান বৃদ্ধ তখন
সারাক্ষণই দ্রব থাকেন অদৃশ্যের নাম জিগিরে
ভয় বলে আর হয় না বলে শব্দ দু'টি অজানা তার চিরদিনের
মোগলরাজের শেষ সীমানায় পা রেখেছেন
ইংরেজের রেজিমেন্টে নাম লিখেছেন
ভারত ভাঙার আন্দোলনে সামনে ছিলেন
বাংলাদেশের স্বপ্ন সে যে তারচে আর
বেশি করে কে দেখেছেন
বাবা বড় শক্ত ধাতের মানুষ ছিলেন
মা বলে সে নরম ছিল
পিঠের পরে কাল গোখরার খড়ম ছিল
আমার মা'র কাছে সে নরম ছিল
হানাদারের আঘাত সয়ে ভাইয়া যখন চলে গেলেন
বাড়ির সবাই কাল বোশেখি ঝড়ের মতো
দমকা দমকা মূর্ছাহত
বাবা তখন আদর করে ভাইয়ার গালে চুমু খেলেন
কত দিনই ঝড় বয়েছে
ঘর ভেঙেছে
উতাল করা ঝড়ের মুখে আমরা তখন হাবুডুবু
দিকভ্রান্ত নাবিক তখন দক্ষপেশী হাল ধরেছে
মুচকি হেসে বলতো খোকা ভয়টা কিসের?
জীবনটা যে অজানারে মৃত্যু ছাড়া
মৃত্যু দিয়েই জীবনটাকে জয় করা যায়
আজো যখন ঝড়ের মুখে উড়তে থাকি
ভাসতে থাকি প্রচলিত স্রোতের সুখে

প্রতিবাদে দাঁড়াইনিকো
বলি আমার শক্তি কোথায়?
হঠাৎ তখন মনে পড়ে শ্বেতশ্মশ্রু কান্তিমান বৃদ্ধটাকে
সন্দ জাগে তিনি আমার পিতা কিনা
না কোনো এক কাপুরুষের জারজ আমি
তা না হলে প্রতিবাদে হয় না মুখর
আদায় করে নেয় না কেন ন্যায্য হিস্যা।

চারণ কবিতায় দয়ার রাজা মুজিবর

"অনেক ধাক্কাধাক্কি করলাম, প্রথম শ্রেণির ভদ্রলোক দরোজা খুললেন না। ট্রেন ভীষণ জোরে চলছে, আমাদের ভয় হতে লাগল, একবার হাত ছুটে গেলে আর উপায় নাই। আমি দুই হাতলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিলাম, আর ওকে বুকের কাছে রাখলাম।

– (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

একজন বঙ্গবন্ধু গবেষক ২০২১ সালের ৩ আগস্ট দৈনিক যুগান্তরে লিখেছেন "১৯৭৫ সালের আগে বাংলাদেশের কোনো লোক-কবি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন কিনা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি, ভবিষ্যতে হলে বলা যাবে।" আমার মনে হয়, এ ধরনের মন্তব্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ। চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই বিশেষ করে সত্তরের নির্বাচনের আগে অসংখ্য লোক-কবি, চারণ-কবি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। প্রতি জেলায় থানায় এমনকি গ্রামে খোঁজ নিলেও বের করা সম্ভব। এ নিয়ে কিছু গবেষণা গ্রন্থ, সম্পাদনা গ্রন্থও রয়েছে। সম্প্রতি বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এ ধরনের একটি কবিতা সংকলন হচ্ছে। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা'র সম্পাদনায় এ নিয়ে কাজ চলছে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমার মধ্যমভ্রাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক বিশ্বাস ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' নামে একটি চারণ কবিতা রচনা করেন। সম্ভবত এই কবিতাটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ চারণ কবিতা, এর আগে আর কোনো কবিতা আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় নি। এই কবিতাটি তখন ঈশ্বরদী ও পাবনা অঞ্চলের বিভিন্ন হাটে মাটে সুর করে খাওয়া হতো। কবিয়ালরা হাটে হাটে বিক্রি করতো। গৃহস্থের বাড়ির উঠানে, বৈঠকখানায় সমবেত হয়ে লোকজন এই কবিতা শুনত। এই কবিতার কথায় ও সুরে মুগ্ধ হয়ে সমবেত জনতা বঙ্গবন্ধুর জন্য অশ্রুপাত করতেন। পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি আরো ক্ষুব্ধ হতেন এবং ঘৃণা পোষণ করতেন। এখনো কবিতাটি এলাকার অনেক লোকের মুখস্ত আছে।

কবিতাটি বাংলা একাডেমির সংকলনসহ নানা উৎসে পাওয়া যায়। ঈশ্বরদী মুক্তিযোদ্ধা সংসদেরও তিনি অন্যতম কর্মকর্তা। তাঁর গ্রামের বাড়িতে একটি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি পাঠাগারের তিনি দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর কবিতাটি এই স্থলে সংযুক্ত করা হলো। আমার জানা মতে, তিনিই প্রথম বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সবচেয়ে দীর্ঘ লোক কবিতা রচনা করেন।

(এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা প্রথম চারণ কবিতার লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুল কালেক বিশ্বাস। কবিতার নাম 'সোনার বাংলার ইতিহাস ও শেখ মুজিবের মুক্তি চাই।' ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে প্রথম চারণটি লেখা হয়। এই কবিতা রচনার সময়ে বঙ্গবন্ধু রাওয়াল পিণ্ডির কাছের এক জেলে বন্দি ছিলেন। কবিতাটি এখানে উপস্থাপন করা হলো। এই কবিতায় তৎকালীন পরিস্থিতির অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। এমনকি সেই সময়ের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার জন্য এই কবিতাটি প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এটি একটি কবিতা হলেও মুক্তিযুদ্ধ কালীন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সঠিক ইতিহাসের তথ্যের প্রাথমিক সূত্র হিসাবেও ব্যবহার হতে পারে।)

প্রথমে আল্লাহ্ ভাবী শেষ নবী দয়ালের কাণ্ডারি
অল্প বয়সে আশাটা যেন পূরণ করতে পারি।
তুমি দয়া কর[২] রহম কর প্রভু করতার,
ঘূর্ণিবায়ুর মাঝে বাঁধলাম ভেনলা পাতার ঘর।
এখন লিখে যাই[২] শোনেন ভাই পূর্ব্ব বাংলার কথা।
পূর্ব্ব বাংলার কথা কইতে মনে লাগে ব্যথা
তবু লিখতে হলো[২] আল্লাহ বল যত মুসলমান
হিন্দু ধর্মে হরি বল বাঁচাও সব সম্মান।
গেল মানির মান[২] ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে এসে
পশুর মতো বাঙালিদের রক্ত নিল চুষে।
কেন এমন হলো[২] প্রশ্ন কর বিশ্ব জনগণ,
প্রশ্নের এখন দিব উত্তর শোনেন দিয়া মন।
প্রথমে ইলেকশন[২] সব আসন আওয়ামী লীগ পাইল,
ব্যাপার দেখে ইয়াহিয়ার মাথা ঘুরে গেল,
গেল ভুট্টোর কাছে[২] অবশেষে বলে আব্বাজান,

বাংলাদেশে এবার মোদের নেই কোনো স্থান।
ভুট্টো অনেক শুনে[২] খুলা পাতিলে গড় খাইয়া পড়িল,
চারদিকে ভুট্টোর খই উপচিয়া পড়িল।
বলে টিক্কা খান[২] আব্বাজান এমন দশা কেন,
আমি চল্লাম বাংলাদেশে ভাবছেন মিছে কেন।
টিক্কা এই বলিয়া[২] সৈন্য নিয়া বাংলাদেশে এলো,
মার্চ মাসে ২৫ তারিখে কারফিউ করে দিল।
শোনেন বঙ্গবাসী[২] হাসি খুশি কান্নাকাটির মাঝে,
পশু সরকার কি কইরাছে সবার জানা আছে।
তাই শটকাটে[২] নয়া হাতে লিখি কবিতা,
এবার শোনেন কামান ট্যাংক মেশিনগানের কথা।
হায়রে হত্যা লীলা[২] এমন খেলা ঘটেছে কোনো কালে,
কোন রাজাতে কামান জুড়ে প্রজা হত্যা করে।
সে ইয়াহিয়া[২] কচু খাইয়া আসল বাংলাদেশে,
নারী ধ্বংস মাল লুণ্ঠন হত্যা করার বেশে।
জ্বালায় বাড়ি ঘর[২] প্রজার উপর চালাইল গুলি,
হায় জানোয়ার মানুষদের রাতারাতি খালি।
যারা ঘুমিয়ে ছিল[২] ঘুমিয়ে রইল চিরদিনের তরে,
কাল কিয়ামতে উঠবে ওরা শহিদের দরবারে।
কিন্তু বাংলাদেশে[২] অবশেষে রক্তের নদী হলো,
রফিক সালাম জব্বার বরকত নৌকার পাল খাটাইল।
মুজিব হাল ছাড়িল[২] বন্দি হলো ইয়াহিয়ার চক্রান্তে,
তাজউদ্দীন নজরুল ইসলাম মাঝির কার্য করেন।
জনগণ মাল্লা হলো[২] হ্যাও বল বীর বাঙালি ভাই,
সূর্য অস্তের আগে নৌকা ঘাটে পৌঁছান চাই।
বাঙালি এই পণেতে[২] সর্বজনে নিল হাতিয়ার,
বাঙালিদের কেচকা মারে জীবন রাখা ভার।
সবাই গেরিলা[২] দেখা যায় চাষীর কাজ করে,
রাত্রিকালে বীর বাঙালি সৈন্য হয়ে পড়ে।
ভাবে মিলিটারী[২] এইরূপ আড়ি সইব কত আর,

কাঁহায় মেলে মুক্তিসেনা কেইছা চিজ তাহার।
রাজাকারদের প্রশ্ন করে[২] ওরা বলে কুচবি মালম নাহি,
সকল কথা শুনে এবার চলে মিলেটারী।
কিন্তু সম্মুখেতে[২] এ্যাম্বুস আছে কে জানেরে ভাই,
এক ফায়ারে শত[২] খতম হইয়া যায়।
মেজর ফোন ধরিল[২] বাতাইল হেঁয়া মুক্তি মেলে,
হাজার[২] পাক সেনা ক্যাম্প করিয়ে বসে।
জ্বালায় বাড়ি ঘর[২] প্রজার উপর চালায় অত্যাচার,
মুক্তিদের খানা দাও রেশন নাও আমার।
ওরা বাঙালি[২] ভুলিনি মা বোনদের কথা,
বাপের সামনে মেয়ে হরণ কাটে ভাইয়ের মাথা।
কোলের শিশুদের[২] কেড়ে নিয়ে বলে মায়ের কাছে,
ব্যানেট চার্জ কর ওর কলিজার উপরে।
মা রাজি হয় না[২] বলা যায় না শুকরের কাণ্ডখানা,
মায়ের স্তন কেটে ফেলে দুগ্ধ আর মেলে না।
কাটে সরম স্থান[২] পশ্চিমা খান রাখে রাজ পথেতে।
শিশুগুলো মোর ওরা ব্যানেট চার্জ করিয়ে
আর যুবতী[২] বলার নি, মাফ করিবেন মোরে,
ওদের সামনে পড়লে পরে সেথায় ধর্ষণ করে।
যারা অতি সুন্দরী[২] চালাইয়া গাড়ি নিয়ে যায় ক্যাম্পেতে
এইরূপে কত নারী[২] ছাড়ছে বাড়ি হইছে স্বামী হারা
নারী জাতিদের রক্ষা করলেন বোন রওশনারা।
ডেনামাইন বুকে বেঁধে[২] জলদি বেগে চলে রাজ পথ ধরে,
মিলিটারির উপর জীবন বিসর্জন করে।
ট্যাংক মারল একখান[২] ইয়াহিয়া খান কেমন বুজছেন হালায়,
নারী পুরুষ এক হইয়া যুদ্ধ মোরা চালাই।
এ জয় হবে মোদের[২] নাইকো আর দেরি শান্তি কমিটি ভাই
অল্প দিনে অশান্তি কইরা দিতে চায়।
এবার মানকচরী[২] বিল পুকুর বাসা বাড়ি হলো,
তার সঙ্গেতে রাজাকারদের দাওয়াত পড়ে গেল।

সবাই এক সঙ্গেতে[২] ওই খানেতে হাজির হওয়া চাই,
বেনেট চাকু লেবুর রস পুরবো তোদের গায়।
আর দেরী নাই[২] চল যাই গাজি হইবারে,
মরার দিন চলে গেছে ডিসেম্বরের আগে।
আর মরব নাকো[২] এবার দেখ শরণার্থীর কথা,
শরণার্থীর কথা লিখতে মনে লাগে ব্যথা।
তবু লিখতে হল এবার চলো হিন্দুস্থানেতে
এককোটি শরণার্থী রইচে সেখানেতে
ওরা এত পাপি[২] এত তাপি বলা নাহি যায়,
পশু রাজার অত্যাচারে গৃহ হারা হয়।
দৈনিক লক্ষে[২] শূন্য হাতে দেশ ছেড়ে চলিল,
নিষ্ঠুর কলেরা তাদের গ্রাস করে নিল।
মরে হাজার[২] হাট-বাজার বন্ধ হইয়া গেল,
কত মানুষ অনাহারে ভুখ লেগে মরিল।
হায়রে কষ্ট কত শত শত[২] লক্ষাধিক মরে।
একই আদমের সন্তান ওরা তুলে নাওগো ঘরে।
ভারত একা দেখে সবাক ডেকে[২] পায় না কোনো সাড়া,
নাকে তেল নিয়ে ঘুমিয়ে রল বিশ্বের ধনী যারা।
ভাবে ইয়াহিয়া[২] সৈন্য নিয়া বেরাতে দিল,
গেরিলাদের কেচকা মারে দিশাহারা হলো।
বলে ভারত যুদ্ধ[২] কেন ক্রুদ্ধ বাঙালিরা ভাই।
ঐ সঙ্গে বিশ্বের বুকে ধোকা দিতে চায়–
তাই আমেরিকা[২] চীন বুকা নাচে বুচা কানে
গণতন্ত্রকে নষ্ট করবে এ ভর সংসারে।
পাগলা ইয়াহিয়া[২] আশা পাইয়া পাঠায় নিয়াজিকে।
ভিক্ষার ঝুলি কান্দে করে বেড়ায় বিশ্বের বুকে
কেউ দেয় না ভিক্ষা[২] পাইল শিক্ষা করে হায়রে হায়
এবার আমি রাজ্য ছেড়ে কোন দেশে পালাই–
আর উপায় নাইকো[২] অন্ধ দেখ ডাকও নিয়াজিকে।
সৈন্যদেরকে আদেশ কর ও চালাও ভারত দিকে

আর দেরি নাই কোথা যায় এসে দেখি শুনি
মাথা তুলে খাড়া হল ধৈর্য্যশীল বাঙালি।
২ তারিখ রাখবেন মনে সর্বজনে, ডিসেম্বর মাসেতে
স্বীকৃতি নিল আজ বাঙালিদের ভাগ্যে
বাঙালি বন্ধু পেল[২] খাড়া হলো মারণ অস্ত্র নিয়ে,
দিগবিজয়ীয়ের নেশা লইয়া চলে আপন দেশে
বন্ধুভুটান এসে[২] দাঁড়ায় পাশে আরও শক্তি হলো,
বন্ধু সৈনিক অররা সেনাপতি ছিল,
আরও মানেক শাহ[২] কর্নেল ওছমান আরও কতজনে
সবাই মিলে লড়ল ওরা জীবন মরণ পণে
যুদ্ধ শুরু হলো পোহাইল চার পাঁচটা দিন
এর মাঝেতে ৬-৭ জেলা হইল স্বাধীন,
এবার ঢাকার দিকে[২] এক সঙ্গেতে মার্চ করে চলিল,
ব্যাপার দেখে নিয়াজি কোন খাইয়া বসিল
বলে অররাকে[২] তার যোগেতে মৃত্যু ভাগ্যে বুঝি
জীবন ভিক্ষা চেয়ে লইলাম বিহারি পাঞ্জাবী
অররা মেনে নিল[২] সময় দিল কর সারেন্ডার–
বাঙালিদের আদেশ করল মারবে নাকো আর।
ওরা বন্দি সবে[২] বিচার হবে বঙ্গবন্ধু এলে।
মুক্তিসেনাদের ছালাম জানাই রাখি এই খানে :
শোনেন শ্রোতাগণে ধীরমনে ভুল পড়েছে ভাই।
মার্চ মাসের ৭ তারিখে জাতির পিতা কয়
ঘরে[২] দুর্গ গড় অস্ত্র ধর বন্ধ কল-কারখানা,
পশ্চিমারা বাংলাদেশে একজনও থাকবে না বাঙালি তাই করিল,
হাতে নিল মারণ অস্ত্র সবে,
২৫ তারিখে জাতির পিতা বন্দি বাসভবনে।

(নোট : ২ চিহ্নিত বাক্যটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হবে।)

শেখ মুজিবের মুক্তি চাই (ভাটিয়ালী সুরে)

১. বিশ্ববাসী ঘুমাইওনা মোদের দুঃখ দেখে যাও। ঐ
বিনা শর্তে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে দাও।
ছালাম জানাই বঙ্গবাসীকে ছালাম জানাই বিশ্ববাসী
জাতির পিতার বঙ্গভবনে ইয়াহিয়ার ফাঁসি
মুক্তিযাদ্ধোদের বলি আমি নিজের দেশকে গড়ে নাও। ঐ

২. জাতির পিতা মুজিবর পান না কোন ভয়-ডর
বাঙালিদের জন্য তিনি ছাড়লেন আপন বাড়ি-ঘর
ইয়াহিয়ার ধরছে টুটি বাঙালিরা এগিয়ে যাও। ঐ

৩. আয়ুবের ষড়যন্ত্র রক্তগঙা গণতন্ত্র।
ইয়াহিয়ার যাদু মন্ত্র ভুট্টা সাহেবের আদিঅন্ত
বঙ্গবন্ধু করছে বিসর্জন বিশ্ববাসী দেখে যাও। ঐ

৪. সাড়ে সাত কোটি বাঙালি একই নামের অধিকারী
যে নামেতে যুদ্ধ করি যার জন্য ছাড়ছি বাড়ি
শেখ মুজিব[২] শেখ মুজিবকে ছেড়ে দাও। ঐ

৫. হায়গো পিতা কত কষ্টে রইচ পিণ্ডির কারাগারে
তোমার ছেলেরা স্বাধীন, পেয়েছে রক্ত রাঙা বাংলাদেশে
মা মোদের বাংলার মাটি চোখের জলে ভাসাই নাও। ঐ

৬. বাংলাবাসীর কাছে আমি করি এই মিনতি
মুক্তি সেনার কথা মোরা না যাব গো ভুলি
ওদের রক্তের উপর ভাসাল এবার শেখ মুজিবের বাংলার নাও। ঐ

৭. কতক জনক দেখা যায় চেয়ারে বসিয়া
বড় বড় লিকসার দেয় মুচে তেল মাখিয়া–
নেতাগুলি এসে এবার মুক্তি সেনাকে সালাম দাও। ঐ।

৮. সাবাস[২] মুক্তি সেনা সাবাস বাঙালি

তোদের তুল্য বিশ্বের বুকে নাইকো কোনো জাতি
চীন আমেরিকা এসে তোমরা বাঙালিদের দেখে যাও। ঐ

৯. মুক্তি সেনা খালেক বলে স্মরণ করতে চাই
চীন আমেরিকা দেখে আমরা করি নাকো ভয়
প্রয়োজন হলে হামলা করব বিশ্ববাসী জেনে নাও। ঐ

১০. বলে রাখছি ইয়াহিয়া বাংলার কথা যাও ভুলিয়া।
সমস্যা হল নিয়াজিকে লইয়া লক্ষাধিক সৈন্য দিয়া।
মুজিবের পায়ে মাথা রেখে বাংলাদেশে রেখে যাও। ঐ

১১. দয়ার রাজা মুজিবর ভুট্টোকে নিয়ে পায় ধর
মাফ করিলে রিহায় পাবি নইলে বলছি হুশিয়ার–
দেরী করলে সৈন্য নিয়ে নিয়ে পাকিস্তানে রেডি হও। ঐ

১২. বীর বাঙালি অস্ত্র ধর পাকিস্তানকে হামলা কর–
ঐ সঙ্গেতে চীন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদীকে খতম কর
সূর্য অস্তের সীমানায় যাবে শেখ সাহেবের বাংলা নাও। ঐ

১৩. মা জাতি ইন্দ্রাগান্ধী মায়ের নৃত্য করছে কাজ।
তাহার দয়ার অনুগ্রহে বাঙালিরা বাঁচল আজ
মা ইন্দ্রাকে নমস্কার জানাই ভারতবাসী জিন্দারও। ঐ

১৪. তোমরা মোদের মৃত্যুর সাথী অন্ধকারের আলোর বাতি
তোমাদের জন্য বেঁচেছি মোরা জন্ম নিয়েছে নতুন জাতি
নতুন দেশকে গঠন কর বিশ্ববাসী অর্থ দাও। ঐ

১৫. মা ইন্দ্রাকে বলতে চাই দেশ মোদের স্বাধীন নয়,
জাতির পিতা বন্দি রয় কেমনে এদেশ স্বাধীন হয়,
পশ্চিম পাকিস্তানকে দখল করতে অররাকে পাঠাইয়া দাও। ঐ

১৬. মহান রাষ্ট্র রাশিয়া যুদ্ধ দেখে ভয় করে না,
এত বড় শক্তি যাদের কেন মুজিব বন্দি রয়,

একটা বারে ধমক দিয়ে ভুট্টার খাই উড়ে দাও। ঐ

১৭. শোন ভুট্টা বলতে ঢাক তোর° বেশি ভরসা নাই।
ঠাণ্ডা বালিতে খই ফোটে সর করলে হবি ছাই,
তোরে এবার পুকায় খাবে মুজিবরকে পাঠাইয়া দাও। ঐ

১৮. শোনেন যত শ্রোতা ভাই লিখি মোর পরিচয়,
নামটি আমার আব্দুল খালেক চরগড়গড়ী বাড়ি হয়,
বাড়ি পুড়া করছে ছাই নেতাগুলি দেখে যাও। ঐ

১৯. আমি একজন ছাত্র বটে পাবেন না মোরে হাটে-বাজারে
মুক্তিযোদ্ধা হয়ে এবার ঘুরে বেড়াই মাঠে-ঘাটে,
বাংলার সরকার জলদি করে মোদের ব্যবস্থা কইরা দাও। ঐ

২০. আমার মত মুক্তিসেনা কতজনা খেতে পায় না
যাদের রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন তাদের কথা ভোলা যায় না,
তাড়াতাড়ি তাদের নিয়ে নিজের কাজে দিয়ে দাও। ঐ

২১. হাটে বাজারে আমাকে দেখবেন না ভাই বিকাইতে
পাইকারীতে সস্তা আছে দিব আসল দরে,
বর্তমান পঁচিশ পয়সা জনগণ নিয়ে যাও। ঐ

প্রত্যন্ত গ্রামের প্রথম চারণকবি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক বিশ্বাসের মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মৃতি ও তাঁর কবিতা নিয়ে একটি আকাড়া স্মৃতিচারণ লিপিবদ্ধ করা হলো। ইতিহাসের প্রয়োজনে এর গুরুত্বও কম নয়।

সূচনা :

৭০ সালের নির্বাচনের আগেই আমরা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে উজ্জীবিত হয়েছিলাম। তিনি আমাদের প্রায় সকল চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। তাঁর সকল কথাকে আমরা অবশ্য পালনীয় মনে করতাম। ৭০-এর নির্বাচনের সপ্তাখানেক আগে আমাদের চরকুড়ুলিয়া হাইস্কুল মাঠে জামায়াত ইসলামের নেতা সোবাহান মৌলানা, মতিউর রহমান নিজামী আরো দুইজন লোক তাদের নাম আমার এই মুহূর্তে মনে নেই। এই চারজন নির্বাচনী জনসভা করতে এসেছে মাইক বাঁধা শেষ, সভার কার্যক্রম শুরু। এই সময়ে আমি ঐ সভা বাধা দেয়ার জন্য এলাকার ছেলেদের মধ্যে মাঠে বল নামাতে বললাম। যা কথা তাই কাজ মাঠে বল নেমে গেলো। মুরুব্বীরা আমার অন্যান্য কাজে বাঁধা দিলেও এ কাজে বাঁধা তো দিলেনই না উল্টো আমার সাহসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর এটা করা সম্ভব হয়েছিল এই জনই যে তৎকালীন সময় আমাদের সারা গ্রামে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যকোনো দলের একজন সদস্যও ছিলনা। আমাদের গ্রামখানি পাবনা, ঈশ্বরদী ও কুষ্টিয়া থানার বর্ডার, ক্যানালের ওপারে কয়েক ঘর লোক ঈশ্বরদী থানার মধ্যে বাস করে, তার পর থেকে পাবনা থানা। এলাকার লোকের ভাষায়, কেনেলের ওপারের লোক অর্থাৎ কেনেলের ওপারে কয়েক ঘর লোক মুসলীম লীগ ও জামায়াত ইসলামের সমর্থক ছিলেন। অবশ্য যুদ্ধচলাকালীন সময় তারা ওই দুই দল ত্যাগ করে কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারাই নির্বাচনের পূর্বে জামায়াত নেতাদের আমাদের গ্রামে এনেছিল। একদিকে জনসভা অন্য দিকে ফুটবল খেলা চলছে। জামাতের চরিত্র অনুসারেই তারা কথা বলতে লাগল। হঠাৎ একটা বল এসে সোবাহান মৌলানার পিঠে লাগল। তখন তারা আর সভার কাজ চালানোর সাহস পেল না। যারা সভা করতে এনেছিল তারা সবাই কাবলী পাড়ার লোক। অর্থাৎ কেনেলের ওপারের। ৬৯ সাল থেকে ২৫ শে মার্চ ৭১ সাল পর্যন্ত সারা বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তান ছিল জনতার দখলে। শুধু ব্যাংক ট্রেজারি সরকারের হাতে ছিল। বাকি ছিল সব বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণে। শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া তেমন হয়নি। আমাদের স্কুল থেকে মাঝে মধ্যে আমি মিছিল বের করতাম। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর আমরা বেশ কয়জন ট্রেনিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কে ট্রেনিং করাবে?

আমার ছোট মামা জহির উদ্দীন অর্থাৎ আমার মায়ের ফুফাতো ভাই আনসার ছিলেন। তিনি আমাদের ট্রেনিং করাতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আসলে উনি আমাদের শারীরিক ট্রেনিং ছাড়া তো অস্ত্রের ট্রেনিং দিবেন কিভাবে সুতরাং সে ট্রেনিং করা হলো না। সেই ভয়াবহ ২৫ শে মার্চ কালো রত্রি এলো। ওই রাতের ভয়াবহতা সেদিন আমরা গ্রামে থেকে বুঝতে না পারলেও পরবর্তী ৯ মাস বুঝেছি তার ভয়াবহতা।

৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে আমার নেতৃত্বে নৌকা মার্কার পক্ষে প্রায়ই মিছিল হতো। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে কাগজের মালা প্ল্যাকার্ডে সেটে আমরা মিছিল করতাম। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তখন আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তখন কবিতা বলতে ছিল চারণ কবিতা। কবিয়ালরা হাটে হাটে সুর করে গেয়ে এই কবিতা বিক্রি করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরাই আমার লেখা দুটি কবিতা এলাকায় খুব নাম করেছিল। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগেই আমি 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' নামে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখি। যেটি পাবনা শহরের বুলবুল আর্ট প্রেসে ছাপা হয়। এই কবিতাটি এলাকার মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ

২৭ মার্চ '৭১ সাল সকাল থেকে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। লোকমুখে শুনতে পেলাম পাকসেনাদের সঙ্গে বাঙালিদের যুদ্ধ হচ্ছে। হচ্ছে বিহারি বাঙালি কচু-কাঁটাকাটি। মাঝে মধ্যে পাবনা শহর থেকে গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আবার কেউ কেউ বলছে হেমায়েতপুর টিকোরি গ্রামে সাধারণ জনগণের সাথে পাকসেনাদের সম্মুখ যুদ্ধ হচ্ছে। তাই শুনে আমি আমার দলবল নিয়ে ছুটলাম যুদ্ধ করতে। দলবল বলতে যে কয়জন সকাল সন্ধ্যা সব সময় এক সঙ্গে থাকি। ছাত্তার, ইয়াকুব, মসলেম, ওমর সাথে আরও কয়েকজন অছাত্র, দাপুনিয়া পার হয়ে যখন আমরা টিকোরী গ্রামে ঢুকলাম তখনই দেখতে পেলাম হাজার হাজার নারী-পুরুস রাস্তার উপর ভিড় করে আছে সবার হাতেই কোনো না কোনো কিছু আছে। দা-কুড়াল, লাঠি, বল্লম, ফালা, ঢাল, সুড়কি আমাদের কাছে একটি সাইকেলের চেইন কয়েকটি সেভেন গিয়ার চাকু। উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলাম পাকসেনারা কোথায়? জনতাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলছে ওইতো সামনে, আমরা বীরের মতো এগিয়ে গেলাম, প্রায় কাশিপুরের নিকটে। কোথাও পাকসেনাদের দেখতে পেলাম না।

আমরা পাকসেনাদের কাছে যাবো ও তাদের মারবো এই আমাদের উদ্দেশ্য। পাবনা বিসিক এলাকায় যুদ্ধ চলছে, শহর থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে আমরা অবস্থান করছি। সামনের দিকে পা বাড়াতেই আধা বয়সী এক মুরুব্বী আমাদের বাধা দিয়ে বললেন তোমরা ও দিকে কোথায় যাচ্ছো? গুলির শব্দ শুনতে পারছো না? আমি মুরুব্বী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের হাতে তো গুলি বন্ধুক নেই। তা হলে কি গুলি করতে করতে ওরা এদিকেই এগিয়ে আসছে? এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের ডেকে নিয়ে কড়া শাসন করে বললেন, আমরা খালি হাতে এক পাও যেন অগ্রসর না হই। সেখানে হাজার হাজার নারী পুরুষের জটলা, মেয়েরা আগতদের কলস কলস পানি খাওয়াচ্ছে। মানুষ ছুটাছুটি করছে কে কি করবে কোনো দিক নির্দেশনা পাচ্ছে না, শহরে আটকে পড়া আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অনেকে অপেক্ষা করছে। সূর্য হেলতে হেলতে পশ্চিম আকাশে যেয়ে অবস্থান করছে আর কিছুক্ষণ পরই অন্ধকার নেমে আসবে। সাথীরা বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। কোনোকিছু আমাদের জানা হলো না শহরে কি ঘটল। আমরা বাড়ি ফিরে আসলাম রাত ১২ টা পর্যন্ত এলাকার যুবকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক ঠিকই হলো, কিন্তু কি করতে হবে তার কোনো সুরাহা হলো না, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো পরের দিন আবার যেতে হবে ভোর হতে না হতেই; মা খাওয়ার তৈরি করে দিলেন। আমরা আবার ২৮ তারিখে টিকোরী গ্রামে গিয়ে হাজির। জানতে পারলাম সব পাকসেনা মারা গেছে, পাবনা জেলা মুক্ত। আমরা আনন্দে আত্মহারা। পাবনা জেলা যেমন হয়েছে তেমনই অন্যান্য জেলাও হয়ত মুক্ত হয়েছে। যুদ্ধ সমন্ধে আমাদের প্রাথমিক ধারণাও ছিল না, সন্ধ্যার সময় রেডিও থেকে শুনলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিলখানা ও রাজারবাগে ওরা ঘুমন্ত ছাত্র বি.ডি.আর পুলিশের উপর গুলি চালিয়েছে। তাতে হাজার হাজার লোক মারা গেছে। ওদের নীলনকশা পূর্ব থেকেই করা ছিল, সেই অনুযায়ী ওরা হত্যা করেছে। তবে বি.ডি.আর পুলিশর সহজেই ছেড়ে দেয়নি, সেখানে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে।

শহিদের লাশ কাঁধে নিলাম

পরের দিন আমাদের গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মাধপুর গ্রামে গুলির শব্দ শুনে আমরা চরকুড়ুলিয়া স্কুল মাঠে জমা হতে থাকি। প্রায় ২০-২৫ জন যুবক মাধপুরের দিকে রওনা হলাম। আবারও সেই লাঠি, চাকু আর দা হাতে করে ছুটলাম। ততক্ষণে পাকসেনারা এলাকা ত্যাগ করে চলে গেছে। মাধপুর

গ্রামের লোকেরা শহিদদের লাশ নিয়ে কাশেম ব্যাপারীর বাড়ির সামনে রেখেছে। আমার জানা মতে এটিই ঈশ্বরদী উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রথম শহিদ। আমি ভাগ্যবান ব্যক্তি শহিদদের একজনের লাশ কাঁধে করে মাধপুর থেকে বাঁশেরবাদা স্কুল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছি। বাড়ি দূরে হওয়ার কারণে ওখান থেকে আমাদের ফিরে আসতে হয়েছে।

মাধপুরের বটগাছ আমার জীবনের অনেক কর্মের স্বাক্ষী, স্বাধীনতার পরে আমরা ওই বটগাছ তলার নাম দিয়েছিলাম আগরতলা। এর কারণ আমরা প্রায় ৭০-৮০ জন ছাত্র চর গড়গড়ি এলাকা থেকে বাঁশেরবাদা স্কুলে পড়তে যেতাম। স্কুল ছুটি হলে কেউ যদি আগে চলে আসত সে ওই বট তলায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করত। সবাই একত্রিত হয়ে চরের পথে পা বাড়াতাম আমাদের শলাপরামর্শ হতো ওই বটতলা বসেই, এই জন্য আমরা ওই বটতলার নাম আগরতলা দিয়েছিলাম। বট গাছটি অবস্থানগত কারণেই আমাদের তার তলায় বসতে হতো। মাধপুর গ্রামের শেষ সীমানা খালপাড়ে এবং আমাদের গ্রামে ফেরার প্রথম সীমানা। গাছটির উত্তর পাশে মাধপুর গ্রাম, বাকি তিন দিকে কোনো ঘর-বাড়ি নেই। যেকোনো পথিকের সেখানে একটু বিশ্রাম না নিয়ে বটগাছটি ত্যাগ করা খুব কষ্টদায়ক ছিল। বর্তমানে ওই বটগাছের নিচে শহিদ স্মৃতিসৌধ তৈরি হয়েছে। আমার যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত বটগাছটি ঐতিহাসিক মর্যাদা নিয়ে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদেরই সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে। ওই বট গাছটাকে আমি সারাজীবন মনের খুব গভীরে ধরে রেখেছি এবং সারাজীবন রাখব। প্রিয় পাঠক যদি কখনো সুযোগ পান দেখে আসবেন মাধপুর গ্রামের ঐতিহাসিক বটগাছটি ওই গাছের আশপাশে প্রকৃতি বর্ণনা দিতে গেলে কথার পাতা এতটাই ভারি হয়ে যাবে- পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে। তবু দু এক লাইন না লিখলে বটগাছটিকে অপমান করা হবে। পদ্মা নদীর পাড় থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে গাছটির নিচ দিয়ে বয়ে গেছে মাধপুরের দহ, এই দহতে হাজার হাজার একর জমি পানিবদ্ধ হয়ে থাকত লোকমুখী আছে মাধপুরের দহে দেও-দৈত্য বাস করে। দহের মাঝখানে পানির পরিমাণ ছিল ২৫/৩০ ফিট আমরা ছোটবেলায় দেখেছি সিরাজগঞ্জের এক গাড়োয়ানের মহিষ ওই দহে নেমে আর উঠতে পারেনি। বড় বড় মাছে ভরপুর থাকতো। দহটা পরে আয়ুব সরকার পদ্মার সাথে সংযোগ খাল কাটলে ধীরে ধীরে পানি কমে জমি জাগতে থাকে। এখন সবুজ ক্ষেত্রে ভরপুর, হাজার হাজার একর জমি। সে দহ এখনো শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়নি। বর্ষাকালে বটতলা থেকে

তাকালে বিশাল নদী মনে হবে, শুকনোর সময় তাকালে বিশাল সবুজ মাঠ, প্রকৃতি সকল শোভা তাকে ঘিরে রয়েছে।

প্রথমবার যেভাবে ভারতে গেলাম

আমার মেজো খালার মেজো ছেলে নুরুল ইসলাম। আমার বাড়ির পূর্বপার্শ্বে ওমর, শফিকুর রহমান, মসলেম, ছাত্তার ও মুজাম আর আমি এই ছয় জন গোপন বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিলাম এই যে, আগামীকাল ১ লা মে ভারতে ট্রেনিং নিতে বাড়ির লোকের অজান্তে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাবো। যা কথা তাই কাজ। নুরু ভাই আমাদের গাইডার, সফি মামা উনিও কুষ্টিয়া শহরে থাকতেন কুষ্টিয়া জেলার বর্ডার দিয়েই আমাদের পার হতে হবে। আমাদের বাড়ি থেকে জলঙ্গী বর্ডার প্রায় ৪০ মাইল হবে। সারা দিন হাঁটতে হাঁটতে আমরা বিকাল ৪ টার সময় বর্ডার পার হলাম। বর্ডার সমন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না, মনে করতাম হয়ত চারিদিকে ঘেরা, না তা নয়, জলঙ্গী নামের পদ্মার একটি শাখা নদী রয়েছে। নদীটি দুই দেশের বর্ডার অর্থাৎ এপারে পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ ওপারে ভারত মাঝখানে দুই দেশের সীমানা ঘেরা ছোট একটি নদী। ডিঙি নৌকায় পার হলাম। পার হতে গিয়ে যা দেখলাম - তা দেখে ভারতে ঢোকার ইচ্ছা শেষ হয়ে গেলো, নদীর মাঝখানে ৪/৫ টা লাশ ভাসতে ছিল। একটি লাশ ফুলে এক পা উঁচু করে ভাসতে ভাসতে নদীর কিনারে বেঁধেছিল। আগের লাশগুলো দেখে আমি প্রথমে মানুষ বলে বিশ্বাস করতে পারিনি। পা উঁচু লাশটা দেখে আমি মনে মনে ভয় পেয়ে গেলাম। আমি স্বাভাবিক মৃত ব্যক্তিকে দেখতে যেতাম না। এমনকি নতুন কবরের পাশ দিয়ে যেতেও ভয় পেতাম। আর সেই মানুষ আজ দেখছি লাশের মিছিল। কোনোমতে ডাঙায় উঠলাম। কিছুদূর হেঁটে গিয়েই পেলাম উঁচু কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দুধারে পড়ে আছে কঙ্কাল। সদ্য মরা কিংবা গত দু একদিন আগের মরা রাস্তার দুধারে কি পরিমাণ লাশ পড়ে ছিল তার হিসাব সেদিন করিনি। আজকের বয়স হলে ঠিকই করতাম। লাশ দেখতে দেখতে চললাম জলঙ্গী বাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের ইউথ ক্যাম্পে। পরে আর লাশ দেখে ভয় হয়নি। এতে মানুষের লাশ কিভাবে রাস্তায় দুধারে এলো, জানতে চাইলাম এক স্থানীয় যুবকের কাছে সে বললো বর্ডার খুলে দেওয়াতে হঠাৎ করে এত লোক এসেছে যে, ভারত সরকারের সামাল দেওয়া কষ্টকর। খাদ্যাভাবে প্রথম প্রথম মানুষেরা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েছে দূষিত পানি পান করেছে, যার জন্য কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে এলাকাতে। যার কলেরা হয়েছে

তার শেষ পরিণতি মৃত্যু। এমনও দেখা গেছে রাস্তা চলতে চলতে কারোর কলেরা হয়েছে–তাকে আর সাথীরা সঙ্গে নিয়ে যায়নি। আমরা স্থায়ী মানুষেরা যতদূর পেরেছি সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া পশ্চিম বাংলার প্রায় লোকেরই আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশে আছে, আত্মীয় স্বজনরা প্রায় সকল বাড়িতেই ভর্তি।

যাদের আত্মীয়-স্বজন নেই তারা দূষিত পানি, বাসী-পঁচা খাবার খেয়ে খোলা আকাশের নিচে স্বল্প জায়গায় বসবাস করত। অতিরিক্ত লোকের চাপের কারণে ব্যাপকহারে কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে। কলেরার প্রকট এতটাই যে কোলের শিশু যদি একবার বমি করেছে মা ধরেই নিচ্ছে যে শিশুটি আর বাঁচবে না। মা শিশুটিকে ফেলেই চলতে শুরু করছে। যাদের সঙ্গে নিজ পরিবারের লোকজন আছে তাদের মৃত্যু একটু সম্মানজনক হচ্ছে, আর যাদের কেউ নেই তাদের লাশগুলোই নদীর জলে বা রাস্তার দুধারে পড়ে আছে। আমাদের নদীতে তেমন বড় মাছ বা কুমির নেই সে কারণে লাশ নষ্ট হতে দেরি হচ্ছে। রাস্তার ধারের লাশগুলো অবশ্য শিয়াল কুকুররা মনের সুখে সাবাড় করছে। এ ছাড়াও চোখ উঠা রোগ সারা নদীয়া জেলায় ছড়ে পড়েছে। দুটি রোগই সংক্রামক বা ছোঁয়াছে রোগ। আমাদেরও হচ্ছে, চোখ উঠলে আমরা বলি জয় বাংলায় ধরেছে। যার সঙ্গে আলাপ করতে ছিলাম সে একজন স্বেচ্ছাসেবক। তার আলাপ চারিতার মাঝেই এটাই স্পষ্ট হয়ে গেল যে ভারতের যুব সম্প্রদায় আমাদের দেশের শরণার্থীদের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সাহায্য করছেন। সন্ধ্যার খাওয়ার আমরা সেরে একটি তাবুতে ঘুমাতে গেলাম। ওই রাত্রি আমার আর ওমরের সেন্ট্রি ডিউটি পড়ল। রাত্রী শেষের দিকে ওমরের ডায়রিয়া শুরু হলো। বাস্তবতা এই যে ওমরের নির্ঘাৎ মৃত্যু। ওমর আমার খেলার সাথী ছিল। আর্থিক অনটনের মাঝে সে বড় হয়েছে ওমরের মা এর স্বপ্ন হলো ওমর বড় হলে ভালো একটা চাকরি করবে তারা একদিন সুখের ঠিকানা খুঁজে পাবে।

ওমরের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিল কারণ ওমরের আর আমার জন্ম মাত্র সাত দিনের ব্যবধান, তবুও সংগত কারণেই ওমরের অবস্থানটা আমাদের পরিবারের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে পরিবারে সদস্য হিসাবে থাকত। আমাদের স্বাস্থ্য এবং গায়ের রং প্রায় এক ছিল। সব মিলে ওমর আমার জমজ ভাই এর মতো ছিল। যে কয়জন আমরা এক সঙ্গে ভারতে গিয়েছিলাম তারা সব এক জায়গায় হলাম। ওমরের কিছু একটা হলে ওমরের মাকে বাঁচানো যাবে না। সুতরাং ওমরকে তার মা এর কাছে নিয়ে

যেতেই হবে যেকোনো মূল্যে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি সহজেই রাজি হলো। বাড়ি ফেরার জন্য আবার কেউ বলল এত রাস্তা কি করে অসুস্থ মানুষ নেওয়া যাবে। আমার সাথে ছাত্তার আর মসলেম থাকলে যেকোনো অসাধ্য কাজ অতি সহজেই করতে পারবো। মসলেম যেমন স্বাস্থ্যবান তেমন দুঃসাহসি। মসলেম বলল ব্যাটা কোনো চিন্তা করো না যদি রাস্তায় মারা যায় ওর লাশ মাথায় করে নিয়ে যাবো ওর মার কাছে। মসলেমের কথায় ছাত্তার জোরাল সমর্থন করল। আমরা ওমরকে নিয়ে ক্যাম্প থেকে ভোর রাত্রে রওনা হলাম। ক্যাম্পের কেউ বিষয়টি জানতে পারলো না। ভারত থেকে ১০ মাইল দূরে কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে আসার পরে ওমর অনেকটা সুস্থতাবোধ করতে লাগল। আমরা বিকালে গ্রামের বাড়ি ফিরে এলাম ওমরের ডায়রিয়া আসার পথেই ভালো হয়ে গেল। ওমর আজও ভালো আছে। কিন্তু নেই তার সেই মমতাময়ী মা আর ছোট ভাই ওসমান। কিছু দিন পরে তারা কলেরাতেই মারা যায়। ওমরের বাবা ভিন এলাকায় ব্যবসা করতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেননি। বড় ভাইটাও মারা গেছেন। আমার জানামতে ওর ছোট দুই বোন আর ওমর জীবিত আছে। আমার খালাত ভাই নুরুল ইসলাম উনার বাড়ি কুষ্টিয়াই হওয়ার কারণে করিমপুর ইউথ ক্যাম্পে চলে গিয়েছিলেন। পরে উচ্চ ট্রেনিং নিয়ে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাড়ি ফিরে আমাদের আর ফিরে যাওয়া হলো না। দিন কোনোমতে চলে যায়। রাত হলেই আমরা ভারতে যাওয়ার জন্য ছটফট করতাম। সন্ধ্যা ছয়টায় রেডিও নিয়ে বসতাম। সফি মামাদের কাঁচারি ঘরের সামনে পাড়ার ছোট বড় সবাই এসে হাজির। কেউ পাটি পেড়ে, কেউ বিছালী পেড়ে, কেউ গামছা পেড়ে কেউ কেউ আবার মাটির উপরেই বিয়ের আসনের মতো করে বসে পড়তেন। শুরু হত ভারতের বাংলা সংবাদ। পাঠক পীযূষ বন্দোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়– এই দুই সংবাদ পাঠকের নাম বাঙালিদের মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর শুরু হতো স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র। সংবাদ যাইহোক না কেন এম,আর মুকুল সাহেবের চরমপত্র পাঠ, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ মুক্তিযোদ্ধাদের জয়বাংলা ধ্বনি আর নজরুলের গানসহ আমাদের দেশাত্ববোধক গান শুনলেই যেকোনো বাঙালির প্রাণ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ছটফট করবে। আমার কাছে এখন মনে হয় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র একাই হাজার হাজার মুক্তিসেনার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারত ও স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদের সততা যাচাই করার জন্য বিবিসি শোনার অপেক্ষায় মানুষ বসে থাকত। সে সময় বিবিসি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছে।

মানুষের আতঙ্ক এই পাকসেনা এলো, এই নকশাল এলো আমাদের গ্রামের তিন চার মাইলের মধ্যে কোনো রাজাকার ছিল না। একটি পরিবার মুসলিম লীগ সমর্থন করতো। তারা মুসলিম লীগের নিরীহ প্রকৃতির ছিল। তারা কোনো সময় কোনো গোলযোগে যেত না।

দ্বিতীয়বার ভারতে

আমরা ভারত থেকে ফিরে আসার পর প্রতিদিন শলাপরামর্শ করি– কবে, কিভাবে ভারতে ট্রেনিং নিতে যাব। আজ যাই কাল যাই করে প্রায় দুই মাস কাটিয়ে দিলাম। জুলাই মাসের প্রথম দিকে আমাদের গ্রামে আসলেন তিলাম নামের একজন বি.ডি.আর সদস্য। সম্পর্কে লোকটি আমার মামা হতো। তিনিই আমাদের যাওয়ার তারিখ ঠিকঠাক করলেন। তবে আমার একটি প্রস্তাব থাকল রাতের আঁধারে পালিয়ে যাব না। যেতে হলে বীরের মতো দিনের বেলায় সবাইকে জানিয়ে যাব। আমার প্রস্তাবে সবাই রাজি হলো। যদি কারোর বাবা-মা বাঁধা দেন তাহলে সবাই মিলে তার বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, ঘরে বসে মরার চেয়ে দেশের জন্য যুদ্ধ করে মরবো। তাতে কোনো বাবা-মা বাঁধা দেবে না বলে আমি বিশ্বাস করি। অনেকেই যাবার প্রস্তুতি নিয়েছিল। সর্বশেষ তিলাম বি.ডি.আর এর বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার হরিপুর কিংবা জয়েনপুর হবে আমাদের পাড়ার আমি, শফিকুর রহমান শফি বয়সে সে সবার বড় ছিল তখন তিনি এইচ.এস.সি পড়তেন কিংবা পাস করেছেন। মোজাম, ছাত্তার, মসলেম এই পাঁচজন রওনা হলাম। আমি যখন বাবা মায়ের নিকট বিদায় চাইলাম তখন আমার বাবা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তবু তিনি আমায় বিদায় জানালেন। বাবা আনন্দে আত্মহারা হয়ে অতিকষ্টে বিছানায় উঠে বসলেন, পশ্চিম দিকে মুখ করে আমার জন্য দু'হাত তুলে দোয়া করলেন এবং বললেন যাও ব্যাটা আমি তোমাকে দেশের জন্য কোরবানী করলাম। তুমি দেশ এবং জাতির ছেলে হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো। তোমরা একদিন জয় করবে এটা আমার বিশ্বাস। মা পিছু পিছু কাঁদতে কাঁদতে কিছু রাস্তা এসে বলল, খালেক দাঁড়াও আমার একটি কথা শুনে যাও।

মানুষের পাপে আয়ু কমে যায় কখনো পাপ কাজ করোনা, পাপ করলে ফিরে আসতে পারবে না। সব সময় পাক-সাফ থাকবে। তোমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। যাও আমি তোমাকে সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় দিলাম। মায়ের কথা শুনে আমি খুব খুশি হলাম। আমার পৃথিবী আমার মা, এ পর্যন্ত মা-বাবা যা যা

বলেছে সব ঠিক হয়েছে। আমার কাছে মনে হতে লাগলো আমি এ দেশের স্বাধীনতা দেখবই সে যত বছরই লাগুক না কেন। কিছুদূর যেয়ে সাথীদের বললাম তোমরা সবই দেখলে এবং শুনলে, এখন থেকে মনে করবে এক ঘণ্টা আগে যে খালেক তোমাদের মাঝে ছিল তার মৃত্যু হয়েছে। এখন যে খালেক তোমাদের মাঝে আছে সে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তার বাবা মাকে কবরস্থ করবে। আজ থেকে তোমরা আমার সাথে থাকবে। আমি যেন তোমাদের সামনে এমন কোন কাজ না করি যে কাজে পাপ হয়। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেল। ওই এলাকার মানুষদের জিজ্ঞাসা করি বর্ডার আর কতদূর? তাদের উত্তর এই তো সামনেই, কিংবা বলে আর দুই ক্রোশ গেলেই বর্ডার। দুই ক্রোশ পার হয়ে যেয়ে কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করলে সে বলে আর তিন ক্রোশ গেলেই বর্ডার। বিকাল হয়ে গেল বর্ডার আর আমরা পাই না। ক্ষুধার জ্বালায় সবায় কাতর। যাই হোক বেলা ডুবার একটু আগে আমরা ভারতের ভেতর ঢুকে পড়লাম। একটা ছোট বাজার খাওয়ার মতো তেমন কিছু নেই। একটা বিস্কুট খেয়ে কেচুয়া ডাঙায় ইউথ ক্যাম্পে আসবো। তিলামের বাড়ি কুষ্টিয়া আর ইউথ ক্যাম্প করিমপুরে। আমাদের সবার কাছে পাকিস্তানি টাকা ছিল। ওই টাকা ভাঙিয়ে ভারতীয় রুপি করতে হবে। আমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত হলো, দুই শত টাকা ভাংতি করার, বাকি টাকা থাকবে। আমাদের দেখে বিএসএফ এর গাড়ি এলো, ওরা আমাদের নিরাপদে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। আমরা ক্যাম্পে ফিরে ফ্রেস হয়ে রাতের খাবার খেয়ে কেচুয়া ডাঙ্গায় রাতে থাকলাম। আর যাবই বা কোথায়? পাবনার সকল মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং সেন্টার কেচুয়া ডাঙ্গা ইউথ ক্যাম্প। যেখান থেকেই আসুক না কেন এখানে ভর্তি হতে হবে। পরে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সেখান থেকে রাত্রেই পরিচয় হলো গ্রামের আরও কয়েক জন বীরমুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে মাল পাড়ার ফয়েজ ভাইয়ের সঙ্গে। চরগড়গড়ীর ইমাজ উদ্দিন শাহ'র ছেলে আনিচ, আয়েজ উদ্দীন প্রামানিকের দুই ছেলে ছাকাত আর মোকাদ্দেস ও আতিয়ার খাঁ এরা সবাই আমার বয়সে বড় অথচ এরা আমাকে সবাই সম্মান করত। কাবলিপাড়ার রওশন ও দোস্ত আব্দুর গফুর আরও বিলকেদার, দাদাপুরসহ ঈশ্বরদী থানার অনেকের সাথে আমার পরিচয় হলো। আরো পরিচয় হলো টিকোরি গ্রামের একভদ্র লোকের সাথে লোকটির হয়ত ইয়াকুব আলি নাম হবে। তিনি ছিলেন পাবনা বুলবুল আর্টপ্রেসের ম্যানেজার। তার প্রেস থেকে আমি একটা কবিতার বই বের করেছিলাম। 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই।' তখন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি। সে সুবাদে তিনি আমাকে

ও আমার বাবাকে চিনতেন। আমাকে দেখে তিনি যেমন আনন্দিত হয়ে ছিলেন তেমনই দুঃখও পেয়েছিলেন। আনন্দিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, আমি এখনো জীবিত আছি। আর দুঃখ পেয়েছিলেন এই ভেবে যে একটি সম্ভাবনাময় তরুণ নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রলোক মৃদু হাসার চেষ্টা করে আমাকে কাছে ডাকলেন। কেমন আছো কবি? ভালো আছি বলেই বললাম, আপনি এই ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করেন? তিনি বললেন, দায়িত্ব ঠিক না তোমাদের জন্য কাজ করি। তোমার কোনো অসুবিধা হলে আমাকে জানাবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভালোই লাগল। অনেক সাহস বেড়ে গেলো। ওই সময় বেশ কিছুদিন ইউথ ক্যাম্পে লোক ছিল না সে জন্য আমাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণে যাওয়ার জন্য প্রায় দশ দিন অপেক্ষা করতে হলো। এর মধ্যে আমি আমার স্বাভাব সুলভ কারণেই অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিলাম। কেচুয়াডাঙ্গা বাজারে সবচেয়ে বড় মিষ্টির দোকান ছিল পাবনা মালিকের ভাগ্যলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যা এখন পাবনা হামিদ রোডে সুখ্যাতির সাথে ব্যবসা করছেন। সকালে নাস্তার জন্য যেয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটাতাম। দোকান দাররাও আমাকে একটু বাড়তি খাতির করতেন, কেন বাড়তি খাতির করতেন তা আমার জানা নেই। হয়ত আমার আলাপ ব্যবহারে নইলে ভালো খরিদ্দার কিংবা তারা মনে করত কোনো নেতার আত্মীয়। যাই হোক সেটা ছিল একান্তই তাদের ব্যাপার।

মালদহের আমবাগানে

ভোরেই আমাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য রওনা হতে হলো। শিলিগুড়ি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে। লোকাল বাস আর লোকাল ট্রেনে প্রায় ৪০/৫০ ঘণ্টা সময় লাগল, মালদহ জেলা গৌড় বাগানে যেতে। এ দীর্ঘ সময় আমাদের কোন খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। দু-একজনের কাছে টাকা পয়সা থাকলেও তারা হাতছাড়া করতে চায়নি। আমরা সন্ধ্যার সময় মারদহ জেলার গৌড় বাগান ক্যাম্পে হাজির হলাম। সে সময় রাতের খাওয়া শেষ। ক্যাম্পের আশপাশে কোনো দোকান বা বাজার নেই, যে স্থানে ক্যাম্প ছিল সেখান থেকে বাহিরের মানুষের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ ছিল না। স্থানটি ছিল সম্ভাবত গৌড়ের রাজধানী একটি মাত্র সিংহদার। ওই এলাকা আম গাছে ভর্তি ভিতরে একটি ছোট মসজিদ দর্শনীয়। সেখানে হাণ্ডিখানা অফিস ও তাবুতে মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্রাম নেয়। বাকি জায়গায় আমপাতায় ভর্তি। সেখানে দেখলাম সকল কর্তৃত্ব

রাজশাহীর নেতাকর্মীদের। আমাদের থাকার জন্য তাঁবু লাগানো হলো আমগাছের নিচে। গাছগুলোর সে সময় ভরা যৌবন একে অপরের সঙ্গে মিতালির জন্য চারদিকে ডালপালা বিস্তার করে একে অপরকে আলিঙ্গন করছে, ওদের মিতালিটা এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে সূর্যের আলোকে মাটিতে আসতে বাঁধার সৃষ্টি করে।

এখানে আম পাতার উপর শুয়ে আমার সারা শরীর চুলকাতে শুরু করছে। কপাল ঘেমে যাচ্ছে। অস্থিরতার কারণে মুখে পানি দিলাম তাতেও আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। সে রাত্রের বর্ণনা থেকে দূরে সরে এলাম নইলে লেখতে পারছি না। আমি এলার্জি রোগী আমি শুধু আপনাদের এইটুকুই বলব মৃত্যুর আগেই কেউ যেন নরকের সাজা না দেখে, দেখলে সে কোনো অবস্থাতেই বর্ণনা দিতে পারব না। শ্রোতা কিংবা পাঠক তার কথা বিশ্বাস করবে না। কেননা সে দৃশ্য তো শুধু সেখানকার জন্যই। যে এর ভুক্তভোগী নয় সে কি করে বুঝবে। বর্ণনা বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু বলব, যেমন মৌমাছির চাকে আঘাত করলে মাছিরা আশপাশের জীব জানোয়ার যাকে পায় তাকেই হুল ফুটায়। ঠিক পাতার নিচের মশাগুলো আমাদের সেইভাবে আক্রমণ করল। মশার সাইজ বড় ঠিক মৌমাছির মতো, সকল মশা এক সুরে গেয়ে উঠল ভোঁ ভোঁ বোঁ বোঁ মনে হল যেন আমরা ভুর করে পাকসেনাদের ক্যাম্পের মধ্যে প্রবেশ করেছি। ১০টি মশার কামড় একজন সুস্থ সবল মানুষের সহ্য করা কঠিন। আমাদের কেউ কেউ তাবু ছেড়ে দৌড়ে পালাল, কেউ কেউ গায়ে কাপড় জড়িয়ে মশার কামড় থেকে বাঁচার বৃথা চেষ্টা করল। এক প্রকারে সবায় তাবু ছেড়ে আলোর পাশপাশে সারা রাত দাঁড়িয়ে কাটাল। কেউ কেউ মাটিতে বসেই ঘুমাইয়ে নিল। পাকসেনাদের সামনা সামনি মাত্র ১০ গজ দূরে থেকে যুদ্ধ করার সৌভাগ্য হয়েছে। সেই বিপদকেইও, একশ গুণের অধিক হার মানিয়ে দেয় সেই রাতকে। গৌড় বাগানের সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ছিল এই যে, আমরা পাবনা জেলা থেকে প্রায় দুইশ জন মুক্তিযোদ্ধা গেলাম, গৌড় বাগান কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য কোনোপ্রকার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেননি। পরের দিন দুপুরে আমাদের খেতে দেওয়া হলো। সেই দিনটি ছিল আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের, আজো মনে পড়ে তার সাধ। সেই দুপুরের খাওয়ার। মোটা চাউলের ভাত চাউলের একটা অংশ কুচি পাথর বা ঝিল মসুরের ডাউল। তিন দিন অর্থাৎ বাহাত্তর ঘণ্টা পর খেতে বসেছি আমাদের সবার ধারণা ছিল তিন দিনের খাবার হয়ত এক দিনেই খেয়ে নিবো। প্রথম ভাগ মুখে দিয়ে আমাদের বুঝতে বাকী থাকল না আরো চব্বিশ ঘণ্টা উপশ থাকতে হবে। ভাতের ঝিল বেছে খাওয়া যে কত কষ্ট তা শুধু ভুক্তভোগিরাই জানেন।

আমরা কেউই সেদিন দুপুরে ভাত খেতে পারেনি, যারা একটু চালাক ছিলেন তারা ভাতে বেশি পরিমাণ ডাউল নিয়ে ঝিল ধুয়ে খাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনদিন পর খেতে বসে কেউ আমরা পাতের ভাত তুলতে পারিনি। সারা ক্যাম্পময় প্রচার হলো পাবনার ছেলেরা ভাত কম খায়। পরের দিন আমরা সুস্থবোধ করায় খেতে বসে সবায় অবাক অল্প পরিমাণ ভাত দিয়ে আর আমাদের ভাত দিতে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ নারাজ, তাদের বক্তব্য আপনারা গতকাল সবায় ভাত নষ্ট করেছেন সে কারণে আপনাদের ভাত কম করে রান্না হয়েছে। যে পরিমাণ রান্না হয়েছে সেই পরিমাণই আপনাদের খেতে হবে। এই নিয়ে বিরাট হট্টগোল সিনিয়রদের হস্তক্ষেপে আপাতত শান্ত হলেও বিকাল বেলায় একজন কেন্দ্রীয় লিডার আসলেন প্রফেসর আবু সাইদ সাহেব, পাবনার ছেলেরা তার কাছে রিপোর্ট করল, উনি বলে দিলেন আপনারা দেশ ছেড়ে এসেছেন যা পাচ্ছেন তার বেশি দেওয়া সম্ভব না।

এ কথা শুনে আরো ক্ষুব্ধ হলাম, পাবনার ছেলেরা এক পর্যায়ে হাতাহাতি করার উপক্রম হলো। তখন গুরুত্বপূর্ণ সেই নেতা ক্যাম্প ত্যাগ করেন, পরের দিন থেকে মোটা-মুটি খাওয়ার মতো খাদ্য পরিবেশন করতে লাগলেন। সারাটা জীবনে লেখালেখি নেহাত কম করিনি; কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমার জন্য ছিল তা আমি কখনো লেখার চেষ্টা করিনি, কারণ একজন লেখার আদর্শ থাকতে হবে সত্যকে উন্মোচন করা, কিন্তু গৌড় বাগানে সপ্তাখানেক পরে আমাদের নেওয়া হলো শিলিগুড়ি জেলার পানিঘাটা নামক স্থানে সেখানে আমাদের উচ্চতর ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। পাহাড়ের উপর ক্যাম্পটির অবস্থান, পার্শ্বেই ঝর্না প্রবাহিত ছোট নদী। নদীর পার্শ্বে কিছু জায়গা জুড়ে ছিল বালুচর মাঝে মধ্যে বড় বড় পাথর পড়ে আছে আমরা সাধারণত সেই নদীতেই গোসল করতাম।

শিলিগুড়িতে যাওয়ার পর আমার অবস্থা অনেকটাই সে রকম হয়েছিল। প্রকৃতির দৃশ্য আমাকে সব সময় মুগ্ধ করে রাখত। সকল চিন্তা ভয়ভীতি সব মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। তবে ট্রেনিং সেন্টারের ওস্তাদগণ আমাদের ভয় দেখিয়ে রাখতেন। বলতেন আপনারা কেউ একা একা রাতে হোক দিনে হোক বাহিরে যাবেন না। এমন কি রাতে যদি কারুর বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয় একা যাবেন না, দল বেঁধে যাবেন। তা ছাড়াও জংলী মেয়েরা ধরে নিয়ে গিয়ে আপনাদের হত্যা করতে পারে। পাহাড়ে আছে সাপ, বিচ্ছুসহ বিভিন্ন ধরনের হিংস্র জানোয়ার। ট্রেনিং চলাকালে আমাদের ঐ দেশীয় সৈনিকদের জন্য খাদ্য

তালিকায় যা যা ছিল আমাদেরও তাই তাই দেওয়া হতো। সকালে পুরির সাথে এক মগ করে চা দিত যা খেতে এতটাই সু-স্বাদু লাগত যে তিন বেলায় ভাত না দিয়ে যদি চা দেওয়া হতো তাহলে আমার কাছে বেশি ভালো লাগত হয়ত। সপ্তাহে দুই-তিন দিন খাসির মাংস দেওয়া হতো খাসিগুলোর চেহারা এতটাই দুর্বল মনে হতো যে ওরা মরার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছে। আর সেই সহযোগিতায় করত মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং সেন্টারের সৈনিকরা। বাইট্রান মেস ডিউটি পড়ত সবার, যাদের মেচ ডিউটি পড়ত তারা বিশেষ খাওয়ার খেতো। বিশেষ করে খাসির মাথা ডিউটিওয়ালদের জন্য বরাদ্দ থাকত। এক সপ্তাহে আমার মেচ ডিউটি পড়ল। যথারীতি নদীর চরে খাসি জবাই করলাম। ছাগল জবাই শেষে মাংস তৈয়ারীর কাজ শুরু এর মধ্যে দুই ছাগির পেট থেকে বের হল চার বাচ্চা, এ দেখার পরে মনটা খুব খারাপ হলো। এই মাংস আমরা প্রতি সপ্তাহে খেয়ে থাকি আমার মেচ ডিউটি না নেওয়াই ভালো ছিল। চোখের আড়ালে অনেক কিছুই ঘটে যায় তাতে আমরা ঘৃণা করি না, চোখের সামনে ঘটলে তো আর মন মেনে নিতে পারে না। এ দিকে মন খারাপ, ওদিকে ঘটল আর এক ঘটনা। আমার সাথে মেচ ডিউটিতে ছিল ভারতীয় সেনা এক সদস্য যার পদবী নায়েক। তিনি ৮/৯ কেজি ওজনের একটা পাঁঠা ছাগল জবাই করবেন। হাতে ধারাল ছুরি আমাকে বললেন, ও বাচ্চু লোক, তোম উসকো সের পাকড়াও। অর্থাৎ এই ছেলে তুমি এই খাসির মাথা ধর। উস্কোবাদ আপনা পাশ খিচো তারমানে আপনার দিকে টেনে ধর। আমিও ইঙ্গিতেই উত্তর দিলাম না আমি পারব না। অমনি ব্যাটা আমার দিকে ছুরি হাতে তেড়ে আসলেন আমি একটু দূরে সরে গিয়ে একটি পাথর হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। ও ভয় পেয়ে দূরে সরে গেলো। পরে অন্য এক সৈনিকের সহযোগিতায় পাঁঠাটি জবাই করল। জবাই বলতে ঘাড় থেকে কেটে ফেলল। ওই দিন আর দুপুরে আমার খাওয়ার রুচি থাকল না। মাংস বাদেই ডাল ভাত খেকে কাটিয়েছি, মনের মাঝে একটু ভয়ের সঞ্চয় হলো, ওই নায়েক ভদ্রলোককে নিয়ে।

ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরলাম

শিলিগুড়ি থেকে আমাদের প্রথমে আনা হলো রায়গঞ্জ, (পশ্চিম দিনাজপুর) সেনানিবাসে সেখানে এসে আমাদের ৭৫ টাকা করে সম্মানি ভাতা দেওয়া হলো। বিকালে আমরা কয় বন্ধু রায়গঞ্জ বাজারে টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতে গেলাম, কেনাকাটা শেষে আমরা একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকলাম, দোকানদারের সাথে পরিচয় হলো–তার বাড়ি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে,

পাবনাতেও অনেক বড় কাপড়ের দোকান ছিল। তিনি বললেন, সব শেষ করে দিয়ে ভারতে এসেছি। যা কিছু এনেছিলাম এখানকার আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতায় এই দোকান দিয়েছি।

কবে দেশ স্বাধীন হবে তা কেউ বলতে পারে না। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তো বেঁচে থাকতে হবে। পরের দিন আমরা কেচুয়া ডাংগা বর্ডারে এলাম, সেদিন ছিল ২৯ রোজা। রাত পোহালেই ঈদ হবে যদি চাঁদ দেখা যায়। আমরা দুপুর বেলায় কয়েক বন্ধু মিলে নতুন সাবান হাতে নদীতে গোসল করতে গেলাম। সেখানে আরও কয়েক জন মুক্তিযোদ্ধা গোসল করছিল। মাঝখানে দু দেশের বর্ডার। এ পারে বাংলাদেশের মেয়েরা গোসল করছে ওপারে ভারতীয়রা। আমরা কয় বন্ধু নদী পার হয়ে এপারে আসলাম এবং বাংলাদেশে এসে গোসল শুরু করলাম। বাংলাদেশী মা বোনেরা আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। আমরা সাবান মাখছি আর বলছি এ সাবান মাখা হবে হয়ত শেষ গোসলের সাবান। নইলে হবে ঈদের সাবান। আজকের রাতেই রওনা দেবো-দেশের বাড়ির দিকে। যে কথা সেই কাজ, রাইফেল গুলিসহ অন্যান্য সরঞ্জমাদি নিয়ে প্রায় দুই শত মুক্তিযোদ্ধা পাবনা জেলায় রওনা দিলাম। কে কিভাবে আমাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে নিয়ে আসছে তা আমরা জানতাম না। কিছু রাস্তা হেঁটে এসে আমরা নৌকা যোগে রওনা হলাম। কোথায় কিভাবে যাচ্ছি কোনো দিক নির্ণয় করতে পারছিলাম না। কিছু রাত বাকি থাকতে দেখলাম মাঝিকে ফিসফিস করে কয়েক জন গালাগালি দিচ্ছে। কেউ বলছে শালাকে গুলি করে মেরে দিই, কেউ বলছে এই বেটা তোর নৌকা মিলিটারি ক্যাম্পে চলে এসেছে। তখনই বুঝতে পারলাম যে মাঝির দিক ভুল হয়েছে। পাকশি মিলিটারি ক্যাম্প থেকে সার্স লাইট মারছে। কিন্তু আমাদের নৌকা হয়ত ওদের চোখে পড়েনি। অবশেষে মাঝি দক্ষিণ পাড়েই নৌকা ভিড়িয়ে দিল। অর্থাৎ আমরা যে পাড়ে ছিলাম সেই পাড়েই রয়ে গেলাম। আমাদের যিনি গাইড করছিলেন তিনি বললেন ওপাড়ে পাকশি ঘাট ওখানে মিলিটারী ক্যাম্প আছে। এখন পার হওয়া যাবে না। আপনারা সারিবদ্ধ হয়ে যাবেন না। চিলমারীর চর সামনে, দেখবেন কয়েকটা খড়ের ঘর আছে, গরুর রাখালরা সেখানে থাকে। খোলা চরে আপনারা এতলোক হাঁটাহাঁটি করলে মিলিটারিরা একবারে মেরে দিবে। সে কারণে আপনারা ভোর হওয়ার আগে প্রস্রাব-পায়খানা প্রয়োজনীয় কাজ সেরে যাবেন। ওই রাখাল বাড়িতে যেয়ে- যার যার মতো করে সেই সেই থাকবেন। এ

কথা শুনে আমার তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, কেননা চর সম্বন্ধে আমার ভালো ধারণা আগে থেকেই আছে। আমার বাবা পদ্মার ভাঙ্গনে সতের বার বাড়ি সরিয়েছেন। আমি নৌকা থেকে কয়েক গজ যেতেই আমার পা গেড়ে গেলো গলন বালিতে। গলনের ধরন এমনই যে একবার পা দেবে গেলে উঠা খুব কষ্টদায়ক। দুজন মুক্তিযোদ্ধার সহযোগিতায় আমি গলন বালি ছেড়ে উঠে রওনা হলাম সেই বাতান বাড়ি বা দোয়াল বাড়ির দিকে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখতে পেলাম দুইটা ছোট ছোট বাড়ি তিনটি করে ছোট ছোট ঘর যার যার মতো আমরা ঘরে উঠে গেলাম। কোনো মতো ঠেলাঠেলি করে বসার জায়গা হলো। আমরা এমনভাবে বসলাম যেন মুরগী ডিমে তা দিচ্ছে। কারো কারো মন খারাপ আজ ঈদ হচ্ছে ঠিক মতো যেতে পারলে বাবা মা ভাইবোনদের সাথে ঈদ করতে পারতাম। আবার ভাবছে আজকের দিনটা বাঁচলে হয়ত কিছু দিন বাঁচতেও পারি। আমরা এমন একটি জায়গায় ছিলাম সেখান থেকে আত্মগোপন করার সুযোগ নেই। পাকসেনারা যদি বুঝতে পারে এখানে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করছে তাহলে তো বুঝতেই পারছেন, যে দিনের কথা আমি লিখছি শুধু এক দিনের কাহিনি সাহিত্যের ভাষায় বর্ণনা করলে একটি মাঝারি গোছের উপন্যাস হতো। বেলা বারোটার দিকে কে বা কারা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তা আমি জানি না। অতি কষ্টে বেলা ডুবে সন্ধ্যা হলো, সেই দিনটা যে পৃথিবীর বুকে কয় ঘণ্টা নিয়ে এসেছিল তা সৃষ্টিকর্তায় জানেন। প্রতিটা সেকেন্ডকে যদি মিনিট আর মিনিটকে যদি ঘণ্টা আর প্রতি ঘণ্টাকে যদি দিন ধরা হয় তা হলেও আমার কাছে ওই দিনটাকে বড় বলে মনে হবে। কমান্ড হলো আপনাদের যার যার অস্ত্রগুলি সরঞ্জামাদি নিয়ে এখনই প্রস্তুত হন। আমরা ঈশ্বরদীর দিকে রওনা হব। এই আদেশে কিছুটা হলেও আমরা স্বস্তি পেলাম। মরতে হয় যুদ্ধ করেই মরবো, এভাবে বন্দি হয়ে মরা যায় না। আমরা রওনা হলাম মাজদিয়া গ্রামের দিকে আমাদের যাওয়ার পথে একটা ছোট খাল আছে সেই খালে কিছুক্ষণ আগে বাঁশ ফেলে সেতু করা হয়েছে। যাতে করে আমাদের জুতা প্যান্ট খুলতে না হয়। কয়েকজন যুবক সেখানে দাড়িয়ে ছিলেন। আমাদের পার করার জন্য। তাদের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হলাম। মাজদিয়া গ্রামের নারী পুরুষ আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নিজ নিজ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সে যে কি দৃশ্য তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। যেন কোনো রাষ্ট্র নায়ককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গ্রামের শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। ওই দিন গ্রামবাসী ঈদ উদযাপন

করেছেন। গ্রামবাসী আমাদের যাকে সেখান পাচ্ছেন তাকে ধরে সেখানেই সেমাই-মিষ্টি সামনে ধরছেন, কেউ না খেতে চাইলে তাকে অনুরোধ করছেন একটু মুখে দেন। বৃদ্ধ মহিলারা আমাদের ধরে ধরে কাঁদছেন আহ্ বাবা সকল আজকের দিনেও বাবা মা এর সাথে ঈদ করতে পারল না। আমরা কয়জন যে বাড়িতে ঢুকেছিলাম তারা ভাত মাংস আমাদের না খাওয়ায়ে ছাড়লো না। এ সকল দৃশ্য আমাদের বাবা মা ভাইবোনদের কথা বেশি করে মনে করে দিতে লাগল। তাদের আত্মীয়তা দেখে আমার মনে হলো এ দেশ স্বাধীন করতে বেশি দিন সময় লাগবে না। অবশ্য পরে জানতে পারলাম এ আত্মীয়তার পিছনে আরো একটি বড় কারণ আছে।

কয়দিন আগে সুলতান মাহ্মুদ রাজাকারদের হাতে শহিদ হন এই গ্রামে। আমার খুব নিকটতম বন্ধু সুলতান মাহ্মুদ ওরফে আতিয়ার ও আমাদের পাশের গ্রামের চরপ্রতাপপুরের ছেলে ও আমার সাথে বাঁশেরবাদা হাই স্কুলে পড়তো। সুলতানের চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার যথেষ্ট মিল ছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিল অনেকেই আমাদের দুই ভাই মনে করতেন। সুলতান মে/জুন মাসের দিকে ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বুদ্ধ করে। পরে অন্য একটা নতুন গ্রুপের সঙ্গে ভারত থেকে ফেরত আসার সময় সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের বসে রেখে, রেকি করতে যায়। সে চরম সাহসী ছিল সে রাত্রে চলার সময় কাউকে সাথে করে নিয়ে যায়নি। সাথীদের নিকট থেকে কিছু দূর যেয়ে কয়েক জন লোকের সাথে ওর দেখা হয়। সে ওই লোকগুলোর নিকট থেকে রাজাকারের অবস্থান জানতে চায়। যাদের কাছে রাজাকারদের অবস্থান জানতে চাই সেই লোকগুলোই ছিল রাজাকার। রাজাকাররা সুলতানকে জানাই সামনে কিছুদূর গেলেই রাজাকারদের ক্যাম্প পাওয়া যাবে। সুলতান সামনের দিকে অগ্রসর হতেই কুলাঙ্গার ভীতু রাজাকাররা পিছন থেকে সুলতানকে গুলি করে। সুলতান ওখানে পড়ে যায় এবং তার মৃত্যু হয়। সাথী মুক্তিযোদ্ধারা ছুটে এসে দেখতে পায় সুলতানের লাশ। শুনেছি আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হারেজ উদ্দীন সাহেবে ওই আগত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ছিলেন। সুলতানের লাশ দেখে মুক্তিযোদ্ধারা এতটাই খেপে গিয়েছিলেন যে তারা বেশ কজন রাজাকারের বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং গ্রাম বাসিদের শাসিয়ে দিয়েছিল এই বলে যে এ এলাকায় যদি একটি মুক্তিযোদ্ধার কোনো ক্ষতি হয় তা হলে এ গ্রামের চিহ্ন রাখব না। গ্রাম বাসীর সহযোগিতায় সুলতানকে মাজদিয়া গ্রামেই দাফন করা হয়। আমরা রাত

দশটার দিকে রওনা হলাম নিজ গ্রাম চরগড়গড়ীর দিকে সাথে অন্য গ্রামের সদস্যরাও ছিলেন। অন্ধকার রাত্রে আমাদের পথ প্রদর্শক কত রাস্তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরাপদে আমাদের গ্রামে রেখে যান তার ইয়াত্তা নেই। আযান পড়ার আধা ঘণ্টা আগে আমরা নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছিয়ে গেলাম। বাড়ি ফিরে বাবা মা ভাই বোনের আনন্দ দেখে নিজেই আত্মহারা হয়ে গেলাম। তাদের বেশি আনন্দের প্রথম কারণ আমি বাড়ি ফিরে এসেছি; দ্বিতীয় আনন্দ এই জন্য যে রাত পোহালেই ঈদ। সেবার দুই দিন ঈদ হয়েছিল। কেউ কেউ ২৯ রোজাই করেছে কেউ কেউ ৩০ রোজা শেষে ঈদ করেছে। মাজদিয়া গ্রামের লোক ২৯ রোজা শেষে ঈদ করেছে। সেই সুবাদে আমি বাড়িতে ঈদ করার সুযোগ পেলাম। ফজর নামাজ শেষ হতে না হতেই শুনলাম পাকসেনারা আমাদের গ্রাম ঘিরে নিয়েছে। আমরা সবাই যার যার বাড়িতে, প্রতিরোধ করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। যাই হোক রাইফেল গুলি নিয়ে একে অপরকে ডাকা ডাকি করে নিরাপদ স্থানে একত্রিত হলাম। মাত্র ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা পাক সেনাদের আসার রাস্তায় কিছু সময় আমরা পজিশন নিয়ে থাকলাম। পরে জানা গেলো পাকসেনারা আসেনি। দু'দিন পরে আমরা গেলাম দাশুড়িয়া। দাশুড়িয়ার এলাকায় পাশের গ্রাম খয়েরবাড়ি এক আওয়ামী লীগ লিডারের বাড়ি আশ্রয় নিলাম। তার বাড়ির কাচারি ঘরে আমরা থাকতাম। তবে এলাকার লোকেরা আমাদের পালাক্রমে খেতে দিতেন, আমার গ্রুপ লিডার ছিলেন শফিকুর রহমান। প্লাটুন লিডার ছিলেন গড়গড়ীর মহিউল ইসলাম মুন্টু ভাই, কোম্পানি কমান্ডারের নাম ছিল সিরাজুল ইসলাম মন্টু। মন্টু ভাইয়ের এর নির্দেশ ছিল এই এলাকাতে যেন কোনো রাজাকার ক্যাম্প করতে বা টহল দিতে না পারে। সারা দিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যা হলে যাই অপারেশনের জন্য তৎপর হয়ে উঠতাম। পাক সেনাদের সঙ্গে আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ কম হলেও আমাদের তৎপরতায় রাজাকাররা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ আরো দীর্ঘদিন হবে মনে করে আমরা এলাকাতেও সহযোগী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছিলাম। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হওয়ায় সরাসরি যুদ্ধ ময়দানের দায়িত্ব আমাদের জন্যও শেষ হয়ে যায়।

কবি পরিচিতি : বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল খালেক বিশ্বাস ১৯৫২ সালে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার চরগড়গড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কেরামত আলী বিশ্বাস ও মা ছানোয়ারা বেগম। তিন ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে পঞ্চম। বড়ভাই আবদুল ওহাব বিশ্বাস ঊর্ধ্বতন ব্যাংক কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি 'কাল্পনিক' ছদ্মনামে লিখতেন। ছোটো ভাই মজিদ মাহমুদ একজন প্রখ্যাত নজরুল গবেষক, কবি, সু-সাহিত্যিক। আবদুল খালেক বিশ্বাস স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় 'সোনার বাংলার ইতিহাস ও শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' চারণ-কবিতা লিখে কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির বিরুদ্ধে সংঘটিত হার্ডিঞ্জ-ব্রিজ যুদ্ধে ও চরপ্রতাপপুর যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। সস্বাধীনতা-উত্তরকালে মায়ের নির্দেশে আবদুল খালেক বিশ্বাস বাংলাদেশ পুলিশে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে যোগ দেন 'এনএসআই'তে। কিন্তু পুলিশের চাকরি তার ভালো না লাগায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে চিত্রজগতে প্রবেশ করেন। এম এ কাশেমের সঙ্গে শ্যামলী কথাচিত্রের ব্যানারে সহকারী পরিচালক হিসেবে 'দ্বীন-দুনিয়া' ছবিতে কাজ শুরু করেন। তৎকালীন পুলিশ সুপার মোতাব্বের রহমানের অনুরোধে পুনরায় পুলিশের চাকরিতে যোগ দেন এবং পুলিশ সুপার তাকে চাকরিতে বহাল করে পদোন্নতি দেন। পদোন্নতি পেয়ে তিনি কোর্ট জিআরও হন। ডিএসবিতে কর্মরত অবস্থায় ঝিনাইদহ জেলার কোর্টচাঁদপুর থানায় বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী রেজা খানের অনুপ্রেরণায় তিনি গান লিখতে শুরু করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি বাংলাদেশ রেডিওতে গীতিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ঢাকার একটি পত্রিকায় তিনি প্রায় ১০ বছর ধরে 'পুলিশের নেপথ্য সংলাপ' শিরোনামে নিয়মিত কলাম লিখতেন। নেপথ্য সংলাপ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি ছড়া লেখার অপরাধে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। ২০০৭ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন।

তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ : ইনস্পেক্টর জুয়েল; চাঁদের দেশের নারী এবং নারী (২০০৫)। নাটক : ভূঁইফোড় (১৯৮৮); চরকাতরার হাট (২০০০); সেলিম মিনতীর প্রেম কাহিনি। প্রবন্ধ-গবেষণা : পুলিশের নেপথ্য কাহিনি (১৯৯২)। সংগীত : নির্বাচিত গান (১৯৮৯); একগুচ্ছ গান। কবিতা : সোনার বাংলার ইতিহাস ও শেখ মুজিবের মুক্তি চাই (১৯৭২); ভালোবাসার অসুখ (২০০২)। এছাড়া তিনি ২০১৮ সালে ঈশ্বরদী উপজেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করে বেশ সমাদৃত হন। (সূত্র : পাবনা প্রতিভা, মোহাম্মদ মহিউদ্দীন ও আব্দুল খালেক বিশ্বাস লিখিত ঈশ্বরদী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস)।

শিশু ও ছড়া সাহিত্যে বঙ্গবন্ধুর হাসি

ভদ্রমহিলা লাজুক হয়ে পড়েছেন, কারণ তার স্বামী বাড়িতে নাই। দুঃখ করে বললেন, আপনারা এলেন আমাদের গরীবের বাড়িতে আমি কী করবো কিছুই তো বাড়িতে নাই। কাকে দিয়েই বা আনাই। তারপর আমাদের জন্য চিং চা বানিয়ে দিলেন। – (আমার দেখা নয়াচীন)

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে আছে বঙ্গবন্ধু ঢাকার কাছে এক বাড়িতে আত্মগোপনে ছিলেন। সেই বাড়িটি ছিল তাঁর বিশ্বস্ত একজন রাজনৈতিক কর্মীর। সে বাড়ির সবাই তাঁকে ভালোবাসেন। একদিন হঠাৎ দেখা গেল পুলিশ এসে হাজির। ওই বাড়ির শাহজাহান নামের একজন কিশোর হয়তো সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। পুলিশ আসার কথা শুনে সেও তার ভাই হেনরীর সঙ্গে তার মামাকে বকতে বকতে বের হয়ে আসে। সে সন্দেহ করছিল, নিশ্চয় তার মামাই পুলিশকে খবর দিয়েছে। ওই বাড়িরই দোতলায় তার মামা থাকত। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, "আর কেউ পুলিশকে খবর দেয় নাই, মামাই দিয়েছে। বাবা বাড়িতে আসুক ওকে মজা দেখাব। শাহজাহান আমাকে খুব ভালোবাসত, সময় পেলেই আমার কাছে ছুটে আসত। আমি যখন পুলিশের গাড়িতে উঠে যাই, শাহজাহান কেঁদে দিয়েছিল। আমার খুব খারাপ লেগেছিল। শাহজাহানের ঐ কান্নার কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারি নাই।" একজন শিশু কখন একজন মানুষকে ভালোবাসে, যখন যে তার মধ্যে একটা শিশু মন খুঁজে পায়।

শিশু শেখ কামালের সেই হৃদয় স্পর্শ করা স্মরণীয় শৈশব-স্মৃতির কথাও আমরা এই বই থেকে জানেত পারি। বঙ্গবন্ধুর অধিকাংশ সময় কাটত জেলে জেলে, নিজের পরিবার ও সন্তানদেরও সময় দিতে পারতেন না। এরই মধ্যে জেল থেকে বাসায় ফিরেছেন। বঙ্গবন্ধুর লেখা থেকে, 'একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে

মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর আব্বা আবা বলে ডাকে। কামাল চেয়ে তাকে। এক সময় কামাল হাচিনাকে বলছে, 'হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।"

সম্ভবত কবিতার চেয়ে ছড়া সাহিত্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশি লেখা হয়েছে। ছড়া মানেই শিশু সাহিত্য নয়। তবে ছড়ার সবচেয়ে বড়গুণ তা সব শ্রেণির পাঠককে তৃপ্ত করতে পারে। যে-সব ছড়া নিছক বড়দের উপযোগী সেগুলোও ছন্দ ও ধ্বনি মাধুর্যের জন্য শিশুরা পছন্দ করে। সব শ্রেণির সব বয়সের কবি ও ছড়াকার এই লেখায় অংশ নিয়েছেন। তাছাড়া শিক্ষার্থী পর্যায়ে, রাজধানীর বাইরে একটি অংশ অন্ত্যানুপ্রাস সমৃদ্ধ কবিতা রচনা করেন, অনেকে সহজাত কাব্য প্রতিভার গুণে বিশুদ্ধ ছড়া লিখে থাকেন। যারা কেবল ছড়া লেখেন তাদের বাইরে প্রায় সকল কবি ছড়া ও শিশু সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা ছড়া লেখা হচ্ছিল। ছড়ায় বঙ্গবন্ধু অনেক হৃদয়গ্রাহী এবং সহজেই শ্রোতার মনে দাগ কাটতে পারে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বলা চলে প্রথম দিকে লিখিত সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারি ছড়া লিখেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় সেই একাত্তর সালেই তিনি কালজয়ী একটি ছড়া লিখেছিলেন, যা এখনো মানুষের মুখে মুখে প্রবাহমান। অন্নদাশঙ্কর রায় প্রবন্ধ কবিতা ও ছড়া রচনায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর দুটি ছড়া দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে নিয়ে লেখা। দেশ ভাগের পরেই তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে লিখেছিলেন- 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে ভাগ হয়নি কো নজরুল।' ঠিক তেমনি স্মরণীয় লেখা বাঙালির জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে লেখা ছড়া কবিতাটি। এই ছড়াটি এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সেটিকে আমরা ছড়া বলব না কবিতা বলব তা নিয়ে ধন্ধে পড়ি। কবিতা এখানে উদ্ধার করছি-

যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
চারিদিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান

নাই নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।

এই ছড়াটির পাঠবিচ্যুতি ও সময় নিয়ে কিছুটা বিভ্রাট আছে। অন্নদাশঙ্কর রায় মারা যাওয়ার পরে কবি কামাল চৌধুরী নানা তথ্য উপাত্ত সমৃদ্ধ একটি লেখায় সেই বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। '১৯৭১ সালের জুলাই মাসে গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা নামে কাব্যসংকলনে এ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন শিশির ভট্টাচার্য এবং অন্যদিন, ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ছড়াগ্রন্থ 'শালি ধানের চিঁড়ে'। তাতে যতকাল-এর স্থলে যতদিন শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে ছড়া সংগ্রহ বা রচনাবলিতে যতদিন শব্দটি রয়েছে। গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গায় প্রকাশিত কবিতাটি ৮ চরণের। ছড়া সংগ্রহের এটি ৮ চরণ। তবে তিনি একে বড়দের ছড়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ছড়ার নাম 'বঙ্গবন্ধু' এটি তাঁর ছড়াসমগ্র ২ (১৯৮৫) ও রচনাবলিতেও (১৯৯৮) অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তিনি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মরণে' নামেও একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশ বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা রয়েছে তাঁর।'

বাংলাদেশে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য জনগণের কাছে তুলে ধরতে আশির দশকে মূলত একটি আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। এই ছড়া আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন মূলত লুৎফর রহমান রিটন, আমীরুল ইসলাম, আসলাম সানী, রহীম শাহ, সুজন বড়ুয়া, আনজীর লিটন প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যারা ছড়া লিখেছেন তাদের সম্পূর্ণ তালিকা সম্ভব নয়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ও সংকলনভুক্ত ছড়াকারদের মধ্যে যাদের এক বা একাধিক মানোন্নীত ছড়া প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা একাডেমিসহ, তাদের মধ্যে উল্লেখ্যরা হলেন– অজয় দাশগুপ্ত, অনীক মাহমুদ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, অজিতা মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, অনিমা মুক্তি গোমেজ, অরুণ শীল, অলোকেশ রায়, অসীম সাহা, আইউব সৈয়দ, আইরীন নিয়াজী মান্না, আখতারুল ইসলাম, আখতার হুসেন, আতাউল করিম, আনজীর লিটন, আ ফ ম মোদাচ্ছের আলী, আবদুল হামিদ মাহবুব, আবুল কালাম বেলাল, আবেদীন জনী, আমীরুল

ইসলাম, আরিফ বখতিয়ার, আলতাফ আলী হাসু, আলম তালুকদার, আশরাফুল আলম পিন্টু, আশিক মুস্তাফা, আসলাম সানী, আসাদ জোবায়ের, আসাদুল্লাহ মামুন, আহসানুল হক, আহমাদ উল্লাহ, আহমাদ মাযহার, আহমাদ স্বাধীন, আহমেদ জসিম, আহমেদ সাব্বির, আহসান মালেক, আহাদ আলী মোল্লা, ইউসুফ রেজা, ইকবাল বাবুল, ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান, ইমরান পরশ, ইমরুল ইউসুফ, উৎপল কান্তি বড়ুয়া, ওয়াসিফ-এ-খোদা, কাব্য কবির, খালেক বিন জয়েনউদ্দীন, গোফরান উদ্দীন টিটু, গোলাম নবী পান্না, চন্দন কৃষ্ণ পাল, জগলুল হায়দার, জসীম মেহবুব, জাফর ওয়াজেদ, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, জিন্নাহ চৌধুরী, জ্যোতির্ময় মল্লিক, জ্যোতির্ময় সেন, তপংকর চক্রবর্তী, তাহমিনা কোরাইশী, দীপ মুখোপাধ্যায়, দুখু বাঙাল, দীপক সাহা, দীপংকর চক্রবর্তী, দেলওয়ার বিন রশিদ, ধ্রুব এষ, নাফে নজরুল, নাসের মাহমুদ, নাসিরুদ্দীন তুসী, নির্মলেন্দু গুণ, নীহার মোশাররফ, পীযূষ কান্তি বড়ুয়া, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর বিকাশ সরকার, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, ফজল-এ-খোদা, ফারুক নওয়াজ, ফারুক হোসেন, বকুল হায়দার, বাসুদেব খাস্তগীর, বিপুল বড়ুয়া, বেলাল চৌধুরী, ব্রত রায়, মনজুর কাদের, মসউদ-উশ শহীদ, মহিউদ্দিন আকবর, মানজুর মুহাম্মদ, মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, মামুন সারওয়ার, মারুফুল ইসলাম, মালেক মাহমুদ, মাসুম আওয়াল, মাহফুজ ফারুক, মাহমুদউল্লাহ, মিজানুর রহমান মিথুন, মিতুল সাইফ, মিয়া মনসফ, মুস্তাফা মাসুদ, মোরশেদ কমল, মোশতাক আহমেদ, রতনতনু ঘাটী, রফিকুল হক, রব্বানী চৌধুরী, রমজান মাহমুদ, রহীম শাহ, রাশেদ রউফ, রিপন আহমদ ফরিদী, রিফাত নিগার শাপলা, রোকনুজ্জামান খান, রোকেয়া খাতুন রুবি, রোমেন রায়হান, লুৎফর রহমান রিটন, শাফিকুর রাহী, শামসুর রাহমান, শামীম খান যুবরাজ, শামসুল ইসলাম, শামস চৌধুরী রুশো, শাম্মী তুলতুল, শারমিন সুলতানা রীমা, শাহনেওয়াজ চৌধুরী, শাহাদাৎ শাহেদ, শাহাদাৎ সরকার, শাহাদত বখত শাহেদ, শাহীন রেজা, শিবু কান্তি দাস, শুচি সৈয়দ, সঞ্জিত দে, স.ম. শামসুল আলম, সন্তোষ ঢালী, সাজিদ মোহন, সারওয়ার-উল-ইসলাম, সিকদার নাজমুল হক, সিরাজুল ফরিদ, সুকুমার বড়ুয়া, সুজন বড়ুয়া, স্বপন কুমার রায়, সৈয়দ আল ফারুক, সৈয়দ খালেদুল আনওয়ার, সুপ্রতিম বড়ুয়া, সোহেল বীর, হাসনাত আমজাদ, হাসান আল আবদুল্লাহ, হাসান রাউফুন, হেনরী স্বপন, হুমায়ূন কবীর ঢালী। শিশু সাহিত্যিক আলী ইমাম সম্পাদনা

করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : সমকালীন চোখে, ছোটদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তবে এই সংকলনগুলোর অধিকাংশের সংকট একটি ভালো ভূমিকা না থাকা। তাড়াহুড়ো করা। তাতে সম্পাদনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, কেবল লেখা সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া সম্পাদকের কোনো দায়িত্ব থাকে না। বঙ্গবন্ধুর উপর লিখিত বই নিয়ে রহীম শাহ'র লেখা থেকে জানা যায়- "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বনন্দিত আদর্শ, চেতনা ও দর্শনের একটি নাম। তাঁর জন্ম হয়েছিল মধুমতি ও বাইগার বিধৌত, পাখির গানে মুখরিত অবারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। মহীয়সী এক জননীর কোল আলোকিত করে জন্ম নেয়া এ শিশুটির পরম আদরের নাম 'খোকা'। টুঙ্গিপাড়া গ্রামের প্রতিটি পথ-প্রান্তর যেন তাকে চেনে। সে গাঁয়ের মাটি তাকে চেনে। মধুমতি নদীতে সাঁতার কেটেই কেটেছে তার দুরন্ত শৈশব। সে শিশুর পায়ের আলতো স্পর্শে যেন ধন্য হয়েছে এ গাঁয়ের মাটিতে গজে ওঠা দূর্বাদল। মাটিও যেন তাকে ভালোবাসে। এ গাঁয়ের বাতাসে বিকশিত হয়েছে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

অমর মহাকাব্যের কবি বঙ্গবন্ধু। বাইগার আর মধুমতীর জলে সিক্ত হয়ে যে খোকা একদিন কেঁদে উঠেছিল টুঙ্গিপাড়ায় সেই খোকাই সময়ের নদীর স্রোতে বেড়ে উঠে হয়ে যায় সকলের বঙ্গবন্ধু। উনিশশ ঊনসত্তর সালের উত্তাল দিনগুলোতে, চারদিকে যখন আগুনের ফুলকিতে তিলে তিলে মাতৃগর্ভে তৈরি হচ্ছিল মুক্তি। পৃথিবীর আরেক কীর্তিমান নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রোর কাছে বঙ্গবন্ধুই হয়ে ওঠেন হিমালয়ের প্রতীক। ৭ মার্চের অনবদ্য ভাষণে নিউইয়র্কের নিউজ উইক ম্যাগাজিনের মূল্যায়নে তিনিই হয়ে উঠেন পৃথিবীর প্রথম 'পোয়েট অব পলিটিক্স'।

ছড়া ও কিশোর কবিতায় যাঁরা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে মহিমান্বিত করেছেন, বঙ্গবন্ধুর ট্রাজিক মৃত্যুকে গভীর দ্যোতনায় চিত্রিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লুৎফর রহমান রিটন, আমীরুল ইসলাম, আসলাম সানী, আহমদ মাযহার, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আনিসুল হক, সুজন বড়ুয়া, আবু হাসান শাহরিয়ার, মসউদ-উশ-শহীদ, মাহমুদ উল্লাহ, শাহাবুদ্দীন নাগরী,

সিকদার নাজমুল হক, আবদুল আজিজ, সিরাজুল ফরিদ, সুকুমার বড়ুয়া, রহীম শাহ ও তপন বাগচী ছাড়াও আরও অনেকে।

ছড়া কবিতার পাশাপাশি "গান হয়ে ওঠে আমাদের ন্যায়যুদ্ধ জয়ের, মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ ও প্রেরণা দৃপ্ত করার অপরিমেয় আঁধার। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল আমাদের সেই উন্মাতাল সময়ের সেইসব গানের সম্প্রচারগত শক্তিশালী হাতিয়ার। সিকান্দার আবু জাফর, হরলাল রায়, গোবিন্দ হালদার, সলিল চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, হাফিজুর রহমান, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আপেল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হুদা, সরদার আলাউদ্দিন আহমদ, আবুবকর সিদ্দিক, ফজল-এ-খোদা, আবদুল লতিফ, আবুল কাসেম সন্দীপ, শহীদুল ইসলাম, নয়ীম গওহর, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, হাবীবুর রহমান, নেওয়াজিস হোসেন, টি. এইচ. সিকদার, ফেরদৌস হোসেন ভূঁইয়া, মকসেদ আলী সাঁই, আখতার হুসেন, শাহ আলী সরকার, মোমতাজ আলী খান, নূর মোহাম্মদ খান, সরদার রজ্জবল আলী দেওয়ান, রেজাউল করিম চৌধুরী, কামাল উদ্দিন আহমদ, মো. আজিজ-উল-ইসলাম, গোবিন্দচন্দ্র রাজবংশী, কে. এম. আলী আজম, মো. সিরাজুল ইসলাম, আবদুল গনি বোখারী, রথীন্দ্রনাথ রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশ (শেষোক্ত তিনজন কবির কবিতায় সুরারোপ করা হয়)– এঁদের রচিত এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার গীত বৃন্দ ও একক সঙ্গীত মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বাধীনতাকামী প্রতিটি বাঙালিকে যুদ্ধকালীন নটি মাস এক মুহূর্তের জন্যও অনুদ্বেল থাকবার সুযোগ দেয়নি। এসব গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত ও মুকুন্দ দাসের গণচিত্তজয়ী অমর সব গানের অনিবার্য ধারাপ্রবাহ তো ছিলই। স্বাধীন বাংলা বেতারতরঙ্গ যোগে যেমন মুক্তিযুদ্ধ, তেমনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গানও আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত এবং অংশুমান রায় গীত শোনো একটি মুজিবরের থেকে/লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি/আকাশে বাতাসে ওঠে রণি/বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ॥ অথবা এখনো যখন বেতার বা টেলিভিশনের ধ্বনি-তরঙ্গে শ্যামল গুপ্তের কথায় এবং বাপ্পী লাহিড়ীর সুরে মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের গাওয়া সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম/মুজিবর, মুজিবর, মুজিবর/সাড়ে সাত কোটি প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম/জয় বাংলা, জয় মুজিবর,

জয় বাংলা, জয় মুজিবর– গানটি শুনি, তখন মন ঘুরেফিরে চলে যায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে এবং মনে হয়, বঙ্গবন্ধু এখনো জীবিত, তাঁরই নামে চলছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। বলা বাহুল্য, এই তালিকা ভগ্নাংশেরও ভগ্নাংশ মাত্র। সমগ্র দেশ পরিসরে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে নাম-না-জানা কত লেখক, শিল্পী গীতিকার ও নাট্যকার তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কী পরিমাণ কাজ করেছিলেন, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া, পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ। এই ভূমিকার স্বল্প পরিসরে তা ধারণ করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য আসছে হাতে। আসছে নানা ধরনের গ্রন্থ, দলিল-দস্তাবেজ ও সঙ্কলন ইত্যাদি। এ-রকমেরই একটি সঙ্কলন মোস্তফা জামান আব্বাসী সম্পাদিত স্বাধীনতা দিনের গান, যাতে সঙ্কলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রচিত ও গীত লোকশিল্পীদের ৭৮টি গান। প্রকাশকাল ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ।"

(জনকের মুখ, আখতার হুসেন, কথা প্রকাশ)

লুৎফর রহমান রিটন বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর নৈবেদ্য সাজিয়েছেন একশ ছড়া দিয়ে। যেমন ছড়াগুলোর শিরোনাম 'ধন্য মুজিব', 'ইতিহাসে', 'শেখ মুজিবের নামে', 'বঙ্গবন্ধু : জাতির পিতা', 'ভুলব না', 'সাতই মার্চ ১৯৭১', 'চির অক্ষয়', 'স্বাধীনতার ঘোষক', '১৫ আগস্ট : ১৯৭৫', 'শাবাশ মুজিবর', 'শেখ মুজিবের নামতা', 'জাতির পিতার জন্মদিনটা', 'বাংলাদেশকে আঁকতে হলে', 'আমার সম্পদ', 'ঋণ শোধ', 'তোমার নামে', 'টাকার মধ্যে এই ছবিটা কার?', 'মুজিবের সন্ধানে', 'বাংলাদেশের হৃদয় জুড়ে', 'মুজিবর মানে', 'মুজিব বন্দনা', 'সেরা বন্ধু বঙ্গবন্ধু' ও 'জয় বাংলা জয় মুজিবর'। বইটির সর্বশেষ লেখা ছড়া হলো 'সেরা বন্ধু বঙ্গবন্ধু'। ছড়াকার উল্লেখ করেছেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০তম জন্মদিনে আমার নৈবেদ্য'।

তোমার নাকি বন্ধু অনেক?
যে বন্ধুরা তোমার আপন, তোমার প্রিয় স্বজন।
বলতে পারো ক'জন ওরা? ক'জন?
তুমি ওদের নাম-ঠিকানা, কোথায় থাকে কোথায় পড়ে
সবই জানো সবই চেনো,
কার কি স্বভাব, কার হৃদয়ে ভালোবাসার রঙটা বেশি গাঢ়
কারো কারো ফোন নাম্বার অনায়াসে স্মৃতি থেকেই বলে দিতে পারো।

মোট কতোজন বন্ধু তোমার? একশো? দু'শো? তারচে বেশি?
পাঁচশো নাকি হাজার?
এতো বন্ধু পাওয়া তো নয় সহজ মোটে,
সুলভ দামে বন্ধু কিনতে পারবে তুমি পৃথিবীতে নেইকো তেমন
শপিং প্লাজা, বাজার।
এক জীবনে হয় না বেশি বন্ধু কারো। বন্ধুভাগ্য হয় না সবার ভালো
কোনো কোনো বন্ধু থাকে যে বন্ধুটির দু'হাত ভরা ভালোবাসার
আলো।
বাংলাদেশেই এমন একজন মানুষ আছেন
কোটি কোটি বন্ধু যে তাঁর! সংখ্যাটা যার গুণে গুণে যায় না করা
শেষ...
তাঁর বন্ধুর তালিকাতে ষোলো কোটি মানুষ এবং একটি পুরো দেশ!
এই বাংলার সকল কিছুর বন্ধু তিনি, আকাশ-বাতাস-মৃত্তিকা-ঘাস
সাগর-নদী-ফুল-পাখি আর স্নিগ্ধ পাহাড় সবার তিনি আপন।
বন্ধু তিনি বাঙালি আর বাংলাদেশের
তাঁকে ঘিরেই একটি জাতির স্বপ্ন, জীবন যাপন।
তিনি হচ্ছেন 'বঙ্গবন্ধু' অর্থাৎ কী না শেখ মুজিবুর, তিনি জাতির
পিতা।
মানচিত্রের সমান তিনি, স্বাধীনতার মোহন বাঁশি, শোষিতদের মিতা।

আমীরুল ইসলামও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ কিছু বই লিখেছেন। এর মধ্যে ছড়া কবিতা আছে তেমন ছোটদের এবং বড়দের গল্পের বইও আছে। যেমন 'বঙ্গবন্ধু ও দোয়েলের গল্প, আমাদের বঙ্গবন্ধু , বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প প্রভৃতি বই বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর অসংখ্য ছড়া কবিতার মধ্যে '৭ই মার্চ' শিশুদের জন্য বেশ উৎসাহ উদ্দীপক।

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু
দিলেন যখন ভাষণ
সেই ভাষণে উঠল কেঁপে
স্বৈরাচারীর আসন।
রেসকোর্সের মাঠে

মুক্তি পাগল লক্ষ লোকের
গলার আওয়াজ ফাটে।
আকাশ কাঁপে বাতাস কাঁপে জয় বাংলার জয়
ধনী গরিব ছাটে বড় একত্রিত হয়
সবাই সেদিন অকুতোভয়ে, দুর্বার দুর্জয়।
লক্ষ প্রাণের ভিড়ে
চঞ্চল অস্থির
ঠিক তিনটায় মঞ্চে এলেন বাঙালিদের বীর।
উন্নত তার শির
কণ্ঠ কী গম্ভীর।
মঞ্চ প্রকম্পিত
সবাই বিচলিত
স্বাধীনতা বিরোধীরা এবার আতঙ্কিত
সেদিন জাতির পিতা
রেসকোর্সে ঐতিহাসিক দিলেন যে বক্তৃতা
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম–
সেদিন থেকে স্বাধীনতার যাত্রা শুরু হয়
জয় বাংলার জয়।

কবি ছড়াকার আসলাম সানীর ধ্যান-জ্ঞান বঙ্গবন্ধু। তিনি কেবল লেখকই নন, তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মাঠ পর্যায়ের সৈনিক। বঙ্গবন্ধু নিয়ে নিয়ে তিনি অসংখ্য বই লিখেছেন, সম্পাদনা করেছেন। তার মধ্যে ছড়া কবিতা গদ্যপদ্য উভয় ধরনের রচনাই আছে। যেমন বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালি বাংলাদেশ, কিশোর গল্পে বঙ্গবন্ধু, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, জাতির পিতা শেখ মুজিব, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ছড়া কবিতা প্রভৃতি। আসলাম সানীর 'পিতাকেই মনে পড়ে' ছড়া কবিতাটি বঙ্গবন্ধু প্রতি তাঁর হৃদয়ের অর্ঘ্যের বহিঃপ্রকাশ।

যখন নীল আকাশে চন্দ্র সূর্য ওঠে
মুক্ত হাওয়ায় মুগ্ধ পাখিরা ছোটে
রিম ঝিম ঝিম বৃষ্টি যখন ঝরে
মুজিবের কথা মনে পড়ে আমার
পিতাকেই মনে পড়ে।
ঢেউয়ের ছন্দে জীবনানন্দে

নায়ের মাঝি ছোটে
ঝিলের জলে শাপলা শালুক
সুখ স্বপ্নে ফোটে
হৃদয় দোলে ওঠে
তখন আমার মন টেকে না ঘরে
দুরন্ত আমি ছুটে যাই যেন
মাঠ ঘাট চরাচরে
প্রাণ যে কেমন করে
মুজিবের কথা মনে পড়ে যায়
পিতাকেই মনে পড়ে।
কৃষক মাঠে শ্রমিক খাটে
উন্নয়নের অগ্রগতির
দেশটা সবাই গড়ে
তখন আমরা শ্রেষ্ঠ বাঙালি
পিতাকেই মনে পড়ে।
পাহাড়ে শান্তি সীমানা প্রাপ্তি
সমুদ্র আয়ত্তে আসে
জনকের আশা বাঙালির ভাষা
বঙ্গদুহিতা হাসে
সোনার ছেলেরা বিশ্বজুড়ে
বিজয় আনন্দে ভাসে
লাল-সবুজের পতাকা ওড়ে
আকাশে বাতাসে।
বীর বাঙালির গর্বে তোমার
মনটা কেমন করে
স্বাধীনতার মহান নেতা
পিতাকেই মনে পড়ে
বাঙালির ঘরে ঘরে
বাঙালির অন্তরে।

ছড়ার সম্রাজ্যে আরেকজন রাজপুত্র রহীম শাহ। যার ছড়া দেশি বিদেশি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছড়ার নানা অঙ্গিকের পরীক্ষাও তিনি

সফলভাবে করেছেন। তিনিও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক ছড়া কবিতার বই রচনা করেছেন, সম্পাদনা করেছেন। যেমন 'গদ্যে-পদ্যে শেখ মুজিব', শত লেখায় বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত একশ কিশোর রচনা, প্রভৃতি। রহীম শাহ'র 'পঁচাত্তরের ভুলে' ছড়া কবিতাটিতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট করুণ গাথার প্রকাশ গটেছে।

আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে
কাঁদে নদীর জল,
মুহুর্মুহু কাঁদতে থাকে
গাছ-পালা ফুল-ফল।
দূর সাগরের ঢেউরা কাঁদে
আছড়ে পড়ে কূলে,
কাশের বাগান বিলাপ করে
একাত্তুরের ভুলে।
বাক-বাকুম পায়রাগুলোর
ভেঙে গেছে ডানা,
ধান খুটে আর খায় না তারা
উঠোনে একটানা।
সবাই জানে কী এর কারণ
কারা যে এর মূলে,
পায়রার খাপে শূন্য এখন
পঁচাত্তরের ভুলে।
খুকুর নূপুর গড়িয়ে গেছে
রক্ত মাটির কাদায়,
জল টলমল খুকুর দু'চোখ
বাঙালিদের কাঁদায়।
রাজপথে আজ হাজার শিশু
করছে হুলস্থুল,
সময় এবার শুধরে নেবার
পচাত্তুরের ভুল।

খালেক বিন জয়েনউদদীনও বঙ্গবন্ধু উপর বহু লেখালেখি করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন, সম্পাদনা করছেন, তার মধ্যে ছড়া কবিতাসহ অন্যান্য মাধ্যমে রচনা

রয়েছে। যেমন, 'বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখালেখি-গবেষণা গ্রন্থ তালিকা' প্রকাশ করেছেন। বঙ্গবন্ধু এবং শেখ পরিবারের ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর 'মুজিব নামের ফুল ফুটেছে' ছড়াটি এখানে উদ্ধার করলাম।

আয়রে খোকা আয়রে খুকি দেখবি যদি আয়
মুজিব নামের ফুল ফুটেছে মধুমতীর গাঁয়।
ফুল ফুটেছে বইছে নদী গাইছে পাখি গান
মুজিব আমার জাতির জনক মুজিব আমার প্রাণ।
আয়রে খোকা আয়রে খুকু দেখবি যদি আয়
মুজিব নামের ফুল ফুটেছে আমার সবুজ গাঁয়
ফুল ফুটেছে দেশটি জুড়ে সুবাস ছড়ায় বেশ
সেই ফুলটির নাম দিয়েছি 'সোনার বাংলাদেশ'।

ছড়া সাহিত্যে যারা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন আনজীর লিটন তাদের অন্যতম। তিনিও বঙ্গবন্ধুর উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ছাড়া কবিতার বই প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে 'আমার ছড়ায় বঙ্গবন্ধু' উল্লেখ্য। 'এখানে আনজীর লিটনে 'আমার বঙ্গবন্ধু' ছড়াটি উৎকীর্ণ করা হলো।

এই যে আমরা আমাদের মতো
গেয়ে যাই গান সুখে অবিরত
এই যে ফসল উর্বরা মাটি
ফুল পাখি নদী অপরূপ খাঁটি
বিজয়ের উল্লাস
এখানে আমার বঙ্গবন্ধু মহানায়কের বাস।
এই যে আমরা পথ হেঁটে যাই
সাহসী প্রেরণা প্রাণ খুঁজে পাই
এই যে মিছিল দাবি-প্রতিবাদ
মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তির স্বাদ
এই যে পতাকা স্বাধীন দেশের
মায়া ধরা এক ছবি
এখানে আমার বঙ্গবন্ধু আলোমাখা এক রবি।

এই যে আমরা বাংলায় চলি
বাংলা ভাষায় মা'র কথা বলি
এই যে হৃদয়ে শহীদের নাম
স্মৃতির স্তম্ভ শ্রদ্ধা-সালাম
এই যে প্রাণের শহীদ মিনার
বাঙালির মূল সুর
এখানে আমার বঙ্গবন্ধু বিজয় একাত্তর।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সুজন বড়ুয়ার লেখালেখিও কম নয়। তিনি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প ছাড়াও লিখেছেন অসংখ্য অসংখ্য বড়দের ও ছোটদের জন্য ছড়া। তাঁর 'বিশ্বসেরা নেতা' ছড়াটি এখানে উদ্ধার করা হলো।

থামাও তর্ক বৃথা এ তর্ক
কোন নেতা বড় কার চে'
আমরা তো সেই প্রমাণ পেয়েছি
একাত্তুরের মার্চে।
একাত্তুরেই নেতা দিয়েছেন
বিশ্ব কাঁপানো ভাষণ
সে ভাষণে ঘোচে পরাধীনতা
টলে দানবের আসন।
তোমরাই বলো কে আছে এমন
কে সে বড় আর তা রচে'
তার গুণ গান যশ অফুরান
যেন রোজ আরো বাড়ছে।
বজ্রকণ্ঠে তর্জনী তোলা
মাথা উঁচু করা বীর সে
তার সে ভাষণ বিশ্ব-দলিলে
এখন সবার শীর্ষে।
আজ আর তাই প্রশ্নটি নাই
কোন নেতা বড় কার চে'

বঙ্গবন্ধুই বড় নেতা যেন
পৃথিবীর সব্বার চে'।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখালেখির পরিমাণ এতো ব্যাপক তার সব নমুনা একটা রচনায় রাখা সম্ভব নয়। বাঙালি জাতির এই বীর পুরুষ জাতি সত্তার নির্মাতা স্বাধীন দেশের স্থপতি জাতির পিতাকে নিয়ে লেখালেখি চলতেই থাকবে।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি সাহিত্যিক ছড়াকারদের লেখা শুরু হয়েছিল পাকিস্তান পর্ব থেকে। ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় শহুরে কবি-সাহিত্যিকের পাশাপাশি স্বভাব কবি, চারণ কবি লোককবিরাও ব্যাপকভাবে মুখে মুখে ছড়া কবিতা বানাতে চেষ্টা করে। যেমন মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি ছড়া মুখ জনপ্রিয়তা লাভ করে, এবং প্রতি এলাকার লোকই দাবি করে, এটি তাদের এলাকার কবিয়ালরা করেছেন, যেমন 'ইলিশ মাছের তিরিশ কাটা বোয়াল মাছের দাড়ি/ টিক্কা খানে ভিক্ষা করে শেখ মুজিবের বাড়ি।' 'বলে ইয়াহিয়া/ কচু খাইয়া।' 'বলে টিক্কা খান/ আব্বাজান।' এসব লোক কবি ছড়াকাররা আজ বিস্মৃত হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান ছিল। তারাই জাতির পিতাকে নিয়ে নিঃস্বার্থ এসব রচনা করেছেন।

আমার বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ : বাল্যস্মৃতি

"আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমাদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে। বাড়ির চার ভিটায় চারটা দালান। বাড়ির ভিতরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, যা আমরাও ছোট সময় দেখেছি বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত। একটা দালানে আমার এক দাদা থাকতেন। এক দালানে আমার এক মামা আজও কোনোমতে দিন কাটাচ্ছেন। আর একটা দালান ভেঙে পড়েছে, যেখানে বিষাক্ত সর্পকুল দয়া করে আশ্রয় নিয়েছে। এই সকল দালান চুনকাম করার ক্ষমতা আজ তাদের অনেকেরই নাই। এই বংশের অনেকেই এখন এ বাড়ির চারপাশে টিনের ঘরে বাস করেন। আমি এই টিনের ঘরের এক ঘরেই জন্মগ্রহণ করি।" –(অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

আমার কাছে বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন- একটি চকলেটের মালার মধ্যে এক উদ্ভাসিত মুখ হয়ে। অনেক চকলেট ও ফুলের মধ্যে তিনি ছিলেন নির্বিকার, তাঁর চোখ দুটি ছিল উজ্জ্বল, উন্নত নাশা- তার নিচেই জোড়া ঘন গোঁফ। প্রশস্ত ললাটের উপর চুলগুলো পেছনের দিকে বিস্তৃত। চশমার কাঁচ গলিয়ে চোখ দুটি ঠিক আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো- কিছুটা উর্ধ্বপানে দৃষ্টি রেখে- যেন কিছুই এড়িয়ে যায় না তার দৃষ্টির সীমানা থেকে- যতক্ষণ আমি তাঁর ছবিটির সামনে থেকেছি, ততক্ষণই সেই ছবির মানুষটি আমায় চোখে চোখে রেখেছেন। এদিক ওদিকে গিয়ে অনেকবার পরীক্ষা করেছি, তাঁর গলায় ঝুলানো সম্মান ও শোভাবর্ধনের রঙিন কাগজের মালা, তাজা ফুলের ব্যবহার তখনো খুব বেশি দৃশ্যগোচর হতো না- সেই সব মালার ভেতরে লুকিয়ে রাখা চকলেট চুরি করার ফন্দি এঁটেছি বহুবার, পেরে উঠিনি, মনে হয়েছে এই বুঝি তিনি ধরে ফেলবেন। যদিও তার অবয়বে ছিল না কোনো কাঠিন্য; টোল খাওয়া চিবুক আর ঘন গোঁফের নিচের ঠোঁট দুটিতে লেগে থাকত চাপা হাসির রেখা। মনে

হতো সব কিছু তিনি দেখতে পাচ্ছেন; কিন্তু ভাবছেন অন্যকিছু। এমনকি তার বাম গালের উপর একটি তিলও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত। যদিও তখনো আমার মানুষকে আলাদা করে চেনার সক্ষমতা তৈরি হয়নি। তখনো কেবল নিজের বাবা মা ভাইবোনের বাইরে কেবল আশে-পাশের খেলার সাথীদেরই চিনতে পারতাম। এর বাইরের সকল জগত ছিল অনুদ্ভাসিত, কল্পনার দ্বারা অবিষ্ট। তখন আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে সবই ছিল, অন্ধকার কালো। গ্রামের বিস্তৃত খেলার মাঠে দাঁড়ালে দেখতে পেতাম- আকাশ কিভাবে নিচে নেমে আসে- গোল তাবুর মতো হয়ে। তার কিনার ঘেষে ছোটছোট সাইবাবলা ও কালো অন্ধকার তমালের বেড়া। আমাদের বাড়ি ছিল পাবনা শহর থেকে দশ কিলোমিটার পশ্চিমে, ঈশ্বরদী থানা এলাকা থেকেও দূরত্ব প্রায় সমান। এমনকি দক্ষিণে কুষ্টিয়া শহর- যদিও যেতে হলে অতিক্রম করতে হতো- প্রমত্ত পদ্মানদী পালতোলা নৌকায়। কিন্তু দক্ষিণে আমাদের গ্রামটিই ছিল শেষপ্রান্ত, তারপর ধূধূ চর। শীতকালে প্রায় দশ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পদ্মায় খেয়া নৌকা পাড়ি দিয়ে এ এলাকার মানুষ কুষ্টিয়ায় যেতো হাটবাজার করার জন্য। তবে কুষ্টিয়া যাওয়ার উত্তম সময় ছিল বর্ষাকালে। পদ্মার একটি শাখা নদীর তীরে আমাদের গ্রামটি গড়ে উঠেছিল। নদীতে নৌকায় উঠলেই ঠিক কয়েক ঘন্টার মধ্যে গড়াই নদীর তীরে কুষ্টিয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দিত। এই কয়েক ঘন্টা রাস্তা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। কখনো দাড় বেয়ে, কখনো গুণ টেনে কয়েক মাইল রাস্তা পার হয়ে মূল পদ্মায় পৌঁছাতে হতো। পদ্মা ও গড়াই নদীর দূরত্ব ও পার্থক্য ছিল খুব কম। এই পদ্মা ও গড়াই নদীর এই অঞ্চলই মূলত ছিল রবীন্দ্রনাথ ও লালন ফকিরের বসতি।

তবে কুষ্টিয়া শহরের আমাদের বড় মাপকাঠি ছিল মোহিনি মিলের চিমনি। খুব ছোট বেলা থেকে আমার কাছে নিজের গ্রাম ছাড়া যে বস্তু প্রতিভাত হয়েছিল সেটি মোহিনি মিলের চঙ। শরৎকালে সন্ধ্যা বা ভোরে প্রায় দশ বারো কিলোমিটার দূর থেকেও আমরা মোহিনি মিলের চঙ দিয়ে ধোঁয়া উড়তে দেখতাম। আমাদের বাড়িতে ছিল বিশাল একটি তাল গাছ। পাবনা হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতাল থেকে তার উচ্চতা দেখা যেতো। বলা চলে পূব দিকে পাবনা শহর আর পশ্চিমে কিছু গ্রাম ছাড়া উত্তর দক্ষিণ প্রায় সবটা ছিল ফাঁকা বিস্তীর্ণ মাঠ। আমার বঙ্গবন্ধু হওয়ার ক্ষেত্রে এই গ্রামের পরিচয়টুকুর কিছুটা প্রয়োজন আছে। যদিও আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র পাঁচশত গজ দূরে

একটি প্রাথমিক ও দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশাল একটি খেলার মাঠ পুরো গ্রামের মর্যাদা হয়েছিল। তারপরেও তালগাছটিও গ্রামের একটি গর্ব হয়ে ছিল; তার পাশেই ছিল সরু ও সমান লম্বা একটি খেজুর গাছ। শীতকাল শেষ হয়ে গেলে কোথা থেকে ঝাকে ঝকে বাবুই পাখি এসে বাসা করতো। আর গ্রামে গবাদি পশু মারা গেলে বিশাল বিশাল গলাছিলা শকুন তালগাছের শাখায় অবস্থান নিতো।

যে সময়টির কথা বলছি, সেটি ১৯৭০ সালের কাছাকাছি। যখন সারা বাংলাদেশ পাকিস্তানের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের রায় দেয়ার জন্য উত্তাল হয়ে উঠেছে। তারই বছর পাঁচেক আগে এই গ্রামে আমার জন্ম। একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল। দশ ভাইবোনের পরিবারে আমি ছিলাম তখন পর্যন্ত সর্ব কনিষ্ঠ। ১৯৭১ সালের শুরুর দিক আমার বাবার পরিবারের শেষ সদস্য এক বোনের জন্ম হয়েছিল। আশ্চর্য মাত্র কয়েক মাসে মুক্তিযুদ্ধের মাঝখানেই সে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিল। কোথাও গুলির শব্দ হলেই বলত- বমম, ধুম, মিলিটারি- এই ধরনের শব্দরাজি তার ঝুড়িতে জমা হচ্ছিল। যে সবার আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকত। কাছেকোলে কারো দিকে হাত বাড়িয়ে দিত- যে তাকে বহন করতে পারত মিলিটারির ভয়ে দূর গ্রামে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। সেও শিখে ফেলেছিল মিলিটারি গ্রামে এলে পালানোর কৌশল, ভুলেও একটি টু শব্দ করতো না। যতক্ষণ না আমরা গ্রাম থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে দক্ষিণে নদী বড়োদাগের কোলের নিচে পৌঁছাতাম। পানি সরে যাওয়ার পরে এই নদীর পাড়ি অনেক দূর নিচে নেমে যেতো। গাঙ শালিকেরা যেভাবে পাড়ের মাটিতে বাসা করে ডিম লুকিয়ে রাখত, আমরাও ঠিক নদীর কিনারায় নানা গর্তে এবং দ'য়ের মধ্যে পালিয়ে থাকতাম- যতক্ষণ ভোর না হতো, যতক্ষণ গ্রাম থেকে কেউ খবর না নিয়ে আসত যে, মিলিটারিরা চলে গেছে। এ কেবল একদিন বা এক রাতের গল্প নয়, অসংখ্য রাতের গল্প। ঘুম থেকে মা কিংবা বোন ভাইদের কেউ একজন বলে উঠল, মিলিটারি আসছে, ওমনি পুরো গ্রাম জেগে উঠতো, সারি সারি নগ্ন পা মেলে বাঁচার প্রত্যাশায় সকলে প্রায় একই দিকে চলতে থাকত। যদিও এই পলানোতে কেউ নেতৃত্ব দিতো বলে মনে হয় না। তবু সবার গন্তব্য যেন একই দিকে, একই লক্ষ্যে।

একটি যুদ্ধের মধ্যে আমার জন্ম হয়েছিল। যুদ্ধের স্মৃতির মধ্যে আমরা বেড়ে উঠেছিলাম। আর সেই যুদ্ধের যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই ছবির মানুষটি। যার জন্য এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল, যার জন্য মানুষ যুদ্ধ করেছিল। তাকে আমি সামনে সরাসরি দেখিনি থেকে দেখিনি। তাকেই পুরো পরিবার, এমনকি পুরো গ্রাম ধ্যান জ্ঞান মেনেছে। তিনি কোথাও ভাষণ দেবে শুনলে ভাইদের মতো বৃদ্ধ বাবাও চঞ্চল হয়ে উঠতেন, তিনি আমাদের জন্য এমন কিছু একটা বলবেন- যা আমরা কেউ জানতাম; তিনি আসলে ছিলেন এক দেবদূত, যিনি মুক্তির কথা শোনাবেন। তাঁর একটি কথা ও নির্দেশ শোনার জন্য একটি কাঠের ট্র্যানে্জস্টারে মানুষ কান পেতে থেকেছে। তার নাম আমরা শেখ মুজিব বলেই জেনেছি। গ্রামের মুরুব্বিদের বলতে শুনেছি শেখের ব্যাটা, কেউ বলত মজিবর। বঙ্গবন্ধু শব্দটিও তখন চালু হয়েছিল। তা কেবল বলত, যারা স্কুল ও কলেজে পড়ত, পাড়ায় মিছিলে নেতৃত্ব দিতো তারা। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে মানুষ জাতির পিতা বলেও মানতে শুরু করেছে।

এবার চকলেটের বঙ্গবন্ধুর কাছে ফিরে আসি। আগেই বলেছি আমাদের গ্রামটি ছিল একটি বর্ধিষ্ণু বসতির, যার অধিকাংশ ছিল শিশু ও তরুণ। বয়স্কদের প্রায় সবাই কৃষি কাজের সঙ্গে ছিল জড়িত। কাজ থেকে ফিরে পাড়ার দহলিজে তাদের নানা বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করতে দেখা গেলেও সকাল হতেই তারা লাঙল গরু নিয়ে মাঠে ছুটত। ফিরে এসে গরুগুলোর যত্ন নিতো, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত, আর ফসলের জো, জমিতে সেচ ও বেচন নিয়ে গল্প করতো। যুবকদের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি- যাদের খুব কম সংখ্যক যুবক স্কুলে যেতো, যদিও গ্রামে একটি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় কেবলই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবু অধিকাংশ গ্রাম থেকে তিন চার মাইল দূরের পুরনো বাঁশের বাদা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হওয়াকে বেশি মর্যাদার বলে মনে করে। তবে দুই স্কুল মিলে পুরো গ্রামে তখন দশ বারো জনের বেশি নবম বা দশ শ্রেণির ছাত্র ছিল বলে মনে হয় না। যদিও এই গ্রামে প্রথম বি.এ পাস করেছিলেন আমার অগ্রজ আব্দুল ওয়াহাব বিশ্বাস ১৯৬৪ সালে। তার প্রায় বছর দশেকের ছোট মধ্যম ভ্রাতা আব্দুল খালেক বিশ্বাস তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। বলা চলে তাকে ঘিরেই এই গ্রামে মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি সংগ্রামের উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র একটি বাড়ি পরে আমার মামা শফিউর রহমান তখন আইএ পাস করেছিল, তিনিও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বে ভূমিকা রেখেছিলেন। আরেক

মেজভাই, মেজখালার ছেলে, যার সঙ্গে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ট সহোদরার বিয়ে হয়েছিল, সেও একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে গমন করেছিলেন।

আমাদের বাড়িতে একটি বাড়তি সুবিধা ছিল- মূল বাড়ির বাইরের দিকে ছিল একটি বৈঠকখানা ঘর। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ছিল গরীব। তাদের থাকার জন্য একটি ছনের ঘর ছাড়া কিছুই ছিল না, ব্যতিক্রম ছাড়া। আমাদের চারি ভিটাতে ঘর ছিল, বাইরের একটি ঘর বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহার হতো। ফলে মুক্তিযুদ্ধকালে একটি বাড়তি সুবিধা পেয়েছিলাম আমরা। তখনো টিনের প্রচলন তেমন শুরু হয়নি, আমাদের বাড়ির এক ভিটায় কেবল একটি টিনের ঘর ছিল, বাকিগুলো ছন দিয়ে ছাওয়া; তখন টিনের চেয়ে ছনের ঘরের কদর একটু বেশি ছিল। এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের বাড়িতে সমবেত হতেন, এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমাদের বাড়িতে রেখে দিতেন। তখন অনেক রকম অস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় গড়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় যে বন্দুক ছিল, তার নাম মেশিন গান। মাঝে মাঝে মেশিন গানের ফাঁকা গুলি করার দরকার হলে আমার মেজভাই আব্দুল খালেক বিশ্বাস এবং মামা শফিউর রহমান- আমাদের শিশুদের বলতেন- তাদের কোমর জড়িয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে। মেশিন গানে গুলি ছোঁড়ার সময়ে তাদের মনে হতো গুলি নিক্ষেপের গতি তাদের শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমরা সেখানে ভারসাম্যের কাজ করতাম। মেশিন গানের গোলা নিক্ষেপের পরে চারিদিকে গুলির অসংখ্য গরম খোসা ছাড়িয়ে থাকত। আমরা কুড়িয়ে নিতাম, প্রথম প্রথম গুলি ছোড়ার পর পরই খোসা কুড়াতে গিয়ে হাতে ছ্যাকা খেয়েছি, আঙুলে ফোসকা পড়েছে। গুলির খোসাগুলি আমরা কুড়িয়ে রাখতাম, খালি খোসা দিয়ে বন্ধুদের সাথে খেলা করতাম। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে আমরা এগুলো আইসক্রিমওয়ালাদের কাছে বিক্রি করতাম, খোসার বিনিময়ে আইসক্রিম ও তিলে খাজা খেতাম। পরে অল্প কিছুদিনের মধ্যে খোসার দাম বেড়ে গেল, তখন আমাদের অনেক আফসোস হতে থাকল, যদি তখন এগুলো এভাবে বিক্রি না করতাম তাহলে পরে অনেক দামে বিক্রি করতে পারতাম। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরে বেশ কয়েক বছর ধরে চলেছিল গুলির খোসা সংগ্রহ। আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে স্কুল মাঠ সেখানে মঙ্গল আর শুক্রবারে হাট বসত। আশে পাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ফড়িয়ারা আসত, খরিদ্দার আসত, দোকানিরা আসত। যদিও এই হাটে কোনো ঘর ছিল না, বর্ষায় শীতে একইভাবে খোলা জায়গায় বসে

বেচাকেনা করতে হতো, তবু সবার জন্য স্থান থাকত নির্ধারিত। এখনো একইভাবে হাট বসে, এখনো অধিকাংশ দোকানি পসরা বসায় উন্মুক্ত ময়দানে, দুএকটা আধাপাকা দোকানও রয়েছে সেখানে। হাটে বেশির ভাগ বিক্রি হতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, তৈজস, অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্য- ধানচাল, গ্রামের মাঠ থেকে তুলে আনা টাটকা শাক-সবজি, মাছ। তবে যুদ্ধের পরে গুলির খোসা কেনার জন্য ভিন গাঁ থেকে ক্রেতা আসত, হাটের এক কোণে চটের ছালা বিছিয়ে গুলির খোসা কিনত, অধিকাংশ বিক্রেতা ছিল, আমাদের মতো শিশুরা; বড়রা ও বাড়ির মেয়েরাও খোসা কুড়িয়ে রাখত, কিন্তু নিজেরা খুব কম বিক্রি করতে আসত; শিশুদের দিয়ে বেচাত। এক হাট থেকে অন্য হাটে খোসার পরিমাণ কমতে থাকে আমাদের। ক্রেতারা লোভ দেখায় বেশি দিতে পারলে বেশি পয়সা দেবে। তখন এক পয়সা, পাঁচ পয়সার তামার মুদ্রা ছিল, দশ পয়সা খাঁজকাটা, পাঁচ পয়সা চৌকোনা, সম্ভবত তখনো পাকিস্তানি চাঁদ তারা উৎকীর্ণ মুদ্রা। চার আনা আট আনা এক টাকার মুদ্রা ছিল রুপোর, অন্তত বড়রা তাই বলতো। এক টাকা দু টাকার নোট তখনো চালু হয়নি। একটা গুলির খোসা বেচতে পারলে একটি দুধ মালাই হয়ে যেতো, কখনো তিলে খাজা, বাতাসা, খাইগাই খোরমা, ঝুরি বারোভাজা কিনতাম। মাঝে মাঝে হাটের এক কোণে জিলাপি ভাজা হতো, গরম গরম জিলাপি, গরম তেল থেকে তুলে গুড়ের সিরাতে ভেজানো হতো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতাম, কখনো কিনতাম এক ছটাক দুই ছটাক। তখনো কেজি কিংবা গ্রামের হিসাব চালু হয়নি। ষোল ছটাকে ছিল এক সের। ছটাকেরও নিচে ছিল আধ ছটাকা, কাকচা, তোলা। মানুষের হাতে পয়সা ছিল না। এক আনা পয়সা নিয়ে হাটে আসত। ছোট ছোট শিশি বোতলের গলায় রশি বেঁধে ঝুলিয়ে হাটে আসতো; কোনোটিতে সরিষার তেল, কোনোটিতে নারিকেলের তেল, আবার কোনোটিতে থাকত কেরোসি তেল। ষোল আনায় এক টাকা। ছয় পয়সায় এক আনা। এসব হিসাব কিভাবে হয়েছিল এখনো তা বলতে পারব না।

তবে আমার সবচেয়ে পছন্দের বন্দুক ছিল ব্যাটাগান। বেশ ছোট বেটেখাটো দেখতে, কালো সারা শরীর গোল গোল ছিদ্রে ভরা। অনবরত গুলি করা যেতে, সম্ভবত একেই ব্রাশ ফায়ার বলা হতো। সব ধরনের বন্দুকই আমরা নাড়াচাড়া করতাম। বন্দুক পরিষ্কারের কাপড়ের ন্যাকড়া, কেরোসিন এসব আমরাই সরবরাহ করতাম। মাঝে মাঝে ব্যাটাগান হাতে নিয়ে গুলি করার

ভঙ্গিও করেছি। তখন এমন একটা সময়, শিশুরাও যে হঠাৎ করে বড় হয়ে গেছিল, তা কেউ টের পায়নি। এখন ফিলিস্তিনি শিশুদের দিকে তাকালে কিছুটা আঁচ করা যায়। এসব বন্দুকের তখন বেশ সৌখিন ব্যবহারও দেখা যেতো। বিশেষ করে অবসরে বৈঠকখানায় গ্রামের মুরুব্বি ও শিশুদের অনুরোধে শখের ফায়ার করা হতো। একটা বিষয় তখন আশ্চর্য হয়েছি- একটি গাছকে লক্ষ করে গুলি করলে, যেদিক দিয়ে গুলি প্রবেশ করত সে দিকটা সামান্যই ছিদ্র দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু যেদিক দিয়ে গুলি বের হয়ে যায় সেদিকটি বিশাল অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। গুলি ঢোকানো যত সহজ বের করা হতো কঠিন। সবাই বল, গুলি গাছের কাণ্ডের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে সবকিছু ছিন্ন ভিন্ন করে বের হয়ে যায়। ব্যাটাগানের বাইরে হাত গ্রেনেড কিভাব পিন খুলে মারতে হয়, তা বাড়িতে ভাই এবং সহ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে দেখতে দেখতে শিখে গিয়েছিলাম। একটি বস্তুর নাম মনে নেই, যেটি অনেকটা হলুদ কলার মতো দেখতে ছিল, মোড়ক খুলে আগুন জ্বালিয়ে দিলে অনেক্ষণ জ্বলতে থাকত। বিশেষ করে শীতের রাতে গা গরম রাখার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করতেন। আমরাও নভেম্বর ডিসম্বরে শীত পোহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সে উষ্ণতা ভাগ করে নিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমরা প্রথম সতেরঞ্জি দেখেছিলাম, এমনকি কম্বলও। একটি ছোট চাদর ও কম্বলের মাঝামাছি ঘন ঠাসা উল বা সুতা দিয়ে বুনানো। বহনে শুবিধা, মাটিতে পেতে, গায়ে জড়িয়ে নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হতো। এই বস্তুটি যথেষ্ট টেসই ছিল; কারণ মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও এটি আমাদের বাড়িতে অনেকদিন ব্যবহার হয়েছিল।

পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই আমরা বঙ্গবন্ধুকে চিনতে শুরু করেছিলাম। এখন বুঝতে পারি সেটা ছিল ৭০ সালের নির্বাচন আগে আগে। এর আগে আমি এতই ছোট ছিলাম সেই সময়ের খুব একটা স্মৃতি মনে করতে পারি না। নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এসব ছিল মিছিলের অংশ, পরিবর্তনের হাওয়া। আগেই বলেছি, আমার মেজভাই তখন দশম শ্রেণির ছাত্র, সামনে মেট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছিল, এরমধ্যে দেশের উত্তাল গণবার্তা আমাদের গ্রামেও আছড়ে পড়েছিল। হয়তো তার আগে থেকেই। মেজভাই ছিলেন স্কুলে এবং এলাকায় ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতা। যদিও ক্লাশ টেনের ছাত্র, তবু বয়স বিশের কোটায়, বেশ স্বাস্থ্যবান, কালো, গাট্টাগোট্টা, সুদর্শন। বেশ ডাকাবুকো হিসাবে পরিচিত, সবাই তাকে সমঝে চলত। যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদে

একাই এগিয়ে যাওয়া ছিল তার স্বভাব। খারাপ লোকজন তাকে দেখে এক হাত তফাতে থাকতো। গ্রামে কিংবা বেগুন খেতে চোর ঢুকলে- নির্ঘাত তার হাতে ধরা পড়বে। অবশ্য সে একা নয়, তরুণদের একটা দলই তার নেতৃত্বে প্রস্তুত থাকত। যদিও আমাদের বাড়িতে চোর আসতে খুব একটা দেখিনি, যদিও আমাদের গ্রামের একটি বড় অংশের লোকজন চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

এই সময়ের একটা ঘটনা মনে আছে, শুক্র কিংবা মঙ্গলবারের কোনো এক হাটের দিনে সন্ধ্যার পরে আমাদের বাড়িতে একজন অপরিচিত অতিথি এসে হাজির। এলাকার একজন পরিচিত লোক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, বয়সে তরুণ, লম্ব সুদর্শন। যে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সে-ই পরিচয় করে দিল- ওই লোকের বাড়ি রূপপুর বিবিসি বাজারে কাছে, আমাদের এক জ্ঞাতির মেয়েকে সম্প্রতি বিয়ে করেছে। এখানে কোথায় আজ বেড়াতে এসেছিল, রাত হয়ে গেছে, যেতে পারেনি; কথায় কথায় জানতে পারি, সে আমাদের সম্পর্কীয় চাচাতো বোনের জামাই। তাকে যদিও কেউ চেনে না, যদিও বিবিসি বাজার আমাদের বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়, দশ বারো কিলোমিটারের মতো হবে; মুক্তিযুদ্ধের সময় এলাকাটি বিবিসি বাজার বলে পরিচিতি লাভ করেছে; কারণ তখন এখানকার চায়ের দোকানগুলোতে যুদ্ধালীন পরিস্থিতি নিয়ে বিবিসি'র খবর শোনার জন্য লোকজন জড়ো হতো, সেই থেকে এর নাম বিবিসি বাজার বলে খ্যাত হয়ে আছে, এই এলাকায় বর্তমানে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ হচ্ছে, যদিও পাকিস্তান আমল থেকে এই এলাকা পরিত্যক্ত পারমানবিক কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত ছিল। এখনকার মতো তখন কোনো ফোন মোবাইল ছিল না, চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে সব খবর পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাকে সরল মনে জামাই ভেবে, রাতে জামাই আদারে আপ্যায়ন করা হলো। মা নিজ হাতে রান্না করলেন, বাবা খোঁজ খবর রাখলেন, বোনরাও সালাম দিয়ে আসল, জামাই বলে কথা। রাতে চৌকির উপর সুন্দর বিছানা করে শুতে দেয়া হলো। কিন্তু পরেরদিন ভোর হওয়ার আগেই সেই নতুন জামাই পলাতক। কি হলো! কি হলো! সবার মধ্যেই কৌতূহল। প্রথমে তো সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, না জানি কোনো ভুলত্রুটির কারণে গোস্‌সা করে নতুন জামাই চলে গেছে। এর কিছুদিন পরে জানা গেল সে বেচারা তার সেই আত্মীয়ের বাড়িতে আবারো এসেছে, আত্মীয় এই ঘটনা জানত না, সে তার

কাছেও গোপন করেছিল। মেজ ভাই এবং তার গ্যাং সেই জামাই বেচারাকে সন্ধ্যার পরে ধরে আনল আমাদের বাড়িতে। অবশ্য শুরুতে তাকে বুঝতে দেয়নি। বাইরের বারান্দায় অনেক্ষণ তার সঙ্গে সবাই রসিকতা ইয়ার্কি ফাজলামো করে কাটাল। 'কি নতুন জামাই, না বলে চলে গেলে যে বড়! আমরা কি তোমার ঠিক মতো আপ্যায়ন করতে পারিনি। বেশ আজ থেকে যাও, সেদিন যেটা কম ছিল আজ সেটা পুষিয়ে দেবো। তখন আমি এতই ছোট এর কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ মেজ ভাই আদেশ দিলেন আমরা শিশুরা যেনো ভেতরের বাড়িতে যায়। এর মধ্যে তাকে উত্তম-মাধ্যম দেয়া শুরু হয়ে গেল। এদিকে জিরুদ্দি (জহিরউদ্দীন) বলে আমার এক মামা ছিলেন, সেও অল্প বয়স্ক বেশ রসিক ও তৎপর। সেও বলল, জামাই এবার কি খাবে, এক একটা মাইরকে তারা এক এক নামে অভিহিত করল, কখনো 'রসগোল্লা, কখনো পায়েস, আবার বলে জামাইকে একটু দই দাও, আরেকজন বলে জামাইয়ের পাতে তো গোস্ত নাই।' আর জামাই বেচারা আব্বার উদ্দেশে বলতে থাকে, 'চাচামি ধরেন তো, চাচিমা ঠেকান তো, চাচামি বাঁচান তো।' আব্বা প্রথমে চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। মারের পরিমাণ বেশি হতেই তিনি সবাইকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, যথেষ্ট হয়েছে ছেড়ে দাও। ভাইয়ের রাগ যদিও পড়তে চায় না, তবু বাবার উপরে কথা নেই। এই জামাই বেচারার ঘটনার পরে 'নিশিকুটুম' বলে একটা নতুন শব্দের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল। মেজভাই ছোট বেলা থেকেই বিড়ি সিগারেটে আসক্ত, কিন্তু গ্রামের মুরুব্বি, শিক্ষক ও বয়স্কদের দেখলে অতি বিনয়ী ভাব দেখাতেন। কেবল নিজ এলাকা নয়, ভিন গায়ের বৃদ্ধ ফকির ভবঘুরে, বাউল, চারণ সবার সঙ্গে ছিল তার গলায় গলায় ভাব। বাইরে কঠিন হলেও খুব নরম দিলের, মানুষের জন্য কিছু একটা করার জন্য তার মন কাঁদে।

এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক মহিলা পাশের মাধবপুর গ্রাম থেকে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই বেড়াতে আসতেন, সঙ্গে দুএকটা আম ও নারকেল নিয়ে আসতেন। আমরা জেনেছি এই বৃদ্ধা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হয়তো ভিক্ষা করে চেয়ে-চিন্তে পাওয়া নারকেল আম আনতেন। পরে অবশ্য আমরা দেখেছি, তার বাড়িতে আম ও নারকেল গাছ ছিল। আমাদের বাড়িতে সেই বৃদ্ধাকে বেশ সম্মান করা হতো, আমরা তাকে দাদি বলে ডাকতাম। সেই ভিক্ষুক মূলত ছিলেন আমার মেজভাইয়ের পাতানো দাদি। সে যে স্কুলে পড়তেন

হয়তো সেখানেই তার সাথে তার কোনো কারণে পরিচয় ও মিল হয়েছে। এ রকম দাদি নানি পাতানোর অভ্যাস মেজভাইয়ের ছিল। তারপর থেকে তাকে ঘরে এনে উঠানো। এমনকি মাধপুর গ্রামে ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশি হওয়ায়, সেই ভিক্ষুক দাদি ধানকাটার মৌসুমে আমাদের বাড়িতে থেকে সারাদিন গায়ে গায়ে ভিক্ষা করে বেড়াতো, রাতে আমাদের সঙ্গে খাবার খেতো, হাসি ঠাট্টা করতো। কিছুটা বড় হয়ে যখন ম্যাক্সিম গোর্কির আমার ছেলেবেলা পড়েছি, তখন তাকে লেক্সেইর দাদি বলে মনে হয়েছে। সারাদিন কোথায় কোথায় গিয়েছে জানতে চাইলে বলত, ভাই তুমি বুঝবে না, ফকিরের পায়ে লক্ষ্মী। মৌসুম শেষ হলে অধিকাংশ চাল ধান-বিক্রি করে নিজ গায়ে ফিরে যেতো। এসব নিয়ে আমাদের বাড়িতে তেমন অভিযোগ ছিল না। আমি ঠিক জানি না, আমার বাবা তখনো বেঁচে ছিলেন, নিজ মায়ের প্রতি তার ছিল দুর্মর ভালোবাসা, যদিও আমাদের জন্মের আগে তার মৃত্যু হয়েছে, তবু বাবা- মা ডাক না দিয়ে বাড়িতে ঢুকতো না, রাতে কিংবা দিনে তাঁর এই অভ্যাসের পরিবর্তন দেখিনি। তিনি ছিলেন অ্যাজমার রোগি, বর্ষার মৌসুমে তাঁর অ্যাজমা যেতো বেড়ে। তার অসুস্থতার সময় সব ছেলে মেয়েকে উপস্থিত থাকতে হতো; এমনকি যাদের বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুর বাড়িতে থাকে, তাদেরও নিয়ে আসতে হতো। সেই ঘোর অসুস্থতা কালেও তিনি আমাদের কারো সেবাকে মূল্য না দিয়ে মাঝে মাঝে মা বলে ডেকে উঠতেন। তার খুব শৈশবে আমার দাদা মারা গিয়েছিল, মায়ের কাছে মানুষ; মায়ের ছিল সহজাত ব্যক্তিত্ব, আগলে রাখার অসম্ভব ক্ষমতা- হয়তো অসুস্থকালেও ভাবতেন মায়ের আশ্রয়ে যেতে পারলে তিনি নিরাপদ বোধ করবেন, হাঁপানির কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন। আমার বাবাও এই ভিক্ষুক মহিলাকে আমাদের দাদি হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। তবে তিনি তাকে কোনো কিছু বলে সম্বোধন করতেন না। তার চলনে একটি রাজকীয় ব্যাপার থাকলেও সবাইকে সম্মান করতেন। তাকে মা বলে সম্বোধন না করলেও তার সঙ্গে বেশ মোলায়েম ব্যবহার করতেন। আমি নিজেও দুএকবার ওই বুড়ির বাড়িতে বেড়াতে গেছি। তবে প্রথম প্রথম তাকে দাদি বলে ডাকতে চাইতাম না, মেজভাই প্রচণ্ড ভয় আর প্রচুর চকলেট ঘুষ দিয়ে সেই ভিখারিনীকে দাদি বলা শিখিয়েছিল।

আমাদের ইশকুলে 'ভিখেরির ছেলে' নামে এক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। মেজভাই ছিলেন এই নাটকের নায়ক মোহন, আর আমি ছিলাম ছোট মোহন।

নাটকে নায়ক মোহনের মা মারা যায়, বড় বোন দুলালী কে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকি। গান গেয়ে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু নায়কের ভিলেন একদিন আমার বোন দুলালী সম্ভ্রম লুণ্ঠনের চেষ্টা করে, আমি বাধা দিলে আমাকে মারধোর করে, ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। এই নাটকে ভিলেনের অভিনয় করেছিলেন আমার ক্লাশের সরাসরি শিক্ষক, আমরা তাকে সাত্তার স্যার বলে ডাকতাম, সম্পর্কে আমার মামা হতেন। বয়সে মেজভাইয়ের চেয়ে কিছুটা বড় ছিলেন। তিনিও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরেও তিনি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীবনের প্রায় পুরো সময় ধরে শিক্ষকতা করেন; আমিও প্রাইমারি স্কুলে তার ছাত্র ছিলাম। কিন্তু এ কথা এখনো ভুলতে পারি না, তিনি ভিলেনের অভিনয় করেছিলেন, আমার বোনকে পাওয়ার জন্য আমায় রাস্তায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অথচ ওই বয়সেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি- এটি শুধু নাটক। আজ ভাবলে আশ্চর্য হই, তখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বছরের বেশি হবে না, সেই বয়সে কি এসব অভিনয় করেছিলাম, নিজ সহোদর, শিক্ষক- ক্ষুদে ছাত্র! এটা যে অভিনয় সেটি বুঝতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু এখনো আমি এই স্মৃতি ভুলতে পারিনি। তখন প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পরীক্ষা শেষ হলে স্কুলের মাঠ এবং খালি ঘরে নাটকের মহড়া হতো। বেশিরভাগই রাজা কিংবা ভিখেরির নাটক হতো। অনেকটা যাত্রাপালার মতো। রাজার পোশাক ভাড়া করে আনা হতো, ফকিরের পোশাক অবশ্য নিজেরা তৈরি করে নিতেন অভিনেতারা। ছেলে অভিনেতাদের মধ্য থেকেই কেউ পুরুষ সাজত। তবে নাটক বলে ওই বয়সে যেভাবেই বুঝি না কেন, মেকাপের পরে তাদের আর চিনতে পারতাম না। বিশেষ করে রাজা আর নায়িকাকে সত্যি সত্যি রূপকথার রাজা মনে হতো। আর যে নায়িকা সাজত, ভাবতাম এত সুন্দরী মেয়ে কোথা থেকে এলো। আগে গ্রামে খুব একটা সুন্দরী মেয়ে দেখা যেতো না। অধিকাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যেতো খুব অল্প বছর বয়সে ১২/১৩ বছরের মধ্যে। মেয়েদের ব্লাউজ ছিল না, ব্রা পড়তেও দেখা যেতো না। এমনকি অধিকাংশ মেয়ের পেটিকোর্ট ছিল না। তারা দশ হাত শাড়ি ভাঁজ করে তাদের শরীর ঢেকে রাখত। নারী মহলে আমরা যারা শিশু ছিলাম তাদের ছিল অবাধ যাতায়াত অন্দর মহলে। আমাদের পাড়ার এক বাড়ির মধ্য দিয়ে হেঁটে শেষ পর্যন্ত যাওয়া যেতো। অনেকটা একটি বাড়ি মতো, সবাইকে চিনত; এবং প্রত্যেকে সম্পর্কে মামি, চাচি, ফুফু কিছু একটা হতো, পুরুষদের ক্ষেত্রেও

তাই। মেয়েরা তখন ঘরের বারান্দায় বসে একসঙ্গে গল্প করতো। যাদের ছোট বাচ্চা ছিল, তারা সবার সামনে প্রায় প্রকাশ্যে বাচ্চাকে দুধ পান করাতো। এমনকি বাড়ির পুরুষদের সামনেও খুব বেশি আড়াল করতে দেখিনি। যদিও তখন ছোট ছিলাম, তবু কেন যেন মনে হয়, মেয়েদের স্তন যে একটি যৌন আবেদনি অঙ্গ তখনো সেই অবক্ষয়ী বোধের জন্ম হয়নি। এটা যে একটা নারী অঙ্গ, এটা যে শিশুর খাদ্য ভাণ্ডার সেটি আজ আমরা ভুলতে বসেছি। এই সময়ে আমার একটা বিশেষ কাজ ছিল, পাড়ার মহিলাদের শিশুর দেখভাল করা। তখন যদিও আমি নিজেও ছিলাম শিশু, তবু মনে আছে তখন গ্রামে পাঁচ ছয় বছর বয়স থেকে শিশু বলে আলাদা কিছু ছিল না। আজ যেভাবে শ্রম ভাগ হয়েছে, শ্রম নিষিদ্ধ হয়েছে, তখন সেটা ছিল না; শিশুরাও পিতামাতার সঙ্গে তাদের উপযোগী কাজ করতে করতে বড় হয়ে যেতো। হয়তো কারো বাড়িতে খেলতে গেছি, গ্রাম সম্পর্কীয় কোনো মামি বলল, ব্যাটা আমার ছেলেটাকে একটা দেখিস তো, আমি কল থেকে পানি নিয়ে আসি। এই সব শিশু রাখতে রাখতে কত শিশুর প্রেমে পড়ে গেছি, মনে হতো এদের ছাড়া বাঁচব না। আসলে এখন বুঝি, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের বোধ মূলত একই রকম। শিশুকালের থেকে বার্ধক্যে তেমন কোনো পার্থক্য করতে পারি না; শুধু সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা ছাড়া। অনেক শিশুকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। অনেক শিশুকে নিয়ে হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। ভাবতাম, এই শিশু, বড় হয়ে সে আমাকে কিভাবে চিনবে। অথচ আমিও ছিলাম একটি শিশু। আমি অনেক দিন মায়ের দুধ খেয়েছিলাম, প্রায় পাঁচ বছরের কাছাকাছি; আমার সর্বশেষ বোনের জন্ম না হওয়া অব্দি। আমাকে মায়ের দুধ ছাড়ানো জন্য মায়ের বুকে নিমপাতা বেটে লাগিয়ে রাখা হতো। কিন্তু আমি এতটাই তার দুগ্ধে আসক্ত হয়েছিলাম, আজ বার্ধ্যকে এসেও তার কুয়াশাচ্ছন্ন স্মৃতি মরে করতে পারি। মাকে ছাড়া আমি একটি মুহূর্ত থাকতে পারতাম না। বড় বোনরা জোর করে স্কুলে নিয়ে যেতো। স্কুল থেকে ফিরে যদি মাকে না পেতাম, তখনই কান্নাকাটি শুরু করতাম। মা ফিরে এলে বলতাম, আমাকে কোলে নাও, যেখানে যেখানে তুমি গিয়েছিলে, সেখানে সেখানে আমাকে নিয়ে চলো।

আমাদের পাড়ায় পূব-পশ্চিম লম্বা একটি একটি কাঁচা রাস্তার দুধারে চল্লিশটি ঘর মিলে ছিল একটি সমাজ। সবগুলো বাড়িই ছিল মূলত রাস্তার দুধারে বিস্তৃত। তখন কয়েকটি সমাজ মিলে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিটি

সমাজের একজন ছিল, সমাজ প্রধান বা পঞ্চায়েত প্রধান। আমাদের গ্রামে এই পঞ্চায়েত প্রধানকে স্থানীয় ভাষায় পরামানিক বলে ডাকা হতো। প্রতিটি সমাজের উপর পরামানিকের ছিল প্রচণ্ড প্রভাব। সবাই তার কথা মেনে চলত। বিয়ে শাদি মিলাদ শব শৎকার প্রতিটি কাজেই তার ছিল প্রাধান্য। দুই ঈদে নামাজের পরে পুরো সমাজের লোক খিঁচুড়ি বা পায়েশ রেধে নিয়ে সমাজ প্রধানের বাড়িতে হাজির হতো। সেখানে প্রত্যেকের বাড়ির রাধা খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন একত্রে করে পুনরায় সবার জন্য সমান ভাগ করা হতো। প্রত্যেকের জানা হয়ে যেতো কার বাড়িতে কি রান্না হয়েছে, প্রত্যেকের রান্নার স্বাদ প্রত্যেকের পাওয়ার সুযোগ ছিল। এভাবে ঈদুল ফিতরে ফেতরার টাকা একত্রে করে সমাজের যারা গরীব তাদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। কোরবানির ঈদে সমাজের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ মাংস রাখা হতো; তারপর সমাজ প্রধানের নেতৃত্বে সবাই মিলে সেই মাংস সমানভাবে যারা কোরবানি দেয়নি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিত। তখন খুব কম লোকেরই কোরবানি দেয়ার সামর্থ্য থাকত। আমার বাবা ছিলেন একটি সামাজের প্রধান। তাকে অনেকে পরামানিক সাহেব বলত। তবে অধিকাংশ মানুষ বলত বিশ্বাসের ব্যাটা, কারণ আমাদের বংশের পরিচয় ছিল বিশ্বাস। গ্রামের অধিকাংশ শিশু কিশোর স্কুলে না গেলেও আমার বাবা মা তাদের প্রতিটি ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়েছে। এমনকি তখন মেয়েদের স্কুলে যাওয়া অনেকে ভালো চোখে দেখত না, তখনো তার প্রতিটি মেয়ে কমবেশি স্কুল শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এই সকল আলোচনা মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগের ঘটনা। যখন শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠছেন এবং একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে অসংখ্য কাগজের মালা থাকত, কেন চকলেট থাকত তখনো বুঝতে শিখিনি। কেন তাঁর ছবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে পাড়ার তরুণরা মিছিল করতো- সেসব জানার বয়স তখনো হয়নি। কিন্তু এটি বুঝতে শিখেছি, শেখ মুজিব বলে কেউ একজন আছেন, যিনি সবার আপনার। আমরাও বড়দের সাথে স্লোগান দিতাম, 'শেখ শেখ শেখ মুজিব/ লও লও লও সালাম।' 'জয় বাংলা' এইসবই মনে আছে। যদিও যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে অনেকে ইয়ার্কি করে বলত, জয় বাংলা/ খ্যাতা-কাপড় সামলা।' তার কারণ তখন প্রায় প্রতি রাতে, এমনকি দিনের বেলাতেও মিলিটারির ভয়ে পালাতে হতো।

মিছিল শুরু হতো মূলত মাগরিব নামাজের পর পর; আয়োজন যদিও শুরু হয়ে যেতো বিকেলের দিকে। স্কুলের অরক্ষিত টিনের ঘরের ভেতর থেকে সব আয়োজন সম্পন্ন করা হতো। আশে পাশের দোকান থেকে চকলেট নেয়া হতো। চকলেটের পাতলা প্লাস্টিকের মোড়কগুলো সুতা দিয়ে পর পর বেধে দেয়া হতো। স্কুলের বিস্কুট দৌড়ের মতো। আসলে ঐ মিছিলে আমাদের থাকা যে খুব প্রয়োজন ছিল, এমন নয়, মেজভাই ছিলেন খুব আমুদ প্রিয়, বাচ্চাদের খুব পছন্দ করতেন। প্রতি শীতকালে দেখতাম তিনি কোথা থেকে তিন চারটে কুকুরের বাচ্চা নিয়ে হাজির। বাচ্চাগুলো এত তুলতুলে, ছোট ছোট পা ফেলে থপথপ করে হেঁটে বেড়াতো; দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করত। কিন্তু আমাদের বাড়িতে কুকুরকে খুব ভালো চোখে দেখা হতো না। বলা হতো কুকুর নাপাক। যে বাড়িতে কুকুর থাকে সে বাড়িতে নামাজ হয় না। মেজভাইকে অবশ্য নামাজ পড়তে দেখিনি, সুতরাং তার জন্য কুকুর থাকলে কোনো সমস্যা ছিল না। কুকুর সম্বন্ধে এ ধরনের সংস্কার কেবল আমাদের বাড়িতে নয়, পুরো এলাকার মানুষই তা মনে করতো। তারপরেও অনেক বাড়িতে কুকুর পালন করতে দেখা যেতো। যদিও সে কুকুরকে কখনো কোলো উঠতে দেখা যায়নি, এমনকি ঘরের মধ্যেও প্রবেশ ছিল মানা। বাড়ির গৃহিনীরা খাওয়ার পরে উঠোনে কিংবা বাহির বারান্দায় কিছু এটোকুটো ধরনের খাবার কুকুরের জন্য বরাদ্দ করতো। তাতেই কুকুরগুলো বেশ নাদুস নুদুস হয়ে যেতো, এবং মালিকের প্রতি বহু কৃতজ্ঞ থাকত, বাইরে থেকে যে কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে বাধা দিতো। অনেক বাড়ির সামনে কিছু কিছু বেওয়ারিশ কুকুর নিজে নিজে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসত। তাদের কেউ পালার জন্য আনেনি; কিন্তু এর আশেপাশে অন্য কুকুর ভেড়ার কোনো সুযোগ ছিল না; এমনকি অপরিচিত লোক গেলেও তারা ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিত। এভাবে একদিন বাড়ির লোকজনও তাদের মেনে নিত; যদিও উত্তম-মাধ্যমও তাদের ভাগ্যে কম জুটত না। মুক্তিযুদ্ধে যেমন মানুষের অবদান ছিল, তেমন কুকুরেরও অবদান ছিল, সেই সব অবদানের কথা কেউ লেখেনি। কুকুরগুলো কিভাবে রাতের বেলা জেগে উঠত বহিরাগত শত্রুর পদধ্বনি শুনে, জাগিয়ে দিত তার মালিককে, গ্রামকে গ্রাম। পাক হানাদারের ভয়ে মানুষ যখন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতো, কুকুরগুলো তাদের সাথে সাথে হেঁটে যেতো, আসহাবে কাহাফের কুকুরগুলোর মতো। যেখানে অত্যাচারি রাজার ভয়ে কয়জন যুবক বাড়ি ছেড়ে অজানায় পাড়ি

জমিয়েছিল, কুকুর ছিল তাদের একান্ত সঙ্গী, তারা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, এই কুকুর তাদের গুহামুখ পাহাড়া দিয়েছিল। অত্যাচারি রাজার বিপরীতে হেঁটেছিল বলে তাদের কুকুরকেও মহাপ্রভু বেহেস্ত দান করবেন বলে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আমরা ঠিক জানি না, স্বৈরাচারি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে যে কুকুর লড়েছিল, হেঁটেছিল, প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করেছিল, তাদের জন্য পরকালে কোনো প্রাপ্য আছে কিনা! তবে কুকুর যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের সহকারি ছিল, তেমন রাজাকারদেরও সহকারি ছিল। বড় হয়ে, চাকরি জীবনে এই গল্পটা শুনেছিলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক সালেহ চৌধুরীর কাছে। তিনি আমাকে এক রাজাকার কুকুরের কথা বলেছিলেন। তিনি তখন সুনামগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধে কোম্পানি কমান্ডার। এলাকার এক দুর্ধর্ষ রাজাকার নেতার বাড়িতে অপারেশনে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ আগেই তাদের পরিচিত সূত্রে খবর পেয়েছেন, সেই রাজাকার নেতাকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে। কিন্তু তার বাড়িতে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না। বাড়িতে কোনো লোক নেই, কেবল একটি কুকুর মেঝেতে শুয়ে আছে, বিষণ্ন নিসাড়। তারা কাউকে না পেয়ে কুকুরটিকে তাড়া করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কুকুরটি কোনোভাবেই তার শোয়া আসন থেকে সরল না। মুখটা দুই পায়ের উপর রেখে, মাটি চেপে শুয়ে রইল। মুক্তিযোদ্ধারা ভাবলেন, নিশ্চয় কুকুরটি অসুস্থ। চলে আসার সময় এক নির্দয় সঙ্গী কি মনে করে কুকুরটির মাথায় একটা গুলি করল, রাজাকারের কুকুর রাজাকারই তো হবে এই ভেবে। গুলি খেয়েও কুকুরটি একচুল নড়ল না। ওখানেই ঢলে পড়ল। ফিরে আসার পরে সালেহ চৌধুরী জানতে পারলেন। ওই রাজাকার নেতা ওই কুকুরের শরীরের নিচে মাটির গর্ত-গড়ে পালিয়ে ছিল। কুকুরটি মারাতে তাদের মধ্যে যে বেদনা তৈরি হয়েছিল, এ খবর জেনে তা থেকে কিছুটা মানসিক মুক্তি ঘটল। কুকুরের বিচার তার মালিকের সঙ্গেই হবে। আজ কুকুরের কথা বলতে গিয়ে অন্যান্য প্রাণির কথাও মনে হলো যারা মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল। মোটর প্রযুক্তি আবিষ্কারের আগে মানুষের চেয়ে যুদ্ধে ঘোড়া হাতি উট ও গরুমহিষের ব্যবহার বেশি হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে রসদ পরিবহনের জন্য ইতরকুলের ভূমিকা মানুষের চেয়ে বেশি ছিল। যোদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব ও হস্তিকেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হয়েছে, অথবা বন্দি হয়ে মেয়ে মানুষের মতো যুদ্ধ লব্ধ মাল হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। আমার স্মৃতিতে গরুগুলোর কথাই বেশি

মনে আছে। বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং নববধূরা গরুর গাড়ি করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে যেতো মিলিটারির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

প্রতিদিনই মিছিল শেষ হতো পুরো গ্রাম প্রদক্ষিণের পরে প্রায় একই জায়গায় আমাদের বাহির বাগানে কদম গাছের নিচে। মিছিলটি অধিকাংশ সময় বাড়ির ভেতর রাস্তা দিয়েই বেশি চলত। শুরুতে মিছিলকারীদের সংখ্য নগন্য হলেও বাড়ির মধ্য যাওয়ার সময় অন্যান্য শিশুরাও যোগ দিতো। এ কাজে মা-বাবারা বাধা দিয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ একটি গ্রামের মধ্যে বাচ্চাদের হারিয়ে যাওয়ার তেমন কোনো ভয় ছিল না, এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিনত। না চিনলে জিজ্ঞাস করতো, এই তুই কার ছেলে রে? এখানে কি করিস? বাড়ি যা। কোনো শিশুর পক্ষেই একা একা গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। অপরিচিত লোকের সঙ্গেও নয়, কেউ না কেউ তাঁকে ধরে ফেলবে, সে কোথা থেকে এসেছে, কার আত্মীয়। এখন গ্রামের সে রূপটি অক্ষত নয়। শহরের মতো কেউ আর কাউকে চিনতে চায় না, সবাই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে উঠছে।

কেবল মিছিলে নয়, বঙ্গবন্ধুর কথা তখন সব জায়গায়, সবখানে আলাপ হতো। হাটে ঘাটে মাঠে চায়ের দোকানে সর্বত্র। অবশ্য তখনো আমাদের গ্রামে চায়ের দোকান তৈরি হয়নি। চায়ের প্রচলন হয়েছিল আশির দশকের শুরু দিকে। তবে মুদির দোকান, হাটেমাঠে, বারান্দায় বৈঠকখানায় দুইজন লোক একত্রিত হলেই শেখ মুজিবের গল্প করতেন। আমি তখন কেবলাই স্কুলে যেতে শুরু করেছি। তখন স্কুলের সহপাঠি এবং শিক্ষকদের মধ্যে অন্তত এই আলাপ শুনেছি, আমাদের এখানে কাগজ উৎপাদ হয়, সেই কাগজ করাচি থেকে সিল মেরে আনা হয়, চার আনার কাগজ আমাদের আট আনায় কিনতে হয়। এক সের চাল তখন এক টাকা ছুই ছুই করছে। এটা আমরা ভালোই বুঝতে পারতাম, লেখার কাগজের প্রচণ্ড অভাব ছিল। এমনকি ক্লাশ পরিবর্তন হলে তখন অধিকাংশ ছাত্র তার আগের ক্লাশের ভাইদের কাছ থেকে কিছুটা কম দামে বই কিনে পুরো বছর চালিয়ে দিত। আমাদের এত সব দুঃখকষ্টের কারণ বুঝেছিলাম পাকিস্তানের দুঃশাসন। যদিও প্রতিদিন তখনো ভোরের এসেম্বিলিতে দাঁড়িয়ে আমরা সমবেত কণ্ঠে গাইতাম- 'পূর্ব বাংলার শ্যামলিমায়, পঞ্চনদীর তীরে অরুণিমায়/ ধূসর সিন্ধুর মরু সাহারায়।' যদিও এসবের মানে বোঝার

বয়স তখনো হয়নি। আর যখন হয়েছে তখন ভেবেছি কি ননসেন্স ভার্সই না ছিল সেগুলো কোথায় পূর্ব বাংলার শ্যামলিমায়, আর কোথায় ধূসর সিন্ধুর মরু সাহারায়। শ্যামলিমার সঙ্গে সাহারার মিল কেন কিভাবে হলো সে-সব প্রশ্ন উত্তরকালে থেকে যাবে, হয়তো সেটিও ছিল সময়ের প্রয়োজনে, আজকের বুদ্ধি বোধ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা দিয়ে সেদিনের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে চাওয়া আরেকটি বোকামি হয়তো বা।

এমন একটা গ্রামে আমার শৈশব কেটেছিল, সেটিই আমার জন্মস্থান; যেখানে একটিমাত্র পরিবার ছিল হিন্দু, যারা পুরো গ্রামের বয়স্ক ও শিশুদের চুল কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন; অবশ্য জীবিকা শব্দটি তাদের জন্য মানানসই ছিল না, তারাই আসলে ছিলেন এই গ্রামের মানুষের মাথা ও চুলের শৈলী-নির্মাতা। স্বভাবত তারা আমাদের শিশুদের মাথাটা তাদের দুই হাঁটুর মাঝখানে চিমটার মতো শক্ত করে ধরে রেখে চুল কাটার কাজটি সেরে নিতেন; যদিও পদ্ধতিটি কষ্টকর তবু এর উপকারি দিক ছিল–মাথাটা হাঁটুর মধ্যে শক্ত করে ধরে থাকায়, ধারালো কাঁচি বা ক্ষুরের আঘাত থেকে রক্ষা পায়। একটি বৃহত্তর গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার লোকের চুল-দাড়ি তারা দক্ষতার সঙ্গে বংশপরম্পরায় কেটে আসছিলেন; এই সুবাদে তাদের যাতায়াত ছিল আমাদের পরিবারগুলোর উঠোন থেকে পাকঘর পর্যন্ত। যেহেতু শিশুদের চুলও তারাই কাটতেন, এমনকি মেয়ে-শিশুদের চুলও আট-দশ বছর পর্যন্ত তাদের সাইজ করে রাখতে হতো; আর এই সুবাধে বাড়ির মহিলাদের কাছেও তারা ছিলেন সমান প্রিয়; মাঝে-মাঝে তারাও তাদের চুলের আগা কেটে নিতেন, আড়ালে-আবডালে। দুই ঈদ বা শবে-বরাতে তাদের ব্যস্ততা যেমন বেড়ে যেতো, তেমনি বিয়ে বা খাতনার অনুষ্ঠানগুলোতে তাদের কাঁচির ঝনঝনানির সঙ্গে আনন্দ ঝরে পড়ত; সবচেয়ে মজা হতো, যখন তারা বিয়ের বর কিংবা খাতনার পাত্রের গোঁফে কিংবা মাথার চুলে একটি পোচ দিয়ে হাতগুটিয়ে বসে থাকতেন; অর্থাৎ এবার ছেলের মা-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে থেকে আনা-আধুলি-কড়ি না-পড়া পর্যন্ত তার চুল কাটা শেষ হতো না। দুই ঈদ বা কোনো অনুষ্ঠানাদি ছাড়া তাদের চুল কামানোর সঙ্গে নগদার্থের কোনো সম্পর্ক ছিল না; বর্ষার শুরুতে আউশ কাটার মৌসুমে, আর শীতের শেষে রবিশস্য মাড়াইয়ের সময়ে তারা বস্তা নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে প্রতিটি বাড়ি থেকে তাদের মজুরি আদায় করে নিতেন; অবশ্য এটি হতো একটি পারস্পারিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে; কাউকে কখনো

বলে দিতে হতো না, তাদের কি পরিমাণ শস্য দিতে হবে, কিংবা তারা নিজেরাও কখনো অতিরিক্ত দাবি করেছেন বলে শোনা যায়নি। এই ব্যবস্থা কেবল তাদের জন্যই চালু ছিল না, যারা নদী পারাপার করতেন, লাঙল বাঁধতেন, কামার বা কুমোরের কাজ করতেন, চিকিৎসা দিতেন–সবার জন্যই ছিল একই ব্যবস্থা; তবে আমাদের গ্রামে চুল-মেরামত ছাড়া আর সকল কাজের সঙ্গে মুসলমানরাই জড়িত ছিলেন; পেশার ধরনের কারণে কাউকে গ্রামের মধ্যে বড় বা ছোট শ্রেণিভুক্তির বিষয়টি তখনো আমাদের গোচরে আসেনি।

মিছিল শেষে আমাদের মধ্যে চকলেট ভাগ করে দেয়া হলেও, চকলেটের লোভে মিছিলে গেছি তা মনে হয় না। জনতার সঙ্গে থাকতে পারার যে আনন্দ তখন থেকেই টের পেয়েছিলাম। সেই স্রোত আমাদের অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আর একটি ছবির মানুষ নানা রূপে উপস্থিত থেকে সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, যা কিছু হচ্ছে, এই মিছিল, এই স্লোগান, এই চকলেট, এই রঙিন কাগজের মালা, সব এই ছবির মানুষটার জন্য তার নাম শেখ মুজিব। তিনি কোথাও এক জায়গায় আছেন আর সবাইকে ভালোবাসছেন। তার প্রশস্ত মুখ ললাটের মধ্যে সেই বার্তা বিচ্ছুরিৎ হতো। তিনি ছবির মাধ্যমে, চকলেট ও রঙিন কাগজের মালার মধ্যে আমাদের সামনে প্রতিভাত হলেও তাঁকে কখনো নিষ্ক্রিয় মনে হয়নি। তিনিও আমাদের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। হাজারো মুখে ভিড়ে কত মুখ হারিয়ে গেছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমাদের একজন হয়ে সবার উপরে বসে আছেন। তিনি যেন আমাদের কারো কষ্ট হতে দেবেন না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী – শেখ মুজিবুর রহমান, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০২১ (একাদশ মুদ্রণ)।
২. কারাগারের রোজনামচা – শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ২০১৯ (দশম মুদ্রণ)।
৩. আমার দেখা নয়াচীন – শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ২০২০।
৪. শেখ মুজিব আমার পিতা, শেখ হাসিনা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৬।
৫. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত নির্বাচিত গল্প – সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল সম্পাদিত, স্বরব্যঞ্জন, ২০২০।
৬. জাতিরপিতা ও অন্যান্য কবিতা – মুহম্মদ নূরুল হুদা, একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৯ (বর্ধিত সংস্করণ)।
৭. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা – সম্পাদক : হাবীবুল্লাহ সিরাজী, বাংলা একাডেমি, ২০২১।
৮. লেখক বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য – শামসুজ্জামান খান, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৯।
৯. মহাজীবনের কাব্য – নির্মলেন্দু গুণ, কথা প্রকাশ, ২০১৩।
১০. বঙ্গবন্ধু ১০০ কবির ১০০ কবিতা – সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল সম্পাদিত, স্বরব্যঞ্জন ২০১৯।
১১. বঙ্গবন্ধু শতবর্ষে শতছড়া – সম্পাদক : ফারুক হোসেন, আগামী প্রকাশনী, ২০২১।
১২. ঈশ্বরদীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস – আব্দুল খালেক বিশ্বাস, দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬।
১৩. বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধায় ভাবনায় স্মৃতিতে – সম্পাদনা : মতিউর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ২০২০।
১৪. গদ্যে-পদ্যে শেখ মুজিব – সম্পাদনা : শাহ্জাহান কিবরিয়া, রহীম শাহ, বাংলা প্রকাশ, ২০১৮ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)।
১৫. অনন্ত মুজিব জন্ম – মুহম্মদ নূরুল হুদা, চলন্তিকা, ২০২১।
১৬. শত কবিতায় বঙ্গবন্ধু – প্রধান সম্পাদক : লিয়াকত আলী লাকী, সম্পাদক : রুবী রহমান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০২০।
১৭. কবিতায় বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষে আবৃত্তির ১০০ কবিতা – সম্পাদনা : নাজমুল আহসান, শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৯।
১৮. শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী নির্বাচিত প্রবন্ধ – সম্পাদনা : ধ্রুব নারায়ণ চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স নভেম্বর ২০১৭ (সপ্তম মুদ্রণ)।

১৯. গণহত্যা জাদুঘর রাষ্ট্র, রাজনীতি ও আধিপত্য – মুনতাসীর মামুন, মাওলা ব্রাদার্স, ২০২১।
২০. পঁচাত্তর ট্র্যাজেডি রক্তরঞ্জিত শতপ্রবন্ধ – সম্পাদক : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, মোনায়েম সরকার, আগামী প্রকাশনী, ২০২০।
২১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রামীর গল্প – সেলিনা হোসেন, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০২০।
২২. বাঙালির বঙ্গবন্ধু – কামাল চৌধুরী, জার্নিম্যান বুক্স, ২০১৯।
২৩. পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেখ মুজিবুর রহমান – সেলিনা হোসেন, কথা প্রকাশ, ২০২০ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
২৪. বঙ্গবন্ধু রাজনীতির মহাকবি নির্বাচিত কবিতা – ফেয়ার পাবলিশিং হাউস, ২০১৪।
২৫. শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা – সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯ (অষ্টম সংস্করণ)।
২৬. বঙ্গবন্ধু : শতবর্ষে শতকবিতা : সম্পাদক মোনায়েম সরকার, আসাদ মান্নান, আগামী প্রকাশনী, ২০২০।
২৭. বাংলা নামে দেশ – আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫ (নবম মুদ্রণ)।
২৮. মিথলজি, এডিথ হ্যামিল্টন, অনুবাদ আসাদ ইকবাল মামুন, ঐতিহ্য, ২০১৩।
২৯. জনকের মুখ, সম্পাদনা আখতার হুসেন, কথা প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ ২০২১।
৩০. উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু, মিল্টন বিশ্বাস, বাংলা একাডেমি ২০২০।
৩১. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়া, বাংলা একাডেমি, ২০২১।
৩২. বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি-ভাবনা, সাজেদুল আওয়াল, বাংলা একাডেমি ২০২১।
৩৩. বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, বাংলা একাডেমি ২০২১।
৩৪. ধন্য সেই পুরুষ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, মোনায়েম সরকার, আগামী প্রকাশনী, ২০২০।
৩৫. বঙ্গবন্ধুর জন্য ভালোবাসায়, আনিসুল হক পার্ল পাবলিকেশন্স।
৩৬. বাড়ির নাম ৩২ নম্বর, আমিনুর রহমান সুলতান, পুথি নিলয়, ২০১৬।
৩৭. মুজিববর্ষের আলোর ফুল, আমীরুল ইসলাম, অনন্যা।
৩৮. বঙ্গবন্ধু ও দেশের কথায়, ওবায়দুল কাদের, জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ২০১৯।
৩৯. আমাদের বঙ্গবন্ধু, তপন বাগচী, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৯।
৪০. বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির স্বপ্ন, নূহ-উল-আলম লেনিন, ঝিনুক প্রকাশনী, ২০০৭।
৪১. বঙ্গবন্ধু বিষয়ক আরও একটি বই, মফিদুল হক, বিদ্যাপ্রকাশ, ২০১২।
৪২. বঙ্গবন্ধু সমগ্র, মুনতাসীর মামুন, সময় প্রকাশন, ২০২০।
৪৩. নজরুল ও বঙ্গবন্ধু, মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইনসটিটিউট।

৪৪. মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধ, মোরশেদ শফিউল হাসান, অনুপম প্রকাশনী, ২০১৯।
৪৫. ভাষা মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু, মোহীত উল আলম, আগামী প্রকাশনী, ২০১৪।
৪৬. মহান নেতা শেখ মুজিব, শেখ জিন্নাত আলী, শব্দকোষ প্রকাশনী, ২০১৯।
৪৭. জনসমুদ্রে এক মহামানব, শেখ রেহানা, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট, ২০০৯।
৪৮. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ, সনৎকুমার সাহা, কথাপ্রকাশ, ২০২০।
৪৯. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, সেলিনা হোসেন, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৮ ।
৫০. কাঁদো প্রিয় দেশ, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, অন্বেষা, ঢাকা ২০১০।
৫১. দুই বাংলার কবিতায় বঙ্গবন্ধু, আহমেদ সুবীর সম্পাদিত, শিশুসাহিত্য কেন্দ্র ২০১৬।
৫২. দুই বাংলার কবিতায় বঙ্গবন্ধু, আখতার হোসেন সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী ২০০৫।
৫৩. কবিতায় বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর কবিতা, শেখ নজরুল সম্পাদিত, পারিজাত প্রকাশনী ২০১৫।
৫৪. বাড়ির কাছে আরশীনগর, আসাদ চৌধুরীর সম্পাদিত, বাংলা-উর্দু সাহিত্য ফাউন্ডেশন।

পত্রপত্রিকা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ – সচিত্র বাংলাদেশ, বিশেষ সংখ্যা, জুন ২০২১।
২. যে রাতে দুয়ার ভেঙেছিল ঝড়ে, জাফর ওয়াজেদ, দৈনিক আজকের প্রত্যাশা, ১৪ই আগস্ট ২০১৮।
৩. চায়ের আড্ডায় সিগারেটের কাগজে যেভাবে জন্ম হয় 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' গানটির, অমিতাভ ভট্টশালী, বিবিসি বাংলা, ১৭ মার্চ ২০১৯।
৪. আড্ডায় জন্ম কালজয়ী গান, প্রণব ভৌমিক, প্রথম আলো, ৪ ডিসেম্বর ২০১৬।
৫. একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ, মোহাম্মদ হাননান, প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১।
৬. রাজু আলাউদ্দিন গৃহীত নির্মলেন্দু গুণের সাক্ষাৎকার, বিডিআর্টস, ১৫ আগস্ট ২০১৫।
৭. বিদেশি লেখকদের মূল্যায়নে শেখ মুজিব, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৭ মার্চ ২০১৭।
৮. বঙ্গবন্ধু তখনও বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেননি, মুহম্মদ আব্দুল আলী, বাংলার ধারা, ১৬ মার্চ ২০২০।
৯. শব্দে ও ছন্দে পিতার মুখ, ইকবাল খোরশেদ, দৈনিক যুগান্তর, ৩ আগস্ট ২০২১।
১০. বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সময়, বাংলাদেশ এশিয়াটি সোসাইটি, ২০১৪।

অতীশ দীপঙ্কর ২৭, ২৭৬ অতুল প্রসাদ ৩৪০

অ্যাথেনা ২২৫, ২২৬, ২২৭
অক্ষয়কুমার দত্ত ৩৬
অলোকেশ রায়
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৩৩৭
অঞ্জনা সাহা ১১৮
অন্নদাশঙ্কর রায় ১১৬, ১২০, ৩৩৬, ৩৩৭
অনীক মাহমুদ ১১৮, ৩৩৭
অমল সাহা ১৫৬
অরুণ শীল ৩৩৭
অরুণাভ সরকার ১১৭, ১৫০
অলকা নন্দিতা ১১৯
অসীম সাহা ১১৬, ১১৭, ১৩৯, ১৫০, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৭২, ৩৩৭
অজয় দাশগুপ্ত ৩৩৭
অংশুমান রায় ৩৪০
অনিকেত রাজেশ ১১৯
অনিকেত শামীম ১১৮
অনিন্দিতা মুক্তা ১১৯
অবিনাশ ভট্টাচার্য ৩৩৭
অমিয়ধন মুখোপাধ্যায় ১২২
অমিত বসু ১২২
অমিতাভ চৌধুরী ১২১
অমিতাভ দাশগুপ্ত ১২২
অলি আহাদ ৬৯
অজিতা মিত্র ৩৩৭
অডিসিউস ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯

আ

আ ফ ম মোদাচ্ছের আলী ৩৩৭
আদ্যনাথ ঘোষ ১১৯
আনোয়ারা সৈয়দ হক ১৫৬
আপেল মাহমুদ ৩৩৯
আবেদীন জনী ৩৩৭
আয়েজ উদ্দীন প্রামানিক ৩২৪
আব্দুর গফুর ৩২৪
আব্দুল মান্নান সৈয়দ ১৭২
আব্দুল খালেক বিশ্বাস ৩০৭, ৩০৮, ৩৫২
আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ১১৭, ১৭১, ১৮৫
আব্দুল হাকিম ১২, ১৪
আইউব সৈয়দ ৩৩৭
আইরীন নিয়াজী মান্না ৩৩৭
আইয়ুব খান ২০২, ২৪২
আইজ্যাক অ্যাসিমভ ৯০
আইজাক রোজেনবার্গ ১৪৭
আনজীর লিটন ৩৩৭
আফরোজা সোমা ১১৯
আফরোজা পারভীন ১৫৬
আফসান চৌধুরী ১৭২
আউং-সান ১৯৭
আবদুর রব সেরনিয়াবাত ৬২
আবদুর রহমান চৌধুরী ৬৯
আবদুল আহাদ ৯৭
আবদুল আজিজ ৩৩৯
আবদুল মতিন খান চৌধুরী ৬৯
আবদুল ওহাব বিশ্বাস ৩৩৩
আবদুল লতিফ সিকদার ১৮৫
আবদুল কাহার চৌধুরী ১৭৯
আবদুল গনি বোখারী ৩৪০
আবদুল হাফিজ ১৫৬
আবদুল হামিদ চৌধুরী ৬৯
আবদুল হামিদ মাহবুব ৩৩৭
আবদুল হালিম ১৮৫

আবদুস সাত্তার ১১৭
আব্রাহাম লিংকন ৪৪
আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৪৯
আবু ইসহাক ১৫৬, ১৭০
আবু রুশদ ১৭১
আবু কায়সার ১১৭, ১৫০
আবু সাঈদ জুবেরী ১৭২
আবু হাসান শাহরিয়ার ১১৮, ১৪২, ৩৩৯
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৪৯
আবুবকর সিদ্দিক ১২২, ৩৩৯
আবুল হোসেন ১১৭, ১২৪
আবুল ফজল ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮
আবুল কাসেম সন্দীপ ৩৩৯
আবুল কালাম বেলাল ৩৩৭
আবুল হাসান ১৫০
আব্বাসউদ্দিন ৭২, ১০০
আভা গান্ধী ৬৬
আমীরুল ইসলাম ১১৬, ১৫৬, ১৬৩, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪২
আল মাহমুদ ২৩৫, ২৩৬
আল মুজাহিদী ১৫০
আলফ্রেড খোকন ১১৯
আলম তালুকদার ৩৩৭
আলমগীর রেজা চৌধুরী ১১৪, ১১৮
আল্লামা ইকবাল ৯০
আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৭১, ২৯৪
আলাওল ১৪
আলবিরুনি ২৩
আলী ইমাম ৩৩৮
আলতাফ হোসেন ১১৭, ১৩১, ১৫১, ১৮৫
আলতাফ আলী হাসু ৩৩৭
আলতাফ শাহনেওয়াজ ১১৯
আশফাক-উল-আলম ১৮৫
আকবর বাদশা ৫৬, ১৫৫, ২৫১
আশরাফুল আলম পিন্টু ৩৩৭
আখতার হুসেন ১২২, ১২৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৬১, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪০
আখতারুল ইসলাম ৩৩৭
আসলাম সানী ১১৬, ১১৮, ১৪২, ১৫২, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪৩
আসাদ চৌধুরী ১১৬, ১১৭, ১৩৭, ১৫০, ২৯৪
আসাদ জোবায়ের ৩৩৭
আসাদ ইকবাল মামুন ২২৯, ২৩৫
আসাদ মান্নান ১১৮, ১১৯, ১৪০, ১৪১
আসাদুল্লাহ মামুন ৩৩৭
আসাদুল্লাহ এ্যাগামেমনন্ ১২৫, ১২৬, ২০৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৯, ২৩০, ২৩১
আহ্‌সান ওয়াহিদ ১৫৬
আহমেদ সাব্বির ৩৩৭
আহমেদ সালিম ১১৬
আহমেদ জসিম ৩৩৭
আহমেদ ফিরোজ ১১৯
আহমেদ রিয়াজ ১৫৬
আহমেদ শিপলু ১১৯
আহমদ রফিক ১৪৯
আহমদ শরীফ ২৪৪
আহমদ ছফা ২৫৩
আহমাদ স্বাধীন ৩৩৭
আহমাদ উল্লাহ ৩৩৭

আহমাদ মাযহার ১৫৬, ৩৩৭
আহসান মালেক ৩৩৭
আহসান হাবীব ২৯৪
আহসানুল হক ৩৩৭
আহাদ আলী মোল্লা ৩৩৭
আছফার ২০৩, ২৩৪
আজাদ এহতেশাম ২৮৬
আনিস রহমান ১৫৬
আনিসুজ্জামান ১৮৫, ১৯২, ২৭৩
আনিসুল হক ১৫৬, ১৮৫, ৩৩৯
আনিচ ৩২৪
আবিদ আনোয়ার ১১৭, ১৩১
আবিদ আজাদ ১৫১
আমিনুর রহমান সুলতান ১১৮, ১৪৪
আমিনুল ইসলাম ১১৯
আরিফ বখতিয়ার ৩৩৭
আরিফুল হক কুমার ১১৯
আশিক মুস্তাফা ৩৩৭
আসিফ নূর ১১৮
আজিজ আহমেদ ৬৯
আতিয়ার খাঁ ৩২৪
আতা খান ১৭৬
আতাউর রহমান ১৪৯
আতাউল করিম ৩৩৭
আতাহার খান ১১৭, ১৩২

ই

ইন্দ্রমোহন রাজবংশী ৩৩৯
ইউসুফ রেজা ৩৩৭
ইব্রাহীম খাঁ ১১২
ইমদাদুল হক মিলন ১৬২, ১৭০
ইমরোজ সোহেল ১১৯
ইমরুল ইউসুফ ৩৩৭
ইমরান পরশ ৩৩৭
ইমাজ উদ্দিন শাহ ৩২৪
ইমতিয়ার শামীম ১৬৪
ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান ৩৩৭
ইকবাল খোরশেদ ১৫৬
ইকবাল আজিজ ১১৮, ১৩৪, ১৫১
ইকবাল বাবুল ৩৩৭
ইকবাল রাশেদীন ১১৯
ইকবাল হাসান ১১৮, ১৩৩
ইয়াহিয়া খান ৩০৯, ৩১১
ইয়াকুব আলি ৬৭, ৩১৭, ৩২৫
ইন্দিরা দেবী ৯৭
ইন্দিরা গান্ধী ১০৭, ১৯৭, ১৯৯
ইফিজিনিয়া ২৩৩
ইলিয়াস শাহ ৩১, ২৭৭

ঈ, উ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯
উইলফ্রেড ওয়েন ১৪৭
উইলিয়ম জোন্স ২৭৫
উৎপল কান্তি বড়ুয়া ৩৩৭

এ

এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার ১৮৫
এ কে ফজলুল হক ২৪, ৪৭, ৬৯, ১১৭, ১৯৩
এ কে এম আব্দুল্লাহ ১১৯
এ কে এম শহীদুল হক ১৮৫
এম এ কাশেম ৩৩৩
এম হাফিজউদ্দিন খান ১৮৫
এম,আর মুকুল ৩২২
এইচ টি ইমাম ৯৭
এজাজ ইউসুফি ১১৯
এবিএম মুসা ১৭৭, ১৭৮
এরিস্টটল ৯৫
এডওয়ার্ড সাইদ ২৬৬
এডিথ হ্যামিল্টন ২২৯, ২৩৫
এডিসি রব্বানী ১৭৩

ও

ওসমান ৩২২
ওয়াসিফ-এ-খোদা ৩৩৭
ওয়াহিদ রেজা ১১৮
ওয়াহিদুজ্জামান ৭০
ওবায়েদ আকাশ ১১৯
ওবায়দুল কাদের ১৮৫, ২০৫
ওমর আলী ১১৭, ১৪৯
ওমর কায়সার ১১৮

ক

করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য ১২২
কবিরুল ইসলাম ১২২
কবিতা সিংহ ১২২
কবীর চৌধুরী ১৮৫, ১৯৭
কামাল লোহানী ১৮৫
কামাল চৌধুরী ১১৬, ১১৯, ১৫১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ৩৩৬
কামাল পাশা ১০৯
কামাল উদ্দিন আহমদ ৩৩৯
কামাল উদ্দিন আহাম্মদ ১৮৫
কায়েস আহমদ ১৭২
কাইয়ুম নিজামী ১৮৫
কাইফি আজমি ১১৬
কাব্য কবির ৩৩৭
কামরুল বাহার আরিফ ১১৯
কামরুল হাসান ১১৮
কায়সুল হক ১১৭, ১২৭, ২১২
কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৮, ১৪১
কাজী রোজী ১১৭, ১৩১
কাজী গোলাম মাহাবুব ৭৫
কাজী আহমেদ কামাল ১৮৫
কাজী নজরুল ইসলাম ১০১, ১০২, ১০৭, ১১০, ১১১, ১১২, ১৪৭, ১৯৯, ২০০, ২৪৫, ২৭৪, ৩০৯, ৩৩৬, ৩৪০
কাজী ফজলুর রহমান ১৫৬
ক্যাসান্ড্রা ২৩১
ক্লাইটেমনেস্ত্রা ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪
কৃষ্ণধর ১২২
কৃষ্ণ-মুহম্মদ, আজাদ কামাল ১০৯
কেয়া চৌধুরী ১৮৫
কে এম নুরুল হুদা ১৮৫
কে এম সফিউল্লাহ ১৮৫
কে. এম. আলী আজম ৩৪০
কেরামত আলী বিশ্বাস ৩৩৩

কেশবচন্দ্র সেন ১১, ১৬, ২২, ৩০

খ

খন্দকার নূরুল আলম ৬৫
খলিল ৪৯
খালেদ চৌধুরী ১১৯
খালেদ এদিব চৌধুরী ১১৭, ১৫০, ১৫৭, ১৬১
খালেদ হোসাইন ১১৮
খালেদ হামিদী ১১৮
খালেক বিন জয়েনউদ্দীন ৩৩৭
খান আলতাফ হোসেন ভুলু ১৮৫
খান বাহাদুর আবদুল মোমেন ৫০
খান সারওয়ার মুরশিদ ৯৩
খাজা শাহাবুদ্দীন ৪৭
খালিদ মারুফ ১৫৬
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস ২৫৪
খুররম খান পন্নী ৭৩
খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন ১৮৫

গ

গফুর মিয়া ২৮১
গাজী মনসুর আজিজ ১১৯
গাজী মাজহারুল আনোয়ার ৩৩৯
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ৩৩৯
গোলাম নবী পান্না ৩৩৭
গোপীনাথ সাহা ১৭, ২৫
গোলাম মোস্তফা ৯৩
গোলাম মুরশিদ ২৭৭
গোলাম শফিক ১৫৬
গোবিন্দ হালদার ৩৩৯
গোবিন্দচন্দ্র রাজবংশী ৩৪০
গোলাম কিবরিয়া পিনু ১১৮

চ

চন্দ্রভানু ১৭২
চন্দন কৃষ্ণ পাল ৩৩৭
চণ্ডীদাস ৩৫
চানক্য বাড়ৈ ১১৯
চার্লস সোরলি ১৪৭
চার্লস ডারউইন ১৫
চিত্তরঞ্জন দাশ ২৫, ৩৪, ৪৯, ১৯৩
চৌএন লাই ৪২

ছ

ছানোয়ারা বেগম ৩৩৩
ছাত্তার ৩১৭, ৩২০, ৩২২, ৩২৩
ছাকাত ৩২৪

জ

জরিনা আখতার ১১৭, ১৩২
জহির উদ্দীন ৩১৭
জহির রায়হান ১৬৪, ১৬৬
জগদীশ চক্রবর্তী ১১৬
জগলুল হায়দার ৩৩৭
জসীম মেহবুব ৩৩৭
জসীম উদ্‌দীন ১২৩
জওহরলাল নেহেরু ৪১, ৪৪, ৭৭, ১০৫, ১৮৪, ২০১
জয়দুল হোসেন ১১৮
জয়নাব বেগম ৫৮
জর্জ ওয়াশিংটন ৪৪
জাফর ওয়াজেদ ১১৬, ১১৮, ১৪২, ৩৩৭

জাকারিয়া চৌধুরী ১২০
জাহাঙ্গীর আলম ৩৩৭
জামাল হোসেন ১১৯
জাহাঙ্গীর আলম জাহান ৩৩৭
জাকির তালুকদার ১৫৬
জাহিদ মুস্তাফা ১১৮
জাহিদ হায়দার ১১৮, ১৫১
জাহিদুর রহিম ৯২, ৯৫
জাহিদুল হক ১১৭, ১৩০, ১৫১
জিন্নাহ চৌধুরী ৩৩৭
জিল্লুর রহমান সিদ্দিক ১১৭, ১২৫, ১৪৯, ১৮৫
জিয়াউর রহমান ২০৫
জীবনানন্দ দাশ ৩৪০
জুনান নাশিত ১১৯
জুলফিকার মতিন ১৫৬
জে.এফ. কেনেডি ১৯৭
জ্যোতি প্রকাশ দত্ত ১৭২
জ্যোতির্ময় সেন ৩৩৭
জ্যোতির্ময় মল্লিক ৩৩৭
জেমস জে নোভাক ৯৫
জোবায়ের মিলন ১১৯

ঝ, ট

ঝর্না রহমান ১১৮, ১৪৩, ১৫৬
টোকন ঠাকুর ১১৯
টি. এইচ. সিকদার ৩৩৯
টিক্কা খান ১২০, ৩০৯, ৩৪৭

ড

ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া ১৮৬
ড. শেখ আবদুল সালাম ১৮৬
ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী ১৮৬
ড. আতিউর রহমান ১৮৫
ড. অতুল সুর ২৭৫, ২৭৬
ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ ১৮৬
ড. এম এ মাননান ১৮৫
ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ১৮৫
ড. এম. শাহ্ নওয়াজ আলি ১৮৬
ড. এএইচএম মোস্তাফিজুর রহমান ১৮৬
ড. মসিউর রহমান ১৮৬
ড. মীজানুর রহমান ১৮৬
ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী ১৮৬
ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ২৭৬
ড. জনসন ৩২
ডা. এস এ মালেক ১৮৬
ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল ১৮৬
ডা. কামরুল ইসলাম খান ১৮৬
ডি. এল. রায় ৯১

ত

তমিজুদ্দিন ৫৩
তপন বাগচী ১১৯, ৩৩৯
তপন রায় চৌধুরী ২৭৮
তপংকর চক্রবর্তী ৩২৭
তানসেন ৫৬, ৮৩, ২০৬
তারাপদ রায় ১২২
তারাশঙ্কর তর্করত্ন ৩৬
তালুকদার রায়হান ১১৯
তাহমিনা কোরাইশী ৩৩৭
তাজউদ্দীন ১৯৭, ১৯৯, ৩০৯
তারিক সুজাত ১১৮, ১৪৪, ২৭৩

তিলাম (বিডিআর) ৩২৩
তিতাশ চৌধুরী ১১৭
ত্রিদিব দস্তিদার ১১৮, ১৩৬
তুষার দাশ ১১৮, ১৪১
তুষার কবির ১১৯
তোফায়েল আহমেদ ১৮৬

থ

থমাস জেফারসন ৪৪
থায়েস্টেস ২৩২

দ

দবিরুল ইসলাম ৬৯
দক্ষিণারঞ্জন বসু ১১৬, ১২২, ১২৩
দান্তে ৯৫
দাউদ হায়দার ১১৭
দিলওয়ার ১১৭
দিলওয়ার চৌধুরী ১২০
দিলওয়ার হাসান ১৫৬
দিলারা মেসবাহ ১৫৬
দিলারা হাফিজ ১১৮, ১৩৪
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩৪০
দীনবন্ধু মিত্র ৩৭
দীপ মুখোপাধ্যায় ৩৩৮
দীপক সাহা ৩৩৮
দীপংকর চক্রবর্তী ৩৩৮
দুখু বাঙাল ৩৩৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩২
দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় ৩২২
দেলওয়ার বিন রশিদ ৩৩৮
দৌলত কাজী ১৪

ধ, ন

ধ্রুব এষ ৩৩৮
ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু ১৮৬
নবগোপাল মিত্র ৮৪
নচিকেতা ভরদ্বাজ ১২১
নইমউদ্দিন ৬৯
নবাব মামদোত ৬৩
নবাব হাবিবুল্লাহ ৬০
নবাবজাদা নসরুল্লাহ ৬০
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১২২
নওরোজী ১৭৫
নরমান ব্রাউন ২৬৬
নওশাদ নূরী ১১৬
নয়ীম গওহর ৩৩৯
নাফে নজরুল ৩৩৮
নাসের মাহমুদ ৩৩৮
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১২২
নারায়ণচন্দ্র ৩৭
নাসরীন জাহান ১৭২
নাহার মনিকা ১৫৭
নাজমুল আহসান ১১৯
নাসির আহমেদ ১১৮, ১৩৩, ১৫১
নাসিরুদ্দীন তুসী ৩৩৮
নাহিদা আশরাফী ১১৯
নাজিম হিকমত ৯০
নাজিমুদ্দীন ৪৭, ৫২, ৬৩, ৬৪, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১
নির্মলেন্দু গুণ ১১৬, ১১৭, ১৫৪, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৪৫, ২৯৪, ৩৩৮
নিশিকান্ত মজুমদার ১২২
নিতাই সেন ১১৯

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১২২
নীহার মোশাররফ ৩৩৮
নীহাররঞ্জন রায় ২৭৫, ২৭৬
নীলিমা ইব্রাহিম ১৮৬, ১৯৭
নুরুল ইসলাম ৩২০, ৩২২
নূরে আলম সিদ্দিকী ৮১, ১৮৬
নূর মোহাম্মদ খান ৩৩৯
নূরুল আমিন ৭১
নূরুল হুদা ১৬৯
নূরুদ্দিন ৫০, ৫৮, ৬০, ২৭২
নূহ-উল-আলম লেনিন ১১৭, ১৩৮
নেওয়াজিস হোসেন ৩৩৯
নেলসন ম্যান্ডেলা ৪৪

প

পরমানন্দ সরস্বতী ১২০
পাইলেডিস ২৩৪, ২৩৫
পারভেজ হোসেন ১৭২
প্রেমেন্দ্র মিত্র ১২০
পূর্নেন্দু পত্রী ১২২
প্যাট্রিস লুমুম্বা ১৯৭
পৃথ্বীশ চক্রবর্তী ৩৩৮
পিয়াস মজিদ ১১৯
প্রবীর বিকাশ সরকার ৩৩৮
প্রথম চৌধুরী ২৭৬
প্রণব মুখোপাধ্যায় ১৮৬, ১৯৮
পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২২, ৩৩৮
পীযূষ কান্তি বড়ুয়া ৩৩৮

ফ

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ৯০
ফরহাদ মজহার ১৫০
ফজল-এ-খোদা ৩৩৮, ৩৩৯
ফজল শাহবুদ্দিন ১৪৯
ফজলুল কাদের চৌধুরী ৫৩, ১৭৬
ফজলুল হক খান ১৮৬
ফজলুল হক সরকার ১১৭
ফরিদ আহমদ দুলাল ১১৮
ফকির ইলিয়াস ১৮৬, ২০৪
ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ওরফে রাণু ৭৭, ১১৩, ১৮৯
ফারুক হোসেন ৩৩৮
ফারুক আলমগীর ১১৭
ফারুক নওয়াজ ৩৩৮
ফারুক মাহমুদ ১১৮
ফারহান ইশরাক ১১৯
ফেরদৌস হোসেন ভূঁইয়া ৩৩৯
ফেরদৌস নাহার ১১৮
ফেলিক্স ইউরলভ ৯৮

ব

বদরুল হায়দার ১১৮
বঙ্গ রাখাল ১১৯, ২৮৬
বদরুদ্দিন ১৭৬
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ১১৬, ১২০
বশীর আল হেলাল ১৭২
বকুল আশরাফ ১৫৬
বকুল হায়দার ৩৩৮
বঙ্কিমচন্দ্র ২০, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ২৭৬
বৃন্দাবন দাস ২৭৮
ব্রত রায় ৩৩৮
বেবী মওদুদ ১১৯, ১৮৬
বাপ্পী লাহিড়ী ৩৪০
বার্নার্ড শ ৩২

বামাচরণ চক্রবর্তী ২৫৪
বাসুদেব খাস্তগীর ৩৩৮
বায়তুল্লাহ্ কাদেরী ১১৯, ১৪৪, ১৪৫
বদিউল রহমান ১৮৬
বীরেন মুখার্জী ১১৯
বুলবুল চৌধুরী ১৭২
বুলবুল মহালানবীশ ১১৯
বুলবুল খান মাহবুব ১৫০
বিদ্যাপতি ২৭৭
বিনোদ বেরা ১১৬, ১২২
বিবেকানন্দ ২০, ৩৪, ৩৯
বিপ্রদাস বড়ুয়া ১৬১, ১৭২
বিপুল বড়ুয়া ৩৩৮
বিমল গুহ ১১৮, ১৩৩
বিমলচন্দ্র ঘোষ ১২০
বিলু কবীর ১৫৬
বিষ্ণু দে ১২২
বেদারউদ্দিন ৭২
বেলাল চৌধুরী ১১৭, ১২৮, ১৪৯, ৩৩৮
বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ১৮৬

ভ

ভাস্কর চৌধুরী ১১৯, ১৭২
ভাগ্যধন বড়ুয়া ১১৯
ভীষ্মদেব চৌধুরী ১১৯
ভুট্টো ১৭৫, ৩০৯, ৩১৪

ম

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১২২
মঞ্জু সরকার ১৭২
মধুসূদন দত্ত ৩২, ৩৭, ২৬৫
মন্নুজান ৫৮
মনজুরে মওলা ১১৭, ১২৯
মনজুর কাদের ৩৩৮
মনীন্দ্র রায় ১২১
মনীষ ঘটক ১২০
মনু গান্ধী ৬৬
মঈনুল আহসান ১৬৯, ১৭০
মমতাজ উদদীন আহমদ ১৮৬
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী ১৮৬
মযহারুল ইসলাম ১১৭, ১২৫, ১৫৭, ২৫৪, ২৯৪
মওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৮৪
মওলানা ভাসানী ১৮, ২৬, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৬৯, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ১০৪
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ১২২
মকসেদ আলী সাঁই ৩৩৯
মসলেম ৩১৭, ৩২০, ৩২২, ৩২৩
মসউদ-উশ-শহীদ ৩৩৯
মহাদেব সাহা ১১৬, ১১৭, ১২৯, ১৩০, ২০২, ২১৭
মহাত্ম গান্ধী ৪৪
মহীবুল আজিজ ১১৮
ময়ুখ চৌধুরী ১১৭, ১৪০
মদি ৮৮
মনি হায়দার ১৫৬
মফিজ ৭৫
মফিজুল ইসলাম খান ১২০
মণীষ ঘটক ১১৬
মশিউল আলম ১৭২
মহিউল ইসলাম মুন্টু ৩২২
মহিউদ্দিন আকবর ৩৩৮
মহিউদ্দিন আহমদ ১৮৬
মজিদ মাহমুদ ১১৮, ২৮৭, ২৯০, ২৯১, ২৯৩, ২৯৯, ৩৩৩

মতিন রায়হান ১১৮
মতিউর রহমান ১৮৬, ২৪৫, ৩১৬
মতিউর রহমান নিজামী ৩১৬
মালেক মাহমুদ ৩৩৮
মালেকা বেগম ১৮৬
মাইকেল ১৪৬
মানকী শরীফ ৭৬
মানজুর মুহাম্মদ ৩৩৮
মামুন সারওয়ার ৩৩৮
মাও সে তুং ৯৫
মাওজেদং ৭, ৪২
মারুফ রায়হান ১১৮
মারুফুল ইসলাম ১১৮, ১৪৪, ৩৩৮
মাওলানা আকরম খাঁ ৫২
মার্কস ৪২, ৪৪
মাখন ৫০
মাসুদ পথিক ১১৯
মাসুদা ভাট্টি ১৮৬
মাসুদুজ্জামান ১১৮
মাসুম আওয়াল ৩৩৮
মাহফুজ ফারুক ৩৩৮
মাহফুজ রিপন ১১৯
মাহবুব রেজা ১৫৬
মাহবুব আলম ১৫৬
মাহবুব উল আলম চৌধুরী ১১৭, ১২৪, ১২৫
মাহবুব কবির ১১৯
মাহবুব সাদিক ১১৭, ১৩০
মাহবুব মিত্র ১১৯
মাহবুব তালুকদার ১৭৩, ১৭৪
মাহমুদ রেজা চৌধুরী ১৮৬
মাহমুদ আল জামান ১১৭
মাহমুদ উল্লাহ ৩৩৯
মাহমুদ কামাল ১১৮
মাহমুদ হাফিজ ১১৯
মাহমুদউল্লাহ ৩৩৮
মাহমুদুল হক ১১৬
মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক ৩৩৮
মানিক মজুমদার ১১৯
মাকিদ হায়দার ১১৭, ১৩৯, ১৫০
মার্টিন লুথার ৩৪
মি. গোলাম কবির ৭০
মিস্টার ক্লিমেন্ট এটলি ৫৪
মিনার মনসুর ১১৮, ১৪৩, ১৮৬
মিল্টন বিশ্বাস ১৮৬
মিয়া ইফতিখার উদ্দিন ৭৬
মির্জা গালিব ৯৫
মিজানুর রহমান মিথুন ৩৩৮
মিহির মুসাকী ১১৯
মিতুল সাইফ ৩৩৮
মুদনূল (মূল নাম মুহম্মদ নূরুল হুদা) ২৫৩
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ১৮৬
মুস্তাফা মাসুদ ৩৩৮
মুস্তাফিজ শফি ১৮৬
মুনতাসীর মামুন ৮২, ৯৫, ২৫৩, ২৫৪
মুকুন্দবিহারী মল্লিক ১৯৩
মুসা সাদিক ১৮৬
মুসলিম তমদ্দুন ৯৪
মুহম্মদ নূরুল হুদা ১১৬, ১১৭, ১৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ২৬৫, ৩০৭
মুহম্মদ শফিকুর রহমান ১৮৬
মুহম্মদ সবুর ৯১
মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৮৬
মুহাম্মদ সামাদ ১১৮, ১৪১

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ১০২
মুজাম ৩২০
মুক্তি গোমেজ ৩৩৭
মুজিব মেহেদী ১১৯
মুজিব ইরম ১১৯
মুজিবুল হক কবীর ১১৭
মোহাম্মদ শাহজাহান ১৮৭
মেনেলাউস ২৩০
মৌলভী শেখ আবদুল হালিম ১১৬
মো. আজিজ-উল-ইসলাম ৩৪০
মো. মাহবুবুর রহমান ১৮৭
মো. সাখাওয়াত হোসেন ১৮৭
মো. জাকির হোসেন ১৮৭
মো. সিরাজুল ইসলাম ৩৪০
মোস্তফা তোফায়েল ১১৯
মোস্তফা জামান আব্বাসী ৩৪০
মোস্তাফা জব্বার ১৮৭
মোনায়েম সরকার ১১৯, ১৮৫, ১৮৭
মোমতাজ আলী খান ৩৩৯
মোরশেদ কমল ৩৩৮
মোল্লা জালালউদ্দিন ৬৯
মোকাদ্দেস ৩২৪
মোশাপদ আলী ৩৩৯
মোশারফ হোসেন ভুঞা ১১৯
মোশতাক আহমেদ ৩৩৮
মোসাদ্দেক আহমেদ ১৫৬
মোহন মিয়া ৫৩
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৭, ৮, ২৫, ২৭, ৪১
মোহাম্মদ তোয়াহা ৬৯
মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ৩৪০
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ৪১, ৪৭, ৭১
মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৯৩
মোহাম্মদ নাসিম ১৮৭
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ৬১
মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ১৮৭
মোহাম্মদ মারুফ ১১৯
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১১৭, ৩৩৯
মোহাম্মদ রফিক ১১৭, ১৩৭, ১৫০
মোহাম্মদ সাদিক ১১৮, ১৩৫
মোহাম্মদ হাননান ১৮৭
মোয়াজ্জেম চৌধুরী ৬১
মোজাম্মেল হক নিয়োগী ১৫৫, ১৫৬
মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১২২
মোহিতলাল মজুমদার ১০৩
মোতাব্বের রহমান ৩৩৩

য

যশবন্ত সিংহ ৪১
যাহিদ হোসেন ১৮৭
যিশু ২৭, ৮৯, ১৭২, ১৮৪

র

রবীন্দ্রনাথ ৮, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬, , ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১৫৩, ১৯৩, ২৪১, ২৬৫, ২৭৪, ২৭৮, ৩৪০, ৩৪৯
রথীন্দ্রনাথ রায় ৩৪০
রণেশ মৈত্র ১৮৭
রণেশ দাশগুপ্ত ২৪৪
রত্নেশ্বর হাজরা ১২২
রবার্ট কেনেডি ১৯৭
রবীন্দ্র গোপ ১১৭, ১৩২
রব্বানী চৌধুরী ৩৩৮

রমজান মাহমুদ ৩৩৮
রওশন ৩২৪
রকনদ (রফিক নওশাদ) ২৫৩
রশীদ হায়দার ১৫৬, ১৬১, ১৮৭
রহমান হেনরী ১১৯
রহীম শাহ ১১৯, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪৪
রজনীকান্ত ৩৪০
রফিক আজাদ ১১৭, ১৩৬, ১৩৭, ২৯৪
রফিকুর রশীদ ১৫৬
রফিকুল ইসলাম ৯৪, ১৮৭
রফিকুল হক ৩৩৮
রবিউল হুসাইন ১১৭, ১২৯
রকিবুল হাসান ১১৯
রহিমা আখতার কল্পনা ১১৮
রতনতনু ঘাটী ৩৩৮
রুবী রহমান ১১৭, ১১৯, ১৩৭, ১৩৮
রুহুল আমিন ১৭৭
রূপার্ট ব্রুক ১৪৭
রাবেয়া খাতুন ১৭১
রামেন্দ্র দেশমুখ্য ১২২
রাশেদ রউফ ৩৩৮
রাশেদ রহমান ১৫৬
রাশেদ খান মেনন ১৮৭
রাসেল আশেকী ১১৯
রাধারাণী দেবী ১২২
রামমোহন ৩২, ৩৯
রামকৃষ্ণ ৩২
রাহাত খান ১১৬, ১৫৬, ১৮৭
রাজনারায়ণ বসু ৮৪
রাজলক্ষ্মী দেবী ১২২
রাজীব আহসান চৌধুরী ১৫০
রাজীব নূর ১৫৬
রাজীব গান্ধী ১৯৭
রাজু আলাউদ্দীন ২০৮
রিজিয়া রহমান ১৭২
রিপন আহমদ ফরিদী ৩৩৮
রিফাত নিগার শাপলা ৩৩৮
রেজা খান ৩৩৩
রেজাউর রহমান ১৫৬
রেজাউল করিম চৌধুরী ৩৩৯
রেণু ৫৭, ৬২, ৬৭, ৭৮, ৩৩৫
রোকনুজ্জামান খান ৩৩৮
রোমেন রায়হান ৩৩৮
রোকেয়া খাতুন রুবি ৩৩৮

ল

লাল মিয়া ৫৩
লর্ড মাউন্টব্যাটেন ৬৪
লর্ড কার্জন ২৭৭
ল্যার্টিস ২২৫
লিয়াকত আলী খান ৬৩, ১৮২
লিয়াকত আলী লাকী ১১৯
লুদু ওরফে লুৎফর রহমান ৭৯, ৮০
লুইপাদ ২৭৬
লুৎফর রহমান রিটন ১১৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০
লে. কর্নেল মহিউদ্দিন সেরনিয়াবাত ১৮৭
লেনিন ৭, ৪২, ৪৪, ৯৫

শ

শ.ম শামসুল ইসলাম ১১৯
শ্যামল গুপ্ত ৩৩৯
শ্যামসুন্দর শিকদার ১১৯
শ্যামাপ্রসাধ মুখার্জি ৪৮

শঙ্খ ঘোষ ১২২
শওকত আলী ১৭২
শওকত ওসমান ১১৬, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৯, ১৮৭, ২০০
শওকত মিয়া ৭৫
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০, ৩৩, ৯০
শরীফ খান ১৫৬
শরতচন্দ্র বসু ১৭৪
শশাঙ্ক এস ব্যানার্জী ৯৮
শহীদ আখন্দ ১৭১
শহীদ কাদরী ১১৭, ১৩৬, ১৪৯
শহীদুল জহির ১৭১
শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১২২
শফিকুর রহমান ৩২০, ৩২৩, ৩৩২
শরিফ মিয়া ২৮১
শহীদুল ইসলাম ৩৩৯
শুচি সৈয়দ ৩৩৮
শাম্মী তুলতুল ৩৩৮
শাকের চৌধুরী ১৭২
শাহেদ কায়েস ১১৯
শামস চৌধুরী রুশো ৩৩৮
শামস আল্‌দীন ১১৯
শামসুর রাহমান ১১৬, ১১৭, ১২৬, ২০৬, ২০৭, ২১০, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২১৭, ২৩৫, ২৩৬, ২৫৬, ২৯৪, ৩৩৮, ৩৩৯
শামসুল হক ৪৩, ৪৪, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ১২২
শামসুল হুদা হারুন ১৮৭
শামস-ই-সিরাজ আফীফ ২৭৭
শামীম রেজা ১১৯
শামীম আজাদ ১১৮
শামীম খান যুবরাজ ৩৩৮
শারমিন সুলতানা রীমা ৩৩৮
শাহ আলী সরকার ৩৩৯
শাহ আজিজ ১৭৬
শাহ এ এম এস কিবরিয়া ১৮৭
শাহ্‌নাজ মুন্নী ১১৯, ১৫৭
শাহনেওয়াজ চৌধুরী ৩৩৮
শাহাবুদ্দীন নাগরী ১১৯, ৩৪৯
শাহজাহান কিবরিয়া ১১৯
শাহাদাৎ শাহেদ ৩৩৮
শাহাদাৎ সরকার ৩৩৮
শাহাদুজ্জামান ১৭২
শাহাদত বখত শাহেদ ৩৩৮
শাহাজাদী আঞ্জুমান আরা ১১৮
শাহরিয়ার কবির ১৭২
শাহীন রেজা ৩৩৮
শাহীন আখতার ১৭২
শান্তা মারিয়া ১১৯
শাফিকুর রাহী ৩৩৮
শাকিরা পারভীন ১১৯
শান্তিকুমার ঘোষ ১১৬, ১২২
শিবলী মোকতাদির ১১৯
শিবু কান্তি দাস ৩৩৮
শিহাব শাহরিয়ার ১১৮
শিহাব সরকার ১১৭, ১৪০, ১৫১, ১৫৬
শিশির ভট্টাচার্য ৩৩৬
শেক্সপিয়ার ২৩, ৩২, ৯৫,
শেখ রেহানা ১৮৭, ২০৫, ২৮৯
শেখ আবু নাসের ৬০
শেখ মুজিবুর রহমান ৭, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৩১, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৮৭, ৯৬, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১১০, ১১১,

১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১৩২, ১৩৯, ১৪৪, ১৫৫, ১৭৭, ১৮৮, ১৯০, ২০০, ২০৭, ২১২, ২৩৯, ২৪৫, ২৫২, ২৫৪, ২৫৮, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯২, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৬০,
শেখ রবিউল হক ১১৯
শেখ লুৎফর ১৩৯, ১৫৬
শেখ কামাল ১০০, ১০৮, ১০৯
শেখ শাহাদাত হোসেন ৬২
শেখ হাফিজুর রহমান ১১৯
শেখ হাসিনা (হাচিনা) ৪৫, ৪৬, ৭৮, ৮২, ৯০, ১১১, ১২৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ২২০, ২৮৯, ৩৩৫
শেখর দত্ত ১৫৬, ১৮৭
শ্রীচৈতন্য ২৭
শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস ২৭৯

স

সফি ৩২০, ৩২২
সলিল চৌধুরী ৩৩৯
স.ম. শামসুল আলম ১৫৬, ৩৩৮
স্যার উইনস্টন চার্চিল ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫৪
স্যার ওয়াল্টার স্কট ৩২
সম্রাট বাবর ৫৬, ১৫৫
সম্রাট শাহজাহান ৫৫
সক্রেটিস ৯৫, ৩০১
সন্তোষ গুপ্ত ১৮৭, ২০১
সন্তোষ কুমার ঘোষ ২৭৯
সন্তোষ ঢালী ৩৩৮
সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১১৬, ১২১
সত্যেন্দ্রনাথ ৪০
সঞ্জীব পুরোহিত ১১৯
সনজীদা খাতুন ৯১
সব্যসাচী ১০০, ১০৮, ১০৯
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১২২
সমর সেন ১২২
সমীর আহমেদ ১৫৬
সমুদ্রগুপ্ত ১৫০
সরদার আলাউদ্দিন আহমদ ৩৩৯
সরদার ফজলুল করিম ১৭৫, ১৮৭, ২০০
সরদার রজ্জবল আলী দেওয়ান ৩৩৯
সরকার আমিন ১১৮
সরকার মাসুদ ১১৮
সাদকার (সাযযাদ কাদির) ২৫৩
সাধনা মুখোপাধ্যায় ১২২
সাদেকা বেগম ৫৮
সারোয়ার কবীর ১৮৭
সালেহ মুজাহিদ ১১৯
সোহরাব পাশা ১১৮
সান ইয়াৎ-সেন ৯১
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ১১৮, ১১৯
সাইফুদ্দিন চৌধুরী ৭৮
সানাউল হক ১১৯
সানাউল হক খান ১১৭
সাইয়িদ আতিকুল্লাহ ১৪৯
সারওয়ার-উল-ইসলাম ৩৩৮
সালভাদর আলেন্দে ২০৩
সালাউদ্দিন বাদল ১২০
সালাহ্‌উদ্দীন আহমেদ ২৭৮

সাগর লোহানী ১১৯
সাজজাদ আরেফিন ১১৮
সাফিয়া খন্দকার রেখা ১১৯
সাহিদা বেগম ১৫৬
সাজিদ মোহন ৩৩৮
সঞ্জিত দে ৩৩৮
সুরেন ব্যানার্জি ৬০
সুনীল বসু ১২২
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১২২, ১৫৬, ১৬০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যয় ২৭৬
সুপ্রতিম বড়ুয়া ৩৩৮
সুব্রত বড়ুয়া ১১৯, ১৫৬, ১৭২
সুবার সিংহ রায় ১৮৭
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৩৪০
সুভাষচন্দ্র বসু ২০, ২৩, ২৪, ২৫, ১০৩, ১৯৩, ২৭৫
সুমন সরদার ১১৮
সুলতান মাহ্‌মুদ ওরফে আতিয়ার ৩৩১
সুলতানা কামাল ১৮৭, ২০৩
সুকান্ত ভট্টাচার্য ৩৪০
সুশান্ত মজুমদার ১৭২
সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৫৬
সুকুমার সেন ২৭৬
সুকুমার বড়ুয়া ৩৩৮, ৩৩৯
সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৮৭
সুচরিত চৌধুরী ১৭১
সুজন বড়ুয়া ১৫৬, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৬
সুজন হাজং ১১৯
সুজাউদ্দিন কায়সার ১১৭
সুফিয়া কামাল ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১৮০
সুহিতা সুলতানা ১১৮
সুচিত্রা মিত্র ৯৭
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৬
সৌম্য সালেক ১১৯
সৌমিত্র শেখর ১৮৭, ১৯৯
সোহেল বীর ৩৩৮
সোবাহান মৌলানা ৩১৬
সোলায়মান সুমন ১৫৬
সোহরাব হোসেন ৭২, ১৩৪
সোহরাব হাসান ১১৮, ১৩৪, ১৫১, ১৮৭
সোহরাওয়ার্দী ২৪, ২৬, ৪৭, ৫২, ৫৩, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৯১, ১০৪, ১০৬, ১৭৪, ১৮৩, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৮, ১৯৯, ২৭৫
সোহাগ সিদ্দিকী ১১৯, ২৫২
সেলিনা হোসেন ১১৬, ১৫৬, ১৫৭
সেলিম মোরশেদ ১৭২
সেলিম চিশতী ৫৬
সিদ্ধেশ্বর সেন ১২২
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৮
সিরাজুল ইসলাম মন্টু ৩৩২
সিরাজুল ইসলাম মুনির ১৫৭
সিরাজুল ফরিদ ৩৩৮, ৩৩৯
সিকদার আমিনুল হক ১১৭, ১৩৬, ১৫০
সিকদার নাজমুল হক ৩৩৮, ৩৩৯
সিকান্দার আবু জাফর ১১৭, ১২২, ১৩১, ২৯৪, ৩৩৯

সিদ্দিকুর রহমান ১১৯
সৈকত হাবীব ১১৯
সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন ১৮৭
সৈয়দ আবুল মকসুদ ২৮৭, ২০৪
সৈয়দ আল ফারুক ৩৩৮
সৈয়দ ইকবাল ১৫৬, ১৬২, ১৬৩
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৬৯
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ১৭২, ১৮৭, ২০৫
সৈয়দ মুজতবা আলী ২৭৯
সৈয়দ শামসুল হক ১১৭, ১২৭, ১২৮, ১৫৬, ২৯৪, ৩৩৯
সৈয়দ শামসুল হুদা ৩৩৯
সৈয়দ খালেদুল আনওয়ার ৩৩৮
সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ১৭৬
সৈয়দ হাসান ইমাম ২৮৭, ২০২
সৈয়দ জাহিদ হাসান ১৮৭
সৈয়দ তারিক ১১৮
স্বপন কুমার রায় ৩৩৮

হ

হযরত ওসমান ২০৬, ২০৭, ২১৩, ২১৪
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২
হরলাল রায় ৩৩৯
হারেজ উদ্দীন ৩৩১
হাজেরা বেগম ৫৮
হাবীবুল্লাহ সিরাজী ১১৭, ১৩৯, ১৫১, ২০৮, ২০৯, ২১০
হারুন উর রশীদ ১৫৬
হারুন হাবীব ১৭২, ১৮৭
হাসনাত আব্দুল হাই ১৭২
হাসনাত আমজাদ ৩৩৮
হাসান ফেরদৌস ১৮৭
হাসান আল আবদুল্লাহ ৩৩৮
হাসান আজিজুল হক ১৮৭, ২০৪
হাসান রাউফুন ৩৩৮
হাসান হাফিজ ১১৮
হাসান হাফিজুর রহমান ১১৭, ১২৬, ২৯৪
হায়াৎ মামুদ ১১৭, ১২৯
হাফিজ রশিদ খান ১১৮
হাফিজুর রহমান ৩৩৯
হামিদ কায়সার ১৭২
হারিসুল হক ১১৮, ১৪৩
হালিম আজাদ ১১৮, ১২০, ১৩৪, ১৫১
হাশেম ৪৪
হাবীবুর রহমান ১২৩, ৩৩৯
হালিমা খাতুন ৫৮
হুমায়ূন কবীর ১১২
হুমায়ূন কবীর ঢালী ৩৩৮
হুমায়ুন আজাদ ১৫৬
হেনরী স্বপন ৩৩৮
হেলাল হাফিজ ১৫০
হোমার ১৫, ২১৭
হোচিমিন ৪২